বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন

রিপোর্ট

ফাল্গুন, ১৩৯৪
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮
মূল্য ৫০.০০ টাকা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
গ্রন্থাগার
সংযোজন সংখ্যা ... ১৪১৭৮
তারিখ ... ৯. ৫.০৫
পুস্তক নং ...

ভূমিকা

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা ও বর্তমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সকল স্তর ও সকল প্রকারের শিক্ষা সম্পর্কে যথোপযুক্ত সুপারিশ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৭ খৃস্টাব্দ, মোতাবেক ৯ই বৈশাখ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ শাঃ৮/১০এম-৮/৮৬/২৭৬/(১৫০)-শিক্ষা নম্বর বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। পরিশিষ্টে সংযোজিত বিজ্ঞপ্তিতে কমিশনের গঠন ও কমিশনের প্রতি প্রদত্ত নির্দেশাবলী এবং কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব নিম্নরূপ ঃ

(ক) শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থা ও বিরাজমান পরিস্থিতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চতর, মাদ্রাসা, কারিগরি ও প্রকৌশল এবং চিকিৎসাসহ সকল স্তরের শিক্ষার ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ়, সময়োপযোগী, উৎপাদনমুখী ও অপচয়হীন করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রণয়ন।

(খ) সুপারিশমালা প্রণয়ন করার সময় প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে এই বিষয়গুলি কমিশনের বিবেচনার জন্য চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে ঃ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পদ্ধতি ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন সমস্যা, ছাত্র বেতন, মাথাপিছু ব্যয় ও বৃত্তি, শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা, শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি, গবেষণা কর্ম, শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদা, কর্মমুখী শিক্ষা ও কর্মসংস্থান, পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন, শিক্ষার জন্য সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পদের সুষম বন্টন, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও উন্নয়ন এবং প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বিষয়।

(গ) দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং আন্তর্জাতিক চিন্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত সুদক্ষ মানবসম্পদ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়েও সুপারিশ করা।

সুপারিশমালা প্রণয়নের সময় কমিশনকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

তদুপরি বাংলাদেশে ইতিপূর্বে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটির রিপোর্ট-সমূহের সুপারিশমালা ও প্রস্তাবাবলীর এখনও পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি সে রকমের সুপারিশসমূহের মধ্যে কোন কোন সুপারিশ গ্রহণ করা যায়, সে বিষয়েও কমিশনকে অভিমত প্রদান করতে বলা হয়।

কমিশনের বিবেচ্য বিষয়সমূহ ব্যাপক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী বিধায় দ্রুত ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে কমিশন অনুধ্যান কমিটি গঠন করে কাজে অগ্রসর হয়েছে। প্রায় তিনশ জন সদস্য সম্বলিত ৩০টি অনুধ্যান ও বিশেষ কমিটির মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও সুধীসমাজের উল্লেখযোগ্য অংশ কমিশনের কাজে এবং সুপারিশ প্রণয়নে সহায়তা করেন।

জনমত যাচাইয়ের অন্যতম পন্থা হিসাবে এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে আমরা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকগণের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হই। কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে এবং অন্যান্য স্তরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও শিক্ষক-শিক্ষিকার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি। এছাড়া নানাস্থানে শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী, রাজনীতিবিদ প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা সভায় তাঁদের মতামত সম্পর্কে অবহিত হই। এসব সফর থেকে আমরা বহু মূল্যবান পরামর্শ পাই এবং শিক্ষা সংক্রান্ত ধ্যান ধারণার সঙ্গে পরিচিত হই। শিক্ষায়তনগুলির বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করি এবং গণসংযোগ ও জনমত যাচাইয়ের সুযোগ লাভ করি। এসব অভিজ্ঞতা আমাদের রিপোর্ট ও সুপারিশ-মালা প্রণয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

অনেক শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগী আমাদের কাছে চিঠি দিয়ে বা বিস্তারিত স্মারকলিপির সাহায্যে তাঁদের মতামত পাঠিয়েছেন। তদুপরি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা সম্পর্কে যে সব নিবন্ধ, সমালোচনা ও প্রস্তাবনা প্রকাশিত হয়েছে তাও আমরা যথাসম্ভব পর্যালোচনা করেছি। এসব স্মারকলিপি, পত্র-পত্রিকা, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষানুরাগীদের আলোচনা থেকে আমরা অনেক মূল্যবান অভিমত ও প্রস্তাব পেয়েছি।

এছাড়া শিক্ষা সেমিনার, আলোচনা সভা ও বৈঠকের ব্যবস্থা করে শিক্ষার বিভিন্ন দিক, সমস্যাবলী ও তাদের সমাধানের ব্যাপারে আমরা মতামত বিনিময় করি। এই মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করি যা আমাদের সুপারিশমালা প্রণয়নে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

ইউনেস্কোর সৌজন্যে শিক্ষা কমিশনের দুই সদস্যের দু'টি টীম ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন ও জাপান সফর করেন। এ সফরে তাঁরা উক্ত দেশসমূহের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন যা আমাদের কাজে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

অন্যান্য দেশের, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত রিপোর্টসমূহ এবং আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি কমিশনের সামনে ছিল। এই তথ্যাবলী আমাদের সিদ্ধান্তসমূহে পৌঁছার এবং সুপারিশমালা প্রণয়নে সহায়ক হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা সম্পর্কে দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির একটি নিজস্ব মতামত রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার দোষত্রুটি সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত, কিন্তু এসব ত্রুটি বিচ্যুতি দূর করার উপায় সম্পর্কে মতভেদ বিদ্যমান। বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে যেসব সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে আমরা সেগুলিই গ্রহণ করেছি। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ জটিল, ব্যাপক ও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন। এই পরিপ্রেক্ষিতে যে সব সমস্যা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে আমরা মনে করেছি সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিয়েছি এবং শিক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ দুর্বলতা ও দোষত্রুটি দূরীকরণের পন্থা নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছি।

বর্তমান রিপোর্টে শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন সম্পর্কে আমরা যথাসম্ভব দিক নির্দেশের চেষ্টা করেছি এবং নির্দেশিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের প্রস্তাবনাও করেছি। এই রিপোর্ট শিক্ষা সম্পর্কে কোনো পান্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ নয়, এতে আমাদের শিক্ষার সকল সমস্যা আলোচিত হয়েছে বা সমাধান দেয়া হয়েছে এমন দাবিও আমরা করিনা। রিপোর্টের সুপারিশসমূহ এজন্য পেশ করা হয়েছে যাতে এগুলির উপর ভিত্তি করে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়। যে সব ক্ষেত্রে উপযুক্ত মনে হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে সুপারিশগুলি কার্যকর করার পন্থার প্রস্তাবও করা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, সর্বস্তরের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী এবং দেশের জনসাধারণ শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে যে মৌল আশা ও আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন আমাদের এই রিপোর্টে তার প্রতিফলন ঘটেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে যে দুর্যোগ বিরাজমান তার আশু নিরসন প্রয়োজন। গভীর চিন্তা, দীর্ঘ আলোচনা ও বিভিন্ন মতামত বিশ্লেষণের পর শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে আমরা বর্তমান সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান অস্বস্তিকর পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে। আমরা আশা করি আমাদের সুপারিশসমূহ সরকার আশু বিবেচনা করে বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা গ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন অনুধ্যান কমিটি ও বিশেষ কমিটির সদস্যবৃন্দ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কমিশনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমরা ঋণী।

জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে আমাদের আভ্যন্তরীণ পরিভ্রমণ সফল করার জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মকর্তাগণ, শিক্ষা বিভাগ, বিভিন্ন জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় শিক্ষাব্রতী ও নেতৃবৃন্দ অকুন্ঠ সহযোগিতাদান এবং সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। আমরা তাঁদের সকলের কাজে কৃতজ্ঞ।

যে সব শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি এবং সমিতি আমাদের কাছে স্মারকলিপির মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান মতামত রেখেছেন তা আমরা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছি। তাঁদের সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষা সম্পর্কে যেসব গঠনমূলক নিবন্ধ, সমালোচনা ও প্রস্তাবনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি আমাদের কাজে বিশেষ সহায়ক হয়েছে। সেসব পত্র-পত্রিকার কাছেও আমরা ঋণী।

থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন ও জাপান সফরে আমরা যে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার জন্য ইউনেস্কো কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এই সফরের সুব্যবস্থা ও সহৃদয় আতিথেয়তার জন্য উক্ত রাষ্ট্রগুলির সরকারসমূহ এবং সেখানকার শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দের কাছে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমষ্টিগতভাবে আমাদের কাজে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। পরিশেষে শিক্ষা কমিশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে রিপোর্ট প্রণয়নের কাজে যথেষ্ট সহায়তা করেছেন। তাঁরাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

মফিজ উদ্দিন আহমদ

মোঃ আজহারুল হক	এ, কে, এম, শামসুল হুদা	মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন
আবুল কালাম মজুমদার	কাজী ফজলুল রহমান	মোঃ শামসুল হক
নুরুল ইসলাম	এম, এ, মান্নান এম, এ, রকীব	মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী
মোশাররফ হোসেন খান	জহিরুল হক ভূঞা	আবদুর রশীদ
বোরহান উদ্দিন আহমদ	আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন	মোহাম্মদ নুরুস সাফা
মুহম্মদ নুরুল হক	আ, হ, ম, করিম	জহিরুল ইসলাম ভূইয়া
টি, সি, মিয়া	মোঃ আবুল কাসেম	মোঃ ইউনুছ শিকদার
এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ	কিউ, এ, মনসুর	মোঃ নুরুল হক
মীর মোঃ আবুল হোসেন	নুরুদ্দীন আলমাসুদ	

তারিখ ঃ ঢাকা, শুক্রবার,
১৩ই ফাল্গুন, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ খৃস্টাব্দ।

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
ভূমিকা		
প্রথম অংশ :	সার-সংক্ষেপ	১—৪৫
দ্বিতীয় অংশ :	মূল রিপোর্ট	৪৭—৩৬২
অধ্যায় ১	শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৪৯
২	শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা	৫২
৩	প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা	৫৭
৪	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা	৭১
৫	মাদ্রাসা শিক্ষা	৯৩
৬	বিশেষ শিক্ষা	১০০
	(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা	১০০
	(খ) স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা শিক্ষা	১০৪
	(গ) দূর-শিক্ষণ	১০৬
	(ঘ) শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা	১০৭
	(ঙ) সঙ্গীত শিক্ষা	১১৪
	(চ) ললিত কলা শিক্ষা	১১৫
	(ছ) জনসংখ্যা শিক্ষা	১১৬
	(জ) কম্পিউটার শিক্ষা	১১৭
	(ঝ) নারী শিক্ষা	১১৯
৭	উচ্চ শিক্ষা	১২১
৮	বিজ্ঞান শিক্ষা	১৪১
৯	বাণিজ্য শিক্ষা	১৫১
১০	আইন শিক্ষা	১৫৬
১১	প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	১৬০
১২	কৃষি শিক্ষা	১৭৯
১৩	চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা	১৮৫
১৪	শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক	২০৬

বিষয়		পৃষ্ঠা
১৫	শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ	২১৩
১৬	গ্রন্থাগার	২১৮
১৭	শিক্ষক-শিক্ষণ	২২৩
১৮	পরীক্ষা ও মূল্যায়ন	২৪০
১৯	শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ	২৫৬
২০	শিক্ষক প্রসঙ্গ	২৬৮
২১	শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা	২৯৭
২২	শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বন্টন ও ব্যয়	৩৫০
২৩	পরিশেষ	৩৬২
	ভিন্নমত	৩৬৩
	পরিশিষ্ট	৩৬৯
	গেজেট বিজ্ঞপ্তিঃ বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা	
	কমিশনের গঠন ও সদস্যবৃন্দের তালিকা	৩৭৩
	ষ্টীয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা	৩৭৭
	অনুধ্যান কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দের তালিকা	৩৭৮
	কমিশন সচিবালয় গঠন ও কর্মকর্তাদের তালিকা	৩৯০

প্রথম অংশ : সার-সংক্ষেপ

সার-সংক্ষেপ

১। শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১. দেশবাসীকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন করে তোলা।

২. দেশে নিরক্ষরতার অবসান ঘটান।

৩. সমাজের প্রতি স্তরের মানুষকে নিজ নিজ মেধা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দেয়া।

৪. নেতৃত্বের গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সঞ্চার করে পারস্পরিক মর্যাদাবোধ সৃষ্টি করা।

৫. আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

৬. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করে আমাদের বিপুল জনশক্তিকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা।

৭. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ সাধনের সাহায্যে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মানুরাগ বৃদ্ধি করা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ সাধন করা।

৯. বিশ্বের সকল দেশের মানুষের আশা—আকাঙ্খার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের একাত্মবোধ সৃষ্টি করা এবং তাদের বস্তুনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক ও সমাজ-সচেতন মানুষে পরিণত করা।

১০. মৌলিক চিন্তার স্বাধীন প্রকাশে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করা এবং সমাজে মুক্ত চিন্তার বিকাশ ঘটান।

২। শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা

১. সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতি শিক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শিক্ষা ব্যবস্থা একদিকে যেমন সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষার ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়ে সমাজ, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। এদেশে শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কসূত্র রক্ষা করেছে। আমাদের দেশে ছাত্রসমাজের প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতা। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে এবং একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্রসমাজ ছিল পুরোভাগে।

২. বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছে নৈরাজ্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা। এর মূলে রয়েছে, অনভিপ্রেত আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিপর্যস্ত অর্থনীতি ও দারিদ্র্য, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, আদর্শ ও সততার অভাব, রাজনৈতিক

অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা প্রভৃতির প্রতিফলন ঘটছে শিক্ষাঙ্গনে। তদুপরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ছাত্রসমাজের ব্যবহার, ছাত্রদলগুলির জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি এবং শিক্ষাঙ্গনে উপস্থিতি, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শিক্ষকদের দলীয় মনোভাব প্রভৃতি অনভিপ্রেত পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলছে।

৩. শিক্ষা প্রশাসনে নিয়ম পালনে কঠোরতার অভাব, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টার অভাব এবং শিক্ষকদের কর্তব্য পালনে শৈথিল্য ও আদর্শ স্থাপনে ব্যর্থতা ইত্যাদি এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সঙ্গে জড়িত রয়েছে।

সুপারিশ

(১) রাজনৈতিক কারণে উদ্ভূত সমস্যাগুলি রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা উচিত। রাজনৈতিক সমস্যা শুধু রাজনীতিবিদরাই সমাধান করতে পারেন। এজন্য দরকার রাজনৈতিক নেতাদের আন্তরিক সদিচ্ছা, সংকল্প ও দৃঢ়তা। এর কোনো বিকল্প নেই।

(২) অন্যান্য সমস্যা শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন ও অভিভাবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে।

(৩) শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতা দূর করে কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে হবে এবং ন্যায়নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে।

৩। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক। **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা**

প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (৩-৫ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত) গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের গ্রামাঞ্চলে এর আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। তবে শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে ঢাকায়, অপরিকল্পিতভাবে বেশ কিছু সংখ্যক কিণ্ডারগার্টেন চালু রয়েছে। এদের বেশির ভাগেরই সামগ্রিক পরিবেশ শিক্ষোপযোগী নয়।

সুপারিশ

(১) দেশে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অনতিবিলম্বে চালু করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী খোলার সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও সরকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, শিল্প ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে এই কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

(৩) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং স্থানীয় জনগণের সাহায্য ও সহযোগিতা এ বিষয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৪) শিশু শিক্ষার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এই শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারিক জ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, অঙ্কন, হাতের কাজ, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয়ে প্রাথমিক প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

(৫) শহরাঞ্চলে কিণ্ডারগার্টেনগুলির সার্বিক উন্নতির জন্য সরকারী নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) শহরে ও শিল্পাঞ্চলে শ্রমজীবী সমাজের শিশুদের জন্য 'শিশুনীড়' গড়ে তোলা প্রয়োজন।

খ) প্রাথমিক শিক্ষা

জাতীয় সার্বিক উন্নয়ন ও মানবিকবোধের বিকাশের প্রধান হাতিয়ার হল শিক্ষা এবং সেই শিক্ষার ভিত হল প্রাথমিক শিক্ষা (৬-১১ বয়:ক্রম পর্যন্ত)। তাই এর গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এ জন্যই বিভিন্ন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক এবং অধিকাংশ দেশে অবৈতনিক। বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় ৪৫,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় এক কোটি ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে এবং অধিকাংশ পঞ্চম শ্রেণী ও তার পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করে।

সুপারিশ

(১) বর্তমানে প্রচলিত পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯৫ সালের মধ্যে সার্বজনীন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে ২০০০ সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী সকল স্তরের শিক্ষার ভিত্তি এবং অনেক শিক্ষার্থীর জন্য সমাপনী শিক্ষা বিধায় এই স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে অর্জিত শিক্ষা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। বাংলা, গণিত, পরিবেশ পরিচিতি, কর্ম অভিজ্ঞতা, ধর্মশিক্ষা ইত্যাদি পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। শিক্ষকদের চাকুরিপূর্ব এবং চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণের ধারাবাহিক ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৪) বিদ্যালয়গুলি সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(৫) বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তদারকি ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৬) ময়মনসিংহে অবস্থিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে, যাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী উন্নয়নে, প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রস্তুতকরণে ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

(৭) দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা সম্ভব। সুতরাং স্থানীয় সরকার ও জনগণের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডে তাদের জড়িত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে উদ্যোগ নিতে হবে।

৪। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

১. ১১ থেকে ১৮ বছর বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক স্তরের অন্তর্গত। সুনাগরিক ও কর্মক্ষম জনশক্তি তৈরির ভিত মাধ্যমিক শিক্ষায় রচিত হয় বিধায় শিক্ষার এ স্তরটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

২. মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান কাঠামো ৩+২+২ এবং এই স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে তেইশ লক্ষ। এর মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ শিক্ষার্থী স্কুল ত্যাগ করে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বেসরকারী। মাধ্যমিক শিক্ষার প্রধান সমস্যাগুলি হল প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকের অভাব, শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, বইপত্র, শিক্ষোপকরণ ও খেলাধুলা ইত্যাদি সুযোগ সুবিধার অভাব।

৩. বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে সংযুক্ত না হয়ে উচ্চশিক্ষার সঙ্গে থাকায় উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা উভয় স্তরই যথাযথ দৃষ্টি ও গুরুত্ব পাচ্ছে না।

৪. মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা নেই।

৫. বর্তমানে তদারকি ও পরিদর্শন তেমন কার্যকর নয়।

সুপারিশ

(১) স্বল্প মেয়াদী ভিত্তিতে বর্তমান শিক্ষা কাঠামো (৩+২+২) চালু থাকলে, তবে ২০০০ সাল নাগাদ ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে বর্তমানের ডিগ্রি কলেজগুলি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে বিযুক্ত করতে হবে।

(৩) এ স্তরে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শাখাটিকে আরো সম্প্রসারিত করে শতকরা ৫০ জন শিক্ষার্থীকে এ শাখায় ভর্তি করার ব্যবস্থা করা দরকার।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অর্থাৎ ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির অর্ধাংশকে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে এবং বাকি অর্ধাংশকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কলেজে রূপান্তর করা যায়।

(৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তরকে মাধ্যমিক স্তরের সঙ্গে যুক্ত করে (২+২) কেবলমাত্র এই স্তরের শেষে একটি সমাপনী পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(৬) ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও সুসজ্জিত ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও পরীক্ষা পদ্ধতিরও যথোচিত পরিবর্তন, উন্নয়ন ও পরিশীলন করতে হবে।

(৭) শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ্যসূচী বিষয়-বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শ্রেণী শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময়োপযোগী করবে। গণিত বিষয়ে সংখ্যা বিজ্ঞানে আধুনিক জ্ঞানসহ কম্পিউটারের ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদান করতে হবে।

(৮) তদারকি ও পরিদর্শন ব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে।

(৯) অনতিবিলম্বে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের বৃত্তিমূলক ও কারিগরি বিষয়সমূহের বিস্তারিত পাঠ্যসূচী প্রণীত হওয়া উচিত। আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। বর্তমানে প্রচলিত কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পকে জোরদার ও সম্প্রসারণ করতে হবে।

(১০) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক বিষয় প্রবর্তনের জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোচিত আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করা প্রয়োজন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও চাহিদার ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষাদান ব্যবস্থা করতে হবে।

(১১) বিদ্যালয়সমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে অন্তত একজন অতিরিক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক একাডেমিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

(১২) সকল বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(১৩) বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৪) শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে নজর রাখার জন্য প্রতি বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা একটি ক্লিনিক থাকা প্রয়োজন।

(১৫) সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১৬) প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণপূর্বক প্রত্যেক স্কুলে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত সময় শিক্ষাদানের জন্য টিউটোরিয়াল কোচিং ক্লাস চালু করা উচিত। শিক্ষকদের অতিরিক্ত শিক্ষাদান কাজের জন্য বাড়তি আর্থিক সুবিধা প্রদান প্রয়োজন।

(১৭) আমাদের দেশের ক্যাডেট কলেজ, ল্যাবরেটরি ও জিলা স্কুলগুলিকে উন্নত করে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মেধার লালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। দারিদ্র্যের কারণে উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে যেন কোনো বাধা সৃষ্টি না হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(১৮) প্রত্যন্ত অঞ্চলে আরো মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৫। মাদ্রাসা শিক্ষা

১. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন ও হাদিস ভিত্তিক। মাদ্রাসা শিক্ষা হচ্ছে ইসলামী শিক্ষারই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ।

২. **ইবতেদায়িঃ** মাদ্রাসা শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হচ্ছে পাঁচ বছর ব্যাপী ইবতেদায়ি। সাম্প্রতিককালে অপরিকল্পিতভাবে এ জাতীয় মাদ্রাসার দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছে। এ সকল মাদ্রাসায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব এবং আর্থিক সংকট বিদ্যমান।

সুপারিশ

(১) ইবতেদায়ি মাদ্রাসার মেয়াদকাল, শিশুদের ভর্তির বয়স, শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতনক্রম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ হবে। তবে আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষকগণ মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রাপ্ত (আলিম) হবেন।

(২) ইবতেদায়ি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য পি,টি,আই,সমূহে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে।

(৩) ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে শিক্ষা বিভাগ সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করবে। প্রতিটি মাদ্রাসার বৈষয়িক সুবিধাবলী নিশ্চিত করার জন্য সরকার ও স্থানীয় জনগণের যৌথ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৫) মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের স্বার্থে দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার পাঠ্যপুস্তকসমূহের সঙ্গে ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ অবশ্য পাঠ্য করতে হবে।

(৬) পর্যায়ক্রমে এ মাদ্রাসাগুলির জাতীয়করণ প্রয়োজন।

৩. দাখিল ও আলিম: মাদ্রাসা শিক্ষার পরবর্তী দুটি স্তর হচ্ছে দাখিল ও আলিম। আর্থিক অনটন এ জাতীয় মাদ্রাসাগুলির অন্যতম সমস্যা। এ সকল মাদ্রাসার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

সুপারিশ

(১) দাখিল ও আলিম শিক্ষাস্তর যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বছর মেয়াদী থাকবে। দুটি স্তরের শেষে প্রান্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। দাখিল স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কোরআন এবং আলিম স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ—এ সব শাখা প্রবর্তিত হবে।

(২) শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের অন্যত্র প্রদত্ত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সুপারিশমালার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে দাখিল ও আলিম প্রান্তিক পরীক্ষার সংস্কার করতে হবে।

(৩) এ জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডকে ভূমির পরিমাণ, পারস্পরিক দূরত্ব, ছাত্র সংখ্যা, বিজ্ঞান পরীক্ষাগার, গ্রন্থাগার, যোগ্য শিক্ষক ইত্যাদি ব্যাপারে অবশ্যপালনীয় শর্ত আরোপ করতে হবে।

(৪) এ দুটি স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে আরবী ব্যবহৃত হবে।

(৫) এ স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান এবং কারিগরি ও উৎপাদনমুখী কাজে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কর্মমুখী শিক্ষা কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

(৬) দাখিল ও আলিম মাদ্রাসাসমূহে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিত করার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ এবং নিয়েমার ও আই,ই,আর. যথাক্রমে শিক্ষকদের কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(৭) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক-শিক্ষণ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়।

৪. **ফাযিল ও কামিল** : ফাযিল পাস ও অনার্স কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে ২ ও ৩ বছর এবং পাস ও অনার্স ডিগ্রীপ্রাপ্তদের জন্য কামিল কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে ২ ও ১ বছর।

সুপারিশ

(১) ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহকে অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে এবং যাবতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রণীত হবে।

(২) ফাযিল মাদ্রাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পুনর্গঠন করে সামাজিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের মৌল বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৩) শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

৬। বিশেষ শিক্ষা

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

আমাদের দেশের শতকরা আশিজন নিরক্ষরের সাথে জড়িয়ে আছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ, কুসংস্কার প্রভৃতি। এ সব অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নয়নের জন্য আমাদের সাক্ষর, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির প্রয়োজন। এ জন্য সাক্ষরতা যেমন অপরিহার্য ঠিক তেমনি প্রয়োজন বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।

সুপারিশ

(১) নিরক্ষরতাকে অন্যতম প্রধান সমস্যারূপে চিহ্নিত করে এর সমাধানের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রাষ্ট্রপতিকে চেয়ারম্যান করে একটি 'জাতীয় গণশিক্ষা পরিষদ' গঠন করা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসহ সকল সম্ভাব্য স্থান সাক্ষরতা অর্জনের শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

(৩) গণশিক্ষার বিভিন্ন দিক ও কার্যক্রম সমন্বিতভাবে পরিচালনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি গণশিক্ষা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই পরিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে গণশিক্ষা প্রকল্পের যথাযথ একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি গণশিক্ষা গবেষণা কোষ থাকা প্রয়োজন।

(৪) জনসাধারণের মধ্যে প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে গণমাধ্যমের ব্যবহার উচিত।

(৫) এদেশের ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে ধর্মের অনুশাসনের মাধ্যমে সাক্ষরতা বিষয়ে অনুপ্রাণিত করার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়।

(৬) বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাঠকর্মীদের পেশাগত প্রশিক্ষণের সাথে সাথে সাক্ষরতা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

(৭) দেশের সকল পি.টি.আই. এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পাঠ্যসূচীতে বয়স্ক শিক্ষা এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আবশ্যিক করতে হবে।

(৮) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সান্ধ্যকালীন বয়স্ক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে।

(৯) কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের সম্প্রসারণ করে উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক কোর্স শেখানোর ব্যবস্থা করা উচিত।

(১০) ব্যাপক গণসাক্ষরতা শিক্ষার জন্য সরকারী তহবিল, জাতীয় লটারি, ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, সিল বিক্রয়, ধর্মীয় দান, শিল্প মালিক ও বিত্তবানদের দান এবং জাতিসংঘের অনুদান থেকে অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

খ. স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যাতে শারীরিক বৃদ্ধি ঘটে তা নিশ্চিত করা দরকার। তাদের কর্মে সজাগ, সচেতন, উদ্যমী, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী করার উদ্দেশ্যে শারীরিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে শারীরিক শিক্ষাকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সুপারিশ

(১) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার স্তরে শারীরিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সরবরাহ থাকা উচিত।

(২) মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে প্রতি ৫০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত একজন প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৩) দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে খুলনা ও চট্টগ্রাম বিভাগে আরো দুটি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা দরকার।

(৪) ঢাকায় মহিলাদের জন্য একটি পৃথক শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৫) শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলির শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকবৃন্দের বেতন ও পদমর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

(৬) স্কুল ও কলেজের দীর্ঘ ছুটিকালীন খেলাধুলা ও অন্যান্য সহপাঠ ক্রমিক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

গ. দূরশিক্ষণ

বাংলাদেশের বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণের জন্য দূরশিক্ষণ একটি বিকল্প পদ্ধতি। আধুনিক প্রকাশনা, শিক্ষা টেকনোলজি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশে ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে।

সুপারিশ

(১) অনতিবিলম্বে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(২) দূরশিক্ষণের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি উপানুষ্ঠানিক পেশাগত ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

ঘ. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। তাদের পুনর্বাসনের জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল।

সুপারিশ

(১) এ দেশের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয় করার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ জরিপ চালাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যমান বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে।

(২) অন্ধ ও মূকবধির ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথক আবাসিক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৩) যেহেতু মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, সে কারণে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রশিক্ষক এনে অথবা দেশী শিক্ষককে বিদেশে পাঠিয়ে শিক্ষক শিক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৪) মানসিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে বৃত্তিমূলক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৫) মানসিক প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়গুলিতে চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকাও প্রয়োজন।

ঙ· সঙ্গীত শিক্ষা

আমাদের দেশে ব্যক্তি ও পরিবারভিত্তিক সঙ্গীত চর্চা বহু প্রাচীন হলেও আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত চর্চার ইতিহাস অতিসাম্প্রতিক। বর্তমানে দেশে একটিমাত্র সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় রয়েছে।

সুপারিশ

(১) প্রত্যেক জেলা শহরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিতে হবে।

(২) প্রত্যেক স্কুল কলেজে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম হিসাবে সঙ্গীত শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে হবে এবং এ জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

(৩) স্কুল কলেজের ভবনগুলিতে সান্ধ্যকালীন ও ছুটির সময়ে সঙ্গীত চর্চার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৪) সঙ্গীত শিক্ষার জন্য উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চ· ললিতকলা

বর্তমানে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামে ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টসসমূহে শিল্পকলা বিষয়ে স্নাতক ও মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

সুপারিশ

(১) আর্টস ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা অন্যান্য বিষয়ের স্নাতক শিক্ষকদের সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন।

(২) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিল্প চেতনা ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় একটি করে আর্ট গ্যালারি প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ছ· জনসংখ্যা শিক্ষা

অপরিকল্পিত জনসংখ্যার ভয়াবহ সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার জন্য জনসংখ্যা শিক্ষা প্রয়োজন।

সুপারিশ

(১) জনসংখ্যা শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত।

(২) অপরিকল্পিত জনসংখ্যা রোধকল্পে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা আবশ্যক।

(৩) বিভিন্ন স্তরের শিক্ষকদের জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিতে হবে।

(৪) জনসংখ্যা শিক্ষার সমুদয় কাজকর্মের তদারকি ও সমন্বয় বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহে একটি করে 'সেল' স্থাপন করা প্রয়োজন।

জ. কম্পিউটার শিক্ষা

বর্তমান বিশ্বে কম্পিউটারের প্রয়োগ ব্যাপক এবং আমাদের দেশেও এর ব্যবহার দ্রুত বিস্তার লাভ করছে।

সুপারিশ

নিম্নমাধ্যমিক থেকে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কম্পিউটার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

ঝ. নারী শিক্ষা

দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নারী শিক্ষা অনস্বীকার্য।

সুপারিশ

(১) প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষার স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(২) দূরত্ব অতিক্রম করার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৩) মেয়েদের জন্য বাস্তবমুখী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন।

(৪) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষিকা পাওয়া যায় তার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধিক মেয়ে নিতে হবে এবং তাদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) মেয়েদের অধিক পরিমাণে চাকুরি দিতে হবে যাতে তারা পড়াশোনায় উৎসাহিত হতে পারে।

(৬) পেশাগত শিক্ষায় মেয়েদের জন্য অধিক সংখ্যক আসন সংরক্ষণ ও বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) উচ্চশিক্ষার সুবিধার্থে মেয়েদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

ঞ. উচ্চশিক্ষা

১. আমাদের দেশে বর্তমানে ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। আরো ২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। স্নাতক (পাস) পর্যায়ে শিক্ষা দেয়া হয় ৪৫১টি কলেজে, এর ৪৩টিতে স্নাতক (সম্মান) ও ১২টিতে মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ কলেজগুলির সাথে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরও সংযুক্ত।

২. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কসূত্র ক্ষীণ।

৩. রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ছাত্র অসন্তোষ, অপরিকল্পিতভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ, শিক্ষক অপ্রতুলতা, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ও উপযুক্ত ল্যাবরেটরির অভাব, পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বনের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, প্রধানত মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং কেবল বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর শিক্ষার্থীর গুণগত উৎকর্ষ বিচারের রীতি প্রভৃতি কারণে উচ্চশিক্ষা আজ তীব্র সঙ্কটের সম্মুখীন। অধিকন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার নিম্নমান উচ্চশিক্ষার গুণগত মানকে প্রভাবিত করছে।

৪. গবেষণাক্ষেত্রে যথোচিত উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষা তেমন ফলপ্রসূ ও কার্যকর হয়ে উঠছে না এবং জ্ঞানের পরিধির বিস্তার সন্তোষজনক নয়।

সুপারিশ

(১) অধিকতর মনোনিবেশের জন্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠান স্বতন্ত্র ও পৃথক থাকা প্রয়োজন।

(২) বিশ্বের অন্যান্য দেশের স্নাতক ডিগ্রির মানের সঙ্গে সমতাবিধান ও আমাদের দেশে প্রচলিত ২ ও ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রীদানের বৈষম্যমূলক প্রথা দূর করার উদ্দেশ্যে স্নাতক পর্যায়ের কলেজগুলির মান উন্নীত করা দরকার যাতে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স পর্যায়ক্রমে ২000 সাল নাগাদ প্রচলন করা সম্ভব হয়। স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার উন্নতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দান, গ্রন্থাগার ও ল্যাবরেটরির উন্নয়ন প্রভৃতি পদক্ষেপ নেয়ার পর কলেজে ৩ বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করা আবশ্যক। স্নাতক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থী তিনটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করবে এবং কোনো বিষয়ে পরীক্ষার্থী ৭০% বা তার বেশি নম্বর পেলে তাকে ঐ বিষয়ে অনার্সপ্রাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হবে। সাধারণভাবে স্নাতক ডিগ্রীকে প্রান্তিক ডিগ্রী বলে গণ্য করা হবে।

(৩) স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থী যাতে কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে সে উদ্দেশ্যে স্নাতক তৃতীয় বছরে কোনো বিষয়ে তাকে ব্যবহারিক জ্ঞান দেয়া যায়।

(৪) অন্যান্য দেশের মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমানে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে মাস্টার্স কোর্স ২ বছরের হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৫) শিক্ষার্থীর তুলনায় দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশ অপর্যাপ্ত বলে প্রত্যেক সাবেক জেলায় একটি করে এবং রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলিতে একাধিক কলেজকে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কলেজগুলির শিক্ষক সংখ্যা, শিক্ষাদানের মান, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি, ভবন, ক্যাম্পাস প্রভৃতি উন্নীত করতে হবে। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থানীয় চাহিদা, প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সম্পদের সহজ লভ্যতা প্রভৃতি বিবেচনার পর বিভিন্ন বিভাগ খোলা হবে। ইতিমধ্যে যে সকল ডিগ্রী কলেজে সম্মান ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলিকে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান হিসাবে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা যেতে পারে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে।

(৬) অনতিবিলম্বে দেশে দুটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে প্রথম ডিগ্রী কোর্স শিক্ষাদানকারী সকল সাধারণ কলেজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা প্রয়োজন।

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে জাতীয় ভাষা বাংলার যথাযথ শিক্ষাদান ও তার অনুশীলন বৃদ্ধি করা দরকার। বাংলার মাধ্যমে যাতে বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চশিক্ষা দান সম্ভব হয় সেজন্য সচেষ্ট হতে হবে।

(৮) আর্থিক সচ্ছলতা অর্জনে সহায়তার জন্য বেসরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা ক্রমানুয়ে সম্পূর্ণভাবে সরকার বহন করবে।

(৯) বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা উচিত।

(১০) সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে, তবে এই পর্যায়ে শিক্ষার্থীর ভর্তি হবে তার মেধা, প্রবণতা ও শিক্ষাগত কৃতিত্ব ভিত্তিক।

(১১) উচ্চশিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সময়োপযোগী ও সামাজিক চাহিদানুগ হবে, তাতে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থা প্রতিফলিত হবে। জ্ঞানের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিকই উচ্চশিক্ষার পাঠক্রমে যথাযথ গুরুত্বলাভ করবে।

(১২) সেশন জট দূর করার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শিফট চালু, নির্ধারিত সময়ে ভর্তি, ক্লাস শুরু, কোর্স সমাপন এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলপ্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১৩) পিএইচ.ডি. ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেই করা উচিত। এই ডিগ্রীর জন্য শিক্ষার্থীদের বিদেশে পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় না করে ঐ অর্থ বরং উপযুক্ত গবেষণাগার, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, উন্নত গবেষণাকেন্দ্র প্রভৃতি গড়ে তোলার জন্য ব্যয় করা বাঞ্ছনীয়। মেধাবী ও যোগ্য শিক্ষার্থীদের বিদেশে পিএইচ. ডি.-উত্তর শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ বা সমন্বিত গবেষণার জন্য উৎসাহিত করা উচিত।

(১৪) মাস্টার্স পর্যায়ে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গবেষণা কাজে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই পর্যায়ে কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী এবং মৌলিকতার প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফেলোশিপ দেয়া উচিত যাতে তারা নিশ্চিন্তে পিএইচ, ডি, করতে পারে।

(১৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো বিভাগকে উৎকর্ষ কেন্দ্র (সেন্টার অব এক্সেলেন্স) হিসাবে গড়ে তোলা প্রয়োজন। মূল্যবান ও অত্যাধুনিক সরঞ্জাম দ্বারা সুসজ্জিত ঐসব কেন্দ্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ পিএইচ, ডি, এবং পিএইচ, ডি,-উত্তর গবেষণার সুযোগ লাভ করবেন।

(১৬) শিক্ষার্থীদের কর্ম সংস্থানের সাহায্যার্থে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য বৃহত্তর উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মসংস্থান (প্লেসমেন্ট) ব্যুরো থাকা উচিত।

৮। বিজ্ঞান শিক্ষা

আধুনিক সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ। কার্যকরী বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার অভাবে বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে অসন্তোষজনক অবস্থা বিরাজ করছে।

সুপারিশ

(১) শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাকে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে।

(২) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শাখায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পি,টি,আই,গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষক নিশ্চিত করা উচিত।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মসূচীকে আরো সম্প্রসারিত করা দরকার। এসব প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা এবং নিয়মিত আবর্তক মঞ্জুরী দেয়া আবশ্যক। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলে যন্ত্রপাতি ক্রয় করার জন্য বিশেষ অনুদান দিতে হবে। স্কুলে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য শিক্ষার্থীদের উপর ল্যাব-ফি ধার্য করা যায়।

(৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় গৃহীত প্রকল্পের অনুরূপ প্রকল্প উচ্চ মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরের জন্য জরুরী ভিত্তিতে গ্রহণ করা দরকার।

(৫) উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শিক্ষক-সহায়ক পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কার্যক্রম আরো জোরদার করা দরকার। এই কাজের গুরুত্ব বিবেচনা করে এজন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা উচিত।

(৬) স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী আধুনিক করতে হবে। কলেজগুলিতে যথোচিত আয়তনের এবং যথোপযুক্ত ও সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি ও শ্রেণীকক্ষ থাকা প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেক কলেজের নিজস্ব ওয়ার্কশপ থাকা উচিত।

(৭) স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগার ও গবেষণাগারে উচ্চশিক্ষার জন্য উপযুক্ত বই, গবেষণা সাময়িকী, বিজ্ঞান বিষয়ক জার্নাল প্রভৃতি এবং যথোপযোগী যন্ত্রপাতি নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী কলেজগুলির বিজ্ঞান শিক্ষাক্ষেত্রে আর্থিক ব্যয় নির্ধারণের জন্য সরকারের একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক।

(৯) বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করে পিএইচ,ডি, গবেষণার জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি ও ল্যাব সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঐ বিভাগগুলির অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে।

(১০) গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযোজক কর্মসূচী (লিংকেজ প্রোগ্রাম) প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(১১) সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণে রিফ্রেশার্স কোর্স-জাতীয় স্বল্পকালীন শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষকদের গতিশীল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সংযুক্ত রাখা উচিত।

(১২) শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা দরকার যাতে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তারা প্রথম থেকে সচেতন থাকে।

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত সংযোগ রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১৪) গবেষণার কৃতিত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য পুরস্কার এবং বিজ্ঞান শিক্ষক ও গবেষকদের জাতীয় স্বীকৃতির সরকারী ব্যবস্থা প্রচলিত হলে বিজ্ঞান চর্চা অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

(১৫) বিজ্ঞানের ভূমিকার যথাযথ বিশ্লেষণ ও বিবেচনার প্রয়োজনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট স্তরে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা দরকার। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আমদানির জন্য আমদানি কর মওকুফ করতে হবে।

(১৬) বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। বিজ্ঞান বিষয়ে উচ্চমানসম্পন্ন প্রয়োজনীয় বই বাংলায় লেখা ও অনুবাদ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত।

(১৭) উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতক প্রথম বর্ষে এক পত্র ইংরেজি পাঠদানের প্রয়োজন হবে।

(১৮) বর্তমান জাতীয় বিজ্ঞান যাদুঘরের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং দেশের নানা অঞ্চলে আঞ্চলিক বিজ্ঞান যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা দরকার। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের ছোটখাট সংগ্রহশালা থাকা উচিত।

(১৯) বিজ্ঞান সমিতি, বিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা গঠন এবং বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তা দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯। বাণিজ্য শিক্ষা

১. আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্পের সুষ্ঠু বিকাশে বাণিজ্য শিক্ষার ভূমিকা খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

২. আধুনিক কালে ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতি ও পদ্ধতিগত পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদের দেশের বাণিজ্য শিক্ষা তেমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। দেশের বাণিজ্য শিক্ষা অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, প্রচলিত পাঠক্রমের অনুপযোগিতা, শিক্ষাদান পদ্ধতির অকার্যকারিতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ পাঠ্য পুস্তকের স্বল্পতা প্রভৃতি সমস্যার ফলে আমাদের বাণিজ্য শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটছে না।

৩. বাণিজ্য একটি ব্যবহারিক ও বাস্তবানুগ বিষয়, কিন্তু আমাদের দেশে বাণিজ্যের বিষয়গুলি প্রধানত তত্ত্বীয়ভাবে পড়ানো হয়। গবেষণা কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সুযোগ কম। স্থানীয় শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বাণিজ্য বিভাগের সম্পর্ক এখনো গড়ে ওঠেনি। ফলে শিক্ষার্থীগণ বাস্তব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

সুপারিশ

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের বহুভাষী শর্টহ্যাণ্ড ও বহুভাষী টাইপ রাইটিং পড়াবার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(২) বাণিজ্য শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী করার লক্ষ্যে সময়ের সঙ্গে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়। বাণিজ্য শিক্ষার ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত বিষয়ের চলতি গতিধারার সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাদের বিশ্লেষণমূলক সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষার্থীদের লেকচার পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে কেস স্টাডি, সেমিনার, মৌখিক ও লিখিত উপস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত।

(৪) স্নাতক পর্যায়ে অধিক সংখ্যক কলেজে বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

(৫) বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত যুক্তিসঙ্গত করতে হবে।

(৬) শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পর্যাপ্ত বই সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

(৮) কর্মসংস্থান ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পপতি ও নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৯) সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্থাপন করার বিষয় বিবেচনাযোগ্য।

১০। আইন শিক্ষা

১. দুই বছর মেয়াদী এল.এল.বি. কোর্স ডিগ্রী মানের জন্য যথোপযুক্ত নয়।

২. গত কয়েক বছরে দেশের বিভিন্ন স্থানে অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত আইন কলেজগুলিতে মাত্রাতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিতে এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে আইন শিক্ষার অবনতি ঘটছে। ছাত্র-ভর্তি মেধাভিত্তিক নয় বললেই চলে।

৩. দেশে আইনজীবীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আইন অনুষদসমূহে গবেষণা কার্যক্রম সে তুলনায় সন্তোষজনক নয়।

সুপারিশ

(১) ফলপ্রসূ ও যথাযথ আইন শিক্ষার জন্য আইন কলেজগুলিতে এল.এল.বি. কোর্সের মেয়াদ বর্তমান দু বছরের জায়গায় তিন বছর হওয়া আবশ্যক। কলেজগুলি থেকে এল.এল.বি. ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এল.এল.এম. ডিগ্রীর মেয়াদ এখনকার মত দু বছর প্রচলিত থাকবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এল.এল.বি. (সম্মান) ও এল.এল.এম. কোর্সের বর্তমান মেয়াদ অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

(২) আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও ভর্তি মেধাভিত্তিক হওয়া উচিত।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইনে এম, ফিল, ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন অনুষদ ও আইন কলেজগুলির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দিকের সমন্বয় সাধন করা উচিত।

(৫) আইন কলেজগুলির অনুমোদনের জন্য দক্ষ শিক্ষক, উপযুক্ত কলেজ ভবন, সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রভৃতি আবশ্যিক শর্ত আরোপিত হওয়া উচিত।

(৬) দেশে একটি পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অব ল স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

১১। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. প্রযুক্তি প্রয়োগ-ক্ষমতাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রগতির পূর্বশর্ত। বস্তুত দেশজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ এবং বিদেশী প্রযুক্তির আত্তীকরণের মধ্য দিয়েই একটি গতিশীল 'প্রযুক্তি কৃষ্টি' গড়ে ওঠে।

২. বর্তমানে দেশে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য ৫১টি ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (ভি.টি.আই), ১২টি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টি.টি.সি) এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা স্তরে ১৮টি পলিটেকনিক এবং তিনটি মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট রয়েছে।

৩. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রকৌশল শিক্ষাদান করছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এ ছাড়া চারটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তিনটি প্রকৌশল বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী এবং কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি ও ইনস্টি-টিউট অব লেদার টেকনোলজিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয়। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি প্রকৌশল বিষয়ে ডিগ্রী প্রদান করে।

সুপারিশ

(১) শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রযুক্তি শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২) ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। এই কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য হবে কারিগরি শিক্ষাকে শিল্প কারখানার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে নীতিমালা প্রণয়ন। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে।

(৩) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিগুলির (বি,আই,টি) প্রত্যেকটিতে কোনো কোনো বিষয়ে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হিসাবে গড়ে তুলতে হবে যেন এগুলি বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পায়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রযুক্তি বাছাই, উন্নয়ন ও প্রয়োগে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

(৪) বিভিন্ন স্তরের প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-স্বল্পতা নিরসনে কারিগরি শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ না করা, যোগ্য শিক্ষক আকর্ষণের নিমিত্ত বিশেষ বেতনক্রম এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা, ছুটি ও অন্যান্য কারণে অনুপস্থিতির ফলে যাতে কাজকর্ম ব্যাহত না হয় তার জন্য সকল প্রকার শিক্ষক পদের ১০% অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশল এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত হবে যথাক্রমে ১০ : ১ এবং ৮ : ১।

(৫) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে যে দুটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে তাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। প্রকৌশলী শিক্ষকদের জন্যও অনুরূপ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

(৬) শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান প্রযুক্তি এবং গবেষণাগারসমূহের আধুনিকীকরণ আশু প্রয়োজন। কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষাক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি ও বাছাই শিক্ষার্থীর মেধা, প্রবণতা ও পূর্ববর্তী পরীক্ষাসমূহের ফলভিত্তিক হবে।

(৮) শিল্প ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি আশু পদক্ষেপ হবে সকল স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশী কার্যক্রম চালু এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশী আইনের সংশোধন করে একটি যুগোপযোগী আইনের প্রবর্তন।

(৯) কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ও টেক্সটাইল কলেজের বর্তমান শিক্ষক-স্বল্পতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজন মত সাময়িকভাবে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনয়ন করা উচিত। এই উভয় ক্ষেত্রেই ডিপ্লোমা স্তরের শিক্ষা কোর্স পুনঃপ্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(১০) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ভি, টি, আই, টি,টি, সি, ও পলিটেকনিক-সমূহকে অবকাশবিহীন প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য করা উচিত।

(১১) সকল বেসরকারী শিল্প ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য একটি অনুমোদিত নিয়োগবিধি থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১২) কারিগরি শিক্ষার সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি 'কারিগরি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা বোর্ড' স্থাপন করা প্রয়োজন।

(১৩) প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়সহ কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ল্যাবরেটরিসমূহে উপকরণের অপ্রতুলতা দূরীকরণের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থানসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৪) একটি দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রয়োজনীয় কারিগরি জনশক্তি নির্ধারণ করা উচিত।

(১৫) বেসরকারী কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতি দান করা উচিত।

(১৬) জাতীয় ভিত্তিতে 'মাস্টার ক্রাফটসম্যান' ও 'মাস্টার টেকনিশিয়ান' বাছাই এবং তাঁদের আর্থসামাজিক স্বীকৃতি দান করা উচিত। এজন্য কারিগরি শিক্ষা বোর্ড প্রয়োজনীয় দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণের পরিমাপ ও মূল্যায়ন করবে।

(১৭) অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণের উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও বি, আই, টি,-গুলিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করা একান্ত প্রয়োজন।

(১৮) সম্ভাবনাময় অগ্রগণ্য বিষয়গুলিতে মাস্টার্স ও পি এইচ,ডি, কোর্সে গবেষণার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

১২। কৃষি শিক্ষা

১. একটি সুপরিকল্পিত কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থাই আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে।

২. বর্তমানে ১১টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও একটি উচ্চতর কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে যথাক্রমে দু বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স ও এক বছর মেয়াদী উচ্চতর প্রশিক্ষণ দান করা হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষাদান করছে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দুটি কলেজে কৃষি বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী দান করা হয়। সম্প্রতি কেবল কৃষি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রদানের উদ্দেশ্যে গাজীপুরে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও তার অনুমোদিত সরকারী বনবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

সুপারিশ

(১) প্রাথমিক স্তরে ভাষা, বিজ্ঞান, গণিত ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে গ্রামীণ পরিবেশ ও পরিচিতিমূলক কৃষি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে।

(২) মাধ্যমিক স্তরে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের মৃত্তিকা, শস্য, গাছপালা, পশু ও মৎস্য সম্পদ পুষ্টি বিজ্ঞান, কৃষি ব্যবস্থাপনা, অর্থ সংস্থান, পণ্য বিপণন বিষয়ে সাধারণ জ্ঞানদান করতে হবে।

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক কৃষি শাখায় কৃষি বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থ বিদ্যা ও গণিত পঠিত হবে।

(৪) কৃষি বিষয়ে শিক্ষক তৈরির জন্য বি, এড, কোর্সের শিক্ষাক্রমে কৃষি বিষয় প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়া, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কৃষি কলেজসমূহে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষকদের কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানদানের জন্য পি, টি, আই, সমূহে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে কৃষি বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(৬) কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দান করতে হবে।

(৭) কৃষক ও সম্প্রসারণ বিজ্ঞানীর মধ্যবর্তী স্তরে কৌশলী বা টেকনিশিয়ান তৈরির উপর বিশেষ জোর দিতে হবে।

(৮) কৃষি পদ্ধতিকে দ্রুত আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে হবে।

(৯) স্নাতক পর্যায়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর জোর দিতে হবে।

(১০) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, মৃত্তিকা বিদ্যা, রসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে সম্মান ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

(১১) কৃষি শিক্ষা বিষয়ক উচ্চতর প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। গবেষণার ক্ষেত্রে দেশের কৃষি উন্নয়ন সমস্যা সমাধানে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে।

(১২) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির শিক্ষাক্রম, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, শিক্ষাকাল, শিক্ষামান ইত্যাদি বিষয়ে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পর্যায়ে একটি সংস্থা গঠন করতে হবে।

১৩। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা

ক. এলোপ্যাথিক চিকিৎসা

১. চিকিৎসা শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করা যাঁরা সমাজ ও মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ হবেন। আমাদের দেশে বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। এর জন্য সামগ্রিক শিক্ষার পরিবেশ এবং চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক জটিলতাই মূলত দায়ী।

২. চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি ইনস্টিটিউট, ৮টি মেডিকেল কলেজ ও একটি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মেডিকেল এণ্ড ডেন্টাল কাউন্সিল-এই ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের অধীন। অর্থ বরাদ্দ,

শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি ও সাধারণ পরিচালনার ভার সরকারের উপর। অন্যদিকে এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের তিনটি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলি তাদের নিজেদের কাজকর্ম ও সমস্যা নিয়ে এত ব্যস্ত যে, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতি-ষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানোন্নয়নের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মনোযোগ দেয়ার সুযোগ ও সময়ের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একদিকে যেমন যথাযথ নেতৃত্ব পাচ্ছেনা, অন্যদিকে তেমনি তাদের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণও শিথিল হয়ে পড়ছে।

৩. চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের চিকিৎসা শিক্ষার মানের ব্যবধান বেড়ে চলছে। আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা প্রধানত পুস্তক ভিত্তিক অথচ বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার রোগ নির্ণয় ও নিরাময় উভয়ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি হচ্ছে তা অনেকাংশে ব্যবহারিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক।

৪. আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে হাসপাতাল কেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষার উপর অধিক জোর দেয়া হয়। ফলে শিক্ষাকালে চিকিৎসা কর্মীগণের গ্রামে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও গ্রামীণ জনগণের বিভিন্ন সমস্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত হওয়ার সুযোগ নেই।

সুপারিশ

(১) চিকিৎসা শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা থেকে পৃথক করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করতে হবে।

(২) দেশের চিকিৎসা শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থের সংস্থান ও বরাদ্দের ব্যবস্থা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূ-হের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা শিক্ষার জাতীয় মান রক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা 'বাংলা-দেশ জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল' (বাংলাদেশ ন্যাশনাল মেডিকেল এডুকেশন কাউন্সিল) স্থাপন অত্যাবশ্যক। সকল মেডিকেল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ এবং ইনস্টিটিউট উক্ত কাউন্সিলের আওতাভুক্ত হবে। দেশের বিকল্প চিকিৎসা শিক্ষাকে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের আওতাধীন আনার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(৩) সকল ইনস্টিটিউটে এম, বি, বি, এস, ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্স, নার্সিং ও অন্যান্য প্যারামেডিকেল কোর্স চালু থাকবে।

(৪) প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটসমূহের হাসপাতালগুলিকে সাধারণ হাসপাতাল থেকে পৃথক করতে হবে। এই হাসপাতালগুলি সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পৃথক পূর্ণাঙ্গ সাধারণ হাসপাতালের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের হাসপাতালে সাধারণ চিকিৎসার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বেড আলাদাভাবে নির্ধারিত রাখা যেতে পারে।

(৫) চিকিৎসা কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের ভর্তি মেধা, প্রবণতা ও পূর্ববর্তী পরীক্ষা-সমূহের ফলভিত্তিক হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও অঙ্ক শাস্ত্রসহ বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

(৬) গ্রামীণ পরিবেশ ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করে চিকিৎসা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীকে সময়োপযোগী করে পুনর্বিন্যাস ও নবায়ন করতে হবে। বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজী, কমিউনিটি মেডিসিন, আচরণ বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন।

(৭) বর্তমান পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি সংশোধন করে মৌখিক, প্র্যাকটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে। সব পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সমভাবে করার উদ্দেশ্যে মৌখিক পরীক্ষার জন্য পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালার বিভিন্ন সেট থাকা উচিত। বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও মেধার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৮) শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কালের একটি নির্দিষ্ট সময় উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে কাজ করা উচিত।

(৯) চিকিৎসকের সংখ্যার সঙ্গে সেবক-সেবিকার সংখ্যার সঙ্গতি রক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নার্সিং কোর্সে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত।

(১০) চিকিৎসা কৌশলী কোর্সগুলি তিন বছর মেয়াদী হওয়া উচিত। প্রত্যেক বিষয়ে আরো উন্নত ও বিশেষ জ্ঞান লাভের জন্য উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(১১) প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির জন্য স্নাতকোত্তর চিকিৎসা শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ করতে হবে।

(১২) চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে।

খ. হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

আমাদের দেশে বহুকাল ধরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলে আসলেও এই শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা খুব বেশি দিনের নয়। বর্তমানে হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলিতে ডিপ্লোমা এবং মাত্র একটিতে ডিগ্রী কোর্স চালু আছে। অধিকাংশ কলেজে অর্থাভাবে খণ্ড-কালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

সুপারিশ

(১) বিপুল জনসংখ্যাকে চিকিৎসার আওতায় আনার জন্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(২) শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণদান করা প্রয়োজন।

(৩) দেশে আন্তর্জাতিক মানের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

(৪) হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলি নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ সংলগ্ন টিচিং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

গ. ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় পাঠ্যপুস্তকের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম, সর্বোপরি সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব রয়েছে।

সুপারিশ

(১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

(২) সরকারী অনুদান বৃদ্ধি, শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং পর্যায়ক্রমে কলেজগুলিকে জাতীয়করণ এবং একটি গবেষণা পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

(৩) দেশের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ইনডোর ও আউটডোর) এবং উপজেলা হেল্থ কমপ্লেক্সগুলিতে এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির সঙ্গে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

১৪। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

১. দেশের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত ও দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক উন্নয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পর্যালোচনা, সংস্কার ও নবায়ন, পাঠ্যপুস্তক রচনা, পরিমার্জন এবং পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি উন্নয়ন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ডের উপর। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পর্যালোচনা, সংস্কার ও নবায়নের দায়িত্ব পালন করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ।

৩. উৎকৃষ্ট মানের পুস্তকের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রণয়ন ও সরবরাহের অভাব আমাদের শিক্ষা বিস্তার ও বিকাশের পথে অন্যতম অন্তরায়।

সুপারিশ

(১) বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ধারণক্ষমতার উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ এবং আকর্ষণীয় ও উচ্চমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা উচিত।

(২) জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি ও সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে পাঠ্যসূচীর সঙ্গতি বিধানের লক্ষ্যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্তরের জন্য শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিষয়-বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি গঠন করা দরকার।

(৩) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে স্থানীয় সম্পদ, জনসমাজের জীবনধারা ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতিফলন ঘটে।

(৪) কৃষি, বিজ্ঞান, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে স্থানীয় কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

(৫) দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য পুস্তক ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে সমপর্যায়ের আরো কয়েকটি অনুমোদিত পুস্তক থাকা বাঞ্ছনীয়।

(৬) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর নিয়মিত পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৭) পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনায় নিয়োজিত অথবা এসব কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক, প্রয়োজনীয় অনূদিত পুস্তক, পাঠ্য-পুস্তক সংক্রান্ত প্রবন্ধ সম্বলিত সাময়িকী ও পত্রিকা, শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ, অভিধান প্রভৃতি দ্বারা 'পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার' স্থাপন করা উচিত।

(৮) সরকারী অর্থানুকূল্যে উচ্চশিক্ষার জন্য নির্ধারিত পুস্তক এবং উন্নতমানের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য প্রকাশকদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে নিয়মিত হারে ফি সংগ্রহ করে পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স পুস্তকের পাঠাগার স্থাপন ও চালু করা উচিত। এই সব পাঠাগার থেকে শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত সময়ের জন্য পাঠ্যপুস্তক ধার দেয়া হবে।

(১০) শিক্ষার্থীরা যাতে নিকৃষ্টমানের নোটবই ব্যবহার থেকে বিরত হয় সেই লক্ষ্যে টেক্সট বুক বোর্ড জরুরী ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক, ওয়ার্কবুক ও গাইড বুকে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, আদর্শ প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি সংযোজন করবে।

(১১) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উন্নতমানের পুস্তক শিক্ষার্থীদের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ করবে।

(১২) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উন্নত মানের পুস্তক রচনার লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সংস্থা স্থাপন করা যেতে পারে।

১৫। শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ

১. আমাদের শিক্ষাগৃহ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

২. বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সুযোগ-সুবিধার শোচনীয় অভাব রয়েছে।

৩. এই অভাব দূর করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ ও সরঞ্জাম (ইকুইপমেন্ট) সরবরাহের উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড স্থাপিত হয়েছে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে 'ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন' নামে একটি সংস্থা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ করে।

সুপারিশ

(১) পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষাগৃহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের কাজে স্থানীয় জনসাধারণ, স্থানীয় প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার।

(৩) বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের ব্যবস্থা করবে।

(৪) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিদেশী যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীলতা দূর করার লক্ষ্যে কেবল অত্যাধুনিক (সফিসটিকেটেড) গবেষণা উপকরণ ছাড়া সব কিছুই দেশে প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া দরকার।

(৫) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(৬) বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা সরঞ্জাম তৈরি করার প্রবণতা ও প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত।

(৭) বিজ্ঞান, কারিগরি, চিকিৎসা ও কৃষি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশে নির্মাণ ও সরবরাহ সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত ঐসব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) শিক্ষাগৃহ নির্মাণ ও সংস্কারের জন্য স্থানীয় সহজলভ্য ও দীর্ঘস্থায়ী উপাদানের ব্যবহার এবং তার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহ নির্মাণ গবেষণা সংস্থা ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষণা কার্যক্রম অতি সত্বর গ্রহণ করা প্রয়োজন।

১৬। গ্রন্থাগার

১. একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য একটি প্রধান শর্ত হলেও আমাদের দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

২. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজসমূহের গ্রন্থাগারগুলি ব্যাপকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত। কোনো কোনো কলেজে স্নাতক সম্মান কোর্সে এমন কি কয়েকটিতে মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান প্রচলন করা হলেও ঐসব প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের আনুপাতিক সম্প্রসারণ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও গ্রন্থাগারের অবস্থা তেমন সন্তোষজনক নয়।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে সরকারী গ্রন্থাগার রয়েছে। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী অনুদান অল্প বলে পর্যাপ্ত সংখ্যক বই কেনা সম্ভব হয় না। এইসব গ্রন্থাগারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বিরল এবং কর্মচারীদের প্রায় সবাই খণ্ডকালীন।

সুপারিশ

(১) বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি, মর্যাদাবোধ জাগানো ও পাঠাভ্যাস গঠনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা দরকার। কিন্তু সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এখন সম্ভব নয় বলে প্রত্যেক উপজেলা সদরে গ্রন্থাগার স্থাপন করে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বই সরবরাহ করা যায়।

(২) উপজেলা গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনার ব্যয়ভার বহন করবে জাতীয় সরকার। বই কেনা ও পরিবেশন করার ব্যয় যৌথভাবে বহন করবে উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা গ্রন্থাগার থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে সরাসরি বই সরবরাহ করা হবে।

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে গ্রন্থাগারসমূহে বই ও সাময়িকীর জন্য ব্যয়বরাদ্দ হবে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে।

(৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করা দরকার। তাঁদের বেতন স্কেল ও মর্যাদা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে।

(৫) প্রয়োজনীয় বিদেশী বই, সাময়িকী প্রভৃতি আমদানির জন্য অধিকতর বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দ এবং এজন্য আমদানি নীতি ও শুল্ক শিথিল করা উচিত।

(৬) প্রয়োজনীয় ফি নেয়ার রীতি প্রবর্তন করে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বই ধার দেয়ার ব্যবস্থা করা যায়।

(৭) সরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে বইয়ের জন্য অর্থবরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত।

(৮) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিতে পর্যাপ্ত বই সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা উচিত।

(৯) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলিতে ও বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে সরকারী অনুদান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(১০) উপজেলা সদরে কেন্দ্র স্থাপন করে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের প্রচলন করলে প্রত্যেক নাগরিক তার বাসস্থানের নিকটে গ্রন্থাগারের বই পেতে পারে।

(১১) জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। উন্নত মানের পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার জন্য এই প্রতিষ্ঠান দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

(১২) জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর অর্পিত কপিরাইট ডিপোজিটের অধিকার সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এটিকে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার জন্য আইন প্রণয়ন করা দরকার। জাতীয় গ্রন্থাগার বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করবে।

(১৩) বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন।

(১৪) জাতীয় আরকাইভসকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান করে এটিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা আবশ্যক। দেশের ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক লিখিত উপকরণ-সমূহ সংরক্ষণ করে তা গবেষকদের ব্যবহার উপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু কার্যক্রমের প্রয়োজন।

(১৫) গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার তৈরির উদ্দেশ্যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিভাগের প্রবর্তন এবং ঢাকায় একটি গ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

১৭। শিক্ষক-শিক্ষণ

১. শিক্ষার মান উন্নয়নে শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশে শিক্ষক-শিক্ষণের চারটি ধারা বিদ্যমান: (ক) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক, (খ) মাধ্যমিক, (গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং (ঘ) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ।

২. প্রাক-প্রাথমিক স্তরে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে অপরিকল্পিতভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে। এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনেকেরই প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব রয়েছে।

৩. বর্তমানে দেশে ৫২টি সরকারী পি,টি,আই, এবং একটি বেসরকারী পি,টি,আই, থেকে বাৎসরিক দশ হাজারের বেশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ক্রমাগতভাবে বহুসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে।

৪. দেশের দশটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে প্রতি বছর প্রায় ৩৭০০ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এ ছাড়াও সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ দূরশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রতি বৎসর তিন হাজারের বেশি কর্মরত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দান করছে। দেশের ৯,৯৭৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত নব্বই হাজারেরও বেশি শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৩৫% প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান ও কার্যক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে: (ক) শিক্ষার আধুনিক গতিধারার সঙ্গে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর প্রত্যক্ষ ও কার্যকর সংযোগের অভাব, (খ) বিষয় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক এবং শিক্ষকদের উচ্চতর পদের অভাব, (গ) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতা এবং (ঘ) শিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়নের প্রয়োজনে পরিদর্শন ব্যবস্থার অনুপস্থিতি।

৫. টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। শিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য শিক্ষকের অভাব এ প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি বড় সমস্যা।

৬. বর্তমানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি কলেজ শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দান করছে। কলেজগুলিতে শিক্ষোপকরণ, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল ইত্যাদি সুবিধা অপ্রতুল।

সুপারিশ

ক. প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক

(১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করতে হবে।

(২) এ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিশেষ শিক্ষণ কার্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

(৩) পি,টি,আই, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে সর্বাগ্রে শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন এবং পদসমূহের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন।

(৪) এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার ও নবায়নের উদ্দেশ্যে আশু ও জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রদোন্নতির ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষণপ্রাপ্ত পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(৬) পি.টি.আই. সমূহে শিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিচালক (প্রশিক্ষণ) -এর অধীনে একটি 'পরিদর্শন ও সমন্বয় কোষ' গঠিত হওয়া প্রয়োজন।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে কিছু সংখ্যক পি.টি.আই.তে বি.এড. (প্রাথমিক শিক্ষা) কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

খ. মাধ্যমিক

(৮) দেশের দশটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজকে 'অবকাশবিহীন প্রতিষ্ঠান' হিসাবে গণ্য করে এর শিক্ষাকালকে এক পঞ্জিকাবর্ষে উন্নীত করা আশু কর্তব্য।

(৯) প্রত্যেকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে প্রতিটি পদে যত দ্রুত সম্ভব বিষয়-সংশ্লিষ্ট যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ এবং যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষককে ধরে রাখার উদ্দেশ্যে অধিক সংখ্যক উচ্চতর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(১০) শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষকগণকে বিভিন্ন গবেষণামূলক ও অনুসারক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে হবে।

(১১) বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে এবং শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষার সমন্বয় ও প্রমিতকরণ প্রয়োজন।

(১২) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে ছাত্রভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী-প্রাপ্তদের, বিশেষ করে স্নাতক পর্যায়ে যাদের গণিত, পদার্থ, রসায়ন বিদ্যা ও ইংরেজি পাঠ্য বিষয় থাকে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(১৩) শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা এবং শিক্ষণ ক্ষেত্রে নবতর উদ্ভাবনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর নবায়ন প্রয়োজন। শিক্ষাক্রমে তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর সুষম বিন্যাস ও যথোপযুক্ত সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

(১৪) বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

(১৫) উচ্চ মাধ্যমিক স্তর শেষে তিন বৎসর মেয়াদী বি.এড. কোর্স প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন।

গ. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি

(১৬) পলিটেকনিকসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক। এই সকল শিক্ষকের জন্য টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে।

(১৭) টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষকের শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন। প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য উক্ত কলেজে অধিক সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষকদের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(১৮) ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষণ ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

(১৯) শিল্প-কারখানায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যোগ্য ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় আকর্ষণ সৃষ্টিকল্পে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদানের সুবিধাদান করতে হবে।

ঘ. শারীরিক শিক্ষা

(২০) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে দেশের ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজকে পুনরায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে।

ঙ. উচ্চতর শিক্ষণ

(২১) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর কোর্স ও গবেষণা কার্যক্রম প্রবর্তন ও জোরদার করতে হবে।

(২২) শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কলেজ স্তরের শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য নিয়েমার-এর শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২৩) নিয়েমার ও আই,ই,আর,এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

চ. সাধারণ

(২৪) শিক্ষার সাম্প্রতিক গতিধারা ও নবতর উদ্ভাবনার সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজনে কর্মরত সর্বস্তরের শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(২৫) শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(২৬) শিক্ষণ কার্যক্রম একটি অবিচ্ছিন্ন অব্যাহত প্রক্রিয়া বিধায় শিক্ষার মান বৃদ্ধির স্বার্থে প্রারম্ভিক শিক্ষণ লাভের পর পর্যায়ক্রমিকভাবে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

(২৭) বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এক্ষেত্রে 'বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পে'র শিক্ষণ কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে।

(২৮) কৃষি শিক্ষায় সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ দান পূর্বক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ করা প্রয়োজন।

(২৯) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষক-শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিলকে কার্যকর করতে হবে।

১৮। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১. শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, প্রবণতা, ব্যক্তিত্ব ও সৃজনশীলতা, উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের যোগ্যতা প্রভৃতির নির্ণয়ে পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. আমাদের দেশের প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা এসব উদ্দেশ্য সাধনে ফলপ্রসূ নয়। পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর ক্রমবর্ধমান হার এবং ব্যাপকভাবে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান ও পরীক্ষা ব্যবস্থার ফল।

৩. রাজনৈতিক অস্থিরতা, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, প্রশাসনিক শিথিলতা প্রভৃতি কারণে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় ইতিবাচক কার্যকারিতা যা ছিল তাও বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

সুপারিশ

ক. প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

(১) প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা দরকার। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বার্ষিক পরীক্ষাসহ অন্তত তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সম্বন্ধে অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে অবহিত রাখতে হবে।

(২) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন ব্যাংক তৈরি করবে। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নমুনা প্রশ্নের ব্যাংক তৈরি করবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং টেক্সট বুক বোর্ড। এই সমস্ত প্রশ্ন বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করতে হবে এবং শিক্ষকগণ এইগুলির অনুসরণে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

(৩) পরীক্ষায় ৫০:৫০ অনুপাতে রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে।

(৪) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সকল পরীক্ষা পরিচালনা করবে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ কমিটি। তবে প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে যথাক্রমে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য আভ্যন্তরীণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত লিখিত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই মৌখিক পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটিতে পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সদস্য হিসাবে থাকবেন। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এই পরীক্ষায় স্থানীয় শিক্ষাবিদ এবং জেলা শিক্ষা অফিসার বা তাঁর প্রতিনিধি থাকবেন।

(৫) পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ঐসব শ্রেণী থেকে অন্তত ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে। প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা জেলা ভিত্তিক হলেও এর সার্বিক উন্নয়ন, মূল্যায়ন ও ফলাফল ঘোষণার দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের।

(৬) পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুচ্ছ (ক্লাস্টার) ভিত্তিতে প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

থ. মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

(৭) সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। বছরে অন্তত দুটি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় বহিঃপরীক্ষার সঙ্গে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল গুরুত্ব লাভ করবে।

(৮) শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মেধার তীক্ষ্ণতা যাচাই এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতি রোধের লক্ষ্যে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অনুপাত বৃদ্ধি করা দরকার। ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য ৫০% নম্বর ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৫০% নম্বর এবং অন্যান্য বিষয়ে রচনাধর্মী প্রশ্নের জন্য ৪০% ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য ৬০% নম্বর বন্টন করা হবে। তবে বিভিন্ন সময়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে এই মান বন্টনের পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

(৯) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড এবং টেক্সট বুক বোর্ডের পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে প্রতি বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলা দরকার। একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয়-শিক্ষকদের সহযোগিতায় এই ব্যাংকের প্রশ্ন প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে। প্রয়োজনীয় সমতা রক্ষার্থে প্রতি বিষয়ে প্রশ্নপত্রের কয়েকটি সেট তৈরি রাখতে হবে এবং ঐসব প্রশ্ন প্রাক-পরীক্ষণের সাহায্যে আদর্শায়িত করতে হবে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশ্নপত্র পাঠাবে এবং এই প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তঃপরীক্ষা পরিচালনা ও প্রান্তিক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। পরিদর্শকগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পরীক্ষার এই পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে কিনা তার তদারকি করবেন।

(১০) উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত।

(১১) ফলাফল উন্নয়নের জন্য পুনরায় পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ায় বর্তমান প্রথা অব্যাহত রাখা যায়। বর্তমান শ্রেণী বিভাগও প্রচলিত থাকবে। তবে ভবিষ্যতে গ্রেড পদ্ধতি চালু করা সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করা উচিত।

(১২) পরীক্ষায় দুটি বিষয় পর্যন্ত যারা অকৃতকার্য হবে তাদের পুনরায় ঐ বিষয়গুলিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ দেয়া যায়। পর পর তিনটি পরীক্ষায় তিন বছরের মধ্যে ঐ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হতে না পারলে তাকে পুনরায় সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

(১৩) পরীক্ষার পদ্ধতি সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। এই সংস্থা প্রশ্ন ব্যাংকের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্ন ব্যাংকের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ, বহিঃপরীক্ষা, অন্তঃপরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়-নীতি নির্ধারণ, উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটারের ব্যবহার, গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শ প্রদান, পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল বিকাশের বিভিন্ন দিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শ অভীক্ষা প্রস্তুত এবং নতুন ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করবে।

গ. পরীক্ষা কেন্দ্র

(১৪) পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। তবে প্রতি উপজেলায় একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে এবং তা সাধারণত উপজেলা সদরে স্থাপিত হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতি জেলা সদরে থাকবে। উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(১৫) পরীক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

(১৬) পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করার জন্য অতি বিশেষ কারণ ছাড়া কাউকে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করার অনুমতি দেয়া হবে না।

(১৭) পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমগুলিকে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার করা উচিত।

(১৮) পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর তদারকি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত প্রচলিত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

ঘ. উচ্চশিক্ষা স্তর

(১৯) স্নাতক (পাস) পর্যায়ে অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য টিউটোরিয়াল, বাড়ির কাজ (হোমটাস্ক), শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা, ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক কাজ ইত্যাদি ছাড়াও প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষাসহ তিনটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা দরকার।

(২০) আভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় উত্তরপত্র শিক্ষার্থীদের ফেরত দিতে হবে যাতে তারা নিজেদের ত্রুটি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারে।

(২১) কোর্সের শিক্ষাদান সমাপন হলে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে অনুমতি দেয়া হবে।

(২২) পাস ডিগ্রীর বেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বিভাগ নির্দেশের নম্বরসীমার সমতা বিধান করা দরকার।

(২৩) এক বিষয়ে অনুত্তীর্ণ হলে সে বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে দেয়ার বর্তমান নিয়ম প্রচলিত থাকবে।

৩. স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর স্তর

(২৪) স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পরীক্ষার ফল নির্ধারণে অন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব থাকা উচিত। প্রতি কোর্সে বছরে অন্ততঃ দুটি অন্তঃপরীক্ষা নেয়া দরকার। টিউ-টোরিয়াল, প্রায়োগিক ও গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর নির্ধারিত থাকা উচিত।

(২৫) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণী নির্দেশের নম্বরসীমা নির্ধারণে সমতা বিধান করা উচিত।

(২৬) পরীক্ষার ফল প্রকাশে যে দীর্ঘ সময় লাগে তা কমানোর পদক্ষেপ হিসাবে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই পরীক্ষার বিস্তারিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করা দরকার। লিখিত পরীক্ষার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে মূল্যায়ন শেষ করতে হবে। উপরন্তু এমন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ষাট দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা যায়।

১৯। শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ

১. দেশে সর্বস্তরে ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীদের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কম। এদের মধ্যে উচ্চমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা আরো কম।

২. বর্তমানে আমাদের দেশে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার অভাব, সেশন জট, পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতি প্রভৃতি কারণে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। তদুপরি ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ তাদের হতাশাগ্রস্ত ও অস্থির করে তুলছে।

৩. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচির অভাবে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত বৃত্তি ও পেশাগত ক্ষেত্রে সঠিক নির্দেশনা লাভ করছে না।

৪. সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বেতনের হার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

৫. নিম্নবিত্ত অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অপারগ। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে না।

৬. আবাসিক সমস্যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভে একটি বড় অন্তরায়।

৭. সেশন জট, পরীক্ষা সময়মত অনুষ্ঠিত না হওয়া, শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা প্রভৃতি কারণে শিক্ষার্থীদের সরকারী চাকুরির জন্য নির্ধারিত বয়ঃসীমার মধ্যে শিক্ষা সমাপন সম্ভব হচ্ছে না, ফলে তাদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।

সুপারিশ

(১) ছাত্রভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির সম্প্রসারণ, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, আবাসিক সুযোগ বৃদ্ধি, শিফট প্রথার প্রচলন ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(২) মাধ্যমিক স্তর থেকে বৃত্তিমূলক ও বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা জোরদার করা উচিত।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সুযোগ সুবিধার সমতাবিধান করতে হবে। সকল শিক্ষার্থীকে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষায় উপকরণ ন্যায্যমূল্যে সরবরাহ নিশ্চিত করা দরকার।

(৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী ও সরকার মিলিতভাবে শিক্ষাঙ্গন থেকে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মানুবর্তিতা দূর করার উদ্যোগ নেবেন।

(৫) সাধারণ ক্লাস, টিউটোরিয়াল ক্লাস ও পরীক্ষা যাতে নিয়মিত ও যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ সতর্ক ও মনোযোগী হবেন।

(৬) শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য শিক্ষার্থী নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে।

(৭) প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের শরীরচর্চা ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৮) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া অব্যাহত রাখার জন্য তাদের বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৯) শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১০) সরকারী চাকুরির বয়ঃসীমা বর্তমান অবস্থায় বৃদ্ধি করা উচিত।

২০। শিক্ষক প্রসঙ্গ

১. দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষকের মান, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার উপর।

২. বর্তমানে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের নিয়োগ, পদোন্নতি, বেতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট ও সন্তোষজনক বিধির অভাব রয়েছে।

৩. বিপুল সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ সরকারীকরণের ফলে শিক্ষকদের সুষ্ঠু জ্যেষ্ঠতা বিধি প্রণয়ন ও প্রচলন দুরূহ হয়ে পড়েছে। সরকারীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ, চাকুরি, বেতন, পদোন্নতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা প্রায়ই সামঞ্জস্যহীন।

৪. সরকারী কলেজে শিক্ষক পদ প্রার্থীদের বি. সি. এস. পরীক্ষায় অন্যান্য কাডারের প্রার্থীদের মত কয়েকটি বিষয়ে বাধ্যতামূলক পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকার ফলে প্রার্থীদের নিজ নিজ বিষয়ের উপর পারদর্শিতা ও ব্যুৎপত্তি যথাযথভাবে যাচাই করা হয় না।

৫. সরকারী কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬২টি অধ্যক্ষ, ৫০টি উপাধ্যক্ষ, ৬৩৭টি সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াও প্রায় আড়াই হাজার প্রভাষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষাদান ও ব্যবহাপনায় বিরাট বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

৬. শিক্ষকতার পেশায় মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করার মত আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক কম। উন্নত দেশগুলির কথা বাদ দিলেও প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির কলেজ, ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তুলনায় আমাদের দেশে ঐ ধরনের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের বেতন অনেক কম।

৭. সরকারী অনুদান দেয়া সত্ত্বেও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত শিক্ষকগণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অনুরূপ আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পান না।

সুপারিশ

(১) শিক্ষাদান, অনুশীলনী তৈরি, শিক্ষার্থীদের পরিচালনা, শিক্ষাজীবনের নানা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আচার আচরণ সম্বন্ধে মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করা, বিভিন্ন অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব শিক্ষকদের পালন করা কর্তব্য। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের শক্তিবৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঠদানরত বিষয়ে গবেষণায় নিয়োজিত থাকা উচিত।

(২) শিক্ষার্থীদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের বার বার বদলী না করে একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘকাল কর্মরত রাখা উচিত।

(৩) শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে শিক্ষকদের কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের উন্নতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রয়োজন।

(৪) সমাজে শিক্ষকদের যথোচিত স্বীকৃতি দেয়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকক্রিয়াকর্মে শিক্ষকদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে তাঁদের যথাযথ স্থান নির্ধারণ করতে হবে।

(৫) শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষক বাছাই, নিয়োগ, পদোন্নতি প্রভৃতি সম্পর্কিত প্রচলিত বিধি ও পদ্ধতির সংস্কার করে সুস্পষ্ট ও সুসংসম্পূর্ণ চাকুরিবিধি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা জরুরী প্রয়োজন।

(৬) অধিক সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষকতার পেশায় সুযোগ দান করার জন্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাডারের প্রাথমিক পদগুলিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়ঃসীমা বাড়ানো দরকার। সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবসরগ্রহণের বয়স বর্ধিত করে ৬০ বছর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৬৫ বছর করা উচিত, কারণ অভিজ্ঞ শিক্ষকদের স্থান পূরণ করা দুরূহ।

(৭) বি. সি. এস. শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষায় প্রার্থীদের কেবল নিজ নিজ বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ব্যুৎপত্তি যাচাই করার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৮) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের শূন্যপদসমূহ অবিলম্বে পূরণ করতে হবে।

(৯) বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীদের প্রতি তাঁরা ব্যক্তিগত মনোযোগ দেয়ার সুযোগ পান।

(১০) সরকারীকরণের মাধ্যমে আত্তীকৃত শিক্ষক এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ-কৃত শিক্ষকদের মধ্যে বেতন ও সুযোগ সুবিধার সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত।

(১১) মেধাবী তরুণদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার জন্য এই পেশাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আর্কষণীয় করে তোলা উচিত।

(১২) সমতুল্য পর্যায়ে সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষকদের একই বেতন স্কেল প্রবর্তন করা আবশ্যক।

(১৩) পদোন্নতির জন্য প্রবীণতা ও চাকুরির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান, নিষ্ঠা ও গবেষণায় কৃতিত্ব বিবেচনা করা উচিত।

(১৪) বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের উপযোগী পদলাভের সুযোগ দানের জন্য উচ্চতর পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে।

(১৫) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের আর্থিক সংকট মোচনের লক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা দরকার। এই ফান্ডে দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলি, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইত্যাদি বার্ষিক চাঁদা এবং সরকার অনুদান দেবে।

(১৬) স্বল্প সময়ের মধ্যে পুঞ্জীভূত শূন্য পদগুলি পূরণ নিশ্চিত করার জন্য অনতিবিলম্বে পি. এস. সির বিশেষ পরীক্ষা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। বিকল্প হিসাবে বর্তমান শূন্য পদগুলি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুমতি দেয়া অত্যাবশ্যক।

(১৭) পি. এস. সির আওতার বাইরের পদগুলি ৬ মাসের মধ্যে পূরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১৮) শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সম্পর্কিত সমস্যাবলীর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগ যাতে সহজ উপায়ে সুষ্ঠুভাবে এবং যথাসময়ে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়, তার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে একটি স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করা উচিত। প্রস্তাবিত কমিশন মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা স্তরের সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। শিক্ষকদের গুণগত মান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে-বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা সার্ভিস কমিশন কর্তৃক মনোনীত শিক্ষকদের তালিকা থেকে নিয়োগ করতে হবে।

২১। শিক্ষাপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ৩টি অধিদপ্তর, ২টি পরিদপ্তর, ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাক্রম ও টেকস্ট বুক বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ফ্যাসিলিটিস বিভাগ, শিক্ষা উপকরণ বোর্ড প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা পরিচালনা করে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বি. আই. টি. কাউন্সিল স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান।

২. আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান অসন্তোষজনক পরিবেশ ও পরিস্থিতির অন্যতম কারণ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা।

৩. প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সুষ্ঠু বন্টনের অভাব শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান ত্রুটি।

৪. শিক্ষা অধিদপ্তরগুলির ক্ষমতা তাদের দায়িত্বের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। তদুপরি বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং একই অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও স্তরের মধ্যে ক্ষমতার যথোচিত বিভাজন এবং সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে।

৫. সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় জটিল সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৬. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়মিত ও কার্যকরী পরিদর্শনের অভাব রয়েছে।

৭. প্রশাসনিক ব্যবস্থার ত্রুটির ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় জনগণের অংশ গ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে।

৮. শিক্ষানীতিকে জাতীয় নীতিসমূহের অপরিহার্য অংশ গণ্য না করাতে শিক্ষা যথাযথ গুরুত্ব লাভ করছে না।

৯. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদের অভাব রয়েছে।

১০. ১৯৩১ সালে সংকলিত এডুকেশন কোড বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রযোজ্য নয়।

সুপারিশ

(১) শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে (ক) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, (খ) মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ও (গ) উচ্চশিক্ষা বিভাগ-এই তিনটি বিভাগে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা অধিদপ্তর সমূহ প্রভৃতির দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ ও বন্টন করা দরকার।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর, সকল আঞ্চলিক/বিভাগীয় শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস করা উচিত। বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরকে (ক) মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও (খ) উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর—এই দুটি অধিদপ্তরে বিভক্ত করতে হবে। এর ফলে নিম্ন পর্যায়ে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন হবে।

(৪) ডিরেক্টরেট অব ইনসপেকশন এণ্ড অডিট এবং ফ্যাসিলিটিস বিভাগকে প্রস্তাবিত আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরিদপ্তরগুলির সঙ্গে একত্রীভূত করা উচিত।

(৫) সুষ্ঠু কর্মদক্ষতা লাভের জন্য অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, সমস্ত আঞ্চলিক/বিভাগীয় ও জেলা শিক্ষা দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত দায়িত্ব, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা ও আর্থিক বরাদ্দকরণ ক্ষমতা অর্পন করতে হবে।

(৬) শিক্ষা প্রশাসনের সুষ্ঠু, যথাযথ ও সন্তোষজনক পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক নৈপুণ্য ছাড়াও পেশাগত যোগ্যতা, বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি, সমস্যা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা, বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কর্মসূচী সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থীদের সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা অপরিহার্য বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদসমূহে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত শিক্ষাবিদদের নিয়োগ করতে হবে।

(৭) শিক্ষা সংক্রান্ত বর্তমান নিয়ম-কানুন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, পরীক্ষার সংশ্লিষ্ট নিয়ম, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদান ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত একটি নতুন এডুকেশন কোড সংকলন করা উচিত।

(৮) সমগ্র দেশে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা

(৯) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুষ্ঠুরূপে নির্বাচনের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে জেলা পর্যায়ে শিক্ষক নিয়োগ করবে জেলা শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি।

(১০) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং প্রাথমিক শিক্ষার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মকর্তার দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা দরকার।

মাধ্যমিক শিক্ষা

(১১) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা দরকার।

(১২) মাধ্যমিক শিক্ষাকে কার্যকরী ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে যথাযথ ও নিয়মিত তদারকি ও পরিদর্শন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি থাকবে এবং সেখানে শিক্ষক, অভিভাবক ও দাতাদের প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। কমিটি বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী কোনো ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবে।

(১৪) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সভাপতি করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা উচিত।

কলেজ শিক্ষা

(১৫) বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কলেজ অধ্যক্ষদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(১৬) বেসরকারী কলেজসমূহে উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ পরিকল্পিতভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

(১৭) কলেজসমূহের পরিদর্শনের উপর গুরুত্ব আরোপের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও শিক্ষা বোর্ডসমূহে নিয়োজিত পরিদর্শকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকদের সঙ্গে বিষয় বিশেষজ্ঞ থাকবেন যাতে কলেজগুলির কর্মসূচী বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার মান নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

(১৮) সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলিতে গভর্নিং বডি নিয়মিত গঠন করতে হবে। গভর্নিং বডির সদস্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে অথবা বাইরে থেকে কোনো বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা

(১৯) মাদ্রাসাগুলি সুষ্ঠু পরিচালনা, উন্নয়ন ও তদারকির জন্য ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল প্রভৃতি স্তরের জন্য ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি থাকবে।

(২০) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা দরকার।

(২১) মাদ্রাসা প্রধানদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ (নেইয়ার)

(২২) দেশের মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষকদের শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যথাযোগ্যভাবে সম্পাদনের জন্য এই প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা উচিত।

বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এন্ড স্ট্যাটিসটিকস (ব্যানবেইস)

(২৩) শিক্ষা সম্পর্কিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রকাশনা ও পরিবেশনের ব্যাপারে এই সংস্থাকে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

১. মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজগুলির উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে ঢাকা, রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লায় অবস্থিত চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। ডিপ্লোমা স্তর পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর। দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড।

২. গত দেড় দশকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বিপুল হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বোর্ডগুলির পক্ষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা বোর্ডসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়।

৩. শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডগুলির মধ্যে মোটামুটি অভিন্নতা থাকলেও শিক্ষার মানের দিক থেকে সেগুলির মধ্যে তারতম্য রয়েছে।

সুপারিশ

(১) ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল নামে একটি প্রতিষ্ঠানের একই প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পরিচালনা করা উচিত। বর্তমান ছয়টি বোর্ড এই প্রতিষ্ঠানের ছয়টি শাখায় রূপান্তরিত হয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করবে।

(২) প্রস্তাবিত কাউন্সিলে একাডেমিক বোর্ডসহ শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী, পরীক্ষা মূল্যায়ন, শিক্ষা বোর্ড সমন্বয়, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা, হিসাব রক্ষণ, পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ থাকবে।

(৩) প্রস্তাবিত কাউন্সিলের প্রধান বা চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন দেশের একজন বিশিষ্ট ও অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ। এই কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক অফিসার এবং শাখা বোর্ডগুলির প্রধান হিসাবেও নিযুক্ত হবেন পণ্ডিত ও যোগ্য শিক্ষাবিদগণ।

(৪) শাখা বোর্ডসমূহের মাধ্যমে কাউন্সিল যথাসময়ে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা প্রভৃতি পরীক্ষা গ্রহণ করবে।

(৫) কাউন্সিলের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনা বোর্ড থাকবে। তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের অনুরূপ।

(৬) সরকারের সঙ্গে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের সম্পর্ক হবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের অনুরূপ যাতে কাউন্সিল একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত হতে পারে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড

(১) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী উইং প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যাওয়া উচিত।

(২) প্রাথমিক শিক্ষার (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

১৯৭৩ সালে প্রণীত আদেশ/আইন অনুসারে পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানারকম অবাঞ্ছিত ও জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

সুপারিশ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালে প্রণীত আদেশ/আইনগুলি পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করে সেই কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

১. বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন নিরূপণ এবং এই শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ, সরকারী মঞ্জুরী গ্রহণ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুসারে তা বরাদ্দ করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করা, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ ও নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং কোনো কলেজকে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা অর্পন বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ভূমিকা গ্রহণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালনের জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়।

২. বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও ক্ষমতার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ও আইনসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে কমিশনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিচালনা বিষয়ে বহুক্ষেত্রে সংঘাত ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।

সুপারিশ

(১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদেশ/আইনগুলির মধ্যে সম্পূর্ণ সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে অস্পষ্টতার অবকাশ না থাকে। মঞ্জুরী কমিশন, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের দায়িত্ব ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিত।

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা বিভাগ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এর কাঠামোর পুনর্বিন্যাস করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে মঞ্জুরী কমিশনের গঠন মূলত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিক না হয়ে সার্বিকভাবে উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হওয়া দরকার।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত উচ্চশিক্ষা বিভাগ গঠন করার পর মঞ্জুরী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষাপূর্বক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২২। শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বন্টন ও ব্যয়

১. দেশবাসীর শিক্ষা ও আর্থসামাজিক অবস্থা পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত, তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাখাতে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় অপরিহার্য।

২. আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। আমাদের সম্পদ সীমিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রচুর অর্থের নিয়মিত যোগান দিতে হবে। সুতরাং শিক্ষার সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ও জনগণের প্রয়োজনীয় অর্থব্যয় ও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

৩. আমাদের সীমিত সম্পদ শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার হতে পারে সেই লক্ষ্যে সুষ্ঠু ও বাস্তবানুগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন দরকার।

৪. শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের আনুপাতিক ব্যয়, শিক্ষার স্তর ও প্রকারভেদে ব্যয় বণ্টন, অর্থ সংস্থানের উপায় ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক।

সুপারিশ

(১) শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান ব্যয় সংকুলানের জন্য জাতীয় ব্যয়ের বর্তমানের ১০% থেকে ২০০০ সাল নাগাদ ২০% এ উন্নীত করতে হবে।

(২) শিক্ষাখাতে সরকারী অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে মোটামুটিভাবে তার ৬০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, ২৫% মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও বিশেষ শিক্ষার জন্য এবং অবশিষ্ট ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা উচিত।

(৩) শিক্ষায় অর্থ সংস্থানের জন্য নতুন কর ধার্য করা প্রয়োজন।

(৪) উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় সরকারসমূহের করের একটি নির্দিষ্ট অংশ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার জন্য ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(৫) কারিগরি শিক্ষা দ্বারা শিল্পকারখানাসমূহ প্রত্যক্ষভাবে উপকার পেয়ে থাকে। এই শিক্ষার অর্থ সংস্থানের জন্য শিল্প কারখানার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা উচিত। এই বাবদে প্রদত্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

(৬) বড় ধরনের প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর ভবিষ্যৎ বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ ও কারিগরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে সুনির্দিষ্ট ব্যয় বরাদ্দ থাকা উচিত।

(৭) আমাদের অর্থনীতিতে বৈদেশিক সাহায্য সর্বোচ্চ পরিমাণে ফলপ্রসূ করতে হলে এই সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। বৈদেশিক সাহায্যের একটি সঙ্গত অংশ প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের জন্য বরাদ্দ হওয়া আবশ্যক।

(৮) মাধ্যমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের সঙ্গতি ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্র-বেতন পুনঃনির্ধারণ করা যায়।

(৯) এই উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তারে এক কালে বেসরকারী পর্যায়ের অবদানই ছিল সর্বাধিক। এই উদ্যোগ বর্তমানে স্তিমিত। সরকারের পক্ষে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়-ভার বহন করা অসম্ভব। সুতরাং বেসরকারী ও ব্যক্তি পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পৃষ্ঠপোষকতা করার স্পৃহা পুনরুজ্জীবিত ও বর্ধিত করার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার।

(১০) শিক্ষার জন্য ব্যক্তি পর্যায়ে হিতৈষণামূলক অনুদান উৎসাহিত করা উচিত। এই ধরনের অনুদানের জন্য কর মওকুফের বর্তমান ব্যবস্থাকে আরো সম্প্রসারিত করা উচিত।

(১১) উচ্চশিক্ষা স্তরে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান ছাড়াও প্রয়োজনে সরকার ও ব্যাংক জাতীয় সংস্থাসমূহ ঋণদানের ব্যবস্থা করবে।

(১২) প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়টি বিকেন্দ্রিক করে এর সঙ্গে স্থানীয় জনসাধারণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে জড়িত করা উচিত।

(১৩) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচী সফল করার জন্য বিপুল সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষক দরকার। এজন্য প্রত্যেক এলাকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের পালাক্রমে বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাতীয় সেবার স্বার্থে শিক্ষকতা করা উচিত।

(১৪) মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিকা বৃদ্ধি করা দরকার। এই শিক্ষা ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছাত্র-বেতন, হিতৈষণামূলক অনুদান এবং অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস থেকে সংগ্রহ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে।

(১৫) নিয়মিত পরিদর্শনের সাহায্যে একদিকে সুষ্ঠু শিক্ষাদান নিশ্চিত এবং অন্যদিকে অপচয় রোধ করার জন্য শিক্ষার সর্বস্তরে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(১৬) অপচয় রোধের লক্ষ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র প্রভৃতির পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। একই শ্রেণীকক্ষ, একই গবেষণাগার ও আসবাব-পত্র বিভিন্ন পর্যায় বা শ্রেণীর জন্য ব্যবহার করা যায়। আমাদের দেশে সহজ-প্রাপ্য ও দীর্ঘস্থায়ী উপকরণের সাহায্যে শিক্ষাগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণ করলে ব্যয় কমানো সম্ভব।

(১৭) সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে গবেষণার জন্য যন্ত্রপাতি (ইকুইপমেন্ট) ক্রয় করা বাঞ্ছনীয়। অত্যাধুনিক ও ব্যয়বহুল প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষম ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা উচিত।

(১৮) উল্লিখিত সুপারিশসমূহ কার্যকর করা এবং অর্থ সংস্থানের নতুন পন্থাউদ্ভাবনের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দানের জন্য একটি কমিটি গঠন করা সমীচীন।

২৩। পরিশেষঃ

এই প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শদান ও সহায়তা করার জন্য অনতিবিলম্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি 'বাস্তবায়ন কোষ' (ইমপ্লিমেন্টেশন সেল) গঠন করার প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অংশঃ মূল রিপোর্ট

অধ্যায় ১

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

১·১· বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা।

১·২· শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

১·৩· জাতিধর্ম নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল মানুষের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত রাখা ও বিকশিত করা শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত হবে। শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর মনে তার পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা, পরিবেশ নিষ্কলুষ রাখা ও জাতীয় সম্পদ যথাযথ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতন করা এবং তাকে সমস্যার বাস্তব সমাধান সন্ধানে অনুপ্রাণিত করার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকবে। শিক্ষা একটি জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা রূপায়নের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর মানুষের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

১·৪· আমাদের দেশে প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজ জীবনে ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল দিকে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষা ব্যবস্থাকে সেজন্য তার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। এ ব্যবস্থা অবশ্যই এমন হতে হবে যেন সকলেই তাঁদের দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পান। এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশে সাহায্য করবে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টির সুযোগ প্রদান করবে।

১·৫· গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানুষের মর্যাদা ইত্যাদি কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। গণতন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার ও কর্তব্য সর্বজনস্বীকৃত। তাই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের মনে যথাযথ ধারণা দেয়া প্রয়োজন।

১·৬· সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজে প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণ চেতনায় দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। এর লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধের সঞ্চার করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী করা এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থাশীল করে তোলা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে যাতে এগুলির যথাযথ প্রতিফলন ঘটে সে দিকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দৃষ্টি রাখতে হবে।

১·৭· যে সকল আদর্শ বাংলাদেশের জন্ম দিয়েছে সেগুলি সংরক্ষণের ব্যাপারে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে একটি মৌলিক ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং দেশবাসীর ভিতর ঐক্যের বোধ শক্তিশালী করতে হবে। দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান, মুক্তি সংগ্রামের তাৎপর্য অবহিত করা, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সমাজ চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলা ভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে।

১·৮· নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ এবং জনসেবার আদর্শ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রদর্শক ও পরিচালক শক্তি হওয়া উচিত। শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে সে যেন সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

১·৯· কোনো রকম কূপমণ্ডুকতা যাতে দেশবাসীর চিত্তে সংকীর্ণতা ও সংস্কারাচ্ছন্ন প্রবণতার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। আধুনিক কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ক্রমেই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত হচ্ছে এবং মানুষের চিন্তাভাবনা ও তৎপরতা দেশ ও রাষ্ট্রের সীমানা অতিক্রম করে বিশ্বের সকল মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে। উদার বিশ্বমানবতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠায় সকল নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করার দিকে শিক্ষা ব্যবস্থা সচেতন লক্ষ্য রাখবে।

১·১০· নানা রকম কুসংস্কার এবং অন্ধ ও অযৌক্তিক ধারণা মোচন করে দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক, বস্তুনিষ্ঠ ও বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার দরকার। নানারকম দুর্নীতি অবসানের লক্ষ্যে আদর্শবাদী, নীতিবান ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভাব গড়ে তোলার প্রয়োজন। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ন্যূনতম শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১·১১· দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির গুরু দায়িত্ব শিক্ষা ব্যবস্থার উপর অর্পিত। বর্তমানে আমাদের বিপুল জনশক্তি জাতীয় সম্পদের উৎস না হয়ে আমাদের অর্থনীতির উপর একটি বিরাট বোঝাস্বরূপ চেপে রয়েছে। শিল্প ও কৃষির অগ্রগতির জন্য জনসাধারণের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানের ব্যাপারে শক্তিশালী কর্মপন্থা গ্রহণ করলে আমরা এই অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারব।

১·১২· অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর উন্নত জাতিগুলির তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক বিনিয়োগ বলে জনসাধারণের শিক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নও সূচিত হয়। প্রধানত একটি দেশের সকল স্তরের মানুষকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজন দ্বারাই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব। সে অগ্রগতি দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা প্রয়োজন। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে জাতীয় সম্পদ নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ হবে। জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতাদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়।

১·১৩· কায়িক শ্রমের প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে আমাদের দেশে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। এই প্রবণতা থেকে রেহাই না পেলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়ন মন্থর গতিতে চলবে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। যেসব বয়স্ক কর্মজীবী ইতিপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাঁদের শিক্ষাদানের সাহায্যে শ্রম দক্ষতা ও মানবিক গুণাবলীর উন্নয়নের সুযোগ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাখতে হবে। দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা শিক্ষা ব্যবস্থায় থাকা দরকার। সংক্ষেপে, দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য যেমন একদিকে সমগ্র ব্যবস্থায় প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সঙ্গে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধন করতে হবে, তেমনি কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, কৃষি, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে।

১·১৪· তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদাদান এবং সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়ণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতার দ্রুত অবসান দরকার। সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়, উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণ বিকাশের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

অধ্যায় ২

শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা

২.১. একটি দেশের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রবহমান ধারাই শিক্ষার গতিপথ নির্মাণ করে। এ প্রক্রিয়ায় সহায়ক উপাদান হিসাবে প্রণীত ও নির্ণীত হয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষোপকরণ এবং পরীক্ষা ও মূল্যায়ন কৌশলসমূহ। একারণেই গতিশীলতা শিক্ষার প্রাণশক্তি হিসাবে কাজ করে। সমাজের ক্রমাগত উত্তরণে নানা বিচিত্র সমস্যার উদ্ভব ঘটে। এ সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এবং নবতর উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচনে শিক্ষাকে নবতর দায়িত্ব ও ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। শিক্ষা সমকালীন বহুমাত্রিক জীবন ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হলেও বস্তুত তা দূর লক্ষ্যাভিসারী। শিক্ষা বর্তমানের নির্মাতা হলেও তার ভিত ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে ধারণ করে। এদিক থেকে শিক্ষাকে সামাজিক পরিবর্তনে নিয়ামক বলা যায়।

২.২. শিক্ষা ব্যবস্থা একটি সামাজিক সাংগঠনিক কর্মকান্ডকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। বস্তুত কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই একদিকে যেমন সমাজ পরিমন্ডলের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে পারে না, অন্যদিকে তা সেই পরিমন্ডলকে অতিক্রম করে বিচ্ছিন্ন কোনো জগৎ নির্মাণ করতে পারেনা। বিকাশমান জীবনের শক্তি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সামাজিক আয়োজন তারই একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবে গড়ে ওঠে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২.৩. সামাজিক ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক তেমনি কঠিন— এ ভূমিকা একাধারে শিক্ষাদানের ও শিক্ষা অর্জনের। এ হ'ল মানুষ গড়ার কাজ, এমন মানুষ যারা সৃষ্টিশীল ও উৎপাদনক্ষম এবং এ উৎপাদন সামাজিক উপযোগিতায় অর্থবহ ও তাৎপর্যময়। অন্য অর্থে, সমাজ তার উন্নতি ও অগ্রগতির নিশ্চয়তা চায় শিক্ষা ব্যবস্থার কাছে। এ নিশ্চয়তা বিধান তখনই সম্ভব হয় যখন শিক্ষায়তন যে মানুষ গড়ে তারা সমাজ গড়ার কাজে নিজেদের জ্ঞান, দক্ষতা, শ্রম ও কুশলতা বিনিয়োগ করতে সক্ষম হয়।

২.৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃহত্তম সমাজ কর্তৃক সৃষ্ট বলেই তাতে অনিবার্যভাবে পরিবার ও সমাজ জীবনের ছায়াপাত ঘটে। আমাদের শিক্ষার্থীরা শিক্ষায়তনে প্রবেশ করে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি নানা সামাজিক পরিমন্ডল থেকে। ফলে তাদের সামাজিক আচরণই সাধারণত প্রতিফলিত হয় শিক্ষাঙ্গনে ও শিক্ষা পরিবেশে।

২.৫. আমাদের তরুণ শিক্ষার্থীদের বিকাশমান জীবনের মনস্তত্ত্বও এ প্রসঙ্গে বিবেচ্য। তারুণ্য শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মনোজগতে সৃষ্টি করে বড় রকমের পরিবর্তন এবং এ পরিবর্তন বাইরের জগতের সঙ্গে বিভিন্ন সংঘাত ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসা দীর্ঘ-লালিত প্রথা ও সংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধকে পরখ করে দেখতে চায়। ফলে তারুণ্য সমাজের স্থির প্রবাহে সৃষ্টি করে আলোড়ন এবং তাতে আনে গতি ও ক্ষিপ্রতা। একারণেই তরুণ সমাজ সহজেই প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী ও প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-রূপে আবির্ভূত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জীবনাচরণে বৃহত্তর জীবন যাত্রার প্রতিফলন ঘটে।

২.৬. একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, আমাদের দেশে বৃহত্তর জনজীবনে আজ বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি বিরাজমান। এই অনভিপ্রেত পরিবেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকতে পারে না। জাতীয় জীবনে যখন অস্থিরতা চলতে থাকে তখন কোনো শিক্ষাঙ্গনই প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না। অপেক্ষাকৃত স্বাভাবিক সময়েও, যখন আপাতদৃষ্টিতে

সমাজে কোনো অস্থিরতা নেই, তখনও গোপন এবং গভীর উদ্বেগ ও অতৃপ্তির লক্ষণগুলি এখানে প্রথম আভাসিত হয়। বস্তুত এটি একটি সহজ সত্য যে, রাজনীতি জাতীয় জীবনের বিচিত্র ঘটনার ধারাকে প্রভাবিত করে। ফলে, অনিবার্যভাবেই শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ সৃষ্টিতেও রাজনীতি একটি শক্তিশালী উপাদান হিসাবে কাজ করে। একটি দেশের শিক্ষাদর্শ ও শিক্ষানীতি বহুলাংশে রাজনৈতিক মতাদর্শ ও সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল। অধিকন্তু শিক্ষার প্রসার ও গুণগত উৎকর্ষ বিধানের প্রয়োজনে যে অর্থ ও মেধার বিনিয়োগ ঘটে তা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত বস্তুগত সুযোগ-সুবিধার প্রবৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে শিক্ষার কাজে নিয়োজিত মানবীয় সম্পদের মানোন্নয়ন রাষ্ট্রীয় নীতির আনুকূল্যেই সম্ভব হয়ে থাকে। শিক্ষাখাতে অর্থের বিনিয়োগ ও শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উপর একান্তভাবেই নির্ভরশীল। সমকালীন রাজনৈতিক আচরণের ধারা প্রবাহ ও বাহিরঙ্গরূপ শিক্ষার পরিবেশকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। প্রায়শই একটি দারিদ্র্য পীড়িত কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি ও স্বল্পশিক্ষিত সমাজের রাজনীতি সুবিধা ভোগী শ্রেণীসৃজন ও পোষণ করে। তাদের আচরণ মূলত আত্মস্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থেই নিবেদিত। আবেগপ্রবণ উঠতি তারুণ্য এরূপ স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক আচরণকে মেনে নিতে পারেনা বলেই প্রতিবাদে উচ্চকণ্ঠ হয়।

২.৭. আমাদের সমকালীন ইতিহাসে কল্যাণবোধে উদ্বুদ্ধ অথচ আবেগ-তাড়িত তারুণ্যের প্রকাশ ঘটেছে। তরুণ সম্প্রদায় সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের সাধারণভাবে জাতির প্রাণশক্তির আধার বলেও অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমান শতকেরই ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে আমাদের তরুণ ছাত্রসমাজ স্বাধীনতা আন্দোলনে রাজনৈতিক আহবানে প্রবলভাবে সাড়া দিয়েছিল। শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে তারা রাজপথে নেমেছে; অধিকার আদায়ের সংগ্রামে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে। এ সকল আন্দোলনের মাধ্যমে তারা গৃহীত হয়েছে জাতির প্রাণশক্তি ও ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে। দেশ বিভাগোত্তর রাজনৈতিক ধারা প্রবাহও তরুণ ছাত্র সমাজকে দারুণভাবে আলোড়িত করে। তৎকালীন আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য ও রাজনৈতিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে তারা গড়ে তোলে সফল প্রতিরোধ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে, একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারাই ছিল পুরোভাগে। সমস্যাক্লিষ্ট জাতি তার নির্ভরতার ভিত হিসাবে দেখেছে ছাত্রসমাজকে। তারা গৃহীত হয়েছে কল্যাণধর্মী সৃষ্টিশীল যোদ্ধা নাগরিক হিসাবে। স্বাধীনতা উত্তরকালে তরুণ ছাত্রসমাজের সে গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা প্রসূত নানা বিচ্যুতি তাদের বিপথগামী ও বিভ্রান্ত করেছে। এ অবস্থা কোনো সুস্থ সমাজ বা কল্যাণমুখী রাষ্ট্র ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না।

২.৮. আজকের দিনে শিক্ষার জগতে এক শ্রেণীর ছাত্রের উচ্ছৃংখল আচরণ, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের খেলা, হত্যাকান্ড, রাহাজানি, দলাদলি ও মারামারি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে যতই বাকবিতন্ডা হোক, এর পশ্চাতে কাজ করছে অনভিপ্রেত সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে লক্ষ্য ও আদর্শহীনতা, গুণ ও মেধার যথাযথ স্বীকৃতির অভাব, সম্পদ লাভে ব্যর্থতা ইত্যাদি বিরোধী শক্তি এক কালের উদ্দীপ্ত জনশক্তিকে অবাঞ্ছিত পথে প্রলুব্ধ করেছে। অতীত তাদের কাছে অর্থহীন, বর্তমান শূন্য, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; জীবিকার ক্ষেত্রে সমাজ এদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। এই নিরাপত্তাহীনতা শিক্ষার ক্ষেত্রে জ্ঞানচর্চা ও সৃজনশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে না। অন্যদিকে স্বাধীনতা উত্তরকালে অপ্রত্যাশিত কিছু সুযোগ তাদের প্রলুব্ধ করেছে। প্রভাব বিস্তারের অদৃশ্য প্রচেষ্টা তরুণদের মধ্যে এক অসম প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করেছে। 'ফন্দি-ফিকির করে কোথাও ঢুকে পড়' আজকের দিনে এ হচ্ছে একটি সহজ পন্থা। এই পদ্ধতিতে সত্যিকার মেধা, সক্ষমতা বা যোগ্যতার প্রশ্নটি গৌণ হয়ে পড়ছে। আমাদের তরুণদের মনে এ বিশ্বাস ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে যে, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা না করেও ফন্দি-ফিকির ও প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়। বৃত্তি নির্বাচন ও বৃত্তিলাভে এ বিভ্রান্তিকর পরিবেশ আমাদের তরুণদের

আত্মশক্তিতে আস্থাবান করে তুলতে পারছে না। ফলে তাদের মনে যে হীনম্মন্যতার বীজ ঢুকছে তা অবাঞ্ছিত পথে আত্মপ্রকাশ খুঁজছে। যে সমাজে স্বার্থ ও দুর্নীতির অবাধ গতি, ন্যায়-অন্যায় যেখানে প্রবলের স্বার্থে নির্ণীত, সেখানে তরুণ সমাজ প্রত্যয়ে দৃঢ় ও বিশ্বাসে অবিচল থাকতে পারে না। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ ও রাজনৈতিক পরিমন্ডলে দূষিত বাতাস শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশে অস্বস্তিকর ঘূর্ণি সৃষ্টি করে।

২·৯· বিদ্যার্থী সমাজ প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়বে না—সমাজে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি ও রাজনীতিকগণ প্রায়শই একথা বলেন। কিন্তু অনেকের ধারণা সে কেবল কথার কথা মাত্র। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে ছাত্রদের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এ উদ্দেশ্যে নানাবিধ সুবিধা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে শারীর ও অস্ত্রশক্তির খেলায় উন্মত্ত করে তোলার অব্যাহত প্রক্রিয়া তরুণ ছাত্র সমাজকে দুঃখজনক পথে ঠেলে দিয়েছে। অবাঞ্ছিত এ পরিস্থিতিতে আরো একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, ছাত্র-রাজনীতি কেবল বিত্তলাভের পথই প্রশস্ত করে না বরং রাজনৈতিক উচ্চাসন লাভের পথও সুগম করে। তদুপরি শিক্ষায়তনে রাজনৈতিক দলগুলির অঙ্গ হিসাবে ছাত্রদলসমূহের অবস্থান ও সরকারী স্বীকৃতি শিক্ষা পরিবেশকে করে তোলে আরো ভয়াবহ। অবিশ্বাস্য রকমের অর্থ ও অস্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে এরা সব রকমের প্রতিপক্ষ দমনে ক্রিয়াশীল হয়। দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়োজনে পছন্দমত ব্যক্তিকে প্রশাসনে মনোনীত করে কিংবা যিনি প্রশাসনে আছেন, তাঁকেও টিকিয়ে রাখার আশ্বাস তাদের ক্রীড়নকে পরিণত করে। অনেক ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালী ছাত্র নেতৃত্বের জিম্মি হয়ে থাকে শিক্ষাঙ্গনের উচ্চ প্রশাসনিক কর্মকর্তা থেকে অধঃস্তন কর্মচারীটিও। দুষ্টচক্রের অব্যাহত দৌরাত্ম্যে প্রকম্পিত হয় শিক্ষাঙ্গন।

২·১০· উল্লিখিত অবস্থায় একটি নতুন মাত্রা হিসাবে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার আভ্যন্তরীণ একাডেমিক কর্মকাণ্ডে উচ্চ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ—যেমন উপযুক্ত শিক্ষক যথোচিত শিক্ষোপকরণ ও পরিবেশ যাচাই না করেই কলেজে সম্মান ডিগ্রী কোর্স এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স খোলার অনুমতিদান। সেই সূত্রে পরীক্ষার হল নিয়ন্ত্রণে অক্ষমতা এবং প্রতিষ্ঠানে পাশের হারের অভাবনীয় ঊর্ধ্বগতি তরুণ ছাত্রসমাজকে দারুণভাবে আলোড়িত করে।

২·১১· আমাদের সমকালীন সমাজে চিরাচরিত আদর্শ ও মূল্যবোধের ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়েছে এবং মূল্যবোধের বিপর্যয়জনিত নৈরাজ্য স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশকেও আক্রান্ত করেছে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, নর-নারী ও পিতা-পুত্র সম্পর্ক ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রচলিত মূল্যবোধে পরিবর্তন এসেছে। সমাজে নানারূপ প্রবঞ্চনা ও কপটাচার যুব সমাজকে সততা, ন্যায় বিচার, নৈতিকতা ইত্যাদি মহৎ মানবীয় গুণাবলীর প্রতি আস্থাভাজন করে তুলতে পারছে না। বড়দের সমাজে, বিশেষ করে রাজনৈতিক উচ্চাঙ্গনে আদর্শবাদিতা ও সততার অভাব অনুভূত হচ্ছে। ফলে আদর্শ যখন যেখানে নিতান্তই অভিজ্ঞতার বস্তু সেখানে সামাজিক বিচ্যুতি হয়ে ওঠে অবারিত ও অপ্রতিহত। পরীক্ষায় দুর্নীতি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস সৃষ্টি, অব্যাহত রক্তপাত ইত্যাদি সেই অবস্থারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

২·১২· সমাজের আদর্শহীনতা, অবিচার ও শোষণমূলক ব্যবস্থা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে যুবশক্তির। কারণ প্রথম তারুণ্যের পরনির্ভর যুবশক্তি আত্মনির্ভর হবার বাসনা পোষণ করে, তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা আশ্রয় খোঁজে আইন-শৃঙ্খলা, নিয়মতান্ত্রিকতা ও আদর্শবাদিতার মধ্যে। তারা যখন নেতৃত্বের মধ্যে লক্ষ্য করে ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা এবং মোসাহেবী চরিত্র তখনই তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও নির্ভরতার ভিত যায় ভেঙ্গে। দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও শক্তি তারুণ্য তখন নিরাশার আঁধারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নানা অশুভ কার্যকলাপের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

২·১৩· সাধারণ নিরাপত্তার অভাব শিক্ষাঙ্গনে জ্ঞান ও বিদ্যার্জনের স্বাভাবিক পরিবেশকে ভয়াবহ-ভাবে বিঘ্নিত করছে। পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন ছেলেমেয়েকে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করে উৎকন্ঠা ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে সময় কাটান। নিরাপত্তাহীন এই পরিস্থিতিতে দেশের লেখাপড়া কতটা বিঘ্নিত হয়েছে, তা সহজেই অনুমেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জট এবং ২/৩ বছরের কোর্স ৫/৬ বছরে শেষ হওয়ার ঘটনা, এ ব্যাপারে আমাদের হয়ত কিছুটা ধারণা দেবে। কেবল সেশন জটই নয়, সেশন জটের কারণে এবং অন্যান্য পরিবেশগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে শিক্ষার মান যে ভয়াবহভাবে নিম্নগামী, তা স্বীকার করতেই হয়।

২·১৪· স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের তরুণদের মধ্যে অসন্তোষজনিত যে উচ্ছৃংখল আচরণ লক্ষণীয় তার জন্য অনেকাংশে দায়ী সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে মূল্যবোধজনিত বিপর্যয় ও আদর্শহীনতা। আমাদের তরুণদের একদিকে যেমন কোনো দেশগঠনমূলক কর্মসূচী দেয়া হয়নি, তেমনি তাদের সামনে বিশিষ্ট কোনো জাতীয় চরিত্র বা আদর্শ তুলে ধরা হয়নি।

২·১৫· শিক্ষাঙ্গন আজ অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির রণক্ষেত্র হয়ে উঠছে। তা সত্ত্বেও অনেক নিবেদিত প্রাণ ও কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যেও নিজ নিজ কর্তব্য পালনে সচেষ্ট। দুঃখজনক হলেও একথা অনেকাংশে সত্য যে, শিক্ষায়তনের বিভিন্ন নির্বাচনে শিক্ষকদের মধ্যে একাধিক দল বিরাজমান এবং তাঁরা দলীয় মনোভাবাপন্ন। তাঁরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ছাত্র সমাজকে ব্যবহার করছেন। এ ধরনের আরো নানা অনভিপ্রেত কর্মকান্ডে তাঁরা জড়িত হয়ে পড়ছেন—এর প্রতিফলন ঘটছে শিক্ষায়, শিক্ষায়তনে এবং ছাত্রসমাজে। এই সকল কর্মকান্ড আমাদের মূল্যবোধের ধ্বসকে আরো ত্বরান্বিত করছে।

২·১৬· আমরা দেশের শিক্ষার সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক, সৃষ্ট সমস্যা এবং প্রভাবকারী উপাদান সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের শিক্ষাঙ্গনে আজ শিক্ষার স্বার্থ কেবল অরক্ষিতই নয়, তা বহুলাংশে বিপর্যস্তও। পরীক্ষা আজ প্রহসনে পর্যবসিত। অস্ত্র ও বাহুবলের সামনে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন নতজানু এবং শিক্ষক সমাজ ন্যুব্জদেহ। বস্তুত অন্তহীন প্রতিকূলতার মধ্যে গোটা শিক্ষাব্যবস্থাই ধুঁকছে। এ দুঃখজনক অবস্থার নিরসন হওয়া প্রয়োজন।

২·১৭· সংক্ষেপে বলা চলে যে, বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান বিশৃংখলা, অস্থিরতা ও অস্ত্র ব্যবহার বহুলাংশে আমাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের ফল। তার সাথে জড়িত রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের যথাযথ নিয়ম পালনে কঠোরতা অবলম্বন, আইন-শৃংখলা রক্ষার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, কঠোরভাবে আইন প্রয়োগের অভাব এবং শিক্ষকদের কর্তব্য পালনে শৈথিল্য ও আদর্শ স্থাপনে ব্যর্থতা।

২·১৮· সুপারিশ

(১) এই পরিস্থিতিতে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে বিশেষ দরকার রাজনৈতিক দলগুলির জরুরী ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে উদ্ভূত সমস্যা-গুলির সমাধান করা। এজন্য চাই রাজনৈতিক নেতাদের আন্তরিক সদিচ্ছা ও সংকল্প। এর কোনো বিকল্প নেই। কারণ, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিক ভাবেই করতে হবে।

(২) শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যজনক বিশৃঙ্খলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাঙ্গনকে মুক্ত রাখার জন্য রাজনীতিবিদদের একটি সম্মিলিত রাজনৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করে বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গনে বিদ্যমান রাজনৈতিক দলসমূহকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ন্যূনতম কর্মসূচী নিতে হবে। কারণ এ ছাড়া শিক্ষাঙ্গনের এসব সন্ত্রাস ও নৈরাজ্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

(৩) অন্যান্য সমস্যা শিক্ষক, শিক্ষা প্রশাসন ও অভিভাবকের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাধান করতে হবে। শিক্ষকদের পক্ষে একাডেমিক বা শিক্ষাজনিত সমস্যা সমাধান সম্ভব। তাঁদেরও ঐকান্তিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে, ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থ ভুলে সার্বিক জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৪) শিক্ষা প্রশাসনের দুর্বলতা দূর করে কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রবর্তন করতে হবে এবং ন্যায় নীতির প্রশ্নে অটল থাকতে হবে।

অধ্যায় ৩

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

ক· প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা

৩·১· আমাদেশে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির বয়স অনূর্ধ্ব ছয় বছর। এর পূর্ববর্তী স্তর, বিশেষ করে ৩—৫ বছর বয়ঃপরিক্রমই প্রাক-প্রাথমিক স্তর হিসাবে চিহ্নিত। এ সময় জীবনের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ কাল। শিশু মনোবিজ্ঞানীরা একে জীবনের গঠনমূলক অধ্যায় বলে বিবেচনা করেন। এ সময়ে শিশুর শারীরিক বর্ধন, নৈতিক ও মানসিক বর্ধন এবং সামাজিক আচরণ ক্রমবর্ধমান গতিতে ও ধারায় প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য শিশুর পরিবেশ হতে হবে বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও প্রকাশের অনুকূল। এখানেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব।

৩·২· মাতাপিতার সান্নিধ্যে গৃহে স্নেহবেষ্টনীর মধ্যে শিশুর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি আদর্শ ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের মত দেশে তা বহুক্ষেত্রে সম্ভব নয়। বিশ্বের অনেক দেশে জন্মের কয়েক মাস পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা রয়েছে।

বর্তমান অবস্থা

৩·৩· আমাদের দেশে সার্থক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, যদিও এই ধরনের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যথেষ্ট। যে কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বা শিশু শ্রেণীর ব্যবস্থা রয়েছে তা কোনো দিক থেকে সন্তোষজনক নয়।

৩·৪· এরই প্রেক্ষিতে, বিশেষ করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক পটভূমিকায় ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় অবধি শিক্ষাদান করা হয়।

৩·৫· কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়গুলি নানা সমস্যায় জড়িত—যার প্রভাবে সার্থক শিশু বিকাশ ভয়ানকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত ব্যবসার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। এর সামাজিক নীতিদর্শন, শিক্ষা পদ্ধতি ও কর্মকান্ডের সাথে শিশু বিকাশের সম্পর্ক ক্ষীণ। এই সব প্রতিষ্ঠানের সবকিছু অপরিকল্পিত। প্রায়শ দেখা যায় কোনো বসতবাড়ি ভাড়া করে স্কুলের কাজ চালানো হয়। এদের অধিকাংশের ঘরগুলি ছোট, আলো-বাতাসহীন ও অস্বাস্থ্যকর। শিশুদের স্বাভাবিক চলাফেরায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী এসব স্থানে তাদের স্বাভাবিক বিকাশ ও বর্ধন ব্যাহত হয়। এদের স্বাস্থ্যসম্মত টিফিনের ব্যবস্থা নেই। এমনকি খাবার পানির অব্যবস্থা কোনো কোনো বিদ্যালয়ে প্রকট।

৩·৬· সরকারী নিয়ন্ত্রণের বহির্ভূত এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম ও পাঠক্রম অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিজস্ব মতানুসারে নির্ধারিত হয়। শিশু বিকাশ ও শিশু মনোবিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ পরিচালক তথা শিক্ষকমন্ডলী শিশুদের উপর অসম্ভব পাঠের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাদের অবাঞ্ছিত পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়। বিদ্যালয়গুলির প্রধানসহ অধিকাংশ শিক্ষকই সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নন। এসব বিদ্যালয়ের সময়সূচী, শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ত্রুটিপূর্ণ ও শিশু বিকাশের সহায়ক নয়।

৩·৭· এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীগুলি একই অঙ্গনে অবস্থিত থাকার ফলে প্রাথমিক স্তরের শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। বিদ্যালয় পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার সমস্ত মনোযোগ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের প্রতি নিবন্ধ থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের চালচলন প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে শিশুদের বয়স ও সামর্থ্যের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তাদের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়।

৩·৮· এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের হার অত্যন্ত বেশি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য কোনো নির্দিষ্ট বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি/বিধি নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষক/শিক্ষিকারা অসন্তুষ্ট থাকেন এবং শিশুদের প্রতি সঠিক মনোনিবেশ করতে পারেন না।

উদ্দেশ্য

৩·৯· প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হল (১) শিশুর শারীরিক, মানসিক ও চারিত্রিক পরিপুষ্টি সাধন করা, (২) ভবিষ্যতে তাকে সুসমন্বিত ও সুশৃংখল সামাজিক জীবন যাপনে যথাবিহিত সহায়তা করা, (৩) খেলাধুলা ও আনন্দদায়ক পরিবেশের মাধ্যমে শিশুর প্রয়োজনীয় অভ্যাস সৃষ্টি করা এবং (৪) পরবর্তী জীবনে শিশুর আদর্শ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি স্থাপন করা। এ সকল ছাড়াও উদ্দেশ্য হল প্রাথমিক স্কুলে প্রবেশের পূর্বে শিশুদের পঠন প্রস্তুতি ও সংখ্যা পরিচিতি এবং ভাল মন্দ বিচারের যোগ্যতা অর্জন করতে শিশুদের সাহায্য করা।

৩·১০· **সুপারিশ**

(১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শিশু শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা আবশ্যক। অবশ্য তার জন্য পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন সময় ও ব্যয় সাপেক্ষ। তাই প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী খোলা বা যোগ করার ব্যবস্থা সত্বর করা যায়। স্থানীয় প্রয়োজনে-জনসাধারণের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী নেই—সেখানে শিশু শ্রেণী খোলার ব্যবস্থা করা উচিত।

(২) আমাদের দেশের প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের এই দায়িত্ব দেশের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ছাড়াও সমাজ কল্যাণ, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার উপর অর্পণ করা যায়। শিল্পাঞ্চলে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা ও আর্থিক দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বর্তাবে। শহর ও গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনবোধে এসব শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক দায়িত্ব এবং পরিচালনার ভার স্থানীয় জনসাধারণের উপর বর্তাবে।

(৩) শহরে ও শিল্পাঞ্চলে বহু পরিবারের মাতাপিতা উভয়কেই প্রয়োজনের তাগিদে কোনো কোনো বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। ফলে সেসব পরিবারের শিশুরা সারাদিন অনাদৃত অবস্থায় ঘরে নিরানন্দ জীবন-যাপন করে। পরবর্তীকালে এসব শিশুর অনেকেরই জীবনে এই বিরূপ পরিবেশের অকল্যাণকর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতির প্রতিরোধকল্পে শহরে ও শিল্পাঞ্চলে, প্রধানত শ্রমজীবী সমাজের প্রয়োজনমত শিশুদের জন্য শিশুনীড় গড়ে তোলার প্রয়োজন।

(৪) শিশুর এই গঠনমূলক স্তরের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা দরকার। যাঁরা প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষাদান করবেন তাঁদের অন্তত মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পেশাগত প্রশিক্ষণও থাকতে হবে। শিশু শিক্ষণ পদ্ধতির ব্যবহারিক জ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, পুষ্টি বিজ্ঞান, ধর্মীয় শিক্ষা, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশু সাহিত্য, গান বাজনা, অঙ্কন, হাতের কাজ, খেলাধুলা ইত্যাদি বিষয় শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত।

(৫) প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় কিন্ডার গার্টেনগুলিতে যে সমস্যা বিরাজমান তার সমাধানের ইঙ্গিত সমস্যাগুলির মধ্যে নিহিত। সেগুলি সনাক্ত করে তার মূলোৎপাটন করলেই সমস্যার সমাধান ত্বরান্বিত হবে। তবে তার জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান, পরিকল্পনা, প্রস্তুতি এবং সর্বোপরি ইতিবাচক মনোভাব প্রয়োজন। সমস্যাগুলি সমাধানে এই সকল বিদ্যালয়ে নিম্নোক্ত সরকারী অনুমোদন ও নিয়ন্ত্রণ অবশ্যই থাকতে হবেঃ

(ক) রেজিস্ট্রেশন।

(খ) শিক্ষা অধিদপ্তর কর্মকর্তার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান।

(গ) সরকার অনুমোদিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন।

(ঘ) প্রয়োজনীয় জমি, ঘরবাড়ি এবং শিশুদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের ব্যবস্থা।

(ঙ) সব শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

(চ) শিক্ষকদের জন্য বেতনক্রম ও নিয়োগনীতি/নিয়োগবিধি প্রবর্তন।

খ· প্রাথমিক শিক্ষা

ভূমিকা

৩·১১· বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে দেশকে অর্থনৈতিক উন্নতির পথে এগিয়ে নেয়ার জন্য শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রয়োজন অপরিসীম। অর্থনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে যথাযথ ব্যবহার করে দ্রুত শিল্পায়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা ৭০-৮০ হওয়া প্রয়োজন। এছাড়া অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও শিক্ষিত জনসংখ্যার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করতে হবে। মৌলিক বা বুনিয়াদী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। বুনিয়াদী শিক্ষা একজন মানুষের জন্মগত অধিকার। একজন মানুষকে তার ব্যক্তিগত চাহিদা ও প্রয়োজন মিটানোর জন্য, পরিবার ও সমাজের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার জন্য, ধর্মীয় কর্তব্য পালন করার জন্য এবং দেশ, জাতি ও বিশ্ব মানবতার প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের জন্য সুষ্ঠু বুনিয়াদী শিক্ষা অত্যাবশ্যক।

৩·১২· এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার চিন্তাভাবনা বহুদিন থেকেই চলছে। পূর্বে গঠিত সকল শিক্ষা কমিশন তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন এ বিষয়ে দিয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্যঃ-

(ক) প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে প্রাথমিক শিক্ষারূপে সার্বজনীন করতে হবে।

(খ) প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত যে অবৈতনিক শিক্ষা চালু রয়েছে তা ১৯৮০ সালের মধ্যে বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ১৯৮৩ সালের মধ্যে প্রবর্তন করতে হবে।

(গ) উপরোক্ত প্রস্তাব সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য যোগ্য শিক্ষক, পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ ও শিক্ষাঙ্গনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

৩·১৩· বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনাতে (১৯৭৩—৭৮) পাঁচ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় তৈরির প্রস্তাব করা হয়। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনাতে (১৯৮০—৮৫) প্রাথমিক শিক্ষার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় এবং শিক্ষাখাতের সমগ্র ব্যয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। তা ছাড়া প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার জন্য দুটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। একটি ইউ. পি. আই. (ইউনিভার্সাল প্রাইমারী এডুকেশন) নামে অভিহিত, বিশ্বব্যাংক সমর্থিত এবং ৪৪টি থানায়/উপজেলায় পরিচালিত। অন্যটি প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প নামে অভিহিত এবং দেশের অবশিষ্ট অংশে প্রয়োগের জন্য গৃহীত। ঐ পরিকল্পনা চলাকালে নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

(ক) ১৯৮১ সালে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর স্থাপন।

(খ) প্রতি ২০-২৫টি বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য একটি করে, দেশে ১৮৩৪টি সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি।

(গ) ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ।

(ঘ) সুসংগঠিতভাবে চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে (ক্লাস্টার ট্রেনিং) শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

(ঙ) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের উন্নততর প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

৩·১৪· এ ছাড়া ইম্প্যাক্ট (Instructional Management by Parents, Community & Teachers) এবং সি. এল. সি. (Community Learning Centre) এই দু'টি পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অল্প সংখ্যক বিদ্যালয়ে চালু করা হয়। ১১টি জেলায় ১৩২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইম্প্যাক্ট শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

৩·১৫· ১৯৮০ সালে মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৩,৯৩৬ (সরকারী ৩৬,৬৬৫, বেসরকারী ৭২৭১) বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮৬ সালে ৪৪,২২৪ (সরকারী ৩৬,৭২২ এবং বেসরকারী ৭৫০২)তে দাঁড়ায়। এই সময়ের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভর্তি সংখ্যা ১৯৮০ সালে ৮২,০০,০০০ থেকে ১৯৮৬ সালে প্রায় ৯২,০০,০০০-এ দাঁড়ায়। শিক্ষক সংখ্যা ১৯৮০ সালে ১,৮৬,৩৭৮ থেকে ১৯৮৬ সালে প্রায় ১,৯০,৫৫৭-তে দাঁড়ায় (সারণী-১)।

প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৩·১৬· বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কল্যাণ ও সার্বিক অগ্রগতির লক্ষ্যে শিক্ষার প্রধান দায়িত্ব হিসাবে দেশের বিপুল জনশক্তির দক্ষতা ও ক্ষমতার বিকাশ সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা হবে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার ও বাহন। সুতরাং প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনে সাহায্য করা। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন শিশুর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও নৈতিক দিকসমূহের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বর্ধন ও অগ্রগতি নিশ্চিত হয়।

সারণী—১

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান

সাল	বিদ্যালয়ের সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা			শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
	সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট	সরকারী	বেসরকারী	মোট
১৯৮০	৩৬,৬৬৫	৭,২৭১	৪৩,৯৩৬	১,৫১,৯৩৬	৩৪,৬৪৩	১,৮৬,৩৭৮	৭০,১৩,২৬৩	১২,০৬,০৫০	৮২,১৯,৩১৩
১৯৮১	৩৬,৬৬৫	৭,২৭১	৪৩,৯৩৬	১,৫৩,০৫৪	৩৫,৩৫০	১,৮৮,৪০৪	৭৩,৫৮,৪২৯	৯,৩৩,৯৯২	৮২,৯২,৪২১
১৯৮২	৩৬,৬৬৬	৭,২৭১	৪৩,৯৩৭	১,৫৭,১৮২	৩১,০৬১	১,৮৮,২৪৩	৭৫,০০,০০০	৯,০০,০০০	৮৪,০০,০০০
১৯৮৩	৩৬,৬৬৮	৭,৮৬০	৪৪,৫২৮	১,৫৭,১৮২	৩২,৭০২	১,৮৯,৮৮৪	৭৫,৫০,০০০	৯,০০,০০০	৮৪,৫০,০০০
১৯৮৪	৩৬,৬৮৫	৭,৩৬২	৪৪,০৪৭	১,৫৭,১৯১	৩২,৭০৯	১,৮৯,৯০০	৭৬,২১,৭২০	৯,৫৪,০৮৭	৮৫,৭৫,৮০৭
১৯৮৫	৩৬,৬৯৮	৭,৫৫২	৪৪,২০০	১,৫৭,২৪৩	৩২,৭৫৭	১,৯০,০০০	৭৯,৩৯,০৫৯	৯,৮১,২৩৩	৮৯,২০,২৯২
১৯৮৬	৩৬,৭২২	৭,৫০২	৪৪,২২৪	১,৫৭,৫৭৪	৩২,৯৮৩	১,৯৩,৫৫৭	৮১,২০,২৮২	৯,৯৫,২৭২	৯১,১৫,৫৫৪

সূত্র: বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৩·১৭· উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নোক্তভাবে বিবৃত করা যায়ঃ

(১) সাক্ষরতা, সংখ্যা ও সংখ্যা ব্যবহার সম্বন্ধে মৌলিক যোগ্যতা অর্জন।

(২) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুধাবন।

(৩) শিক্ষা ও কাজের মধ্যে সংযোগ স্থাপন এবং কাজ ও শ্রমের মর্যাদার প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

(৪) স্বাস্থ্য সম্মত জীবন যাপনের জন্য অভ্যাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন।

(৫) পরিবেশ সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি ও সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন।

(৬) সকল নাগরিকের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি।

(৭) সকল মানুষই আল্লাহর সৃষ্টি এই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার উপর ভিত্তি করে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও আন্তর্জাতিক সমঝোতার মনোভাব সৃষ্টি, সকল চিন্তা ও কর্মপ্রেরণার উৎস হিসাবে সৃষ্টিকর্তার উপর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মানো এবং সৃষ্টিকর্তার উপর একনিষ্ঠ বিশ্বাসের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ জন্মানো।

(৮) ব্যক্তি, পরিবার-সদস্য, সমাজ-সদস্য ও সুনাগরিক হিসাবে অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

(৯) দেশ, দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি।

(১০) জাতীয় সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা দেয়া ও শ্রদ্ধাবোধ জাগানো।

৩·১৮· বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো ও উদ্দেশ্যাবলী দুটি মূল লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হবে। লক্ষ্য দুটি হলঃ

(১) দুই হাজার সালের মধ্যে ৬—১০ বছর বয়সী সকল ছেলেমেয়ের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

(২) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে অর্থবহ করা এবং এর গুণগত মানোন্নয়ন করা।

বর্তমান অবস্থা

৩·১৯· দুই হাজার সালের মধ্যে 'সবার জন্য শিক্ষা' এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিক্ষার মোট ব্যয় বরাদ্দের শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ধার্য করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে (১৯৮৫—৯০) প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সমগ্র দেশের জন্য একটি মাত্র জাতীয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পের লক্ষ্য ধার্য করা হয়ঃ

(ক) ৬—১০ বছর বয়স পর্যন্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র ভর্তির সংখ্যা (বিশেষ করে ছাত্রী ভর্তির সংখ্যা) তৎকালীন ৬০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৭০ শতাংশ করা।

(খ) ১৯৮৫ সালে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হবে তাদের অধিকাংশের অন্তত পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করানো।

(গ) উন্নততর ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন এবং শিক্ষণের মান উন্নয়নের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষার আভ্যন্তরীণ কার্যকুশলতা বৃদ্ধি করা।

৩·২০· বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যালয় ত্যাগী শিক্ষার্থীদের সমস্যাটি সর্বাধিক প্রকট। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শন আরো জোরদার করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, শিক্ষার উপকরণ, খেলার সরঞ্জাম ও গ্রন্থাগার এবং সুলিখিত ও চিন্তা কর্ষক পুস্তকের অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যালয় না থাকায় দেশের সকল শিশুর পক্ষে শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব হয় না।

প্রাথমিক শিক্ষা কাঠামো

৩·২১· এই শিক্ষার কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫ বছর মেয়াদী এবং পর্যায়ক্রমে দুই হাজার সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয় হবে।

অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা

৩·২২· প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা (১ম—৫ম শ্রেণী) ১৯৯৫ সাল নাগাদ পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্তভাবে অবৈতনিক, সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করতে হবে।

বাধ্যতামূলক প্রথম শ্রেণী—১৯৯১ সাল

বাধ্যতামূলক দ্বিতীয় শ্রেণী—১৯৯২ সাল

বাধ্যতামূলক তৃতীয় শ্রেণী—১৯৯৩ সাল

বাধ্যতামূলক চতুর্থ শ্রেণী—১৯৯৪ সাল

বাধ্যতামূলক পঞ্চম শ্রেণী—১৯৯৫ সাল

প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে শিক্ষার্থীদের জন্য 'শেখো ও রোজগার কর' এ রকম ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। এর ফলে উপস্থিতির হার বাড়বে এবং গরীব পরিবারের কিছুটা আয়ের পথ খুলবে। অধিকন্তু এই পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিপক্কতার সাথে সংগতি রেখে তাদের কিছু কিছু দক্ষতা ও নৈপুণ্য অর্জনে সহায়তা করা সম্ভব হবে।

৩·২৩· প্রাথমিক শিক্ষা আবশ্যিক করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ

(ক) স্থানীয় সরকারের সহযোগিতায় জাতীয় সরকার সারা দেশব্যাপী বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করবে। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষ প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যৌথ আর্থিক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।

(খ) যেখানে সম্ভব প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

(গ) যেসব পরিবার দারিদ্র্য সীমার অত্যন্ত নিচুস্তরে আছে তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ইউনিফর্ম, বই-পত্র, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

(ঘ) প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফিডার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(ঙ) প্রয়োজনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিফট পদ্ধতি প্রচলন করা যেতে পারে।

(চ) প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছুটিসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে কাজের মওসুমে শিক্ষার্থীরা ক্ষেতে-খামারে কাজ করতে পারে।

(ছ) প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা প্রাথমিক বিদ্যালয়েই করতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন

৩·২৪· প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ দেশের সকল শিক্ষার্থীকে প্রদানের সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবেঃ

(১) বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ থেকে আগত সকল শিক্ষার্থী যেন প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিটি স্তরে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য নিরাময়মূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

(২) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সাফল্যজনকভাবে সমাপন করার পর একজন শিক্ষার্থী কোন কোন যোগ্যতা অর্জন করবে তা নির্ধারণ করতে হবে। এসব যোগ্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে শ্রেণী ও বিষয়ভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতাগুলিও নির্ধারণ করতে হবে।

(৩) বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী যাদের বেলায় প্রাথমিক শিক্ষাই হবে সমাপনী শিক্ষা তাদের চাহিদার প্রতি বিশেষ নজর রেখে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করতে হবে যাতে অর্জিত শিক্ষা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগে। সাথে সাথে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী স্তরের উচ্চশিক্ষার ভিত্তিভূমি। কাজেই শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু, পদ্ধতি বিন্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ও সতর্ক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

(৪) শিক্ষাক্রমের মূলনীতি, লক্ষ্য, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষকদের সচেতন ও অবহিত করার জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষাক্রমের সফল প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের জন্য নতুন আঙ্গিকে বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির চেষ্টা করার সাথে সাথে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

৩·২৫· প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রম প্রণয়নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেন (ক) জীবন ও সমাজের বাস্তব অবস্থার সংগে পরিচয় ঘটে, (খ) চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, (গ) নৈতিক মূল্যবোধের ভিত সৃষ্টি হয় এবং (ঘ) কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ হয়। এই প্রসংগে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) নিম্নোক্ত মত বিশেষ প্রণিধানযোগ্যঃ

'দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব পরিবেশ সমাজের চাহিদা, ছাত্রদের মানসিক ও দৈহিক ক্ষমতা এবং অভিরুচির সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে প্রাথমিক শিক্ষা পাঠক্রমের ব্যাপক পুনর্বিন্যাস করা দরকার। প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সর্বত্র শিক্ষা পদ্ধতি কর্মমুখী হবে এবং পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের চাইতে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিতে হবে।' আমাদের মত এ বিষয়ে অভিন্ন।

৩.২৬. সেই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি (১৯৭৫) কর্তৃক প্রণীত শিক্ষাক্রম কাঠামো বিবেচ্য। এই শিক্ষাক্রম যা চালু করা হয়েছে, তা চলতে পারে। তবে, কর্ম অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা বাড়ি, ক্ষেত-খামার, কারখানা ইত্যাদিতে যে কাজ করে তার সাথে যেন সরাসরি সংযোগ ঘটে। সেইজন্য চারু ও কলা, হাতের কাজ (বাগানের কাজ, স্কুল ঘরের পরিচ্ছন্নতা, খেলনা তৈরি, মাটির মডেল তৈরি, কাঠের কাজ, তাঁতের কাজ, বই বাঁধান, বেত ও বাঁশের কাজ, সেলাইয়ের কাজ, হাঁস-মুরগী পালন, প্লাস্টিক দ্রব্যাদি তৈরি, ফসল মওসুমে ক্ষেতে-খামারে কাজ ইত্যাদি), কৃষি সম্প্রসারণ কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চাষাবাদের কাজে তারা অংশ নেবে। ফসল তোলার মওসুমে বিদ্যালয় বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। এই সমস্ত বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমের একটি নমুনা সারণী-২তে দেয়া হল। শিক্ষাক্রম নমনীয় হবে। বিদ্যালয় স্থানীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে হাতের কাজ বা কৃষি সম্প্রসারণ কাজের কর্মসূচী গ্রহণ করবে। যেখানে ইংরেজি পড়ানো হবে না, সেখানে ইংরেজির জন্য যে সময় দেখানো হয়েছে সে সময় অন্য বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব অনুসারে বন্টন করা যায়।

৩.২৭. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমান প্রাথমিক স্তরের পরে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। তবে চাহিদা ও প্রয়োজনবোধে প্রাথমিক স্তরে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষাদান করা যেতে পারে।

সারণী ২

১ম—৫ম শ্রেণীর জন্য শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের জন্য সাপ্তাহিক সময় বন্টনের সুপারিশ

ক্রমিক নং	বিষয়	সময়ের হার (%) ১ম ও ২য় শ্রেণী	সময়ের হার (%) ৩য়—৫ম শ্রেণী
১।	মাতৃভাষা ..	৩৩.৩৩	২০.৬০
২।	গণিত ..	২০.০০	১৭.৭০
৩।	পরিবেশ পরিচিতি ..	১৬.৬৭	১৭.৭০
৪।	ধর্ম শিক্ষা ..	১০.০০	৮.৮৫
৫।	শারীরিক শিক্ষা ..	১০.০০	৮.৮৫
৬।	চারু ও কারুকলা, হাতের কাজ, কৃষি সম্প্রসারণ ..	১০.০০	৫.৯০
৭।	সঙ্গীত ..		৫.৯০
৮।	ইংরেজি* ..		১৪.৫০
	মোট	১০০.০০	১০০.০০

* যে সব স্কুলে ইংরেজি পড়ান হবে না সে সব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী ঐ সময় (১৪.৫০) পুনর্বন্টন করতে পারবে।

শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতি

৩·২৮· প্রাথমিক শিক্ষার মানের উপর পরবর্তী সকল শিক্ষার গুণগত মান নির্ভরশীল। এ স্তরের শিক্ষা শিশুর প্রথম শিক্ষাই নয় বরং পরবর্তী জীবনের দিক নির্দেশক বললে অত্যুক্তি হয়না। এস্তরের শিক্ষা তাই সর্বোচ্চ শিক্ষার মতই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই অনুমিত হয় যে, এ দায়িত্ব যে শিক্ষকের উপর অর্পিত তাঁকে তাঁর পেশার জন্য উপযুক্ত ও নিষ্ঠাবান হতে হবে। সেজন্য এ স্তরের শিক্ষক নির্বাচনে ও নিয়োগে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষক নির্বাচনে ভুল হলে পদ্ধতিগত যত প্রশিক্ষণই দেয়া হোক না কেন যোগ্য শিক্ষক তৈরি সম্ভব হয় না। এ স্তরের উপযোগী শিক্ষক বাছাই ও নিয়োগের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ রাখা হলঃ

(১) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকতার জন্য কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। কমপক্ষে এক বছর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষকতায় প্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা দরকার। এ জন্য একটি প্রবণতা পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ করা যেতে পারে।

(৩) প্রশিক্ষণবিহীন উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের জন্যও প্রশিক্ষণ আবশ্যক।

(৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য সাধারণ যোগ্যতা এবং এইচ·সি· ইন·এড· ডিপ্লোমাধারী হতে হবে।

৩·২৯· শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বাংলাদেশে গঠিত বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন নানা সুপারিশ রেখেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)-এর সুপারিশগুলো প্রণিধানযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে এই কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে এখনও প্রযোজ্য।

প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ তিনভাবে হতে পারে। যেমনঃ

(১) প্রস্তুতিমূলক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের নিয়োগের পর পরই হতে পারে।

(২) চাকুরিতে নিযুক্তির পর পেশাগত দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ হতে পারে।

(৩) চাকুরিকালীন সময়ে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘমেয়াদী বিভিন্ন সঞ্জীবনী ও সামার স্কুল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষায় নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে পরিচিতি ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি। এগুলি পি, টি, আই, নেইপ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ইনস্টিটিউটে আয়োজন করা যেতে পারে।

৩·৩০· বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকদের পদোন্নতির সুযোগ খুব সীমিত। এই সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়ঃ

(১) যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সংখ্যা চারশত অথবা তদূর্ধ্ব সেসব বিদ্যালয়ে একটি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এ পদের জন্য উপযুক্ত বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে এই পদ পূরণ করতে হবে।

(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকগণকে পদোন্নতির মাধ্যমে উচ্চতর পদ যথাঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুচ্ছ বা ক্লাস্টার পরিদর্শক/পরীক্ষণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, পি, টি, আই, ইনস্ট্রাক্টর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা যায়।

ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন (নেইপ)-

৩.৩১. প্রাথমিক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গঠনমূলক বৃহত্তর অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশ অনুযায়ী ময়মনসিংহে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানকে আরো উন্নত ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন যাতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয়ঃ

(১) প্রশিক্ষণ কর্মসূচী (শিক্ষক-প্রশিক্ষক, শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের চাকুরিকালীন প্রশিক্ষণ)।

(২) গবেষণা কার্যক্রম (ক্লাস রুম ভিত্তিক এ্যাকশন রিসার্চ ও প্রাথমিক শিক্ষা গবেষণা)।

(৩) শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী ও অন্যান্য শিক্ষা সামগ্রী প্রস্তুতিতে সহায়তা।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

৩.৩২. প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করতে হলে দেশবাসীর সার্বিক সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে না পারলে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করা সম্ভব হবে না।

৩.৩৩. বর্তমানে বাংলাদেশে বিদ্যালয় গমনযোগ্য শিশুর প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ বিদ্যালয়ে যায়। বাকি শতকরা ৩২ ভাগ শিশু বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই বিরাট অংশকে নিরক্ষর রেখে আমরা কখনো ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব না। কারণ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী দেশের উন্নতি ও অগ্রগতির প্রধান শক্তি। তাছাড়া দেশের সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার আছে।

৩.৩৪. পৃথিবীর বহু দেশেই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। বাংলাদেশেও সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা প্রয়োজন। এজন্য যে বিপুল অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন তা কেবল কেন্দ্রীয়ভাবে বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য স্থানীয় উদ্যোগ অপরিহার্য।

৩.৩৫. উন্নত দেশগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক স্তরে ব্যয়ের সিংহভাগ স্থানীয় জনসাধারণ বহন করে। কখনো কখনো স্থানীয় অধিবাসীগণ বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষকগণের বেতন, তাঁদের থাকার ব্যবস্থা ও শিক্ষা উপকরণাদির পুরোপুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। বাংলাদেশেও প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম স্থানীয় ও জাতীয় দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হওয়া উচিত। এই বিষয়ে এই রিপোর্টের ২২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩.৩৬. সুপারিশ

(১) সারাদেশে জরিপের মাধ্যমে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় কোথায় এবং কতটি প্রয়োজন নির্ধারণ করতে হবে।

(২) জনসাধারণ স্থানীয় উদ্যোগে যে বিদ্যালয়ের জায়গা, গৃহ, আসবাবপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন সেসব বিদ্যালয় সরকারীকরণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে।

(৩) জাতীয় সরকার কেবল শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের দায়িত্ব বহন করবে। বিদ্যালয় গৃহ রক্ষণাবেক্ষণ, সংস্কার এবং অন্যান্য সমস্ত দায়-দায়িত্ব স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বহন করবে।

(৪) যে সমস্ত এলাকাবাসী দারিদ্র্যের কারণে বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারবে না, সেসব এলাকায় সরকারী উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে।

(৫) স্থানীয় উদ্যোগে বিদ্যালয় স্থাপন, সংরক্ষণ ও আর্থিক সংস্থান করতে হলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(৬) বর্তমানে সরকার যে পরিমাণ কর আদায় করে তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বিপুল অর্থের ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার জন্য শিক্ষাকর আদায় করার ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষাঃ স্থানীয় সহায়তা

৩.৩৭. স্কুল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের প্রয়োজনেই আমাদের দেশে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে ওঠার প্রচলন বহু পূর্ব থেকেই চলে আসছে। প্রথমাবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে এ সমস্ত গ্রামীণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনোরূপে সাহায্য সহযোগিতার ব্যবস্থা ছিল না। কালক্রমে স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় সেগুলিকে তৎকালীন সরকার স্বীকৃতি দিয়ে আর্থিক সাহায্যের প্রচলন করে। অবশেষে বাংলাদেশ (গ্রামীণ) প্রাথমিক শিক্ষা আইন ১৯৩০ অনুযায়ী সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জেলা বোর্ডের অধীনে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারের এই উদ্যোগ কেবলমাত্র শিক্ষক/শিক্ষিকাদের বেতন প্রদান ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল। জমি, স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র, শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণকেই ব্যয়ভার বহন করতে হত। স্কুলের সার্বিক উন্নতির জন্য স্থানীয় জনসাধারণকেই বেশি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হত।

৩.৩৮. স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭৩ থেকে বাংলাদেশে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ পূর্বক বর্তমানে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করছে। যেহেতু প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, এবং সর্বপ্রকার সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ইদানীং স্বীকৃতি লাভ করছে সেহেতু প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার পরিবর্তে স্থানীয় জনসাধারণকে বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নতি বিধানে সম্পৃক্ত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

৩.৩৯. প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সরকারীকরণের পূর্বে স্থানীয় জনসাধারণ বিশেষ করে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, দাতা ও নেতৃস্থানীয় অভিভাবকবৃন্দ বিদ্যালয়ের সর্বাধিক উন্নতিকল্পে জড়িত হয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতেন এবং স্কুলগৃহ, আসবাবপত্র ও অন্যান্য বিষয়ে নিজেদের সাধ্যমত স্থানীয় সাহায্যের ব্যবস্থা করে বিদ্যালয় পরিবেশকে উন্নত করার প্রয়াস পেতেন। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি সরকারীকরণের পর সমাজ ও স্থানীয় জনসাধারণের এই প্রবণতা আস্তে আস্তে হ্রাস পেতে থাকে এবং বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা নেই বললেই চলে। কারণ দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ ইত্যাদি ব্যাপারে সামাজিক বা স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি আজ সমাজ থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই অবাঞ্ছিত অবস্থা

নিরসনকল্পে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতার উৎসগুলি চিহ্নিত করা আবশ্যক। শিক্ষক, স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তা ও অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা সার্বিক উন্নতিকল্পে সহযোগিতার জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি/সমিতি/প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করবেনঃ

(১) বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি,

(২) শিক্ষক অভিভাবক সমিতি,

(৩) মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় কমিটি,

(৪) সামাজিক উন্নয়নে নিয়োজিত স্থানীয় যুবসংঘ ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও স্থানীয় শিক্ষা কর্মকর্তাগণ যদি উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা দ্বারা বিদ্যালয়ের সকল প্রকার সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে পারেন তাহলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতিকল্পে আগ্রহশীল ও তৎপর হয়ে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবেন।

৩·৪০· সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় জনসাধারণ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রগুলিতে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারেনঃ

(ক) প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী বয়সের শিশুদের জরিপ,

(খ) জরিপকৃত শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি ও দৈনিক উপস্থিতি বৃদ্ধি,

(গ) বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রী যাতে পঞ্চম শ্রেণীর পাঠ সমাপ্তকরণের পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ না করে তার ব্যবস্থা,

(ঘ) বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার ও আসবাবপত্র সংক্রান্ত ব্যাপারে সহযোগিতা,

(ঙ) বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা, বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠান উদযাপন,

(চ) ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচীতে বিভিন্ন সরকারী বিভাগের সম্প্রসারণ কর্মীর অংশ গ্রহণ।

প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যতজন শিক্ষক থাকবেন এলাকাকে ততভাগে ভাগ করে এক একটি এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক শিশু জরিপ, দৈনিক উপস্থিতি ও শিশুদের স্কুল ত্যাগ বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে এলাকার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য নেতৃস্থানীয় অভিভাবক, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের সমন্বয়ে একটি সংস্থা গঠনপূর্বক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে অভিভাবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁরা অত্যন্ত উৎসাহবোধ করবেন, আনন্দিত হবেন এবং বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগী হবেন।

৩·৪১· ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক অভিভাবক সমিতির মাসিক অধিবেশনে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষকগণ স্ব স্ব এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের জরিপ অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি, নিয়মিত উপস্থিতি, বিদ্যালয় ত্যাগ বন্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে একটি মাসিক রিপোর্ট পেশ করবেন এবং উক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে মাসিক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ পূর্বক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে খুবই সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া যাবে। বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, মেরামত, সংস্কার, আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে

বর্তমানে প্রচলিত ঠিকাদারের পরিবর্তে স্কুল ম্যানেজিং কমিটিকে সম্পৃক্ত করলে কমিটির সদস্য-বৃন্দ খুবই উৎসাহবোধ করবেন এবং কাজের মান উন্নত হবে ও ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস পাবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি জনসাধারণের প্রদত্ত জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এর রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কারের দায়িত্ব তাঁদের হাতে থাকা যুক্তিযুক্ত ও সমীচীন। নিজেদের দানকৃত জমির উপর নিজেদের ছেলেমেয়েদের জন্য ঘর ও আসবাবপত্র নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পারলে স্বাভাবিক-ভাবেই স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহবোধ করবেন এবং কাজের পরিমাণ ও গুণগত মানোন্নয়নে যত্নবান ও সচেষ্ট হবেন।

৩·৪২· বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভা, ক্রীড়ানুষ্ঠান ও অন্যান্য জাতীয় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পারলে তাদের সন্তান সন্ততিদের কৃতিত্ব স্বচক্ষে দেখে বিদ্যালয়ের প্রতি তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই অনুরাগী হয়ে পড়বেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতি বিষয়ক যে কোনো কর্মে সহযোগিতার হাত বাড়াতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

৩·৪৩· ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন ভিত্তিক শিক্ষাদানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের স্থানীয় সম্প্রসারণ কর্মীদের সহযোগিতা কামনা করলে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবেন এবং অভিভাবকবৃন্দ তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের কৃষি, স্বাস্থ্য, সমবায়, পশুপালন ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান দেখে বিদ্যালয়ের প্রতি অনুরাগী হবেন এবং বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁরা সহযোগিতা করতে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হবেন।

অধ্যায় ৪

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

ভূমিকা

৪.১. শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার পরবর্তী ও ডিগ্রী শিক্ষার পূর্ববর্তী স্তর মাধ্যমিক শিক্ষা নামে চিহ্নিত। যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ স্তরে এক প্রান্তে বিদ্যমান প্রাথমিক শিক্ষা, অন্য প্রান্তে উচ্চশিক্ষা। এ জন্য মাধ্যমিক শিক্ষাকে শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদণ্ড বলা হয়।

৪.২. মাধ্যমিক স্তরে সাধারণত ১১ থেকে ১৭/১৮ বছর বয়ঃক্রমের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে। মনোবিজ্ঞানে এই বয়ঃক্রমকে বয়ঃসন্ধিকাল বা কৈশোর বলে। এই সময়েই কিশোরদের দ্রুত শারীরিক ও মানসিক বর্ধন ও বিকাশ ঘটে। এই কারণে এই স্তরকে কেন্দ্র করে সমস্ত শিক্ষা সংস্কার করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ভিত তৈরি করতে পারে, তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়, তারা সমাজ ও দেশের জন্য সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়।

মাধ্যমিক শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.৩. আমাদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী হবেঃ

(১) শিক্ষার্থীর প্রাথমিক স্তরে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষাকে সম্প্রসারিত ও সুসংহত করা।

(২) শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান দান করা, যেমন ভাষা, অংক, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরনীতি, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও শরীর চর্চা, পরিবেশ, চারু ও কারুকলা ইত্যাদি।

(৩) শিক্ষার্থীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করা।

(৪) দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রয়াসে প্রয়োজনীয় কর্তব্যনিষ্ঠ ও কর্মকুশল জনশক্তির অংশ হিসাবে শিক্ষার্থীকে তৈরি করা।

(৫) সুনাগরিক তৈরি করা যেন শিক্ষার্থী নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ হয়।

(৬) শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান-ভিত্তিক গণতান্ত্রিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

(৭) শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পুরোপুরি স্ফুরণে সাহায্য করা।

(৮) মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার উপযোগী করে গড়ে তোলা।

(৯) শিক্ষার্থী যেন স্বীয় চিন্তায় ও যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী ও অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় সেভাবে তাকে গড়ে তোলা।

(১০) শিক্ষার্থীকে এমন শিক্ষাদান করা যেন স্বীয় পরিবার, সমাজ তথা বিশ্বে উন্নত জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়।

(১১) শিক্ষার্থীর কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে একটি উত্তম পেশার জন্য তৈরি করা।

(১২) শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

মাধ্যমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থা

৪.৪. বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো হলঃ নিম্নমাধ্যমিক ৩ বছর, মাধ্যমিক ২ বছর ও উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর (৩+২+২=৭) এবং এই পর্যায়ে প্রায় দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে।

সারণী

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

স্তর	প্রতিষ্ঠান সংখ্যা			শিক্ষার্থীদের সংখ্যা			শিক্ষকের সংখ্যা		
	সরকারী	বেসরকারী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
নিম্নমাধ্যমিক	—	২৫৮৮	২৫৮৮	১৯০৯৭৪	১২৩৫৫৯	৩১৪৫৩৩	১৫৪৫৭	১৩৫৯	১৬৮১৬
মাধ্যমিক	২১৩	৭০৫৩	৭২৬৯	১৬০১০৯৭	৭৪৪১৪৯	২৩৪৫১৬৬	৭৭১৩৬	৮৩৫৯	৮৫৪৯৫
উচ্চ মাধ্যমিক	১০	২৮১	২৯১	৬৯০৫১	২৩৫৩৫	৯২৫৮৬	৩৬২৯	৫১২	৪১৩৩

৪·৫· এই প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকাংশ বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সরকার বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাবদ মাসিক প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ, বাড়ি ভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসা বাবদ ১০০ টাকা প্রদান করে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ সরকার যে অনুদান প্রদান করে তা পর্যাপ্ত নয়। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে এই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম নানাভাবে বিঘ্নিত হয়।

৪·৬· মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সমস্যা অনেক। তাদের মধ্যে রয়েছেঃ

(১) সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষকের পদের শূন্যতা।

(২) শিক্ষার্থীর তুলনায় শ্রেণীকক্ষের অপ্রতুলতা।

(৩) বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাগৃহ অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহারের অনুপযুক্ত।

(৪) বিদ্যালয়গুলিতে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় আসবাব ও শিক্ষোপকরণের অভাব।

(৫) সরকারী ও বেসরকারী উভয় ধরনের বিদ্যালয়ে বই-পুস্তকের অভাব।

(৬) অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নিয়মিত পরিদর্শনের অভাব।

(৭) বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষকের অপর্যাপ্ততা।

(৮) সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বস্তুগত ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধার অভাব।

(৯) বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিসমূহের নির্লিপ্ততা।

(১০) বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-অভিভাবকের নিয়মিত সংযোগের অভাব।

(১১) বিদ্যালয় উন্নয়ন কাজে ফ্যাসিলিটিস বিভাগের সাথে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ের অভাব।

৪·৭· এই সকল সমস্যা সমাধানের পথ সমস্যার মধ্যেই নিহিত। সেই আলোকে সুপারিশ করিঃ

(১) একটি আশু ব্যবস্থা হিসাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা শিক্ষকের শূন্যপদসমূহ পূরণের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিদ্যালয় ভবন মেরামত এবং নতুন শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করে স্থানাভাব দূর করতে হবে। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য পর্যাপ্ত সরকারী অনুদান দিতে হবে।

(৩) প্রয়োজনীয় শিক্ষোপকরণ, খেলাধুলার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র নিশ্চিত প্রয়োজন।

(৪) পর্যাপ্ত বইপত্র সংগ্রহ ও সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উন্নতি বিধান করতে হবে।

(৫) স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুতপক্ষে পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধান জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভূত হচ্ছে।

(৭) ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডিকে সক্রিয় করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৮) উন্নয়ন কাজের তদারকির জন্য অধ্যক্ষ, প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকদের এবং ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়ে শক্তিশালী উন্নয়ন কমিটি গঠন করতে হবে।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থানীয় উদ্যোগ, সহযোগিতা ও সহায়তা বৃদ্ধির সকল প্রকার ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(১০) ক্রমান্বয়ে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা পুরোপুরিভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১১) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকার থেকে নির্দিষ্ট হারে অনুদান প্রদান করা উচিত। নতুবা এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সংগে সংগে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বাজেট বরাদ্দও বাড়ানো প্রয়োজন, কেননা বর্তমানে প্রাপ্ত সম্পদ অপ্রতুল।

(১২) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো

৪·৮· পূর্বে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষা কাঠামো ৩+২+২। আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে (১৯১৭ সালে) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের (স্যাডলার কমিশন) সুপারিশের আলোকে এ কাঠামোটি গড়ে ওঠে। এ কমিশনের মতে উচ্চমানের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মানের উপর নির্ভরশীল। তাই মাধ্যমিক পর্যায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝামাঝি ২ বছর মেয়াদী ইন্টারমিডিয়েট (উচ্চ মাধ্যমিক) কোর্স চালু করা হয়। এই কোর্সটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বাছাই করে উচ্চশিক্ষার জন্য তৈরি করা। এ দিক দিয়ে কোর্সটি ইংল্যান্ডের 'এ' লেভেলের সমপর্যায়ভুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে মেধা নির্বিশেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা উত্তীর্ণ সকল শিক্ষার্থীর জন্য কোর্সটি উন্মুক্ত রাখার ফলে এর অন্তর্নিহিত সার্থকতা লোপ পেয়েছে এবং জাতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন উচ্চ শিক্ষালাভের পাসপোর্টে পরিণত হয়েছে। ফলে একদিকে হ্রাস পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান অন্যদিকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে তথাকথিত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বেকারের সংখ্যা।

৪·৯· **সুপারিশ**

(১) স্বল্প মেয়াদী ভিত্তিতে বর্তমানে প্রচলিত কাঠামো (৩+২+২) চালু থাকা উচিত। তবে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সাধারণ শিক্ষার ১১শ ও ১২শ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মেধার ভিত্তিতে 'এ' লেভেলের মত কড়াকড়ি আরোপ করা উচিত।

(২) দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে বর্তমানে চালু ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলিকে দু'ভাগ করে এক ভাগের কলেজগুলিতে নবম ও দশম শ্রেণী যোগ করে স্বয়ংসম্পূর্ণ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যায় এবং অপর ভাগের কলেজগুলিকে ইংল্যাণ্ডের ফার্দার এডুকেশন কলেজ বা আমেরিকার কমিউনিটি কলেজের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে মৌলিক বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থাসহ বিবিধ বৃত্তিমূখী ও কারিগরি কোর্স প্রবর্তন করা যায়। এ ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক শিক্ষা একটি পূর্ণাঙ্গ ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর। এই স্তরে সমস্ত শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও কার্যক্রমের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতেও এই স্তরে একই শিক্ষা পরিবেশ সৃষ্টি মনোবিজ্ঞান সম্মত। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে বর্তমান ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলির যেখানে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষা দেয়া হয়, সঙ্গে নবম ও দশম শ্রেণী সংযোগ যুক্তিযুক্ত। এতে যেমন ক্রমোন্নীত ধারাবাহিক পাঠদান ও শিক্ষা কার্যক্রম সংহত ও দৃঢ় হবে তেমনই মাধ্যমিক শিক্ষার বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর চাপ নিরসনে সহায়ক হবে।

(৪) বর্তমানে চালু ২ বছরের মাধ্যমিক স্তরটির (নবম ও দশম শ্রেণী) গুরুত্ব অনেক হ্রাস পেয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ এখন চাকুরিতে নিম্নমান সহকারী পদের জন্যও ইণ্টারমিডিয়েট অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। কাজেই দীর্ঘ মেয়াদী ভিত্তিতে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের কাঠামো হওয়া উচিত ৩ বছরের নিম্ন মাধ্যমিক (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী) এবং চার বছরের মাধ্যমিক (৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্রেণী)। এতে সুবিধা হবে এই যে, প্রাথমিক শিক্ষার স্তর যখন অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে তখন মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর হবে ৪ বছরের, ৯ম, ১০ম, ১১শ ও ১২শ শ্রেণীর।

৪·১০· বর্তমানে প্রচলিত যথাক্রমে ৯ম ও ১০ম শ্রেণী এবং ১১শ ও ১২শ শ্রেণীগুলির শেষে পর পর দুটি প্রান্তিক ও ফাইনাল পরীক্ষার স্থলে শুধুমাত্র ১২শ শ্রেণীর শেষে একটি সমাপনী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এর ফলে বর্তমানে প্রচলিত অহেতুক দ্বৈত ব্যবস্থা লোপ পাবে এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সমগ্র কাঠামোটি যুক্তিসঙ্গত হবে। এ ক্ষেত্রে যারা ৯ম ও ১০ম শ্রেণীর লেখাপড়া শেষ করে বিদ্যালয় ত্যাগ করবে তাদের বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ডের ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রধান সার্টিফিকেট ইস্যু করবেন।

গ্রানথেইস লাইব্রেরী
যোজন সংখ্যা— ৭৪১৭৬

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

নিম্নমাধ্যমিক স্তর

৪·১১· প্রাথমিক স্তরেই বলা হয়েছে যে, সমাজের চাহিদা, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক উন্নয়ন প্রভৃতির সাথে সংগতি রেখে শিক্ষাক্রম তৈরি হওয়া উচিত। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই নিম্নমাধ্যমিক স্তরের (৬ষ্ঠ—৮ম) শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ সুপারিশ করা হচ্ছেঃ

বিষয়সমূহ		সময়ের শতকরা ভাগ
বাংলা	...	১৫·০
অংক	...	১৫·০
ইংরেজি	...	১০·০
সাধারণ বিজ্ঞান	...	১৫·০
সমাজ বিজ্ঞান	...	১০·০
ধর্ম শিক্ষা	...	০৭·৫
কর্ম অভিজ্ঞতা (হাতের কাজ, কৃষি সম্প্রসারণ কাজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি)।	...	১০·০
চারুকলা	...	০৫·০
সংগীত	...	০২·৫
আরবী/অন্য একটি ভাষা	...	০৫·০
শারীরিক শিক্ষা	...	০৫·০
		১০০

প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে সংগীত শিক্ষা দেয়া অসুবিধাজনক সেখানে যদি সংগীত চালু না হয়, তবে ঐ সময়ও কর্ম অভিজ্ঞতায় ব্যয় করতে হবে। সংগীত শিক্ষা ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। তৃতীয় ভাষা যদি কোনো শিক্ষার্থী নিতে না চায়, তার ঐ সময় ইংরেজি শিক্ষায় ব্যয়িত হবে।

৪·১২· আমাদের দেশের অবস্থার কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ, জীবন যাত্রা, স্থানীয় অর্থনীতির কর্মধারা ও কর্মজীবনে প্রবেশের ভবিষ্যৎ কর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির সুষ্ঠু প্রতিফলন মাধ্যমিক ও উচ্চ পর্যায়ের পাঠ্যসূচীতে থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর মধ্যে অর্থাৎ বয়ঃসীমা (১৪ থেকে ১৭/১৮ বছরের মধ্যে) প্রতি বছর গড়ে প্রায় চার লক্ষের মত শিক্ষার্থী নানা কারণে বিদ্যালয়ের পড়াশোনা ত্যাগ করে এবং পুরোপুরিভাবে সমাজ জীবনে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এদের জীবিকা অর্জনে সহায়ক শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। অন্যথায় তাদের অধিকাংশই ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করবে এবং বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে সমাজে বিশৃংখলতা আনবে। যে কোনো দেশের পক্ষে এ অবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

৪·১৩· মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকাংশের জন্যই প্রান্তিক শিক্ষা। এই জন্য এই শিক্ষাস্তর এমন হবে যাতে এই শিক্ষা অধিকাংশের জন্য অর্থবহ হয়, যাতে তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হয়ে জীবিকা অর্জন করতে পারে এবং দেশ গড়ার কাজে সহায়ক হয়। অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যার ছাত্ররা অবশ্য উচ্চশিক্ষায় চলে যায়।

সাধারণ শিক্ষাঃ মাধ্যমিক স্তর

৪·১৪· উচ্চতর শিক্ষার প্রস্তুতিদানের উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের এই শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত। এই শিক্ষাক্রম চার বছর মেয়াদী। বর্তমানে দুই ভাগ, নবম ও দশম শ্রেণী এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী এই শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সকল শিক্ষার্থী এ পর্যায়ে (৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে) বাংলা, ইংরেজি ও অংক আবশ্যিক পঠনীয় হিসাবে অধ্যয়ন করবে। এছাড়াও শিক্ষার্থী অন্যান্য কয়েকটি বিষয় নির্বাচন করে অধ্যয়ন করবে। দশম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীরা বহিঃপরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে এবং উত্তীর্ণ হলে মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এস.এস.সি.) পাবে।

৪·১৫· ১৯৮৩ শিক্ষা বর্ষের নবম শ্রেণীর এবং ১৯৮৪ শিক্ষা বর্ষের দশম শ্রেণী যে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে ১৯৮৫ সালে মাধ্যমিক স্কুলের সার্টিফিকেট (এস.এস.সি.) পরীক্ষা গৃহীত হয়েছে এবং তারপর থেকে বর্তমানে যে পাঠক্রম প্রচলিত তা নিম্নরূপঃ

আবশ্যিক বিষয়সমূহ

১।	বাংলা	..	২০০
২।	ইংরেজি	..	২০০
৩।	গণিত	..	১০০
৪।	ভূগোল	..	১০০

নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহ—

প্রথম গুচ্ছ

সাধারণ বিজ্ঞান (সমন্বিত)—

—জড় বিজ্ঞান—১০০ } ২০০
—জীব বিজ্ঞান—১০০ }

অথবা

ইতিহাস—৭৫, অর্থনীতি—৭৫,
ও পৌরনীতি—৫০

দ্বিতীয় গুচ্ছ

নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যে কোনো দুইটি

২০০

———

১০০০

(১) ইসলাম ধর্ম শিক্ষা, (২) হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, (৩) বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা, (৪) খৃষ্ট ধর্ম শিক্ষা, (৫) উচ্চতর বাংলা, (৬) উচ্চতর ইংরেজি, (৭) আরবী, (৮) ফার্সী, (৯) উর্দু, (১০) সংস্কৃত, (১১) পালি, (১২) উচ্চতর গণিত, (১৩) ললিত কলা, (১৪) সঙ্গীত, (১৫) বিজ্ঞান (কলা শাখার জন্য), (১৬) বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, (১৭) গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন, (১৮) খাদ্য ও পরিপুষ্টি, (১৯) ব্যবসায় পদ্ধতি ও বাণিজ্য নীতি, (২০) বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ, (২১) বাণিজ্যিক ভূগোল, (২২) টাইপ শিক্ষণ, (২৩) জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন, (২৪) লোহালক্কড়ের কাজ, (২৫) কাঠের কাজ, (২৬) ফলিত বিদ্যুৎ শক্তি এবং (২৭) গৃহ নির্মাণ।

৪·১৬· মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সংস্কার ও উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নকালে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। উপরের তালিকা থেকে দেখা যাবে যে, যারা সমন্বিত বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে তাদের জন্য সমাজ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক নয়। অন্যদিকে যারা কলা শাখায় ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতি নিয়ে নবম ও দশম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করবে তাদের জন্য বিজ্ঞান অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক নয়। অথচ ভূগোল বর্তমানে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে সকলের জন্য একটি আবশ্যিক বিষয়। আমাদের মতে উপরোক্ত ব্যবস্থা যুক্তিযুক্ত নয়। বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীর জন্য শুধুমাত্র ভূগোলের ১০০ নম্বরের একটি পত্রের পরিবর্তে সমাজ বিজ্ঞান নামে ১০০ নম্বরের একটি পত্র আবশ্যিক করা যায়, যাতে ভূগোল, ইতিহাস, অর্থনীতি ও পৌরনীতির সমন্বয়ে পাঠ্যসূচী তৈরি এবং পুস্তক রচনা করা হবে। কলা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রত্যেক পত্রে ৫০ নম্বর ধার্য করে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতির জন্য মোট ২০০ নম্বরের চারটি (অর্ধ) পত্র নির্ধারিত করা যায়। বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা যেখানে ২০০ নম্বরের ২টি পত্র সমন্বিত বিজ্ঞান বিষয় এবং ১০০ নম্বরের একটি সমাজ বিজ্ঞান বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে যেখানে কলা শাখার শিক্ষার্থীরা ২০০ নম্বরের ৪টি (অর্ধ) পত্র ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি বিষয়সমূহ এবং ১০০ নম্বরের সাধারণ বিজ্ঞান বিষয়ে (উভয়ক্ষেত্রে মোট ৩০০ নম্বর) বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করবে।

৪·১৭· বিজ্ঞানের সাথে রয়েছে জীবনের সরাসরি যোগাযোগ। বিজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ ব্যতীত সমাজের সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্য সাধারণত উন্নত দেশসমূহে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে বিজ্ঞান পড়ান হয়। এই কারণে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)-সহ অন্যান্য শিক্ষা কমিশন ও কমিটি বিজ্ঞানকে মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। আমরাও ঐ সকল কমিশন ও কমিটির সাথে এই বিষয়ে একমত যে ঐ স্তরে বিজ্ঞান সকল শাখার জন্য বাধ্যতামূলক হওয়া আবশ্যক।

৪·১৮· সম্ভবত সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা না থাকায় ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে নবম ও ১৯৮৪ সালের দশম শ্রেণীর শিক্ষাক্রমে কলা শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানকে নৈর্বাচনিক করা হয়েছে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখন বিজ্ঞান পাঠ করছে না। এই ব্যবস্থা আমরা সন্তোষজনক বলে মনে করি না। সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নবম ও দশম শ্রেণীতে আবশ্যিকভাবে যাতে বিজ্ঞান পড়ান যায় সে বন্দোবস্ত করা অত্যাবশ্যক।

৪·১৯· সঙ্গে সঙ্গে আমরা এও মনে করি যে, বিজ্ঞান শাখার জন্য যে সমন্বিত বিজ্ঞান (২০০ নম্বরের ২টি পত্র) বিষয় বর্তমানে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকল শিক্ষার্থীর জন্য আপাতত আবশ্যিক করা যাবে না। অথচ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান পড়ানো হবে না, তাও ঠিক নয়। তাই কলা শাখার জন্য সাধারণ বিজ্ঞানের একটি ১০০ নম্বরের পত্র রাখা উচিত হবে—যা ১৯৮৪ সালের এস.এস.সি পরীক্ষা পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। আমাদের সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার উন্নত মান নিশ্চিত না করা পর্যন্ত বর্তমানে নবম ও দশম শ্রেণীর জন্য যে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ১৯৮৩ সালে প্রবর্তিত হয়ে বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে তা বাতিল করে নিচের সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনতিবিলম্বে চালু করা উচিত হবেঃ

নবম ও দশম শ্রেণীর সাধারণ শিক্ষার শিক্ষাক্রম নিম্নরূপ হতে পারেঃ

	বিষয়		নম্বর
১।	বাংলা	..	২০০
২।	ইংরেজি	..	২০০

মন্তব্য

৩। অংক .. ১০০

৪। (ক) সমন্বিত বিজ্ঞান ..

ভৌত বিজ্ঞান .. ১০০
ও
জীব বিজ্ঞান .. ১০০ } ২০০

(ক) ১৯৮৫ সালের মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য প্রবর্তিত এবং তখন থেকে প্রচলিত সিলেবাস অনুসারে।

(খ) সমাজ বিজ্ঞান ১০০

(খ) ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি ও পৌরনীতি বিষয়গুলির সমন্বয়ে নতুন ভাবে তৈরি সিলেবাস অনুসারে।

অথবা

৪। (গ) ইতিহাস .. ৫০
ভূগোল .. ৫০
অর্থনীতি .. ৫০
পৌরনীতি .. ৫০ } ২০০

(ঘ) সাধারণ বিজ্ঞান .. ১০০

(গ) উপরে (ক) এ উল্লেখিত সিলেবাস প্রবর্তনের পূর্বে প্রচলিত কলা প্রভৃতি শাখার জন্য প্রবর্তিত সিলেবাস অনুসারে।

৫। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা/হিন্দু ধর্ম শিক্ষা/বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা/খ্রীস্ট ধর্ম শিক্ষা/নৈতিক বিষয়ক শিক্ষা (ঙ) .. ১০০

(ঘ) কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কোনো ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে বা কোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয় ধর্ম শিক্ষা ছাড়াও নৈতিক বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইলে তা করা যাবে।

৬। নিম্নলিখিত বিষয় সমূহের মধ্যে যে কোনো একটি .. ১০০

১,০০০

(১) উচ্চতর বাংলা
(২) উচ্চতর ইংরেজি
(৩) উচ্চতর গণিত
(৪) আরবী
(৫) ফার্সী
(৬) উর্দু
(৭) সংস্কৃত
(৮) পালি
(৯) ব্যবসায় পদ্ধতি ও বাণিজ্য লিপি
(১০) বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ
(১১) বাণিজ্যিক ভূগোল
(১২) টাইপ লিখন ও স্টেনোগ্রাফী

(১৩) বস্ত্র ও পরিচ্ছদ

(১৪) গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন

(১৫) খাদ্য ও পরিপুষ্টি

(১৬) জ্যামিতিক ও কারিগরি অংকন

(১৭) ললিতকলা

(১৮) সংগীত

(১৯) কৃষি বিজ্ঞান

(২০) পশু পালন

শিক্ষার্থীদের শরীর চর্চা ও খেলাধুলায় নিয়মিত এবং সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়ন কর্মে বছরে ৬০ ঘন্টা বাধ্যতামূলকভাবে যোগ দিতে হবে।

৪·২০· এখানে উল্লেখ্য যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে জোরদার করার জন্য ইতিমধ্যে সরকার কতিপয় পদক্ষেপ নিয়েছে। যেমন, মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সার্বিক সুযোগ-সুবিধা ও গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহযোগিতায় 'মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষা' প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে (১) ল্যাবরেটরিসহ বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে এবং (২) এই প্রকল্পাধীন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের পেশাগত কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। সরকার মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ তৈরি ও সরবরাহ করার জন্য বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড স্থাপন করেছে। স্বাভাবিকভাবে আশা করা যায় যে এই বোর্ড তাদের কর্ম পরিধি বৃদ্ধি করবে এবং বিদ্যালয়গুলির বিজ্ঞান উপকরণ সরবরাহ করতে সমর্থ হবে। শুধু উপকরণ তৈরি যথেষ্ট নয়, বিদ্যালয়গুলি যাতে উপকরণ (ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য জিনিসপত্র) ক্রয় করতে পারে, সেজন্য সরকার অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করবে।

৪·২১· বিজ্ঞান শিক্ষা জোরদার করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে শিক্ষক নির্দেশিকা ও বিজ্ঞান শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন, বিদ্যালয়সমূহে ল্যাবরেটরি নির্মাণ, যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও ভৌত সুযোগ প্রদান। আমরা মনে করি যে, উপরোক্ত পদক্ষেপ যথাযথ ও সময়োপযোগী।

৪·২২· উপরে উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আশাবাদী যে অচিরে আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এমন অবস্থায় উপনীত হবে যখন আবশ্যিক বিষয় হিসাবে সমন্বিত বিজ্ঞান পড়ান সকল বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে। তখন উপরে সুপারিশকৃত শিক্ষাক্রমের পরিবর্তে নিচে সুপারিশকৃত শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করতে হবে, অর্থাৎ নবম ও দশম শ্রেণীতে সকল শিক্ষার্থীর সমন্বিত বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করতে হবেঃ

১। বাংলা	..	২০০
২। ইংরেজী	..	১০০
৩। অংক	..	১০০

৪।	বিজ্ঞান (সমন্বিত) .. জড় বিজ্ঞান—১০০ জীব বিজ্ঞান—১০০	২০০
৫।	ইতিহাস ..	৫০
৬।	ভূগোল ..	৫০
৭।	অর্থনীতি ...	৫০
৮।	পৌরনীতি ..	৫০
৯।	ধর্ম শিক্ষা ইসলাম ধর্মশিক্ষা/হিন্দু ধর্মশিক্ষা/ বৌদ্ধ ধর্মশিক্ষা/খ্রীস্ট ধর্মশিক্ষা/ নৈতিক বিষয়ক শিক্ষা ..	৫০
১০।	বৃত্তিমূলক বিষয় (১টি) ..	৫০
১১।	নৈর্বাচনিক বিষয় (১টি) ..	১০০
		১০০০

বৃত্তিমূলক বিষয়সমূহের তালিকা

(১) টাইপ লিখন ও স্টেনোগ্রাফী, (২) বস্ত্র ও পরিচ্ছদ, (৩) ললিতকলা, (৪) সঙ্গীত, (৫) কৃষি বিজ্ঞান, (৬) পশু পালন, (৭) কাঠের কাজ, (৮) লোহালক্কড়ের কাজ, (৯) গৃহ নির্মাণ, (১০) বিদ্যুৎ বিষয়ক কাজ, (১১) কম্পিউটার ইত্যাদি।

নৈর্বাচনিক বিষয়সমূহের তালিকা

(১) ব্যবসা পদ্ধতি ও বাণিজ্য নীতি, (২) বাণিজ্যিক গণিত ও হিসাব রক্ষণ, (৩) বাণিজ্যিক ভূগোল, (৪) গৃহ পরিচালনা ও পারিবারিক জীবন, (৫) খাদ্য ও পরিপুষ্টি, (৬) জ্যামিতিক ও কারিগরি অঙ্কন, (৭) উচ্চতর বাংলা, (৮) উচ্চতর ইংরেজি, (৯) উচ্চতর গণিত, (১০) আরবী, (১১) ফার্সী, (১২) উর্দু, (১৩) সংস্কৃত, (১৪) পালি ইত্যাদি।

৪·২৩· **সুপারিশ**

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সকল শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞান শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে ব্যবহারিক শিক্ষা সঠিকভাবে দেয়া হয়, সেজন্য যথোপযুক্ত ল্যাবরেটরি থাকতে হবে।

(২) প্রয়োজনীয় উপকরণে সমৃদ্ধ ল্যাবরেটরির অপ্রতুলতার জন্য নবম ও দশম শ্রেণীতে যে ধারা প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছে তা যত সত্বর সম্ভব পরিবর্তন করে উপরে দেয়া শিক্ষাক্রম চালু করতে হবে। সুপারিশ কার্যকরী করার জন্য সরকারকে ত্বরান্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে ঐ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যাপ্ত অনুদান দিতে হবে।

(৪) শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা যাতে ঠিক মত নির্ধারিত হয় এবং তা অর্জিত হয়, সেজন্য অধিদপ্তরসমূহ ও বোর্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যসূচী নিয়মিতভাবে বিষয় বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শ্রেণী শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে পরীক্ষা ও নিরীক্ষা করে সময়োপযোগী করতে হবে।

(৬) গণিত

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে গণিতের জ্ঞান যেমন অপরিহার্য তেমনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় গণিতের প্রয়োজনমুখী অবদানও অনস্বীকার্য। এজন্য প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একটি আবশ্যিক বিষয়রূপে গণিত শিক্ষা-দান ছাড়াও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নৈর্বাচনিক বিষয়রূপে উচ্চতর গণিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৭) ভাষা শিক্ষা

(ক) বাংলাঃ মাতৃভাষায় পাঠাভ্যাস, উচ্চারণ শুদ্ধি, ভাবের আদান-প্রদান, সাহিত্যরস উপভোগ ও মৌলিক রচনা রীতি শিক্ষাদানের জন্য ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। এজন্য ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় বাংলা পঠন-পাঠনের জন্য সাপ্তাহিক পিরিয়ডের সংখ্যা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় বেশি থাকবে, কিন্তু মাতৃভাষায় শিশুর ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির সংগে সংগে উক্ত পিরিয়ডের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাবে যাতে প্রাপ্ত সময় অন্যান্য জটিল বিষয় শিক্ষাদানের জন্য বন্টন করা যেতে পারে। বস্তুত বাংলা ভাষার মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন পরোক্ষভাবে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষায় নৈপুণ্য অর্জনের ভিত্তি প্রস্তুত করতে প্রভূত সাহায্য করে। তাই প্রথম শ্রেণীতে মাতৃভাষা শিক্ষাদানে যে সময় ব্যয় করা হয়, তার এক তৃতীয়াংশ কম সময় ব্যয়িত হওয়া উচিত ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে শিক্ষাদানের জন্য।

(খ) ইংরেজিঃ আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের পাঠ্যসূচীতে আধুনিক ভাষারূপে ইংরেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিশু মনোবিদ্যার সংগে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন দেশে পঞ্চম বা ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা পড়ানো হয়। বহুক্ষেত্রে একটি বিশেষ শ্রেণী থেকে বিদেশী ভাষা পড়াবার ব্যবস্থা থাকলেও তা আবশ্যিক নয়। যে কোনো ভাষা শেখার জন্য ভাষাগত কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে হয়। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক, পাঠ্যসূচী, পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ। তাই একটি ভাষা কত বছর ধরে শিক্ষা দেয়া হল সেটা বড় কথা নয়, আসল কথা কিভাবে ভাষাটি শেখানো হল। তাই আমরা ইংরেজি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে বাধ্যতামূলক করতে সুপারিশ করেছি, তবে কোনো স্কুল তার পূর্বে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইংরেজি শিক্ষা আরম্ভ করতে পারে।

(৮) বৃত্তিমূলক শিক্ষা

অতীতের সব শিক্ষা কমিশন ও কমিটি বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। দেশে দক্ষ শ্রমশক্তি ও কারিগর তৈরির জন্য বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা অপরিহার্য। আমরাও ঐ কমিশনগুলির সঙ্গে একমত। তাই আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

বর্তমানে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা দেশে চালু আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ভি, টি, আই এবং টি, টি, আইসমূহ (প্রকৌশল ও কারিগরি অধ্যায় দ্রঃ), এ, আই, টি (কৃষি শিক্ষা অধ্যায় দ্রঃ), চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নার্সিং, প্যারা-মেডিক্যাল, টেকনিশিয়ান ইত্যাদি (চিকিৎসা শিক্ষা অধ্যায় দ্রঃ) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প। বর্তমানে ৪০২টি স্কুলে এই কমিউনিটি স্কুল প্রোগ্রাম চালু আছে। আমরা সুপারিশ করি যে, এই প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরো জোরদার ও সম্প্রসারণ করতে হবে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী এই শিক্ষার সুযোগ পেয়ে স্বনির্ভর হতে পারে।

(৯) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা

বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভিত হবে মাধ্যমিক স্তর। সেজন্য নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে আমরা আবশ্যিকভাবে এই শিক্ষাদানের সুপারিশ করেছি। শিক্ষার্থীরা সাধারণ কোর্সে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটি বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করবে। এজন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে কতগুলি বৃত্তিমূলক বিষয় চালু করতে হবে। তবে দশম শ্রেণী পাশ করার পর কতগুলি বৃত্তিমূলক কোর্সে যেমন পলিটেকনিক, এ,আই,টি ইত্যাদিতে যোগ দিতে পারবে। অর্থাৎ যারা সাধারণ ধারায় যেতে পারবে না, বা যাওয়ায় আগ্রহী নয়, তারা ট্রেড বা কারিগরি ধারায় যেতে পারবে এবং ভবিষ্যতে চাকুরি না পেলেও স্বনির্ভর হয়ে কর্মসংস্থান করে নিতে পারবে। তা ছাড়া যেহেতু সবাইকে এই বৃত্তিমূলক বিষয় নিতে হবে এবং হাতে-কলমে কাজ করতে হবে, সেহেতু শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ এতে গড়ে উঠবে। যাতে এই বৃত্তিমূলক বিষয় উত্তমরূপে শিক্ষা দেয়া যায় তার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষা পদ্ধতির ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা সুপারিশ করি যে একজন অতিরিক্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রত্যেক বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক স্কুলে নিয়োগ করা উচিত, যার শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ন্যূনপক্ষে ডিপ্লোমা। এই শিক্ষকের উপর সমস্ত বৃত্তি-মূলক শিক্ষার দায়িত্ব থাকবে। তাছাড়া বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকও রাখতে হবে। বর্তমানে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প যে ৪০২টি স্কুলে চালু আছে, সেগুলি কেন্দ্র হিসাবে চালু থাকবে এবং ক্রমে ক্রমে এই ব্যবস্থা অন্যান্য স্কুলে চালু করতে হবে। সব স্কুলেই একই বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন নেই। যে স্কুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে যে বিষয় শিক্ষাদানের সুযোগ সুবিধা গড়ে তুলতে পারবে, সেখানে সেগুলিই খোলা উচিত হবে। পরিবেশ কেন্দ্রিক ট্রেড বিষয় খুললে তাতে খরচ কম পড়বে এবং শিক্ষাদান সহজ হবে। সব ক্ষেত্রেই ব্যয়সাধ্য যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হবে না। এ জন্য সরকারকে বেসরকারী স্কুলে পর্যাপ্ত অর্থ যোগান ও অনুদান দিতে হবে। দেশের সবগুলি স্কুলে এই বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করলে বেকার সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে।

(১০) উপানুষ্ঠিক শিক্ষা

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প যে বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে, সেখানে সাধারণ শিক্ষা ধারার পাশাপাশি স্কুল ত্যাগী শিক্ষার্থী এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকবে। যে শিক্ষকেরা এই প্রকল্পে নিয়োজিত আছেন বা ভবিষ্যতে নিয়োজিত হবেন তাঁরাই এই প্রশিক্ষণ দিবেন। একই প্রতিষ্ঠানে এভাবে নিয়মিত শিক্ষার্থীদের এবং অন্যান্যদের শিক্ষণ চলতে পারে।

কর্ম অভিজ্ঞতা

৪·২৪। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সম্যক বিকাশের জন্য তাত্ত্বিক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তার প্রবণতা, নৈপুণ্য ও লব্ধজ্ঞান প্রয়োগের পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে। আমাদের জনজীবনের চাহিদা এবং দেশের সম্পদ ও উৎপাদনের বিভিন্ন প্রেক্ষিত বিবেচনা করে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের কর্ম অভিজ্ঞতা কার্যক্রমে বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সমাজ বিজ্ঞান, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, সমাজ সেবা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। এভাবে শিক্ষাদান প্রক্রিয়া ও কর্ম অভিজ্ঞতা একীভূত করা সম্ভব। চীন দেশে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য বছরে দুই সপ্তাহ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের জন্য চার সপ্তাহ খামার ও কারখানায় শ্রমদান করা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য যে, কর্ম অভিজ্ঞতার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীকে কোনো একটি বিশেষ কাজে দক্ষ বা শিক্ষিত করে তোলা, যা সে বৃত্তি বা পেশারূপে গ্রহণ করবে। কিন্তু কর্ম-অভিজ্ঞতা হচ্ছে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা শিক্ষার্থীর মনমানস ও কর্মকুশলতাকে বৃদ্ধি করে তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করে।

শিক্ষক সংকট (সাধারণ মাধ্যমিক স্তর)

শিক্ষক প্রস্তুতকরণ

৪·২৫· বর্তমানে আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে প্রধান বিষয়সমূহ যথা—গণিত, ইংরেজি, ইতিহাস, ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে অনেকগুলি নতুন বিষয় প্রবর্তনের ফলে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয় নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। তাই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে গণিত ও পদার্থবিদ্যা না নিয়েই শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানে গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে। আর এসব গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ও আই, ই, আর-এর বি, এড কোর্সে ভর্তি হচ্ছে। অথচ এটাই স্বাভাবিক যে মাধ্যমিক স্তরের ভাবী শিক্ষক অন্তত পক্ষে দুটি স্কুল বিষয়ে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট স্তরে ব্যুৎপত্তি লাভ করবেন। বর্তমানে বি, এড, কোর্সে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে একথা সত্য নয়। কাজেই এখন অনন্যোপায় হয়ে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক তৈরির জন্য বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করা উচিত যেন বি, এড, কোর্সে স্কুল বিষয়সমূহে ব্যুৎপত্তি ও পেশাগত জ্ঞান একই সঙ্গে অর্জনের ব্যবস্থা করা যায়।

৪·২৬· **সুপারিশ**

(১) টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক প্রার্থীদের মধ্যে বি, এ, ও বি, এসসি,-তে যাদের মাধ্যমিক স্কুল বিষয় সম্পর্কিত দুটি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি রয়েছে তাদের উক্ত কোর্সে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তি করা প্রয়োজন।

(২) আই, ই, আর, এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজগুলিতে তিন বছর মেয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কোর্স চালু করার সম্ভাবনা অনতিবিলম্বে পরীক্ষা করে দেখা উচিত, যাতে মাধ্যমিক স্তরের ভাবী শিক্ষক অন্তত পক্ষে দুটি স্কুল বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত পার্থক্য ও শিক্ষাক্রম

৪·২৭· অনেক দেশে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের স্কুল ও শিক্ষাক্রম রয়েছে। যেমন ইংল্যান্ডের গ্রামার স্কুল, চীন দেশে কী স্কুল, ভারতে নভোদয় বিদ্যালয়। আমাদের দেশে জিলা স্কুল, কলেজিয়েট স্কুল, ল্যাবরেটরি স্কুল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি ধরনের স্কুলে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি করার প্রয়াস রয়েছে। দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য সাধারণ বৃত্তি ছাড়া তাদের লেখাপড়ার পুরো খরচ বহন করার কোনো ব্যবস্থা এদেশে নেই।

৪·২৮· এতদ্ব্যতীত এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো উন্নত বা অগ্রসর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নেই বা সে ধরনের কোনো প্রান্তিক পরীক্ষার ব্যবস্থাও নেই। এদেশের সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরণ করে এবং একই প্রান্তিক পরীক্ষায় যেমন এস, এস, সি/এইচ, এস, সি, ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করে। সাধারণত পরীক্ষার বিভাগ দেখে শিক্ষার্থীদের মেধার বিচার করা হয়ে থাকে।

৪·২৯· এ ব্যবস্থার ফলে একদিকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার উপযোগী উন্নতমানের শিক্ষা লাভ করতে পারে না, অন্যদিকে মন্থর বা নিম্ন মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ করবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের অনভিপ্রেত বোঝা হয়ে মেধা ও শক্তির অপচয় ঘটায়। অথচ মাঝারি ও নিম্ন মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাও তাদের মেধার উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ করলে সমাজের উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৪·৩০· স্ট্যানফোর্ড বিনের পরিশীলিত অভীক্ষায় দেখা যায় যে, উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ১ জনের মত। *এ ধরনের শিক্ষার্থীর বুদ্ধ্যংক ১৪০ এর উপর। বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ। এদের মধ্যে শতকরা ১ ভাগ হারে উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মেধার লালনের জন্য এবং নিম্ন মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বাড়তি সময়ে নিরাময়মূলক শিক্ষার জন্য আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(১) আমাদের দেশের দশটি ক্যাডেট কলেজ, একটি রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ এবং কোনো কোনো ল্যাবরেটরি স্কুলকে উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ধরনের মেধা স্কুলে রূপান্তর করা যায়। এ সকল স্কুলের প্রশাসনিক দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত থাকবে, কেবল মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে এবং দারিদ্র্যের কারণে কোনো শিক্ষার্থীর লেখাপড়ায় কোনো বাধা থাকবে না। অর্থাৎ স্বল্প বিত্ত বা বিত্তহীন পরিবারের মেধাবী ছেলেমেয়েদের যাবতীয় লেখাপড়ার ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে। এ সকল স্কুলের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি উচ্চ শিক্ষার উপযোগী হবে। সেই সঙ্গে উচ্চ মানের শিক্ষাদানের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা এসব স্কুলে সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(২) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আমাদের দেশে প্রতি বছর সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার নতুন বিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। এই সকল নতুন বিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক বিদ্যালয় পুরাতন জেলা শহরগুলিতে স্থাপন করে ক্রমবর্ধমান মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ঐ সকল বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এভাবে আনুপাতিক হারে অন্যান্য বিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সঙ্গে মেধা

---

*Chauhan, Advanced Educational Psychology, Vikaas Publishing Home Ltd. New Delhi, Page 294.

বিদ্যালয়গুলির সংখ্যাও বৃদ্ধি পাবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বিদ্যালয়ে গড়ে এক হাজার শিক্ষার্থী হিসাবে এজন্য প্রায় ২৮টি উচ্চ মেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে।

(৩) নিম্ন মেধা সম্পন্ন বা মাঝারি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যারা স্কুল সময়ের অতিরিক্ত সময়ে বাড়তি শিক্ষার সুযোগ লাভ করতে চায়, তাদের জন্য স্কুলেই বাড়তি লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। যে সকল শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের নিরাময়মূলক পাঠদান করবেন, তাঁদেরকে তাঁদের মাসিক বেতনের অতিরিক্ত অর্থ সম্মানী বাবদ প্রদান করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে নিয়মিত কোনো শ্রেণী শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করতে পারবেন না।

(৪) বর্তমানে এস, এস, সি/এইচ, এস, সি, স্তরের পরীক্ষা কেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ফেল করে, সমাজে অদক্ষ ও অপ্রয়োজনীয় জনশক্তিরূপে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে এবং সমাজের অর্থনীতিতে অনভিপ্রেত প্রভাব বিস্তার করছে, তাদের যথাযথ বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সমাজের উৎপাদনমূলক কার্যক্রমে জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আবশ্যক।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী

৪·৩১· দশম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্তির পর একাদশ শ্রেণীতে অধ্যয়নের প্রাক্কালে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনানুযায়ী বহুমুখী শিক্ষাক্রমসমূহের যে কোনো একটিতে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পর তারা একটি বহিঃ পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং সার্টিফিকেট পাবে।

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

আবশ্যিক বিষয়সমূহ

পাঠ্য বিষয়	নম্বর
১। বাংলা	২০০
২। ইংরেজি	২০০

এই পাঁচটি বিষয় ছাড়াও নৈর্বাচনিক বিষয় তিনটির অতিরিক্ত অন্য একটি নৈর্বাচনিক চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবে।

নৈর্বাচনিক বিষয় সমূহ

যে কোনো শাখা থেকে
তিনটি বিষয় (২০০ × ৩) ৬০০

১০০০

(ক) **বিজ্ঞান শাখা ঃ সাধারণ**

(১) **নিচের তিনটি বিষয়ই নিতে হবেঃ**

(১) পদার্থ বিজ্ঞান

(২) রসায়ন বিজ্ঞান

(৩) গণিত

(২) নিচের যে কোনো একটি বিষয় চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) জীব বিজ্ঞান

(২) মনোবিজ্ঞান

(৩) ভূগোল

(৪) পরিসংখ্যান

(৫) গার্হস্থ্য অর্থনীতি

(৬) কৃষি বিজ্ঞান

(৭) অর্থনীতি

(খ) বিজ্ঞান শাখাঃ ডাক্তারীপূর্ব (চিকিৎসা শিক্ষা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

নিচের চারটি বিষয়ই নিতে হবে ঃ

(১) পদার্থ বিদ্যা — তিনটি আবশ্যিক এবং বাকিটি চতুর্থ বিষয় বলে গণ্য হবে।

(২) রসায়ন বিদ্যা

(৩) জীব বিজ্ঞান

(৪) গণিত

(গ) বিজ্ঞান শাখাঃ কারিগরি পূর্ব

(১) নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবেঃ

(১) পদার্থ বিজ্ঞান

(২) রসায়ন বিজ্ঞান

(৩) গণিত

(২) নিচের যে কোনো একটি বিষয় চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) অর্থনীতি

(২) ভূগোল

(৩) পরিসংখ্যান

(৪) কৃষি বিজ্ঞান

(৫) জীব বিজ্ঞান

(৬) প্রকৌশলী অংকন ও ওয়ার্কশপ প্রাকটিস

(৭) কম্পিউটার

(ঘ) **বিজ্ঞান শাখাঃ কৃষি বিজ্ঞান**

নিচের বিষয়গুলি নিতে হবেঃ (কৃষি শিক্ষা অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

(১) কৃষি বিজ্ঞান — এর তিনটি আবশ্যিক এবং বাকিটি চতুর্থ বিষয়রূপে গণ্য হবে।

(২) রসায়ন বিজ্ঞান

(৩) পদার্থ বিজ্ঞান

(৪) গণিত

(ঙ) **কলা শাখা**

নিচের যে কোনো তিনটি বিষয় নিতে হবেঃ

(১) অর্থনীতি

(২) পৌরনীতি

(৩) ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস

(৪) সমাজ কল্যাণ/সমাজ কর্ম/সমাজ বিজ্ঞান

(৫) যুক্তি বিদ্যা

(৬) মনোবিজ্ঞান

(৭) ভূগোল

(৮) গণিত

(৯) পরিসংখ্যান

(১০) গার্হস্থ্য অর্থনীতি

(১১) আরবী/ফার্সী/সংস্কৃত/পালি/উর্দু/ইসলামী শিক্ষা

(১২) বাংলা উচ্চতর/ইংরেজি উচ্চতর

(১৩) সামরিক বিজ্ঞান

(১৪) কৃষি বিজ্ঞান

(১৫) সঙ্গীত।

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে দেয়া হবে সেগুলি ছাড়া বাকিগুলির মধ্য থেকে যে কোনো একটি চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবে।

(চ) **বাণিজ্য শাখা**

(১) নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবেঃ

(১) হিসাব রক্ষণ ও হিসাব বিজ্ঞান

(২) বাণিজ্য নীতি

(৩) অর্থনীতি ও বাণিজ্যিক ভূগোল।

(২) নিচের যে কোনো একটি চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) শর্টহ্যান্ড ও টাইপ লিখন

(২) গণিত

(৩) পরিসংখ্যান

(৪) কৃষি বিজ্ঞান

(৫) কম্পিউটার।

(ছ) গার্হস্থ্য অর্থনীতি শাখা

(১) নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবেঃ

(১) সাধারণ বিজ্ঞান এবং খাদ্য ও পরিপুষ্টি

(২) ফলিত শিল্পকলা এবং বস্ত্র ও বয়ন শিল্প

(৩) গৃহ পরিচালনা এবং শিশুর পরিবর্ধন ও পারিবারিক জীবন যাপন।

(২) নিচের যে কোনো একটি চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) কুটির শিল্প

(২) অর্থনীতি

(৩) মনোবিজ্ঞান

(৪) সঙ্গীত

(৫) কৃষি বিজ্ঞান।

(জ) ইসলামী শিক্ষা শাখা

(১) নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবেঃ

(১) ইসলামী শিক্ষা

(২) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি

(৩) আরবী।

(২) নিচের যে কোনো একটি চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) অর্থনীতি

(২) পৌরনীতি

(৩) সমাজ কল্যাণ/সমাজ কর্ম/সমাজ বিজ্ঞান

(৪) কৃষি বিজ্ঞান।

(ঝ) সঙ্গীত শাখা

(১) নিচের বিষয় তিনটি নিতে হবেঃ

(১) লঘু সঙ্গীত

(২) উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

(৩) অর্থনীতি/পৌরনীতি।

(২) নিচের বিষয়গুলির যেটি নৈর্বাচনিক বিষয় হিসাবে নেয়া হয়েছে সেটি ছাড়া বাকিগুলির মধ্যে যে কোনা একটি চতুর্থ বিষয় হিসাবে নেয়া যাবেঃ

(১) অর্থনীতি

(২) পৌরনীতি

(৩) ইতিহাস

(৪) মনোবিজ্ঞান

(৫) ভূগোল

(৬) গণিত।

মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বাসনের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ

৪·৩২· আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষা এখন পর্যুদস্ত। ১৯৭২ সালের সংক্ষিপ্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে এ-বিপর্যয়ের শুরু। যে সব জাতি বিগত দু'টি বিশ্ব সমরে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারাও শিক্ষার ক্ষেত্রে এরূপ আত্মঘাতী পন্থার কথা চিন্তা করতে পারেনি। এ স্তরের শিক্ষার পুনর্বাসনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৪·৩৩· সুপারিশ

(১) উপদেশ ও নির্দেশনা (কাউন্সিলিং ও গাইডেন্স)—শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত, বৃত্তিমূলক ও ব্যক্তিগত উপদেশ ও নির্দেশনার ব্যবস্থা মাধ্যমিক স্কুলের জন্য থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি স্কুলের অন্ততপক্ষে একজন শিক্ষককে এ বিষয়ে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেয়া উচিত। নিয়েয়ার, আই.ই.আর ও টি,টি, কলেজসমূহে উক্ত প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা যায়।

(২) আভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান জোরদারকরণঃ আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে থাকেন একজন প্রধান শিক্ষক এবং একজন সহকারী প্রধান শিক্ষক। অন্যান্য দেশের মত আমাদের বিদ্যালয়গুলিতেও কমপক্ষে ২ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক থাকা প্রয়োজন। একজন থাকবেন পাঠক্রমিক কার্যক্রম এবং অন্যজন সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের দায়িত্বে। অনুরূপভাবে প্রতি কলেজেও দুজন উপাধ্যক্ষ থাকবেন।

(৩) বিদ্যালয়ের আয়তন, আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক সাজ-সরঞ্জামঃ পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, সেজন্য দরকার বিদ্যালয়ের প্রশস্ত আয়তনের শ্রেণীকক্ষ, প্রশাসনিক কক্ষ ও ল্যাবরেটরি, ওয়ার্কশপ, জিমনেশিয়াম, শিক্ষার্থী কমনরুম, স্টাফ কমনরুম, কৃষির জমি/বাগান, খেলার মাঠ ইত্যাদি।

(৪) **শিক্ষা সফরঃ** দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান, শিল্প ও বাণিজ্য এলাকা, যাদুঘর ইত্যাদি শিক্ষা সফরের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

(৫) **টীম গঠনঃ** আভ্যন্তরীণ খেলাধুলা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ে হাউস প্রথা থাকা বাঞ্ছনীয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয় যেমন—বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, গণিত, ফটোগ্রাফী, কৃষি, নার্সিং ইত্যাদি সম্পর্কিত 'হবি টীম' গঠন করা উচিত।

(৬) **স্বাস্থ্য বিধিঃ** শিক্ষার্থীদের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে নজর রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া একজন ফার্মাসিস্টের পরিচালনায় তাদের জন্য প্রতি-বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা একটি ক্লিনিক থাকা উচিত।

(৭) **শরীরচর্চাঃ** শরীরচর্চা শিক্ষকের অধীনে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিন ড্রিল ও খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

(৮) **সমাজ সেবাঃ** সমাজের বাইরে বিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্ব নেই। কাজেই শিক্ষকদের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীদের সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করা উচিত। বয়স্ক সাক্ষরতা ও বয়স্ক শিক্ষা, রাস্তাঘাট নির্মাণ, প্রতিবন্ধীদের সাহায্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, নৈসর্গিক বিপদ-আপদে সাহায্য ইত্যাদি উপরোক্ত কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৯) **বিদ্যালয় সমবায় স্টোরঃ** প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পরিচালনায় তাদের সমবায় স্টোর থাকা উচিত।

(১০) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্যক্রমকে জোরদার করার জন্য শ্রবণ-দর্শন উপকরণ ব্যবহার করা উচিত।

(১১) প্রতি বছর ১লা মাঘ শিক্ষক দিবস পালন করা উচিত।

(১২) প্রতি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য আচরণ বিধি থাকা উচিত।

প্রাইভেট টিউশন

৪.৩৪. আমাদের বিদ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত ও দায়িত্বশীল শিক্ষকের অভাবে সারাদেশে ব্যাপকভাবে নীতিবিগর্হিত প্রাইভেট টিউশন চালু হয়েছে। অনতিবিলম্বে এ সামাজিক ব্যাধির নিরসন প্রয়োজন।

৪.৩৫. সুপারিশ

(১) প্রাইভেট টিউশন নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।

(২) প্রত্যেক শ্রেণীর পশ্চাদপদ ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা আলাদা গ্রুপ করে টিউটোরিয়াল কোচিং ক্লাস চালু করা উচিত। শিক্ষকদের অতিরিক্ত শিক্ষাদান কাজের জন্য বাড়তি আর্থিক সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন।

(৩) প্রাইভেট টিউশনে নিযুক্ত শিক্ষকদের সম্পর্কে বার্ষিক গোপনীয় রিপোর্টে বিরূপ মন্তব্য প্রদান এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে এই মন্তব্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

(৪) প্রাইভেট টিউশনের বিরুদ্ধে অভিভাবকদের সচেতন করে তোলা দরকার।

(৫) প্রতি বিষয়ের পাঠ্যসূচীকে সারা বছরের কার্যদিবস অনুযায়ী নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(৬) পাঠ-পরিকল্পনা-মাফিক শ্রেণীকক্ষে সঠিক পাঠদান নিশ্চিত করা কর্তব্য।

(৭) পাঠ-পরিকল্পনা ও পাঠদানের মূল্যায়ন করা কর্তব্য।

(৮) ঘন ঘন পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে পাঠদানের কার্যকারিতা যাচাই করা উচিত।

(৯) পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষক কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যক পাঠদান নিশ্চিত করতে হবে।

(১০) শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি বিধান করতে হবে।

(১১) স্কুলে শিক্ষার্থী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

(১২) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত।

(১৩) অন্যান্য দেশের ন্যায় শিক্ষকদের জন্য সার্টিফিকেশন বা রেজিস্ট্রেশনের প্রথা চালু করা দরকার।

(১৪) এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি কর্তৃক বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় নীতিমালা তৈরি করা একান্ত দরকার।

অধ্যায় ৫

মাদ্রাসা শিক্ষা

মাদ্রাসা শিক্ষার লক্ষ্য

৫·১· প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য শিক্ষা ব্যবস্থা কতিপয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও একথা সত্য। এদিক দিয়ে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার দুটি বিশেষত্ব রয়েছে—একটি মৌল বা চিরন্তন, অন্যটি অমৌল বা পরিবর্তনশীল। প্রথমোক্তটি মহাগ্রন্থ কোরআন ও হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শরিয়তে নিহিত—আল্লাহ ও রসুলে বিশ্বাস এবং সর্বোপরি মানবিক সকল কার্য আল্লাহকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত—জীবনের প্রতি এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি। দ্বিতীয়টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে স্থান ও কাল ভেদে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা সম্ভব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদের গৌরবময় যুগে অবিনশ্বর এবং নশ্বর এ দুটির মধ্যে একটি আশ্চর্য সেতুবন্ধ গড়ে তোলা হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা এবং জাগতিক শিক্ষাকে পৃথকরূপে না ভেবে বরং দুটিকে পরস্পরের পরিপূরক রূপে দেখা হয়। এ সমন্বিত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপই হচ্ছে মাদ্রাসা শিক্ষা।

বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার পটভূমি

৫·২· ১৭৮০ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এদেশে প্রচলিত বর্তমান মাদ্রাসা শিক্ষার সূত্রপাত ঘটে। সরকারী অফিসে, বিশেষ করে ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতসমূহে বিচার কার্য পরিচালনার জন্য মুসলিম আইনে পারদর্শী আমলা তৈরি করাই ছিল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৩৫ সালে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং ১৮৩৭ সালে আদালতের ভাষা হিসাবে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি প্রচলিত হলে সরকারী কর্মচারী 'প্রস্তুতির ক্ষেত্র' হিসাবে মাদ্রাসার গুরুত্ব হ্রাস পেতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের ধর্ম চর্চা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে মাদ্রাসা শিক্ষা পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। অধিকন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৫৭) প্রকল্পে মাদ্রাসা শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মুসলমানেরা তাতে অনুকূল সাড়া দিতে পারেনি। ফলে, বিশ্ববিদ্যালয় বহির্ভূত একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষা গড়ে ওঠে এবং সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে আরো তিনটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে বেসরকারী উদ্যোগে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আরো বহু মাদ্রাসা গড়ে ওঠে।

৫·৩· বিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতা মাদ্রাসাকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জোর প্রচেষ্টা শুরু হয়। এ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে 'নিউ স্কিম' মাদ্রাসার উদ্ভব ঘটে এবং পরীক্ষামূলক-ভাবে মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষাসহ উর্দু, বাংলা, আরবী, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, ইংরেজি, অংকন, হাতের কাজ, শরীর চর্চা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষার পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে উক্ত মাদ্রাসাগুলিতে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট স্তর স্থাপন করা হয়। ১৯৫২ সালের পূর্ব বাংলা শিক্ষা কমিটির (আকরম খাঁ কমিটি) সুপারিশ অনুযায়ী মাদ্রাসাগুলিকে মাধ্যমিক এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট স্তরকে সাধারণ কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত কমিটি নিউ স্কিম মাদ্রাসা বিলোপ করার জন্য দুটি শর্ত আরোপ করেছিল—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ নম্বরের ইসলাম ধর্ম নামে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় প্রবর্তন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিয়াত নামে একটি পৃথক শাখার ব্যবস্থা করা।

মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বিরাজমান অবস্থা

৫·৪· বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী বর্তমানে দেশে প্রায় ১৩,০০০ ইবতেদায়ি (প্রাথমিক) মাদ্রাসা রয়েছে এবং এ মাদ্রাসাগুলিতে প্রায় ৫২,০০০ জন শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। মাধ্যমিক স্তরে দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা ২,৮৭২, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা ৬৪৪, ডিগ্রী স্তরে ফাযিল মাদ্রাসা ৬২৯ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা হচ্ছে ৭৫। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাগুলিকে সরকার বাৎসরিক এককালীন অনুদানসহ বিশেষ অর্থ মঞ্জুরীও প্রদান করে থাকে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। এ উদ্দেশ্যে দপ্তরের 'বিশেষ শিক্ষা' শাখায় একজন উপ-পরিচালক ও একজন সহকারী পরিচালক নিয়োজিত আছেন। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসাসমূহের মঞ্জুরী প্রদান, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালন ও সনদ প্রদান ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে থাকে।

৫·৫· বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষার স্তরসমূহ নিম্নরূপঃ

স্তর		শ্রেণীর সংখ্যা	মেয়াদকাল
(১) ইবতেদায়ি	..	৫	৫ বছর
(২) দাখিল	..	৫	৫ ,,
(৩) আলিম	..	২	২ ,,
(৪) (ক) ফাযিল (পাস)	..	২	২
(খ) ফাযিল (অনার্স)	..	৩	৩
(৫) কামিলঃ ফাযিল পাস কোর্সে উত্তীর্ণদের জন্য	..	২	২
ফাযিল অনার্স কোর্সে উত্তীর্ণদের জন্য	..	১	১

৫·৬· উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের অনুমোদন প্রদান এবং ফাযিল ও কামিল পরীক্ষাসমূহ পরিচালনা এবং উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সনদ প্রদান করে থাকে।

ইবতেদায়ি

৫·৭· সুদীর্ঘকাল ধরে প্রাথমিক স্তরে মক্তবসমূহ নিউ-স্কিম মাদ্রাসার 'ফিডার' প্রতিষ্ঠানরূপে প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত শিক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মক্তবসমূহের অবলুপ্তি ঘটে। কিন্তু সামাজিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে 'ফিডার' প্রতিষ্ঠানরূপে ইবতেদায়ি ও ফোরকানিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সাম্প্রতিককালে এ জাতীয় মাদ্রাসার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫·৮· বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহের অনুমোদন প্রদান করে। কিন্তু পদ্ধতিগত নমনীয়তার কারণে আবশ্যকীয় শর্তাবলী (ভূমির পরিমাণ, ভবন, শিক্ষক ও শিক্ষোপকরণ) যথাযথ পূরণ না করে অনেক মাদ্রাসা গড়ে উঠেছে। অধিকন্তু স্থানীয় চাপের ফলে অবস্থানগত দিক থেকেও এগুলি সুপরিকল্পিত নয়।

৫·৯· ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহের আয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে জনসাধারণের চাঁদা, সরকারী অনুদান এবং স্থানীয় সরকারের (উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ) প্রদত্ত অনুদান। কিন্তু আয়ের উৎস একাধিক হলেও কোনোটিই নিয়মিত নয়। ফলে, কোনো মাদ্রাসার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল নয়।

৫·১০· যোগ্য ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব এ জাতীয় মাদ্রাসাসমূহের একটি বড় সমস্যা। এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কোনো শিক্ষক নেই বললেই চলে। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন-মানের শিক্ষকদের উপর এ স্তরের শিশুদের শিক্ষার ভার ন্যস্ত রয়েছে। অধিকন্তু মাদ্রাসা সমূহের পরিদর্শনের তেমন কোনো নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। অন্যান্য সমস্যার মধ্যে শ্রেণীকক্ষ, আসবাবপত্র ও শিক্ষোপকরণের অভাব উল্লেখ্য।

৫·১১· সুপারিশ

(১) ইবতেদায়ি স্তরের মেয়াদকাল হবে ৫ বৎসর এবং স্তরে অনূর্ধ্ব ৬ বৎসরের শিশুরা ভর্তি হবে।

(২) ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহ বেসরকারী প্রচেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছে। তবে অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীনভাবে স্থাপন না করে প্রয়োজন অনুসারে অবস্থানগত সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে এ প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে তোলা যেতে পারে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(৩) এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষার মান উন্নীত করার লক্ষ্যে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার মান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে আরবী ও দীনিয়াত শিক্ষাদানের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা প্রাপ্ত (আলিম) শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষকদের সকলেরই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া দরকার। এ উদ্দেশ্যে আপাতত প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসমূহে ইবতেদায়ি শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংখ্যা সংরক্ষিত থাকা দরকার। অদূর ভবিষ্যতে পৃথক ইবতেদায়ি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা প্রয়োজন। শিক্ষকদের বেতনক্রম ও চাকুরির শর্তা-বলী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত।

(৪) প্রতিটি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক শ্রেণীকক্ষ, শিক্ষোপকরণ, আসবাবপত্র ও খেলার মাঠের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। সরকার ও স্থানীয় জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে এ ক্ষেত্রে কার্যকর ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে।

(৫) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীনে উপজেলা পর্যায়ে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা-সমূহের নিয়মিত ও কার্যকর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী ইবতেদায়ি মাদ্রাসাসমূহের জন্য স্বতন্ত্র পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(৬) দীনিয়াত ও আরবী শিক্ষার বিষয়সমূহ ছাড়া সাধারণ শিক্ষার বিষয়সমূহের (বাংলা, গণিত, সমাজপাঠ ইত্যাদি) জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্ধারিত পাঠ্য পুস্তকসমূহ ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় পঠিত হবে। ধর্মীয় বিষয়সমূহের পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য পাঠ্যপুস্তক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যপুস্তকই হবে—এতে দুই ধারায় একই পর্যায়ের শিক্ষার মানের সমতা বেশ খানিকটা চলে আসবে। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ইবতেদায়ি মাদ্রাসার জন্য ধর্মীয় বিষয়-সমূহের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করবে। মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে কেউ ইচ্ছা করলে সাধারণ শিক্ষাক্রমে চলে আসতে পারবে।

(৭) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধাবলীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ববস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৮) প্রত্যেকটি ইবতেদায়ি মাদ্রাসার সার্বিক পরিচালনা ও উন্নতির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের আওতায় একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে। এই কমিটির গঠন নিম্নরূপ হবেঃ

(১) ইউনিয়ন পরিষদ বা উপজেলা পরিষদের প্রতিনিধি (চেয়ারম্যান),
(২) মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক (সদস্য-সচিব),
(৩) একজন শিক্ষক প্রতিনিধি (সদস্য),
(৪) একজন অভিভাবক প্রতিনিধি (সদস্য),
(৫) একজন দাতা প্রতিনিধি (সদস্য)।

(৯) শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের উপকরণসমূহ যে সব মাদ্রাসায় বিজ্ঞান পড়ান হয়, সে সব মাদ্রাসায় প্রদান করা উচিত।

(১০) ইবতেদায়ি স্তরের ৫ম শ্রেণীর শেষে বর্তমান বৃত্তি পরীক্ষা চালু থাকবে।

(১১) ইবতেদায়ি স্তরের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিম্নরূপে হবেঃ

পদ		যোগ্যতা	বেতনক্রম
সুপারিনটেনডেন্ট	(১)	ফাযিল, সি, এড,	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের অনুরূপ।
সহকারী মৌলভী	(২)	আলিম, সি, এড,	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকের অনুরূপ।
সহকারী শিক্ষক	(১)	আলিম বা উচ্চমাধ্যমিক, সি, এড,	,,
কারী	(১)	মুজাব্বিদ মাহির, সি, এড,	,,

(১২) পর্যায়ক্রমে ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলির জাতীয়করণ প্রয়োজন।

দাখিল ও আলিম

৫·১২· দাখিল ও আলিম—এ দুটি স্তর যথাক্রমে ৫ ও ২ বৎসর মেয়াদী। দুটি স্তরের শেষেই বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করে।

৫·১৩· উল্লিখিত দুটি স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হলেও মাদ্রাসাসমূহে কোনো বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি নেই। ফলে ব্যবহারিক অনুশীলনের অভাবে বিজ্ঞান শিক্ষা কার্যকর হচ্ছে না। অধিকন্তু, বেশির ভাগ মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষকের পদসমূহ প্রায়ই শূন্য থাকে। এ অবস্থা অভিপ্রেত নয়।

৫·১৪· আর্থিক দিক থেকে দাখিল ও ফাযিল মাদ্রাসাসমূহ সরকারী অনুদান, জনগণের দান ও চাঁদা, জমিজমা, ছাত্র-বেতন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা ইত্যাদি উৎসের উপর নির্ভরশীল। এ সকল উৎস থেকে আয় অনিয়মিত হওয়ার কারণে মাদ্রাসাসমূহে আর্থিক অনটন লেগেই থাকে।

৫·১৫· এ স্তরের মাদ্রাসাসমূহের পরিদর্শনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অথবা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের কোনো নিয়মিত কার্যক্রম নেই। অনিয়মিতভাবে যে পরিদর্শন ব্যবস্থা চালু রয়েছে তা প্রধানত হিসাব নিরীক্ষণ ও অনুদান প্রদানের প্রয়োজনেই অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য পরিদর্শনের ভূমিকা এখানে গুরুত্ব লাভ করে না।

৫·১৬· এ স্তরের মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং ধর্ম-বিষয়ক গবেষণালব্ধ নবতর জ্ঞান ও ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেকেলে পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জ্ঞান চর্চার একমাত্র অবলম্বন হয়ে রয়েছে। অধিকন্তু, সুগঠিত গ্রন্থাগার ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে জ্ঞানচর্চার তেমন সুযোগ এ সকল মাদ্রাসায় নেই।

৫·১৭· **সুপারিশ**

(১) দাখিল ও আলিম শিক্ষা স্তর যথাক্রমে পাঁচ ও দুই বৎসর মেয়াদী থাকবে এবং দুটি স্তরেই প্রান্তিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। দাখিল স্তরের নবম শ্রেণী থেকে মানবিক, বিজ্ঞান, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কোরআন—এ চারটি শাখা এবং আলিম স্তরে মানবিক, বিজ্ঞান ও মুজাব্বিদ—এ তিনটি শাখা প্রবর্তিত হবে।

(২) দাখিল ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পরিচালনা করবে। অধিকন্তু জেলা পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা অফিসারের পদ সৃষ্টি সাপেক্ষে আঞ্চলিক ভিত্তিতে দাখিল জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনার সার্বিক দায়িত্বও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(৩) শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের অন্যত্র প্রদত্ত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত সুপারিশ-মালার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে দাখিল ও আলিম চূড়ান্ত পরীক্ষার সংস্কার সাধন করতে হবে। সাধারণ শিক্ষার অনুরূপে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রশ্নপত্রে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষিত হবে। এ ছাড়া, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাস করে যথাসম্ভব তা জেলা পর্যায়ে সীমিত করা সমীচীন।

(৪) দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা স্থাপন ও মঞ্জুরী প্রদানের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা বোর্ডকে অবশ্য পালনীয় কতিপয় শর্ত আরোপ করতে হবে। এ শর্তগুলির মধ্যে থাকবেঃ

(ক) ভূমির পরিমাণ (কমপক্ষে এক একর),

(খ) সমপর্যায়ের দুটি মাদ্রাসার মধ্যকার দূরত্ব (কমপক্ষে ৮ কিলোমিটার),

(গ) ছাত্র সংখ্যা (দাখিল ২৫০ ও আলিম ২০০),

(ঘ) সুগঠিত বিজ্ঞান পরীক্ষাগার,

(ঙ) নির্দিষ্ট মানের গ্রন্থাগার ও

(চ) প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক ইত্যাদি।

(৫) দাখিল ও আলিম উভয় পর্যায়ে শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে আরবী ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে আরবী।

(৬) এ স্তরে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে কারিগরি ও উৎপাদনমুখী কাজে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য দান করাই হবে কর্মমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য। স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে মাদ্রাসাসমূহে নিম্নলিখিত কর্মমুখী শিক্ষার কোর্স চালু করা যেতে পারেঃ

(ক) **কারিগরিঃ** কাঠের কাজ, ধাতব পদার্থের কাজ, বিদ্যুতের কাজ, রেডিও ও টেলিভিশন মেরামত, গৃহ নির্মাণ, তাঁতের কাজ ইত্যাদি।

(খ) কৃষিঃ ভূমিকর্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার ও মেরামত, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি।

(গ) বাণিজ্যঃ পত্র-বিনিময়, টাইপ-রাইটিং, শর্টহ্যান্ড, হিসাব-রক্ষণ, সেলস-ম্যানশীপ ইত্যাদি।

(ঘ) অন্যানঃ বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, বই বাঁধাই ইত্যাদি।

(৭) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। দাখিল স্তরের শিক্ষকগণ অবশ্যই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবেন এবং এ জন্য টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-সমূহে দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য নির্দিষ্ট আসন সংরক্ষিত থাকবে। দাখিল ও আলিম পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন বিষয়-ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। নিয়েয়ার ও আই, ই, আর, এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। এ ছাড়াও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক-শিক্ষণ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত অনুষদে ধর্মীয় বিষয় হিসাবে তফসির, হাদিস ও ফিকহ্ ইত্যাদি বিষয়ে কার্যকর শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্য পরিচালনা সম্ভব হবে।

(৮) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যাতে নিয়মিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করা হয় তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বিষয়-বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের শিক্ষক নিয়ে কমিটি গঠন করবে। আপাতত বর্তমান শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী চালু থাকবে।

(৯) আলিম ও ফাযিল মাদ্রাসাসমূহের জন্য গভর্নিং বডি গঠন করা উচিত।

ফাযিল ও কামিল

৫·১৮· ফাযিল পাস ও অনার্স কোর্সের মেয়াদ যথাক্রমে দুই ও তিন বছর চালু থাকবে। ফাযিল পাস ও অনার্স ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের জন্য কামিল ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদও যথাক্রমে দুই ও এক বছর চালু থাকবে। যখন সাধারণ শিক্ষার স্নাতক ডিগ্রীর মেয়াদ তিন বছর এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর মেয়াদ দুই বছর হবে, তখন ফাযিল কোর্সের মেয়াদ তিন বছর এবং কামিল কোর্সের মেয়াদ দুই বছর হবে।

৫·১৯· বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ফাযিল ও কামিল শেষ পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান করে। সাম্প্রতিক কালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও আজ পর্যন্ত ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। ফলে এ সকল মাদ্রাসায় শিক্ষার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মান অর্জিত হচ্ছে না। অধিকন্তু পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রেও নানা জটিলতার উদ্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যেখানে শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা পরিচালন ও ডিগ্রী প্রদান করছে সেখানে মাদ্রাসা শিক্ষার ক্ষেত্রে এ দায়িত্বসমূহ পালন করছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। এ অবস্থা অভিপ্রেত নয়।

৫·২০· ফাযিল ও কামিল উভয় স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামের নবতর গবেষণালব্ধ উচ্চতর জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে, কামিল পর্যায়ে উচ্চতর জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনে যে গবেষণা প্রয়োজন তা এখানে অনুপস্থিত রয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার অন্যান্য স্তরের সঙ্গে ফাযিল ও কামিল স্তরেও যোগ্য শিক্ষকের অভাব লক্ষণীয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে বিগত কয়েক বৎসরে ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যোগ্য শিক্ষকের অভাব তীব্রতর হচ্ছে।

৫.২১. সুপারিশ

(১) ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ অবিলম্বে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি এফিলিয়েটিং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্সে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে। এ ব্যবস্থায় নতুন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন আবশ্যক হবে। অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলীও বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারণ করবে।

(২) ফাযিল (পাস ও অনার্স) এবং কামিল (প্রথম ও শেষ পর্ব) ডিগ্রী কোর্সের বিস্তারিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রণয়ন করবে।

(৩) উল্লিখিত কোর্সসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর পুনর্গঠন করে উভয় স্তরেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য এ স্তরের মাদ্রাসাসমূহে উন্নতমানের বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ও প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৪) এ স্তরে ধর্মীয় শিক্ষাকে একটি গতিশীল বিষয় হিসাবে উপস্থাপন করতে হবে। যুগে যুগে দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাসের অগ্রগতির আলোকে ইসলামকে উপস্থাপনে সক্ষম হলেই শিক্ষার্থীরা এর গতিশীল তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হবে।

(৫) মাদ্রাসা শিক্ষা সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য এই রিপোর্টের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অধ্যায়ে সুপারিশকৃত পরিদপ্তরগুলিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ/শাখা স্থাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(৬) শিক্ষা ক্ষেত্রে একই ধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে পর্যায়ক্রমে সাধারণ শিক্ষার সাথে সমন্বিত করতে হবে।

অধ্যায় ৬

বিশেষ শিক্ষা

ক. নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১.(ক) দেশ ও জাতির সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ হল তার জনসম্পদ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দ্বারাই জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের মুখ্য হাতিয়ার হল সাক্ষরতা। আমাদের দেশের শতকরা আশিজন নিরক্ষরের সাথে জড়িয়ে আছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ ও কুসংস্কার। এসব অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করে আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন করতে হলে আমাদের সাক্ষর, শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উন্নত দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তির প্রয়োজন। এজন্য সাক্ষরতা যেমন অপরিহার্য, ঠিক তেমনি প্রয়োজন জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম।

ক্রমিক উন্নয়নের ধারা

৬.২.(ক) বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকেই এদেশের সচেতন একটি শ্রেণী দেশ থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার কথা ভেবে আসছে। ১৯১৭-১৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে স্থানীয়-ভাবে এদেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু করা হয়। পল্লী পুনর্গঠন দপ্তরের উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে ১৯৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের দিকে এ কর্মসূচী আরো ব্যাপ্তি লাভ করে। ১৯৬৩ সালে শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে বয়স্ক শিক্ষার একটি কার্যক্রম চালু করা হয়। এই কার্যক্রমে আর্থিক বরাদ্দ অত্যন্ত কম থাকায় তা দেশের মুষ্টিমেয় কয়েকটি থানায় সীমাবদ্ধ ছিল। সারাদেশে এ কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব পড়েনি।

৬.৩.(ক) আমাদের স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে গণশিক্ষার প্রসারকল্পে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়নি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অধীনে গণশিক্ষার একটি প্রকল্প গৃহীত হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্য নবগঠিত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি স্বতন্ত্র গণশিক্ষা উইং খোলা হয়। প্রকল্পটি পরিচালনার সার্বক্ষণিক দায়িত্বে কিছুসংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং সারাদেশে গণশিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে বই, পোস্টার ইত্যাদি বিলি করা হয়। ১৯৮২ সালের মাঝামাঝি প্রকল্পটি মূল্যায়ন করা হলে তাতে নানাবিধ কৌশলগত ও প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত হয়। ফলে ১৯৮২ সালে প্রকল্পটি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পটির বিনিয়োগ ছিল ৯.৩৯ কোটি টাকা। মূল্যায়নানুযায়ী মাথাপিছু ১৩০ টাকা ব্যয়ে ৭ লক্ষ লোককে অক্ষর জ্ঞান দেয়া হয়। অবশ্য বয়স্ক সাক্ষরতা, উপানুষ্ঠানিক পেশামূলক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এদেশে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে সীমিতভাবে প্রচলিত রয়েছে।

৬.৪.(ক) বয়স্ক শিক্ষার একটি নতুন প্রকল্প বর্তমান সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। ১৯৮৭ সালে সেপ্টেম্বর মাসে সাক্ষরতা খাতে ২৫ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্পের ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতার হারের ক্রমোন্নতি নিচের সারণীতে প্রদর্শিত হল:

সারণী

সাল		সামগ্রিক সাক্ষরতার হার
১৯৫১	..	১৬'৪
১৯৬১	..	১৭'৬
১৯৭৪	..	২০'২ (১৯৭১ সালে আদমশুমারি হয়নি)
১৯৮১	..	২১'২
১৯৮৫	..	২২'০০ (আনুমানিক)

এই সারণী পর্যালোচনা করলে এদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচীর শম্বুকগতি সহজেই ধরা পড়ে।

সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক

রাষ্ট্রীয় নীতি ও রাজনৈতিক সংকল্প

৬.৫.(ক) সমগ্র জাতির বোঝাকে সম্পদে রূপান্তরিত করার জন্য যে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সুদৃঢ় সংকল্প ও রাষ্ট্রীয় নীতির আবশ্যক তা বলাই বাহুল্য। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে চেয়ারম্যান করে অনতিবিলম্বে একটি 'জাতীয় গণশিক্ষা পরিষদ' গঠন করা প্রয়োজন।

ধর্মীয় শক্তি ও সম্ভাবনা

৬.৬.(ক) এদেশের লোক ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এবং শতকরা নব্বই জনেরও অধিক লোক ইসলাম ধর্মাবলম্বী। এদেশের সংস্কৃতিতে ধর্মীয় চেতনা অত্যন্ত গভীর। এ ধর্মীয় শক্তিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সাফল্যজনকভাবে ব্যবহার করা উচিত। মুসলিম ধর্মে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন ফরজ বা অবশ্যকরণীয়। মুসলমানরা প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ে এবং সপ্তাহে একবার জুমআর নামাজ আদায় করে। বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য মুসলমানদের একত্র হওয়ার এই সুযোগ গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের অক্ষরজ্ঞান লাভ করার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। প্রতি শুক্রবার জুমআর নামাজের সময় ইমামগণকে নিরক্ষর মুসলমানদের অক্ষরজ্ঞান লাভের জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে এবং সারাদেশে দুই লক্ষ মসজিদে সাক্ষরতার ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমাম দ্বারা করতে হবে। এজন্য ইমাম প্রশিক্ষণ প্রকল্পকে বিশেষভাবে পরিচালিত করতে হবে। বাছাইকৃত মসজিদগুলির মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক বয়স্ক নিরক্ষরকে গণশিক্ষা দেয়া যায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের যেমন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টানদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নিরক্ষরদের অক্ষরজ্ঞান দানের সুব্যবস্থা করতে হবে। সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিরক্ষতা দূরীকরণের জন্য প্রচার চালাতে হবে।

গণশিক্ষা পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

৬.৭.(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং বয়স্ক সাক্ষরতার সকল সরকারী ও বেসরকারী কার্যক্রমকে সমন্বিত করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা পরিদপ্তর স্থাপন করতে হবে। বয়স্ক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য মন্ত্রণালয় অথবা পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের সঙ্গে সমবেতভাবে এই পরিদপ্তর কর্মসূচী বাস্তবায়ন করবে। সমাজসেবা, নারী শিক্ষা, কৃষি উন্নয়ন, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় বয়স্ক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/পরিদপ্তরগুলিকে প্রস্তাবিত পরিদপ্তরের সঙ্গে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। এই পরিদপ্তর বেসরকারী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও পালন করবে।

গণশিক্ষা গবেষণা কোষ

৬.৮.(ক) জ্ঞানের ধারা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রবহমান। এই ধারা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে নিরন্তর জ্ঞানের চর্চা ও গবেষণা অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। সাক্ষরতা প্রকল্পকে ধাপে ধাপে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য পরিকল্পনা ও গবেষণার প্রয়োজন। একাডেমিক কার্যক্রম, যেমন বই-পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা, বইয়ের পরিমার্জনা ও পরিশীলন, গণমাধ্যমে নানারূপ প্রচারণা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত ইত্যাদি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য গণশিক্ষা গবেষণা কোষ স্থাপন করা প্রয়োজন।

গণমাধ্যমের যথাযথ ব্যবহার

৬.৯.(ক) একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগানোর জন্য গণমাধ্যমগুলির যথাযথ ব্যবহার অনস্বীকার্য। গণমাধ্যমগুলিকে পরিকল্পিত ভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেষ্ট হতে হবে। এই শক্তিশালী মাধ্যমকে যথাযথভাবে ব্যবহারের পরিকল্পনা করবে জাতীয় সাক্ষরতা ও গবেষণা কাউন্সিল। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব থাকবে প্রস্তাবিত নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা পরিদপ্তরের উপর। এ পরিদপ্তরকে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসতে হবে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে।

শিক্ষা কেন্দ্র

৬.১০.(ক) এ মহান জাতীয় দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ গ্রামের বৈঠক ঘর, মিলনায়তন, অব্যবহৃত বাড়িঘর, সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি স্থান ব্যবহৃত হবে।

শিক্ষক

৬.১১.(ক) দান মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এবং এর মধ্যে জ্ঞানদান সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ পার্থিব দান ব্যবহারে হ্রাস পায়, কিন্তু জ্ঞান ব্যবহারে বৃদ্ধি পায় এবং মানুষকে স্বাবলম্বী করে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে জ্ঞান দানে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে হবে। জ্ঞান দান ইসলাম ধর্মের অঙ্গ কাজেই ধর্মীয় ও মানবিক উভয় দিক থেকেই জ্ঞান দান করা শিক্ষিত মুসলিম সমাজের কর্তব্য।

পুরস্কার বা সামাজিক স্বীকৃতি

৬.১২.(ক) নিরক্ষরতা দূরীকরণে নিবেদিত প্রাণ সকল রাষ্ট্রকর্মীদের আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দেয়া প্রয়োজন।

৬.১৩.(ক) **সুপারিশ**

(১) নিরক্ষরতাকে অন্যতম জাতীয় প্রধান সমস্যারূপে চিহ্নিত করে এই সমস্যা সমাধানের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাষ্ট্রপতিকে প্রধান করে একটি জাতীয় গণশিক্ষা পরিষদ গঠন করা উচিত।

(২) মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়কে গণশিক্ষার জন্য ব্যবহার করা এবং প্রত্যেক সভা-সমিতি এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিশেষ করে জুমআর নামাজের সময় এর ব্যাখ্যা করতে ইমামগণকে অনুরোধ করা দরকার। ধর্ম মন্ত্রণালয়কে সারাদেশে সমস্ত মসজিদে সাক্ষরতার ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইমামদের দ্বারা চালিত করতে হবে। অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রচার চালাতে এবং গীর্জায় ও মন্দিরগুলিতে সাক্ষরতার ক্লাস নিতে হবে। ধর্ম মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৩) সাক্ষরতা প্রদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সকল উদ্যোগকে সমন্বিত ও জোরদার করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে 'নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও গণশিক্ষা' নামে একটি পরিদপ্তর স্থাপন করতে হবে।

(৪) দেশের সকল পি.টি. আই. এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

(৫) সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পেশাগত প্রশিক্ষণের জন্য যে সকল সংস্থা রয়েছে সে সকল সংস্থার আওতায় গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু ও জোরদার করা প্রয়োজন। মহিলাদের অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে গণশিক্ষা স্থান পাওয়া উচিত।

(৬) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সান্ধ্যকালীন বয়স্ক শিক্ষা কোর্স চালু করতে হবে। এ সকল আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কোর্সে সাক্ষরতা, পেশাভিত্তিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

(৭) কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প সম্প্রসারিত করে উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক কোর্স প্রদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৮) শিক্ষার্থীরা প্রান্তিক পরীক্ষার পরে এবং ফলাফল প্রকাশ পর্যন্ত যে সময় পায় তাকে গণশিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য উচ্চ স্তরে শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভর্তির জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেয়া যায়। গণসাক্ষরতা এবং বয়স্ক শিক্ষার জন্য নিম্নোক্ত পন্থায় তহবিল সংগ্রহ করা প্রয়োজন:

(ক) সরকারী তহবিল থেকে বরাদ্দ।

(খ) জাতীয় উদ্যোগে লটারির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ।

(গ) ধর্মীয় দান থেকে অর্থ সংগ্রহ।

(ঘ) ডাক টিকিট প্রচলন, ব্যাংক, বীমা থেকে চাঁদা, থার্ব, পেট্রোল পাম্প ও গাড়ি থেকে ব্যাজ বিক্রির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ।

(ঙ) শিল্প কারখানা ও বিত্তশালীদের প্রদত্ত দান।

(চ) বিশেষ স্মারক সীল বিক্রি।

(ছ) জাতিসংঘসহ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা।

(জ) ইউনেস্কোর সাক্ষরতা, বয়স্ক শিক্ষা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা খাত থেকে অনুদান।

(ঝ) উদ্ভাবনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ; প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি/প্রধান মন্ত্রী/শিক্ষা মন্ত্রীর বিশেষ সাক্ষরতা তহবিল গঠন।

খ স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১.(খ) আমাদের শিশুদের জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বাড়ন্ত সময়টাতে শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে তাদের সুস্থ ও সবল করে গড়ে তোলার ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অত্যন্ত অপ্রতুল। আমাদের সন্তানদের সুস্থ, সবল, সুশৃংখল এবং আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে হলে আমাদের শিক্ষায়তনগুলিতে শরীর চর্চা, শারীরিক ও স্বাস্থ্য শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

৬.২.(খ) ব্রিটিশ আমল থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন ও কমিটি শারীরিক শিক্ষা ও শরীর চর্চার উপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্কুলের মাঠ ও শরীর চর্চা শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি সত্ত্বেও স্কুল প্রাঙ্গনে এ বিষয়টি অবহেলিত রয়েছে। এ দেশে প্রচলিত পুঁথিকেন্দ্রিক শিক্ষাক্রম, সাধারণভাবে শিক্ষিত সমাজের শ্রমের প্রতি অনীহা এবং স্কুল সমাজে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান ও সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব এজন্য দায়ী। শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হল:

(ক) শারীরিক, মানসিক, আবেগিক ও সামাজিকভাবে সুস্থ ও সবল নাগরিক তৈরি করা।

(খ) শৈশব ও কৈশোরের বাড়ন্ত দেহের জন্য শারীরিক সঞ্চালনের চাহিদা নিবৃত্তি করা।

(গ) যে কোনো কর্মে সজাগ, সচেতন, উদ্যোগী, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়ী হতে অনুপ্রাণিত করা।

(ঘ) খেলার মাঠের মত সামাজিক জীবনেও সুশৃংখল ও আইনানুগ জীবন যাপনে শিক্ষার্থীকে অভ্যস্ত করা।

(ঙ) ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিরাপত্তার জন্য উপযুক্ত ও সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের মনোভাব গড়ে তোলা।

শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক

৬.৩.(খ) প্রাথমিক স্তরের শিশুদের শারীরিক বিষয় শিক্ষার জন্য পৃথক শিক্ষক রাখার প্রয়োজন নেই। এ স্তরের প্রত্যেক শিক্ষককেই আংশিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে। এ স্তরের শিশুরা তাদের দ্রুত বর্ধনশীল দেহে শক্তি ও উদ্দীপনাকে বেশিক্ষণ স্থিরভাবে ধরে রাখতে পারে না। সেজন্য এ স্তরে পৃথিবীর সকল দেশে কর্ম অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের রীতি চালু আছে। এ স্তরের শিশুরা কঠোর ব্যায়াম বা শরীরচর্চা না করে ছন্দের তালে তালে নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি, ছড়া আবৃত্তি, অঙ্গভঙ্গি, স্বাধীনভাবে হাত পা নড়াচড়া করবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিষয় শিক্ষার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের অঙ্গ সঞ্চালনের এবং প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণী কক্ষের বাইরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন। উদাহরণ স্বরূপ, উদ্ভিদ, নদী, পশুপাখি ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষাদানের সময় তাদের শিক্ষায়তনের বাইরে নিয়ে যাবার প্রয়োজন হতে পারে। তবে এই ধরনের শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকদের যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

৬.৪.(খ) মাতৃভাষা, সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্পর্কিত জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এতদ্ব্যতীত এ স্তরের শিক্ষকগণ মৌখিকভাবে শ্রেণীকক্ষে দৈহিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং খাদ্যপুষ্টি সম্পর্কে আলোচনা করবেন। মাধ্যমিক স্তরে শারীরিক শিক্ষার জন্য খেলার মাঠ, ব্যায়ামাগার এবং শারীরিক শিক্ষার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। যদিও সরকারীভাবে সকল মাধ্যমিক স্কুলের জন্য খেলার মাঠ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষকের প্রয়োজন স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, তথাপি বাস্তবক্ষেত্রে বহুসংখ্যক স্কুলে এ সকল সুযোগ-সুবিধার অভাব পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ স্কুলসমূহের দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতা। প্রতি ৫০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং প্রতি স্কুলের জন্য একটি খেলার মাঠ ও একটি জিমনাশিয়াম থাকা প্রয়োজন। উচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উপরোক্ত সুযোগ-সুবিধা আরো ব্যাপকভাবে থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের জন্য নানারকম খেলাধুলা ও শরীর চর্চার পর্যাপ্ত সরঞ্জাম থাকা উচিত। এ সকল খেলাধুলা ও শরীর চর্চা পরিচালনা করার জন্য উন্নতমানের শিক্ষক এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

৬.৫.(খ) সুপারিশ

(১) মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তরের সকল শিক্ষায়তনে শারীরিক শিক্ষা ও শরীর চর্চার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা প্রয়োজন।

(২) প্রত্যেক মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজে প্রতি ৫০০ জন শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত একজন শারীরিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ করা দরকার।

(৩) শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য শিক্ষার নিয়মিত মূল্যায়ন করে তা প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ডে লিপিবদ্ধ করা উচিত।

(৪) প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বল্পমূল্যে পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা দরকার।

(৫) স্কুলের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে শারীরিক শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অপ্রতুল বিধায় ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগের ন্যায় চট্টগ্রাম ও খুলনা বিভাগেও ২টি শারীরিক শিক্ষা কলেজ স্থাপন করা প্রয়োজন।

(৬) ঢাকার শারীরিক শিক্ষা কলেজটিকে সাভারস্থ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশে স্থানান্তরিত করে, বর্তমান কলেজটিকে মহিলাদের শারীরিক শিক্ষা কলেজে রূপান্তরিত করা উচিত।

(৭) শারীরিক শিক্ষা কলেজগুলির ফ্যাকালটি সদস্যগণের বেতন ও পদমর্যাদা অন্যান্য সরকারী কলেজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

(৮) বাংলাদেশের স্কুল-কলেজগুলিতে শারীরিক শিক্ষা সম্পর্কিত জরিপ চালিয়ে এ সকল প্রতিষ্ঠানের চাহিদা নিরূপণ করে সে অনুযায়ী শিক্ষক ও সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৯) গণমাধ্যমগুলিতে খেলাধুলা সম্পর্কিত উন্নতমানের অনুষ্ঠান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(১০) দেশীয় খেলাধুলা উৎসাহিত করা দরকার এবং দেশীয় উপকরণ ব্যবহার করে নতুন নতুন খেলাধুলার উদ্ভাবন করা প্রয়োজন।

(১১) স্কুল কলেজে দীর্ঘ অবকাশের সময় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে খেলাধুলা, সঙ্গীত চর্চা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রয়োজন।

(১২) বর্তমানে শারীরিক শিক্ষা কলেজদ্বয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন। এই কলেজদ্বয়কে পূর্বের মত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত করে শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব, কার্যকারিতা এবং সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে এর একাত্মতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়।

গ দূরশিক্ষণ

ভূমিকা

৬.১.(গ) আধুনিক প্রকাশনা, শিক্ষা-প্রযুক্তি এবং গণমাধ্যম ব্যবহার করে নিজ গৃহে বসে শিক্ষা গ্রহণের যে ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে চালু হয়েছে, তাই দূরশিক্ষণ নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্পূরকরূপে এই দূরশিক্ষণ ব্যবস্থা আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

৬.২(গ) বাংলাদেশে দূরশিক্ষণ কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৮৫ সালে শুরু হয় একটি সীমিত শিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে প্রথম ব্যাচ শিক্ষার্থী ১৯৮৭ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি,এড,ডিগ্রী লাভ করেছে। দূরশিক্ষণের সাফল্য সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ৩০শে আগস্ট, ১৯৮৪ সালের ৪৪তম সভার সিদ্ধান্ত উল্লেখ্যঃ "অনতিবিলম্বে সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষার বিস্তার এবং বিশেষভাবে কর্মজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাদের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে দেশে একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।" ১৯৮৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পরিষদ অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দূরশিক্ষণ কর্মসূচীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক

৬.৩.(গ) এদেশের জনগণের শিক্ষার প্রতি অনুরাগ অতি প্রাচীন ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অনুকূল। কিন্তু আর্থসামাজিক বাধার কারণে জনগণের এই কাম্য অনুরাগকে প্রচলিত পথ ও পদ্ধতিতে যথাযথভাবে তৃপ্ত করা সম্ভব নয় বিধায় বর্তমানে উদ্ভাবিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূরশিক্ষণ কর্মসূচীর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রসার বাঞ্ছনীয়। এই উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ ও জোরদার করার জন্য উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে।

৬.৪.(গ) দূরশিক্ষণ কর্মসূচী কর্মজীবী মানুষকে তার কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করেনা, গৃহিনীর গৃহ, স্বামী, গৃহস্থালি ও ছেলেমেয়েদের দেখাশোনার বিঘ্ন ঘটায় না, সমাজসেবককে তার জনসেবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে না, বরং অতি অল্প খরচে এবং সরকারী সাহায্য ও মঞ্জুরী ছাড়াই তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

৬.৫.(গ) দূরশিক্ষণ দেশের সীমিত সংখ্যক শিক্ষায়তনের দালান-কোঠা, শিক্ষা সরঞ্জাম ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পুরোপুরি কাজে লাগানোর মাধ্যমে শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটায়।

৬.৬.(গ) এ কর্মসূচী ব্যাপক প্রসারলাভ করলে শিক্ষিত বেকারদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মেধা ও শক্তিকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যাবে।

৬.৭.(গ) দূরশিক্ষণ কর্মসূচী শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মোচন ছাড়াও প্রকাশনা ও শিক্ষা প্রযুক্তির নবতর উদ্ভাবনা ব্যবহার করে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম।

৬.৮.(গ) সুপারিশ

(১) দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ ও বর্তমান কর্মসূচীকে আরো জোরদার করার জন্য অনতিবিলম্বে একটি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। বিশদভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে সরকারের একটি কমিটি গঠন করা উচিত।

(২) শিক্ষক-শিক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীর দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক প্রকল্প গ্রহণ করে দূরশিক্ষণ কর্মসূচীর প্রসার ঘটানো উচিত।

(৩) দূরশিক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে সাময়িক স্বল্প মেয়াদী প্রত্যক্ষ শিক্ষণ ব্যবস্থা (Distance-cum-contact) চালু করে শিক্ষিত বেকারদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপযোগী করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ সকল শিক্ষিত বেকারকে অবিলম্বে দেশসেবার সুযোগ দিয়ে জাতীয় মেধার অপচয় রোধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(৪) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক পেশাভিত্তিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা ও দক্ষতাভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন।

ঘ. শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের

ভূমিকা

৬.১.(ঘ) বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রতি দশটি শিশুর মধ্যে জন্ম নিচ্ছে একটি প্রতিবন্ধী শিশু। এই শিশুটি হয় অন্ধ, নয় মূক-বধির, নয় মানসিক অথবা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী। এদের সবারই প্রয়োজন সুচিকিৎসা, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন। তার সাথে এদের প্রয়োজন পরিবার ও সমাজের সহানুভূতি। বাংলাদেশেও শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধিত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য একটি মানবিক সমস্যা।

৬.২.(ঘ) আমাদের দেশে এ ধরনের প্রতিবন্ধির সংখ্যা জানার জন্য কোনো জরিপ করা হয়নি। তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে সারা পৃথিবীতে সকল প্রকার প্রতিবন্ধীর সংখ্যা শতকরা ১০ জন। দারিদ্র্য, অপুষ্টি ও অন্যান্য কারণে আমাদের দেশে এই সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি। সাধারণত অনুমান করা হয় যে, বাংলাদেশে শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা দেড় কোটির মত। এদেশে অধিকাংশ দরিদ্র পরিবারের অন্ধ, মূক, বধির ও শারীরিক পঙ্গুরা সাধারণত ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। জাতীয় স্বার্থে তাদের এই বৃত্তি গ্রহণ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। প্রতিবন্ধিত্ব ও প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য আমাদের দেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তবে এগুলি প্রয়োজনের তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল।

প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থার বর্তমান অবস্থা।

৬.৩.(ঘ) বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তিকে সমাজে পুনর্বাসনের উপযুক্ত যত্ন, পরিচর্যা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা নিতান্ত অপ্রতুল। বস্তুত সমাজের সর্বস্তরে প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তির সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব রয়েছে। তবে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম বিদ্যমান সীমিত পরিসরের হলেও সে সবের মূল্যায়ন আবশ্যক। কারণ এ সব কার্যক্রমের উন্নতি সাধনের মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্যাপক কর্মসূচীর প্রণয়ন ও সমাজে তাদের পুনর্বাসন সম্ভব। সেজন্য আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশু ও ব্যক্তির জন্য প্রচলিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল:

অন্ধদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

৬.৪.(ঘ) **সরকারী কর্মসূচী:**

(ক) **অন্ধদের স্কুল:** বাংলাদেশ সরকারের সমাজ কল্যাণ বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য পাঁচটি স্কুল চালু রয়েছে। সরকারী অর্থে এসব স্কুলে অন্ধ ব্যক্তিরা ব্রেইল পদ্ধতি অনুসরণে প্রাথমিক স্তরে পঞ্চম শ্রেণীর উপযুক্ত জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায়। এ ছাড়াও সঙ্গীত এবং নানা জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অর্জন করতে পারে।

(খ) **অন্ধদের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থা:** অন্ধ শিশু কিশোররা যাতে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন সমবয়স্ক শিশু কিশোরদের সাথে মিলেমিশে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে সেজন্য সমাজ কল্যাণ বিভাগ একটি কর্মসূচী চালু করেছে। এই উদ্দেশ্যে বিদেশী সহযোগিতার সম্প্রতি ঢাকার একটি ব্রেইল প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(গ) **বয়স্ক অন্ধ প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী:** দেশের চারটি বিভাগে অবস্থিত অন্ধ স্কুলের সাথে বয়স্কদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য চারটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রের প্লেসমেন্ট সার্ভিসেস শাখার মাধ্যমে অন্ধ ব্যক্তিকে নিকটবর্তী শিল্পকারখানায় চাকুরি দেয়া হয়।

৬।৫।(ঘ) **বেসরকারী কর্মসূচী**

(ক) **বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দি ব্লাইন্ড (বি এন এস বি):** পশ্চিম জার্মানীর একটি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বিএনএসবি ঢাকা শহরের মীরপুর এলাকায় অন্ধদের জন্য একটি বৃত্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এখানে ১১০ জন পুরুষ ও ৪৭ জন মহিলা চক তৈরি, তাঁত বোনা, কাঠের কাজ,

বই বাঁধাই, পাটের জিনিসপত্র তৈরি, দর্জির কাজ, সূচীকর্ম, উল বোনা, বাগান ও পশুপালনের প্রশিক্ষণ লাভ করছে। এ ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে এই সংস্থা অন্ধদের জন্য একটি চক্ষু শিবির, একটি পাঠাগার, গবেষণা কেন্দ্র ও ছাত্রাবাস নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

(খ) এ্যাসিস্ট্যান্স ফর দি ব্লাইণ্ড চিলড্রেন (এবিসি): উক্ত সংস্থা বিএন এস সি-র পরিচালিত বিভিন্ন কেন্দ্র ও ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল এবং অন্ধ স্কুলগুলির মাধ্যমে ব্রেইল পদ্ধতিতে রচিত বইপত্র অন্ধদের মধ্যে বিতরণ করে। যেসব ছেলেমেয়ে সরকারী অনুদানে পরিচালিত সমন্বিত কর্মসূচী অনুযায়ী স্বাভাবিক স্কুলে শিক্ষা গ্রহণ করছে তাদের জন্য এবিসি ছাত্রাবাস নির্মাণ করেছে। এই সংস্থা অন্ধদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিরও ব্যবস্থা করে থাকে।

মূক বধিরদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।

৬.৬.(ঘ) **সরকারী কর্মসূচী**

(ক) **মূক-বধির স্কুল:** প্রধান প্রধান জেলা শহরে অর্থাৎ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় একটি করে মূক-বধির স্কুল সরকারী অর্থে সমাজ কল্যাণ দপ্তর নির্মাণ করেছে। এ ছাড়া চাঁদপুর, ফরিদপুর ও সিলেট শহরে তিনটি এ রকম স্কুল চালু রয়েছে। এ সব স্কুলে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার পাশাপাশি ছবি আঁকা ও বৃত্তি বিষয়ে কার্যকর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

(খ) **বয়স্কদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন:** উক্ত স্কুল প্রাঙ্গনে মূক ও বধিরদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ অর্জনের পৃথক পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। একত্রে এসব কেন্দ্রকে ট্রেনিং এণ্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারস ফর দি ফিজিক্যালী হ্যান্ডিক্যাপড নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

(গ) **চাকুরী পুনর্বাসন কেন্দ্র:** ঢাকার টঙ্গীতে অবস্থিত অন্ধ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ রকম একটি কর্মসূচী চালু রয়েছে। এখানে প্রায় ২০০ বধির শিশু ও যুবককে বিভিন্ন কাজ শেখানো হয়। এ ছাড়াও এখানকার হিয়ারিং সেন্টারে বধিরতার মাত্রা নির্ধারণ, উপযুক্ত চিকিৎসা, শ্রবণ সাহায্যকারী যন্ত্রপাতি তৈরি ও মেরামত ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে।

৬.৭.(ঘ) **বেসরকারী কর্মসূচী:** বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান স্বীয় অর্থে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঢাকা, বগুড়া ও ময়মনসিংহ শহরে বধির ছেলেমেয়েদের জন্য চারটি বিদ্যালয় নির্মাণ করেছে। ছেলেরা ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশোনা করে, কিন্তু মেয়েদের বাড়ি থেকে যাতায়াত করতে হয়। এ জাতীয় স্কুলে প্রধানত বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

শারীরিক পঙ্গু, অস্থিবৈকল্য, অবশ, পক্ষাঘাত ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্তদের জন্য প্রশিক্ষণ

৬.৮.(ঘ) **সরকারী কর্মসূচী**

পঙ্গু পুনর্বাসন ও চিকিৎসা কেন্দ্র (আর আই এইচ ডি): পঙ্গুদের চিকিৎসা কেন্দ্র প্রথম স্থাপিত হয় ১৯৭২ সালে ঢাকা শহরে। বিখ্যাত শল্য বিশারদ ডঃ গাস্ট ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধে আহত পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

পরবর্তীকালে সরকারী ব্যবস্থাপনার অধীনে এখানে অস্ত্রোপচার, ফিজিওথেরাপী, কৃত্রিম অঙ্গ তৈরি ও সংযোজন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। এখানে বর্তমানে পক্ষাঘাত ও অস্থিরোগ চিকিৎসার বিভিন্ন দিক নিয়ে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু রয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকা শহরে আরো দু'টি পঙ্গু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

৬.৯.(ঘ) **বেসরকারী কর্মসূচী**

(ক) দি বাংলাদেশ কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েলফেয়ার পঙ্গুদের জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মাণ করেছে।

(খ) উইমেন্স ভলাণ্টারি এসোসিয়েশন (ডব্লিউ ভি-এ) পঙ্গুদের সাহায্য দানের লক্ষ্যে একটি আবাসিক পঙ্গু প্রতিষ্ঠান চালু করেছে।

(গ) অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও কানাডার সহায়তায় রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলার সাধনপুরে পঙ্গু শিশু নিকেতন নামে একটি সংস্থা চালু আছে।

মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

৬.১০.(ঘ) **বেসরকারী কর্মসূচী**ঃ বর্তমানে দেশে মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন ক্ষেত্রে সরকারী কোনো বিশেষ স্কুল অথবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নেই। তবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মানসিক প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রেখেছেঃ

(ক) প্রতিবন্ধী শিশুর পিতামাতার সমন্বয়ে গঠিত 'দি সোসাইটি ফর দি কেয়ার এণ্ড এডুকেশন অব মেণ্টালী রিটার্ডেড চিলড্রেন' (এস সি ই এম আর সি) নিয়মিত স্কুলে ৬টি বিশেষ শিক্ষা ক্লাস চালু করে ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত বয়সের প্রতিবন্ধী শিশুদের লেখাপড়া, অঙ্কন ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি পেশী সঞ্চালন, সামাজিক বোধশক্তি ও ভাব বিনিময়ের নৈপুণ্য অর্জনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে।

(খ) এসসিইএমআরসি এবং নরওয়ের এসোসিয়েশন ফর দি মেণ্টালী রিটার্ডেড (বি আই এম আর) এর যৌথ উদ্যোগে ১৯৮২ সাল থেকে ১৬ বছরের চেয়ে বেশি বয়সের প্রতিবন্ধী যুবক-যুবতীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিশেষ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ঢাকার ৬টি বিশেষ শিক্ষা ক্লাস ছাড়াও দেশের অন্যান্য কয়েকটি শহরে বিশেষ শিক্ষাক্রম চালু করেছে।

(গ) ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী ফাউণ্ডেশন ঢাকা শহরে 'কল্যাণী' নামে মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষ শিক্ষার স্কুল স্থাপন করেছে। শিশু বিকাশ ক্লিনিকে অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী ও শিশু বিশেষজ্ঞের সাহায্যে পরীক্ষা করানোর পর প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের কল্যাণীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। প্রতিবন্ধিতার মাত্রা অনুযায়ী লেখাপড়া, নাচ গান শেখানো হয়। এ ছাড়া রান্না, সেলাই, তাঁতবোনা ও হস্তশিল্প জাতীয় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে ঢাকা শহর ও দূরবর্তী অঞ্চল থেকে আগত প্রতিবন্ধী শিশুদের মা বাবাকে প্রতিবন্ধী সন্তানের শিক্ষা, যত্ন ইত্যাদি সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়।

বিরাজমান সমস্যা

৬.১১.(ঘ) বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য যে সকল কার্যক্রম রয়েছে সেগুলি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা বিজড়িত। যেমন অন্ধ, মূক-বধিরদের বিদ্যালয়ের ভবনগুলি মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়ছে। প্রশিক্ষণের অভাবে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ছাত্রাবাসের অভাবে ছাত্র ভর্তি হ্রাস পেয়েছে ইত্যাদি। নরওয়ে ও সুইডিস ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির সাহায্যে ১৯৮২ সালে একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের আওতায় টঙ্গীতে অবস্থিত অন্ধদের বিদ্যালয় ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মেরামত ও উন্নয়নের কাজ ১৯৮৬ সালে সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে অন্যান্য স্থানের বিদ্যালয়ের অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি। তদুপরি ঢাকার আসাদ গেটে অবস্থিত বিদ্যালয়টি স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা চলছে। বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়গুলি তুলনামূলক ভাবে অনেক ভাল চলছে। তবে তাঁরাও অর্থাভাবে এগুলি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারছেন না। শিক্ষক প্রশিক্ষণ সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানেরই একটি বড় সমস্যা।

৬.১২.(ঘ) সুপারিশমালাঃ সার্বিক

(১) অন্ধ, মূক-বধির, শারীরিক ও মানসিক পঙ্গু ছেলে-মেয়েদের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য সরকার কর্তৃক অনতিবিলম্বে জরিপ চালাতে হবে। জরিপের ভিত্তিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিশেষ শিক্ষার বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হবে।

(২) অন্ধ ও মূক-বধিরদের একই সঙ্গে শিক্ষাদানের জন্য বর্তমানে সারা বাংলাদেশে মাত্র কয়েকটি বিশেষ বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু এদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথক পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রথমে প্রতিটি বিভাগে ও পরে প্রতিটি জেলায় প্রয়োজনানুসারে অন্ধ ও মূক বধিরদের জন্য পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ ও উন্নতমানের বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। অন্ধ ও মূক-বধিরদের বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ও আলাদা পাঠ্যপুস্তক তৈরি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের সুব্যবস্থা করতে হবে।

(৩) এই বিশেষ বিদ্যালয়গুলি ছেলে ও মেয়েদের জন্য পৃথক ও আবাসিক হওয়াই উচিত। উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষাক্রম বিশেষ পদ্ধতিতে এদের শেখাবার ব্যবস্থা থাকবে। এর উদ্দেশ্য এদের সক্ষম ও উপার্জনশীল করে তোলা। বাধাগ্রস্ত বলেই প্রথম দিকে এদের শিক্ষার গতি হয় মন্থর। তবে এদের মানসিক প্রবণতা যাচাই করে বৃত্তিমূলক ও প্রয়োগমুখী শিক্ষাদান করলে স্বনির্ভর হওয়ার ব্যাপারে তাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে।

(৪) অন্ধদের শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথমে ৫ম শ্রেণী, পরে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষার্থীর ন্যায় সাধারণ শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে, তবে তাদের প্রবণতা অনুযায়ী সঙ্গীত ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাছাড়া শরীরচর্চা, আবৃত্তি-এ সবও এদের শেখানো উচিত। দৃষ্টিহীনকে শিক্ষা দিতে হলে দৃষ্টিমান শিক্ষককে বিশেষ পদ্ধতি আয়ত্ত করতে হবে। এজন্য শিক্ষক শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। তাই এদের জন্য পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিশেষ বিদ্যালয় তৈরির আগেই শিক্ষক-শিক্ষণের এবং প্রচলিত ব্রেইল হরফে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য-পুস্তক তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষক তৈরির বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষণ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

(৫) মূক ও বধিরদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্নমাধ্যমিক স্তরে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। এদের শিক্ষার উদ্দেশ্য হল জীবিকা অর্জন ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ। তাই অন্ধদের মত মূক-বধির ছেলেমেয়েদের প্রবণতা অনুসারে আলাদাভাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। অষ্টম শ্রেণীর পর যারা আর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না, এ স্তরটি হবে তাদের জন্য পুনর্বাসনের প্রস্তুতি পর্ব। এই পর্বে মূক ও বধিরদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কাজ, ছাপার কাজ, দর্জির কাজ, টাইপের কাজ ও বিভিন্ন কুটির শিল্পের কাজও শেখানো যেতে পারে। সমবায় ভিত্তিতে যেখানে কৃষি বা পশুপালন করা সম্ভবপর সেখানে মূক ও বধিরদের নিয়োগ করলে তারা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবে। সেজন্য তাদের বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ল্যাবরেটরি ও ওয়ার্কশপ স্থাপন করতে হবে।

(৬) অন্ধদের ন্যায় মূক ও বধিরদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। সেজন্য এ ধরনের বিদ্যালয়ের সঙ্গে বিদ্যমান শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে যতদিন এদেশে এ প্রকার শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হবে না, ততদিন শিক্ষকদের বিদেশে পাঠিয়ে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা উচিত। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বিদেশী বিশেষজ্ঞ এনে এ দেশেই শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) বর্তমানে মানসিক পঙ্গু ছেলেমেয়েরা মাত্র তিনটি বেসরকারী সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে। এদের সার্বিক বিকাশ সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহানুভূতিশীল ও সহনশীল হতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় হল এদের সাহচর্যে যেন সুস্থ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার গতি ব্যাহত না হয়। শিক্ষকদের থাকতে হবে ধৈর্য, মনস্তাত্ত্বিক গুণাবলী ও সংবেদনশীল মন। তাই এদের শিক্ষার জন্য আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করা প্রয়োজন। এসব বিদ্যালয়ে মানসিক পঙ্গু ছেলেমেয়েদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাদান করতে হবে। এর উদ্দেশ্য হল তারা যেন অন্তত তাদের সাধারণ প্রয়োজন বুঝতে পারে এবং স্বাবলম্বী হয়ে চলতে পারে।

(৮) অবশাঙ্গ, অস্থিবৈকল্য ও পক্ষাঘাতজনিত শারীরিক পঙ্গুদের জন্যও বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ সব বিদ্যালয়ে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে এবং শারীরিক পঙ্গুদের চিকিৎসার (যেমন ফিজিওথেরাপী স্পিচথেরাপী ইত্যাদি) বন্দোবস্ত রাখতে হবে। এজন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

৬.১৩ (ঘ) সুপারিশমালাঃ স্বল্প মেয়াদী

(১) প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষক-শিক্ষণঃ প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন শিক্ষক-শিক্ষণ। এ ধরনের ব্যবস্থায় নিম্নোক্ত শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন:

(১) বিশেষ শিক্ষাদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক।

(২) থেরাপিস্ট
- (ক) ফিজিওথেরাপিস্ট
- (খ) স্পিচ থেরাপিস্ট
- (গ) অকুপেশনাল থেরাপিস্ট

(৩) চিকিৎসক

(ক) শিশু বিশেষজ্ঞ

(খ) মনোচিকিৎসক

(গ) শল্য বিশারদ।

(৪) মনোবিজ্ঞানী

(ক) শিশু মনোবিজ্ঞানী

(খ) চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী।

(২) প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে অবস্থিত শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ ও প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষক তৈরির ব্যবস্থা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণরত শিক্ষক শিক্ষিকাদের মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মূক-বধির ও অন্ধদের বিদ্যালয়-গুলিতে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে। এ ছাড়া উপরোক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণরত শিক্ষার্থীদেরও বিশেষ বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান প্রদান করা উচিত।

(৩) ফিজিওথেরাপিস্ট, স্পিচ-থেরাপিস্ট ও অকুপেশনাল থেরাপিস্ট প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা শহরে পঙ্গু হাসপাতালে প্রশিক্ষণের জন্য পুনরায় চালু করতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন জেলায় যখন আরো পঙ্গু হাসপাতাল চালু করা হবে, তখন সেখানেও অনুরূপ প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা প্রয়োজন।

(৪) প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও চিকিৎসার জন্য অন্যান্য যে বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন এবং যাঁরা দেশে বিদ্যমান, যেমন শিশু বিশেষজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী, মনোচিকিৎসক ইত্যাদি তাঁদের খণ্ডকালীন উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করা আবশ্যক।

বিশেষ শিক্ষাশ্রেণী

৬.১৪.(ঘ) শুরুতে প্রতি উপজেলায় প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার জন্য সাধারণ সরকারী একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষা শ্রেণী খোলা উচিত। উন্নতিশীল দেশগুলিতে নিয়মিত স্কুলের সাথে এ ধরনের বিশেষ শিক্ষা শ্রেণীর সমন্বয়ে স্বল্পমাত্রায় প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা চালু রয়েছে। স্বাভাবিক শিশুদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করলে দেখা গেছে প্রতিবন্ধী শিশুদের বিকাশে সাহায্য হয় এবং তাদের অনেক উন্নতি ঘটে।

সুপারিশমালাঃ দীর্ঘ মেয়াদী

৬.১৫.(ঘ) শিক্ষক শিক্ষণঃ প্রতিবন্ধীদের শিক্ষক তৈরির জন্য বাংলাদেশ সরকারের সমাজ সেবা বিভাগ একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে মোট ৩০ জন শিক্ষকের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। শিক্ষকশিক্ষণের এ ব্যবস্থা যদি তাড়াতাড়ি এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত হয় তবে প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার অনেকটা উন্নতি হবে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন

৬.১৬.(ব) প্রথমে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং পরবর্তী কালে প্রতিটি উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য অন্ধ, মূক-বধির, শারীরিক পঙ্গু ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদা আলাদা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সব ধরনের প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের শিক্ষায় বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সুতরাং প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাথে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং পরবর্তী কালে সম্ভব হলে কারিগরি কর্মশালারও ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. সংগীত শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১. (ঙ) বিজ্ঞানের আধুনিক জ্ঞান থেকে আমরা জানি যে, শিশুর পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কানই সর্বপ্রথম মাতৃজঠরে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এও লক্ষ্য করি যে, সঙ্গীত শিল্পীর পরিবার থেকে অথবা সঙ্গীত পরিবেশ থেকে সুরস্রষ্টার জন্ম হয়। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ উচ্চারণ, সঠিক বাচনভঙ্গি তথা সঙ্গীতের প্রভাব কেবল মানব সমাজে নয়, সমগ্র প্রাণীকুলেও অপরিসীম। সঙ্গীত আমাদের কর্মে, সেবায়, যুদ্ধে প্রেরণা যোগায় এবং আমাদের প্রেমে ধর্মে ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে। শিক্ষায় শিশুকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ছড়া, কবিতা ও সঙ্গীতের প্রভাব অনস্বীকার্য। দেশাত্মবোধের বিকাশ, জাতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা, রুচিশীলতা ও সৌন্দর্যবোধ এবং মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ নাগরিক সৃষ্টিতে সঙ্গীতের প্রভাব ও গুরুত্ব রয়েছে। সঙ্গীত বলতে নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং তাদের সমন্বয়ে যে আবেশ ও আনন্দ সৃষ্টি হয় তাকে বোঝায়।

৬.২. (ঙ) এদেশে সঙ্গীত শিক্ষা চর্চা ও প্রচলন প্রাচীনকাল থেকে অব্যাহত থাকলেও প্রধানত ব্যক্তি বা পরিবারকেন্দ্রিক ছিল। স্কুল, কলেজে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা সাম্প্রতিককালে লক্ষ্য করা গেলেও তা প্রধানত সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের অন্তর্গত। ব্যক্তিগত ও বেসরকারী উদ্যোগে শহরাঞ্চলে কিছু কিছু সঙ্গীত একাডেমী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় সঙ্গীত শিল্পী বর্তমানে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বিচরণ করছেন তাঁরা প্রধানত এসব সঙ্গীত একাডেমী এবং পারিবারিক পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করেছেন।

৬.৩. (ঙ) এদেশে সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় (বিদ্যালয় স্তরটি অনানুষ্ঠানিক) প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৬৩ সালে বেসরকারী উদ্যোগে। বর্তমানে এ মহাবিদ্যালয়টি সরকারী প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সঙ্গীত ও ললিতকলায় শিল্পীদের উৎসাহিত করার জন্য এসব বিষয়ে উন্নতমানের চর্চার জন্য শিল্পকলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিল্পকলা একাডেমীর কার্যক্রম ইতিমধ্যেই দেশে ও বিদেশে সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

৬.৪. (ঙ) সংগীত শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলী

(ক) শিক্ষার্থীর মধ্যে শিল্প ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করা।

(খ) শিক্ষার্থীর আবেগকে সঠিক পথে চালনা করে সত্য, সুন্দর ও ন্যায়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

(গ) সঙ্গীত আন্তর্জাতিক ভাষা। এই ভাষার ব্যবহার করে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করা।

(ঘ) সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে মানব মনের সুকুমার ও মানবিক বৃত্তিগুলির উন্মেষ ও বিকাশ সাধন করা।

(ঙ) সঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে দেশাত্মবোধ, জাতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, লোকাচার, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, মানবিক মূল্যবোধ ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নিবেদিত হতে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা।

৬.৫.(ঙ) সুপারিশ

(১) প্রত্যেক আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম হিসাবে সঙ্গীত চর্চার সুযোগ বৃদ্ধি করা উচিত।

(২) স্কুল ও কলেজসমূহে পেশাগত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ করা আবশ্যক।

(৩) প্রত্যেক জেলা শহরে সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপনের বেসরকারী উদ্যোগকে সরকা অনুদান দিয়ে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।

(৪) নতুন করে সঙ্গীত ভবন নির্মাণ সম্ভব না হলে সুবিধাজনক স্কুল বা কলেজ ভবনে সান্ধ্যকালীন সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

(৫) সঙ্গীত চর্চার ঐতিহ্যগত পারিবারিক ও গোষ্ঠিভিত্তিক সংঘগুলিকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন।

(৬) দেশের অভিজ্ঞ ও বিজ্ঞ সঙ্গীতজ্ঞদের দ্বারা লিখিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী উন্নতমানের বই প্রকাশের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৭) সঙ্গীত শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৮) দেশের একমাত্র সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়টির মান উন্নত করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্য প্রয়োজন।

চ. ললিতকলা

ভূমিকা

৬.১.(চ) সৃষ্টির আদিকাল থেকে শুরু করে আজ অবধি মানুষ সৌন্দর্যের সাধনা করছে। সৌন্দর্য বলতে কেবল দেহগত সৌন্দর্য বোঝায় না, মানুষের চিন্তা, প্রকাশভঙ্গি, আচরণ রুচিবোধ ইত্যাদি মানুষের সৌন্দর্যবোধের অন্তর্ভুক্ত। ললিতকলার মাধ্যমে শিক্ষার্থী অঙ্কনের সাহায্যে তার সৌন্দর্যবোধ প্রকাশের সুযোগ পায়। প্রধানত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে ললিতকলা স্কুল শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত, সেগুলি হল:

ক. সৌন্দর্যবোধের বিকাশ সাধন,

খ. লিখতে শেখার দক্ষতা অর্জন,

গ. চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধন করে কোনো বিষয়ে মনোযোগ ধরে রাখার অভ্যাস গঠন।

ক্রমোন্নতি

৬.২.(চ). ললিতকলা বিষয়ে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তান আমলে ঢাকায় গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শিক্ষার্থীদের চাহিদা পুরণের জন্য রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ আরো দুটি ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। এ সকল ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর মাস্টার্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়। যেহেতু এ সকল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার নিম্নতম যোগ্যতা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পাশ সেহেতু এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করা শিল্পীগণ যদিও ব্যবহারিক কাজে বেশ দক্ষ হন, কিন্তু ভাষার দিক থেকে কিছুটা দুর্বল থেকে যান। এর ফলে শিক্ষকতা পেশায় এ সকল শিল্পী যথেষ্ট সাফল্য প্রদর্শন করতে পারেন না। এ জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানে ভাষা শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট বা স্নাতক ডিগ্রীপ্রাপ্তদের আর্টস ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা উচিত যেন তাঁরা ভবিষ্যতে উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারেন। এ ধরনের শিক্ষকদের পদমর্যাদা উচ্চতর হওয়া প্রয়োজন।

৬.৩.(চ). সুপারিশ

(১) স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত শিল্পী শিক্ষকদের বেতন ও পদমর্যাদা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্নাতক শিক্ষকদের সমতুল্য হওয়া উচিত।

(২) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিল্প চেতনা ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি জেলায় একটি আর্ট গ্যালারী প্রতিষ্ঠা করা উচিত।

ভূমিকা

ছ. জনসংখ্যা শিক্ষা

৬.১.(ছ) একটি জনগোষ্ঠি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারে যদি সে জনগোষ্ঠিকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে জনসম্পদে রূপান্তর করা যায়। অপরিকল্পিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলে এবং সে জনসংখ্যার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে সে অনভিপ্রেত জনসংখ্যা দেশের সীমিত সম্পদের উপর ভয়াবহ চাপ সৃষ্টি করে এবং দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। অপরদিকে সাধারণ জনজীবনে এই অনভিপ্রেত জনসংখ্যা সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার কারণ হয় এবং আর্থসামাজিক ভারসাম্য বিনষ্ট করে। পরিকল্পিত জনসংখ্যা যেমন একটি দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, অপরিকল্পিত জনসংখ্যা তেমনি একটি দেশের নানাবিধ দুঃখ দুর্দশার কারণ—এ সচেতনতা ও উপলব্ধি সৃষ্টির জন্য জনসংখ্যা শিক্ষার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৭৬ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। তারপর আকস্মিকভাবে ১৯৮৫ সালে প্রকল্পটি বন্ধ হয়ে যায়।

৬.২.(ছ) বর্তমান শতাব্দীর সত্তরের দশকে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ৩ শতাংশ হারে প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থার প্রতিকারকল্পে বাংলাদেশ সরকার জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যাটিকে এক নম্বর সমস্যারূপে চিহ্নিত করে এবং জনসংখ্যা হ্রাস করার বহুমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে। এতদসঙ্গে কেবলমাত্র শারীরিক ও ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থা ছাড়াও শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টির দিকটিও বিবেচনা করা হয়। ফলে জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পটি গৃহীত হয় এবং একটি সফল প্রকল্প হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম এদেশের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সাগ্রহে গ্রহণ করে এবং বিগত নয় বছরে প্রকল্পটির অধীনে বিপুল সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা ও গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

৬.৩.(ছ). সুপারিশ

(১) একটি দেশের পরিমিত জনসংখ্যাকে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদে রূপান্তরিত করতে হলে জনসংখ্যা শিক্ষা সামগ্রিক শিক্ষা কার্যক্রমের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত যাতে অকস্মাৎ প্রকল্পটি পরিত্যাগের ফলে ইতিমধ্যে বিগত নয় বছরের অর্জিত সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত না হয়।

(২) বাংলাদেশে অপরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এখনো ব্যাপক হারে ঘটছে। এই বৃদ্ধির হার হ্রাস করতে হলে অন্যান্য কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করা আবশ্যক। একথা বলা সঙ্গত যে, জনসংখ্যা হ্রাস করার কার্যক্রম শিক্ষিত পরিবারে যতটা সফল ও কার্যকর অশিক্ষিত পরিবারে ততটা নয়। সেজন্য এটা ধরে নেয়া যুক্তিযুক্ত যে জনসংখ্যা শিক্ষা কার্যক্রম জনসংখ্যা সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।

(৩) উল্লিখিত প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হওয়ার সময় তার বিপুল পরিমাণ পুস্তক-পুস্তিকা ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ ও আসবাবপত্র জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের (এনসিটিবি) কাছে অর্পণ করা হয়-এ উদ্দেশ্যে যাতে সংস্থাটির মধ্যে একটি জনসংখ্যা বিভাগ খুলে প্রকল্পটির যাবতীয় কাজের গতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ যাবত এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে জনসংখ্যার কার্যক্রম স্তিমিত হয়ে গেছে। তাই এনসিটিবিকে এ ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিশেষ করে, এর দায়িত্ব হবে চালু পাঠ্যসূচীর পরিমার্জন ও পরিশীলন, প্রশিক্ষণের বই-পুস্তক সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ, নতুন শিক্ষোপকরণ তৈরি এবং জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা। দেশের স্বার্থে পূর্বের প্রকাশনা ও গবেষণা অব্যাহত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

(৪) শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি ও প্রথম ডিগ্রী স্তরের বিপুল সংখ্যক শিক্ষককে জনসংখ্যা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দানের অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নিতে হবে যথাক্রমে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, নেইপ, নিয়েমার ও আই ই আর কে। এক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কাজটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শুরু করা প্রয়োজন।

(৫) জনসংখ্যা শিক্ষার সমুদয় কাজকর্মের তদারকি ও সমন্বয় বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহে অনতিবিলম্বে একটি করে সেল স্থাপন করা প্রয়োজন। এ ছাড়া জনসংখ্যা শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পরামর্শ প্রদানের জন্য জনসংখ্যা শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবর্গের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে।

জ. কম্পিউটার শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১. (জ) আমাদের দেশে কম্পিউটার বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ভবিষ্যতে এ প্রয়োজন দেশে ও বিদেশে আরো অনেক বেশি দেখা দেবে। সাম্প্রতিক কালে দেশের স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞানার্জনের প্রতি খুবই উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

৬.২.(জ) সুপারিশ

(১) বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কম্পিউটার বিষয়ে পাঠক্রম চালু করার বিষয়টি জরুরী ভিত্তিতে বিবেচনা করা দরকার। শিক্ষার পরিবেশ, অভিজ্ঞ শিক্ষক, পরিকল্পিত পাঠ্যসূচী এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ এসবের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে কম্পিউটার শিক্ষাকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :

(ক) প্রাথমিক পর্যায়: ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে কম্পিউটার সম্পর্কে একটি অধ্যায় সংযোজন করে প্রাথমিক ধারণা, যেমন কম্পিউটার কি, এ দিয়ে কি কি কাজ হয়, এর গঠন ও অংশগুলির প্রাথমিক ধারণা দেয়া যেতে পারে। এ পর্যায়ে বাইনারী সিস্টেম ও কোডের ধারণাও যোগ করা যেতে পারে।

(খ) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়: ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে সহজ প্রোগ্রাম, সাধারণ হিসাব, প্যাকেজ, যেমন: ওয়ার্ড প্রসেসিং, চিত্রাঙ্কন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত অধ্যায় থাকবে এবং বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে এসব বিষয়ে শিক্ষাদান করা হবে। এসব বিষয়ে প্রদর্শনী ও ব্যবহারিক ক্লাস চালু করা প্রয়োজন।

(গ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়: এ পর্যায়েই হবে কম্পিউটারের তত্ত্ব, প্রয়োগ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিস্তারিত শিক্ষার সুযোগ। এ পর্যায়ে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শীঘ্রই কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স চালু করা দরকার।

(ঘ) পেশাজীবী প্রশিক্ষণ পর্যায়: মাধ্যমিক স্তরের পারদর্শী ও আধাপারদর্শী বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য এবং অতি দ্রুত দেশের চাহিদা পূরণের জন্য দেশের সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলিতে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ আরো ব্যাপকভাবে চালু হতে পারে। এ ধরনের সরাসরি প্রয়োগমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ খুবই ফলপ্রসূ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

(২) কম্পিউটার বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কম্পিউটার বিজ্ঞান কোর্স অপরিহার্য। এ স্তরে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞের সংখ্যা সীমিত বিধায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু না করে, কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান খোলা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(৩) মাঝারি বা মধ্যস্তরের দক্ষ জনশক্তি, যাঁরা কম্পিউটার ব্যবহার, প্রয়োগ, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে পারদর্শী হবেন, তাঁদের সংখ্যাই হবে সর্বাধিক। সুতরাং এ প্রয়োজন মেটাবার জন্য কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিতে বিশেষ দীর্ঘ মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা যেতে পারে।

(৪) উপকরণ প্রদান এবং বিশেষ প্রজেক্টের মাধ্যমে সারা দেশের বাছাইকৃত স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক, কৃষি কলেজ ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের নির্বাচিত শিক্ষকদের কম্পিউটার বিষয়ে জ্ঞান ও পড়াবার পদ্ধতি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে শিক্ষার বিস্তার ও মনোন্নয়নের প্রতি জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

ঝ. নারী শিক্ষা

ভূমিকা

৬.১.(ঝ) দেশ ও জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে নারী সমাজের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ কথা বলার প্রয়োজন হয় না যে, দেশের মোট জন সংখ্যার অর্ধেক অশিক্ষিত ও উপেক্ষিত রেখে জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সেজন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পুরুষের অংশগ্রহণ অর্থবহ করার সাথে সাথে নারী সমাজের অংশগ্রহণকেও তাৎপর্যময় করে তোলার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। তাই স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পূর্ববর্তী সকল শিক্ষা কমিশন ও কমিটি নারী শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। আমরাও এ ব্যাপারে তাদের সাথে একমত পোষণ করি।

বর্তমান অবস্থা

৬.২.(ঝ) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ আশানুরূপ না হলেও তেমন অসন্তোষজনক নয় (সারণী দ্রষ্টব্য)। বর্তমানে মোট শিক্ষার্থীর মধ্যে মেয়েদের অংশ প্রাথমিক স্তরে শতকরা ৪০ ভাগ, মাধ্যমিক স্তরে ৩০ ভাগ, কলেজে ১৮ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ভাগ।

সারণী

ছাত্রীদের মোট শিক্ষার্থীর শতকরা হার

সাল			প্রাথমিক	মাধ্যমিক	কলেজ*	বিশ্ববিদ্যালয়*
১৯৮১	..	..	৩৮·৭৫	২৫·০৯	১৭·৮৮	১২·৪৫
১৯৮২	..	..	৩৯·৪৯	২৪·৭০	১৮·৫০	১৮·২১
১৯৮৩	..	..	৪০·১১	২৬·৩০	১৭·৫০	১৮·৪২
১৯৮৪	..	..	৪০·৬৩	২৮·৯৪	১৯·৮২	১৭·৮৪
১৯৮৫	..	..	৪০·৪৭	২৯·২৬	১৭·৪৭	১৭·৯৩

*শিক্ষাবর্ষ ভিত্তিক

৬.৩.(ঝ) নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও কার্যকর করার জন্য নিচে কয়েকটি সুপারিশ করা হল:

(১) প্রাথমিক থেকে উচ্চতর স্তর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রয়োজন হলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অধিক সংখ্যক ছাত্রী ভর্তির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষালাভে উৎসাহ সৃষ্টি ও সুযোগ বৃদ্ধিকল্পে অদূর ভবিষ্যতে একটি স্বতন্ত্র মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

(২) সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে সহশিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৩) আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। দূরত্ব অতিক্রম করার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে মেয়েদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(৪) মেয়েদের পাঠ্য বিষয় স্থির করার সময়ে যুগোপযোগী ও বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা যায় এসব বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।

(৫) বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দিতে হবে, যেমন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকতা, নার্সিং এবং মেডিকেল ট্রেনিং, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস আদালতে কাজ করার শিক্ষা ও দক্ষতা লাভ, হাঁস-মুরগী পালন, কৃষি খামারে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন, সেলাই, রান্না, হাতের কাজ, বাঁশের কাজ, ছবি আঁকা, ছবি তোলা, টেলিফোন অপারেটর অথবা টেলিফোন, টেলিভিশন ও রেডিও মেকানিকের কাজ ইত্যাদি। এ জন্য মাধ্যমিক স্তরে বিশেষ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(৬) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে যাতে অধিক সংখ্যক শিক্ষিকা নিয়োগ পায়, তার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অধিক মহিলা নিতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণকালে যাতে থাকার অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে যথাযথ আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) মেয়েদের অধিক পরিমাণ চাকুরি দিতে হবে যাতে মেয়েরা পড়াশোনায় উৎসাহিত বোধ করে।

(৮) চিকিৎসা, প্রকৌশল, কৃষি, আইন প্রভৃতি পেশাগত শিক্ষায় মেয়েরা ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ভর্তি হচ্ছে। যাতে এতে আরো অধিক সংখ্যক মেয়ে আসে সে লক্ষ্যে তাদের জন্য আসন সংরক্ষণ এবং অধিক পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

অধ্যায় ৭

উচ্চশিক্ষা

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৭.১. ব্যক্তির বিকাশে এবং সমাজ ও দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিতে উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতির উচ্চাকাঙক্ষা পুরণের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষাই প্রধান অবলম্বন।

৭.২. মানুষকে কেবল তথ্যের ভাণ্ডারে পরিণত করা বা তার জ্ঞানস্পৃহা প্রবল করাই উচ্চশিক্ষার চরম লক্ষ্য নয়। মানুষের চিত্তকে নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক করার জন্যও উচ্চশিক্ষার ভূমিকা খুব স্পষ্ট। যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে মানুষ যে উপলব্ধিতে পৌছে বা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তাকে নির্বিকার চিত্তে প্রকাশ করার শক্তি যোগায় উচ্চশিক্ষা।

৭.৩. মানুষকে যথার্থ অর্থে সংস্কৃতিবান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বে পরিণত করার প্রতি উচ্চশিক্ষার সচেতন ও সতর্ক লক্ষ্য থাকে। দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সুদীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীর আচরণ, কর্ম-তৎপরতা, জীবনযাপন, বিশ্বাস ও চিন্তাভাবনার মধ্যে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এই সংস্কৃতিকে নিজের মনে সংগঠিত করে আধুনিক যুগের উপযোগী করে চর্চা করতে মানুষকে সাহায্য করে উচ্চশিক্ষা।

৭.৪. পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রকৃতির রহস্যময় দিক উন্মোচন করার সাধনা ও প্রকৃতির উদঘাটিত শক্তির ব্যাখ্যা দেয়ার প্রচেষ্টাই সভ্যতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখার প্রধান শর্ত। কেবল উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেই এই শর্ত পূরণ করার উদ্যোগ নেয়া সম্ভব।

৭.৫. উচ্চশিক্ষা মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করে, কিন্তু তথ্যভারাক্রান্ত করে রাখে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাপ্ত জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে আত্মস্থ করাই উচ্চশিক্ষিত মানুষের প্রধান কর্তব্য। এই জ্ঞান কল্পনার সাহায্যে সামাজিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারলে উচ্চ শিক্ষার লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে। বিদ্যা কেবল নির্জীব তথ্যের সমষ্টি নয়, কল্পনার সাহায্যে যথোচিত ব্যবহার করে উচ্চ শিক্ষিত মানুষ নানারকম তৎপরতায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। কল্পনা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটানো এবং কল্পনার সাহায্যে জ্ঞানের উপযুক্ত প্রয়োগ করার নানা পন্থা অনুসন্ধান করা উচ্চশিক্ষিত মানুষের বৈশিষ্ট্য।

৭.৬. কোনো বিষয়ে উচ্চশিক্ষা মানুষকে সে বিষয়ে দক্ষতা দান করে। সম্পদ, সময়, শ্রম ও মেধার অপচয় না ঘটিয়ে এবং এগুলির সর্বোত্তম ব্যবহারের সাহায্যে পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনে সাহায্য করে পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা।

৭.৭. দেশবাসীর কর্মদক্ষতা জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদের যথোচিত ব্যবহার করতে না পারার ফলে জনসংখ্যা সম্পদে পরিণত না হয়ে বরং ভার বলে পরিগণিত হয়। উপযুক্ত নেতৃত্বের সাহায্যে মানুষের কর্মদক্ষতা যথাযথ ব্যবহার সম্ভব। আবার, বিভিন্ন পেশাভুক্ত শ্রমজীবী মানুষের জন্য গভীর শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া কারো পক্ষে এই নেতৃত্ব অর্জন করা অসম্ভব।

৭.৮. উপযুক্ত নেতৃত্ব ব্যতিরেকে দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট মোচন করা কিছুতেই সম্ভব নয়। উপযুক্ত ও সুপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা যথোচিত নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মানুষকে শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান করে। দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে শোচনীয় অবস্থা বিরাজ করছে তা দুর করার লক্ষ্যে নেতৃত্বদানের মানুষ তৈরির জন্য পরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা অপরিহার্য।

৭.৯. উচ্চশিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে নিরলস কর্মাভ্যাস, নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞান স্পৃহা, সক্রিয় উদ্যোগ, সততা, ন্যায়বোধ, স্বাধীন চিন্তাশীলতা ও সামাজিক সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতা এবং তার সমস্যা সমাধানের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে। সংক্ষেপে বলা যায়, জ্ঞানার্জন ও চরিত্র গঠনে উচ্চশিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বর্তমান উচ্চ শিক্ষা

৭.১০. আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান ধারার প্রবর্তন হয় ইংরেজ শাসকদের উদ্যোগে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে এই উপমহাদেশে স্থাপিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত এলাকায় উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের আওতাধীন ছিল। ১৯২১ সালে আবাসিক উচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা শহরের প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া এই এলাকায় অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনেই থেকে যায়।

৭.১১. ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভাগের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক চরিত্র অনেকাংশে বর্জন করা হয় এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের উচ্চশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠান এর আওতাধীন আসে। এরপর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে রাজশাহী বিভাগের সকল কলেজ এবং সাবেক বরিশাল জেলা (পরে সাবেক পটুয়াখালী জেলাও) ছাড়া খুলনা বিভাগের সকল কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সকল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় থেকে যায় ঢাকা বিভাগের কলেজগুলি, সাবেক বরিশাল জেলার (সাবেক পটুয়াখালী সহ) কলেজগুলিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন থেকে যায়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্থাপিত, এর আওতাধীনে কোনো কলেজ নেই। এইবিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ছাড়া ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (ইউনিভারসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী) নামে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেশের সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ও শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়েছে। সিলেটে দেশের অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটা এগিয়ে গেছে। দেশের নবম বিশ্ববিদ্যালয় খুলনায় স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে।

৭.১২. দেশের ৪৫১টি কলেজে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। এর মধ্যে ৪৩টি কলেজে স্নাতক পর্যায়ে অনার্স কোর্সে এবং ১২টি কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

৭.১৩. বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার গড় হিসাবে ১:২০ থেকে ১:৩০। কলেজসমূহে এই হার ১:৬০। কোনো কোনো কলেজে কয়েকটি বিভাগে শিক্ষক ছাত্রের আনুপাতিক হার ১:১৫০ থেকে ১:২০০। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, সরকার কর্তৃক গঠিত এনাম কমিটির রিপোর্টে শিক্ষক ছাত্রের আদর্শ হার ১:৪৫ বলে নির্দেশ করা হয়েছিল।

উচ্চ শিক্ষার সমস্যাবলী

৭.১৪. আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা আজ প্রবল সংকটের সম্মুখীন। এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের সম্পর্ক ক্ষীণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য যেন চাকুরিজীবী তৈরি করা এবং এই শিক্ষালাভের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের সম্পর্ক শিথিল

হয়ে পড়ে। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ যেখানে নিরক্ষর সেখানে মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের প্রধান ধারার সঙ্গে ক্ষীণ সম্পর্কিত হলে সামাজিক বিবর্তনে অবদান রাখা তাদের পক্ষে দুরূহ হতে বাধ্য।

৭.১৫. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অবিরাম ছাত্র অসন্তোষের ফলে পড়াশোনা ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন দল ও উপদলের সংঘর্ষ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু সমাপন ও প্রসারের পক্ষে অনুকূল নয়। অপ্রিয় হলেও এ কথা সত্য যে, শিক্ষকদের মধ্যে মতানৈক্য, দলাদলি ইত্যাদি উচ্চশিক্ষার সুষ্ঠু গ্রহণ ও প্রসারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭.১৬. প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করেই নতুন নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং চালু কলেজগুলির সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অপরিকল্পিত এরূপ সম্প্রসারণে ফল হয়েছে উন্নত মান অর্জনের পরিবর্তে শিক্ষার মানের গুরুতর অবনতি। উচ্চশিক্ষার জন্য দেশে অনেক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হচ্ছে। এর অধিকাংশই অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাই শিক্ষার মান উন্নয়নে বা সামাজিক অগ্রগতিতে এরা কার্যকর অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে না।

৭.১৭. কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে শিক্ষকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। অল্প সংখ্যক শিক্ষকের পক্ষে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষাদান কার্যকর ও ফলপ্রসূভাবে সম্ভব হতে পারে না। সুতরাং উচ্চশিক্ষার মানের যে অবনতি হচ্ছে তাতে আশ্চর্যান্বিত হবার কিছু নেই।

৭.১৮. দেশের যে কলেজগুলিতে স্নাতক অনার্স ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে তার সবগুলিই সরকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মান তুলনামূলকভাবে ভাল হলেও স্নাতক অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কলেজের একই শিক্ষক অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান ছাড়াও উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) পর্যায়ে শিক্ষাদান করে থাকেন। উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক পাস, স্নাতক অনার্স ও স্নাতকোত্তর প্রথম পর্ব ও দ্বিতীয় পর্ব পর্যায়ে পাঠদান করলে কোনো শিক্ষকের পক্ষে পাঠদানের উন্নত মান বজায় রাখা সম্ভব নয়। সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগ ও চাকুরির নিয়ম-কানুন জটিল ও দীর্ঘসূত্রী বলে সংকট ক্রমেই তীব্ররূপ ধারণ করছে। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের ব্যাপারেও অবস্থা সন্তোষজনক নয়। এনাম কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের পর অধিকাংশ সরকারী কলেজে কোনো কোনো বিভাগে শিক্ষকের সংখ্যা অত্যন্ত অপর্যাপ্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণভাবে শিক্ষকের স্বল্পতাও বিশেষভাবে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার মান পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার মান। এর পাশাপাশি স্নাতক অনার্স ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে একই সময়ের মধ্যে একই পাঠ্যসূচী পাঠদান করা সত্ত্বেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকের সংখ্যা কয়েক গুণ বেশি। সেখানে কলেজগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বর্তমান হার আনুপাতিকভাবে খুবই অসন্তোষজনক।

৭.১৯. অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষার জন্য সহায়ক নয়। অপরিকল্পিতভাবে প্রতিষ্ঠিত অনেক কলেজে গ্রন্থাগারে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাব রয়েছে। পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি কলেজের সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার থাকা সত্ত্বেও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে অল্প সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ঐসব গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

৭.২০. উপযুক্ত সরঞ্জামসমৃদ্ধ ল্যাবরেটরি ছাড়াই অনেক কলেজে স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষাদান করা হয়। ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ মোটেই সন্তোষজনক নয়। এমনকি স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে বিজ্ঞানের নানা বিষয়ে পাঠ দেয়া হয় এমন সব কলেজেও যথাযথ ল্যাবরেটরি নেই। ফলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় নামমাত্র। শিক্ষার্থীদের না হয় কানসেপ্ট বা সারবস্তুর অনুধাবন, না হয় প্রয়োগ জ্ঞান। উচ্চশিক্ষা নিয়েও শিক্ষার্থীরা তাই দেশের বিজ্ঞান উন্নয়নে তেমন ভূমিকা রাখতে পারে না।

৭.২১. পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অসদুপায় অবলম্বন করার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উচ্চশিক্ষার সংকট আরো তীব্র ও ঘনীভূত হচ্ছে। কলেজগুলিতে এই সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। স্নাতক (পাস), স্নাতক (অনার্স) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়েও বিভিন্ন পরীক্ষার অবাধে নকল করা প্রায় নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

৭.২২. বর্তমানে স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্ন। এই শিক্ষা সামাজিক চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হবার ফলে উচ্চশিক্ষার মানের উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট প্রাপ্তরা কাজের অভাবে অনন্যোপায় হয়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভিড় জমাচ্ছে। তাদের অধিকাংশ কলা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। পৃথিবীর বিত্তশালী ও উন্নত দেশগুলিতেও এরূপ দৃষ্টান্ত মেলা ভার। এই ভিড়ের কারণে অন্যদিকে বহু নিচু-মানের কলেজের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এবং পুরাতন কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীর প্রচণ্ড ভিড়ের ফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে।

৭.২৩. আমাদের উচ্চশিক্ষার বর্তমান পদ্ধতি নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, এই পদ্ধতিতে জ্ঞান লাভের অন্যান্য উপায় বাদ দিয়ে মুখস্থ বিদ্যার উপর জোর দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর গুণগত উৎকর্ষ বিচারের বেলায় সাধারণত বহিঃপরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করা হয়। তৃতীয়ত, উচ্চশিক্ষা দ্বারা লাভবান হতে পারে এরূপ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ায় সাধারণভাবে শিক্ষার উচ্চমান বজায় রাখা সম্ভবপর হয় না। চতুর্থত, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহে খুব কম সংখ্যক শিক্ষক গবেষণাকর্মে রত থাকেন বলে গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাদানের কার্য সম্পর্কিত হয় না। শিক্ষার পরিবেশের অনুপযোগিতা শিক্ষার উপকরণের অভাব এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ও সম্পর্কের অসন্তোষজনক অবস্থা আদর্শ উচ্চশিক্ষার অন্তরায়। ফলে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান শোচনীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৭.২৪. উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের উচ্চশিক্ষার পুনর্বিন্যাস অত্যাবশ্যক। এ কারণে এবং উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনের যে ব্যবস্থাদি ও কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই অধ্যায়ের পরবর্তী অনুচ্ছেদসমূহে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

৭.২৫. সকল অবাঞ্ছিত ও প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার ফলপ্রসূ বিকাশে আমরা আশাবাদী। বিভিন্ন পর্যায়ে কার্যকর সংস্কার সাধন করলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে উচ্চ-শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব। এই লক্ষ্যে আমরা কয়েকটি সুপারিশ করি:

সুপারিশ

৭.২৬.(১) উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ক্রমানুয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এ কথা সত্যি যে, দেশের সকল উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের বিশ্বাস, দেশের শতকরা ১০ ভাগ উচ্চ বিদ্যালয়ে এই কোর্স প্রচলন করা যায়। দেশের ক্যাডেট কলেজ, আবাসিক মডেল স্কুল, ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এবং আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে একাদশ ও দ্বাদশ

শ্রেণীতে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হয়। উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে ক্রমে আরো বেশি সংখ্যক উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলন করা যেতে পারে।

একই সঙ্গে যে সকল কলেজে কেবল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদান করা হয় ঐসব প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের ব্যবস্থা করা যায়। দেশে ২৯১টি উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ রয়েছে। এর সবগুলিতেই ক্রমে মাধ্যমিক স্তর প্রচলন করা যেতে পারে।

উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স শিক্ষাদানের দায়িত্ব উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের উপর অর্পিত হলে কলেজে কেবল স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। কলেজ শিক্ষকগণ তখন কেবল উচ্চশিক্ষার পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন। আশা করা যায় যে, এতে তাঁদের শিক্ষাদানের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে।

(২) জ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের পরিধি প্রসারিত হয়েছে এবং প্রতিদিনই তা আরো প্রসারিত হচ্ছে। প্রচলিত দুই বছরে স্নাতক পাস কোর্সের পড়াশোনায় কোনো বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। যদিও শিক্ষার্থী ডিগ্রী লাভ করে, তবু এই স্বল্প বিদ্যা পরবর্তী জীবনে তার খুব কাজে আসে না। এই কারণে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি তাদের স্নাতক ডিগ্রী তিন বছর অথবা ততোধিক মেয়াদের করেছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশেও অনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে (সারণীদ্রষ্টব্য)।

এমনকি আমাদের দেশেও চিকিৎসা বিদ্যায় স্নাতক কোর্সে পাঁচ বছর এবং প্রকৌশল ও কৃষিতে স্নাতক কোর্সে চার বছর শিক্ষালাভ করতে হয়। কলা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য স্নাতক কোর্সের গুরুত্ব চিকিৎসা, প্রকৌশল বা কৃষিতে স্নাতক কোর্সের চেয়ে কম একথা ভাববার কোনো কারণ নেই।

সারণী

বিভিন্ন দেশে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার কাঠামো

দেশের নাম	প্রথম ডিগ্রী (সাধারণ) মেয়াদ কাল (বছরে)
ভারত	৩
শ্রীলংকা	৩
অস্ট্রেলিয়া	৩
ইন্দোনেশিয়া	৪
থাইল্যাণ্ড	৪
দঃ কোরিয়া	৪
জাপান	৩
ফিলিপাইন	৪
পাকিস্তান	৩
যুক্তরাষ্ট্র	৪
যুক্তরাজ্য	৩/৪
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৫/৬
চীন	৪/৫

(ক) আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (অনার্স) কোর্স উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের শতকরা হার প্রায় একশত। পক্ষান্তরে স্নাতক (পাস) কোর্সে শতকরা ত্রিশ জনের বেশি শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয় না। স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনটি বিষয়ের পাঠক্রম আয়ত্ত করতে না পারাও শিক্ষার্থীদের ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম কারণ। আবার পাস কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণ দেখা যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকুরিতে নিয়োগ, উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান, গবেষণার সুযোগ দেয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে স্নাতক (অনার্স) কোর্সে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পায়। আমাদের মধ্যে এ রকম ধারণা হয়ে গেছে যে, স্নাতক (পাস) কোর্সের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগত মান নিম্ন পর্যায়ের। সুতরাং কর্মক্ষেত্রে স্নাতক (পাস) ডিগ্রিধারীরা বৈষম্যমূলক ব্যবহার পেয়ে থাকে।

(খ) এই সব বিবেচনা করে আমরা স্নাতক পর্যায়ে দুই ধারার পরিবর্তে এক ধারার তিন বছর মেয়াদী কোর্স প্রচলনের সুপারিশ করি। এখনকার মত তিনটি বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীরা এই কোর্সে শিক্ষালাভ করবে। প্রতি বছর অনুষ্ঠেয় পরীক্ষা চূড়ান্ত পরীক্ষা বলে বিবেচিত হবে এবং কোনো শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বরের কম পেলে সেই বিষয়ে তাকে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে এবং দ্বিতীয় বছরের শেষে অনুষ্ঠেয় বাৎসরিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সময় ঐ বিষয়ের ঐ পত্রে তাকে পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ দেয়া হবে।

(গ) দ্বিতীয় বছরের শেষ পরীক্ষায় কোনো পত্রে অনুত্তীর্ণ হলে তৃতীয় বা শেষ বছরের শেষে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষায় তাকে ঐ বিষয়ের ঐ পত্রে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার সুযোগ দেয়া হবে। তৃতীয় বছরের শেষে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ফলের গড় নির্ণয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হবে। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা বা অনুশীলনী পরীক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। অনুশীলনী পরীক্ষাসমূহের ফল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ও চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সঙ্গে যোগ করা হবে।

(ঘ) বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে কয়েকটি ধারা রয়েছে: যেমন সনাতন পদ্ধতি, কোর্স পদ্ধতি, বাৎসরিক পদ্ধতি। আমরা বিভিন্ন ধারা লোপ করে একটি অভিন্ন পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে সুপারিশ করছি। স্নাতক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীকে অনধিক তিনটি বিষয়ে নিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। এই বিষয়গুলির কোর্সের পদ্ধতি ও প্রথার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেরাই নির্ধারণ করবে। কোনো বিষয়ে পরীক্ষার্থী শতকরা ৭০ অথবা ততোধিক নম্বর পেলে তাকে ঐ বিষয়ে অনার্স প্রাপ্ত বলে চিহ্নিত করা হবে।

(ঙ) বর্তমানে অনার্স পাঠরত শিক্ষার্থীদের সাবসিডিয়ারী বিষয়সমূহে কম গুরুত্ব দেয়া হয়। ঐ সব বিষয়ে কেবল পাশ নম্বর পেলেও অনার্সে খুব ভাল ফল করা সম্ভব। আমরা ঐ ব্যবস্থা লোপ করার পক্ষে মত পোষণ করি। আমরা এই সুপারিশ করি যে, স্নাতক পর্যায়ে পাঠ্য তিনটি বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিতে হবে।

(চ) স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শিক্ষার্থী যাতে কোনো পেশায় নিয়োজিত হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে স্নাতক পর্যায়ে তৃতীয় বছরে কোনো বিষয়ে ফলিত জ্ঞান লাভের সুযোগ দেয়ার জন্য বিষয়টি তার পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে। মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য পাঠরত শিক্ষার্থীগণ নিজেদের বিষয়সমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক বা একাধিক পত্রে ফলিত জ্ঞান লাভ করবে। আমরা মনে করি যে, এই বিষয়ে শিক্ষালাভ করলে স্নাতক পর্যায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর সে কোনো না কোনো কাজ খুঁজে পাবে।

(ছ) স্নাতক ডিগ্রীকে একটি প্রান্তিক ডিগ্রী বলে গণ্য করা হবে। স্নাতক পর্যায়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শিক্ষার্থীগণ নিজ নিজ রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে নিজেদের পেশা বেছে নেবে এবং প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মেয়াদের প্রশিক্ষণ নিয়ে সেই পেশার উপযুক্ত হয়ে উঠবে।

(জ) প্রস্তাবিত তিন বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী কোর্স নীতিগতভাবে গৃহীত হলেও কলেজগুলির বর্তমান অবস্থায় আমরা অবিলম্বে এই কোর্স প্রবর্তনের পক্ষে সুপারিশ করতে পারি না। কলেজগুলির বর্তমান অবস্থা এই কোর্স প্রবর্তনের জন্য অনুকূল নয়। তিন বছরের স্নাতক শ্রেণীতে শিক্ষাদানের পূর্বশর্ত হিসাবে কলেজগুলিকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলা দরকার। প্রথমেই শিক্ষক স্বল্পতার সমস্যা সমাধানে মনোযোগ দিতে হবে। বিভিন্ন কলেজে ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। শিক্ষক-ছাত্রের এই দুঃখজনক অনুপাত নিয়ে এই রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। তিন বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্সে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠক্রম বৃদ্ধি পাবে, তখন বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকদের সাহায্যে শিক্ষাদান করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এই কোর্স প্রবর্তনের আগে কলেজগুলিতে শিক্ষক সংখ্যা যাতে সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন।

(ঝ) আরো গুরুত্ব দেয়া দরকার শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের উপর। এই লক্ষ্যে তাঁদের উচ্চতর পড়াশোনা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর দেশেবিদেশে প্রকাশিত বই-পুস্তক, সাময়িকী ও জার্নাল যাতে তাঁদের নিকট সহজলভ্য হয় সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঞ) বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধনও তিন বছরের স্নাতক কোর্স প্রবর্তনের অন্যতম শর্ত। অধিকাংশ কলেজের গ্রন্থাগার উচ্চশিক্ষার যথোচিত চর্চার জন্য উপযুক্ত নয় বলে এই অধ্যায়ে মত প্রকাশ করা হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় পুস্তক, সাময়িকী, জার্নাল প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থাগারগুলি সমৃদ্ধ করার উপর আমরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি।

(ট) ল্যাবরেটরি সম্বন্ধেও আমরা একই মত পোষণ করি। তিন বছরের স্নাতক কোর্স প্রবর্তনের আগে বিভিন্ন কলেজের ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় ও আধুনিক সরঞ্জামের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এই কোর্সের উপযুক্ত শিক্ষাদান যাতে সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে ল্যাবরেটরি উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ সতর্ক ও সযত্ন দৃষ্টি রাখবেন।

(ঠ) উপরোক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর না করা পর্যন্ত স্নাতক পর্যায়ে দুই বছরের কোর্স অব্যাহত থাকবে। আমরা শিক্ষা সংকোচনের পক্ষে নই। আমরা মনে করি যে, এই সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে কলেজগুলিতে তিন বছর মেয়াদের স্নাতক কোর্স প্রবর্তন করে দুই ধারার পরিবর্তে একই রূপ ডিগ্রী চালু সম্ভব হবে। আগামী সাত থেকে দশ বছরের মধ্যে কলেজগুলি যাতে এই কোর্স প্রদান করতে পারে সেদিকে সরকার, তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের সচেতন ও তৎপর হতে হবে।

(৩) স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মাস্টার্স কোর্স দুই বছর মেয়াদী হবে। স্নাতক কোর্সে যারা গড়ে একটি নির্দিষ্ট নম্বর বা তার অধিক পাবে এবং যে বিষয়ে স্নাতককোত্তর শ্রেণীতে পাঠ করতে ইচ্ছুক সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট নম্বর পাবে তারাই মাস্টার্স শ্রেণীতে ভর্তির উপযুক্ত বলে গণ্য হবে।

(৪) মাস্টার্স পর্যায়ে যে সব শিক্ষার্থী কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে, যাদের অতীত পরীক্ষাসমূহের ফলাফল সন্তোষজনক, যাদের মধ্যে মৌলিকতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং যারা বিশেষ কোনো বিষয়ে গবেষণায় আগ্রহী সেই বিষয়ে তাদের দক্ষতা বিবেচনা করে তাদের এম,ফিল,পি-এইচ, ডি, ইত্যাদি উচ্চ ডিগ্রী লাভের সুযোগ দেয়া উচিত। কোনো বিষয়ের বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তাদের ফেলোশিপ দেয়া যেতে পারে। ডক্টরেট ডিগ্রীর প্রার্থীর যোগ্যতা বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিবেচনা করা উচিত। গবেষণার বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর

ধারণা, ঐ বিষয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাসমূহ সম্পর্কে তার জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পরীক্ষা করে তাকে পিএইচ,ডি, ইত্যাদি উচ্চ ডিগ্রী লাভের জন্য প্রস্তুতি নেবার অনুমতি দেয়া যায়।

(৫) দেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য আবেদন করে। উচ্চশিক্ষা লাভে আগ্রহী এই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্য ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষালাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান করা সম্ভব নয়। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই সব প্রতিষ্ঠানের ধারণ ক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবার ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে দেশে আরো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন।

(ক) আমরা সাবেক জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে কলেজকে এবং রাজধানী ও বিভাগীয় শহরগুলিতে এক বা একাধিক কলেজকে উন্নত করে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করি। এই মর্যাদা দেয়ার আগে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে শিক্ষকদের সংখ্যা, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষাদানে তাঁদের মান ও নিষ্ঠা এবং কলেজের গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, কলেজ ভবন, কলেজের এলাকা প্রভৃতি পরীক্ষা করে দেখা অত্যাবশ্যক হবে।

(খ) প্রস্তাবিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক বিভাগ থেকে মেধা, যোগ্যতা, পাঠদানে নিষ্ঠা, প্রকাশিত রচনা প্রভৃতি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষককে এম,ফিল,পি-এইচ, ডি, ইত্যাদি উচ্চ ডিগ্রীর জন্য গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। এভাবে অগ্রসর হলে যথাসময়ে এবং অপেক্ষাকৃত কম খরচে দেশে এম,ফিল,পি-এইচ,ডি, প্রভৃতি উচ্চতর ডিগ্রীপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং এতে বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় কাজ শুরু করতে পারবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও ডিগ্রী কলেজগুলিতে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হলে ছাত্র ভর্তির সমস্যার একটু সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। এতে উচ্চশিক্ষা আরো বিস্তার লাভ করবে।

(গ) প্রস্তাবিত এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিভাগ খোলার দরকার নেই। স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সম্পদের সহজলভ্যতা প্রভৃতি বিবেচনা করে বিভিন্ন বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেয়া যায়। সিলেট বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শুরু করার আগেই এ বিষয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকা দরকার। সিলেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে খনিবিদ্যা, চা শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে এবং খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বনশিল্পবিদ্যা, নৌপ্রযুক্তি প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণার ব্যবস্থা রাখা উচিত। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পুনর্গঠন করে উভয় স্তরেই সামাজিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানের মৌল বিষয় হিসাবে পদার্থ, রসায়ন, জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যায় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে। তবে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে কোনো কলেজ থাকবে না। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। নিজেদের শিক্ষার্থীদের জন্য তারা শিক্ষা ও পাঠক্রম প্রস্তুত, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদান

করতে পারবে। শিক্ষক নিয়োগ এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগ তারা খুলতে পারবে। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নের পর তারা উচ্চতর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের গবেষণার সুযোগ দিতে পারবে।

(৬) উচ্চশিক্ষা দানের কাজে নিয়োজিত কলেজগুলির অধিকাংশই বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। নানা রকম প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এইসব প্রতিষ্ঠান উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করছে। বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ দেয়া হলেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম এবং অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর বাবদ তেমন কোনো অনুদান দেয়া হয় না। ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু তাদের কার্যক্রম নানাভাবে বিঘ্নিত হয়। বেসরকারী কলেজসমূহের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা ক্রমান্বয়ে পুরোপুরিভাবে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হওয়া উচিত। এ স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম বিশেষ করে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য শিক্ষোপকরণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর জন্য সরকার থেকে অনুদান প্রদান করা উচিত। নতুবা এ স্তরের শিক্ষার উন্নয়নের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বাজেট বরাদ্দও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে প্রদত্ত সম্পদ খুবই অপ্রতুল।

(৭) বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

ভর্তি সমস্যা ও ভর্তির যোগ্যতা

৭.২৭. স্নাতক পর্যায় থেকে উচ্চশিক্ষার শুরু। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে ভর্তি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। ১৯৮৬ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ প্রায় আশি হাজার শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়েছে। যারা ভর্তি হতে পারে তাদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজেদের ইচ্ছা বা প্রবণতা অনুসারে বিষয় নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়। স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী অনার্স পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী কলেজে ভর্তি হয়। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ পাস কোর্সে অধ্যয়ন করে।

৭.২৮. সমাজের সকল স্তরের শিক্ষার্থীর জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হবে। তবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যাতে সুনির্বাচন হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। উচ্চশিক্ষালাভকারী ব্যক্তি নিজের পঠিত বিষয় সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক ধারণার অধিকারী হবে। উচ্চশিক্ষা যাতে তাকে একজন সত্যিকার শিক্ষিত ব্যক্তিতে পরিণত করে এবং একই সঙ্গে পেশাগত ক্ষেত্রে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

৭.২৯. **সুপারিশ**

(১) সাধারণত প্রার্থীর মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং ভর্তি পরীক্ষায় তার ফলাফল ভর্তির যোগ্যতার মাপকাঠি হবে। এও গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিভাবান, সক্ষম ও পরিশ্রমী বলে প্রমাণিত শিক্ষার্থীদের উচ্চতর পর্যায়ে অধ্যয়ন চালিয়ে যেতে দেয়া উচিত। প্রতিভাবান শিক্ষার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণী বৈষম্য থাকবে না। কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ভর্তির জন্য শিক্ষার্থীদের বাছাইর ব্যাপারে পরস্পর সমঝোতার মাধ্যমে উপায় নির্ধারণ করবে। শিক্ষার পূর্বতন পর্যায়ে শিক্ষার্থী যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে সে সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী (ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড) এবং তার ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক প্রবণতা সম্পর্কে শিক্ষকগণ যে সকল অভিমত প্রদান

করেছেন ভর্তির ব্যাপারে সেগুলিও বিবেচনা করে দেখা উচিত। কোনো এক বা একাধিক ধরনের উচ্চশিক্ষার প্রতি প্রার্থীর বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে কিনা সতর্কভাবে উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করা বাঞ্ছনীয়।

(২) উপরোক্ত বিষয়াবলীর সুষ্ঠু সমাধান হলেও আসল সমস্যা ভর্তির স্থান সংকুলান। দেশে প্রতি বছর বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তির জন্য আবেদন করে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চশিক্ষা লাভে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই আসন সংখ্যার স্বল্পতার জন্য ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়। আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে বিপুল সংখ্যক উচ্চশিক্ষালাভে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান সম্ভব নয়। প্রতি বছর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যাবার ফলে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। তাই সমস্যা সমাধানের পথ উদ্ভাবন করতে হবে। আমরা সুপারিশ করেছি যে, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ক্রমান্বয়ে উন্নতমানের উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পাঠদানের দায়িত্ব উন্নতমানের উচ্চ বিদ্যালয়সমূহের উপর অর্পিত হলে, কলেজে কেবল স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। কলেজ শিক্ষকগণ তখন কেবল উচ্চ শিক্ষার পাঠদানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন বলে আশা করা যায় যে, তাঁদের শিক্ষাদানের মান অপেক্ষাকৃত উন্নত হবে এবং কলেজে উচ্চশিক্ষালাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য স্থানও করা যাবে।

(৩) এর সাথে আমরা সাবেক জেলাগুলিতে একটি কলেজকে এবং রাজধানীতে ও বিভাগীয় শহরগুলিতে এক বা একাধিক কলেজকে উন্নত করে পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুপারিশও করেছি। বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রস্তাবিত উন্নতমানের কলেজগুলি (যেগুলি পর্যায়ক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে) এবং ডিগ্রী কলেজগুলিতে (উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাদান থেকে দায়মুক্ত) স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তির ব্যবস্থা করা হলে ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তির সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। এতে উচ্চশিক্ষা আরো বিস্তারলাভ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

অধ্যয়ন যোগ্য বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিবেচনা

৭.৩৩. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যাতে দীর্ঘ সময়ের জন্য অপরিবর্তিত না থাকে সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করা খুবই প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে সর্বদা তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীসমূহ পুনর্বিবেচনা করে দেখতে হবে, যাতে আমাদের শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মিটাতে পারে, বুদ্ধিগত জীবনের ক্ষেত্রে আমাদের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং বিশ্বের সর্বত্র আমাদের শিক্ষার সুনাম হতে পারে। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে এমন ধারার পাঠ্যসূচী তৈরি করবে যা সময়োপযোগী এবং সামাজিক চাহিদা মিটাতে সমর্থ। আরো বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যাতে পাঠসূচীতে আমাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়। উচ্চশিক্ষাকালীন অবস্থায় যেন পরিষ্কার বোঝা যায় আমাদের বর্তমান অবস্থা কি এবং কি করলে আমাদের আরো সমৃদ্ধি হতে পারে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগে তাদের ব্যবহার, নিজেদের চাহিদা অনুসারে বিদেশী প্রযুক্তি, প্রয়োগ ইত্যাদি ধরনের ব্যবস্থা পাঠ্যসূচীতে থাকা দরকার।

৭.৩১. প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভূ-তত্ত্ব, সমুদ্র প্রাণীতত্ত্ব এবং খনিতত্ত্বের অধ্যয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। তেমনিভাবে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষভাবে পল্লীর অর্থনীতি ও কৃষি অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সমস্যাবলীর সম্যক পর্যালোচনা করতে হবে। এ ছাড়াও শিল্প ব্যাপারে সৌরশক্তি, বাত্যাশক্তি ও মহাসাগরীয় শক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা অনুসন্ধান করতে হবে। বর্তমানে এই দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে অবশ্যই সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের যথাযথভাবে অবহিত থাকতে হবে। সংবাদপত্র, বেতার, চলচ্চিত্র ও গণসংযোগের সকল ক্ষেত্রে কাজের জন্য এমন ধরনের লোকের প্রয়োজন যারা কেবল সংবাদ সংগ্রহ ও পরিবেশনের নৈপুণ্যের অধিকারী হবে না, উপরন্তু ব্যাপক সাধারণ শিক্ষার অধিকারীও হবে। এছাড়া গণসংযোগ বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরও আমাদের প্রয়োজন। এসব কারণে যোগাযোগ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পৃথক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের ব্যাপারে প্রভূত সমর্থন প্রদান করা উচিত হবে।

৭.৩২. আমাদের প্রায়োগিক দিকে দৃষ্টি দেয়া যেমন দরকার, উচ্চশিক্ষায় তেমন তাত্ত্বিক দিকেও বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যাতে জ্ঞান আহরণে ও বিতরণে আমরা বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে না পড়ি। মৌলিক, তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক শিক্ষার সমন্বয়েই উচ্চশিক্ষা জীবিকা অর্জনে সহায়ক হবে। অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টি, জ্ঞানের পরিধি বিস্তার, মানব মনে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা সৃষ্টি এবং স্রষ্টা সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রভৃতি তৈরি উচ্চশিক্ষার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য এবং আমাদের সেদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষায় প্রকৌশল যেমন দরকার, তেমনিই দরকার দর্শনশাস্ত্র। জ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা ও সম্মুখ অভিযান বিশ্ববিদ্যালয়েই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই।

৭.৩৩. আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নত মানের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষাপ্রাপ্ত বহু ডিগ্রীধারী ব্যক্তির প্রয়োজন হবে। এর চাহিদা মিটাবার জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন। কেবলমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স রয়েছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারের চাহিদা মিটাবার জন্য দেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ডিগ্রী-উত্তর ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

৭.৩৪. বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যথাযথভাবে আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলা শিক্ষাদান এবং এর বিশেষ অনুশীলন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাতীয় ভাষা বাংলা শিক্ষাদানের ব্যাপারে উন্নততর শিক্ষা পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং এ সম্পর্কে অধিকতর গবেষণা পরিচালনা উচিত। প্রধান প্রধান আধুনিক ভাষা অধ্যয়নের জন্য আধুনিক পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করারও প্রয়োজন রয়েছে।

সেশনজট

৭.৩৫. দেশে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে সেশন জট একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা-স্বরূপ। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্সগুলি সময়মত সমাপন করে পরীক্ষা সময়মত অনুষ্ঠিত না হওয়ার দরুন এবং প্রায় প্রতিটি পরীক্ষা বারবার পিছিয়ে যাবার কারণেই এই সেশন জটের উদ্ভব। আবার এ দুটি কারণের মূলে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অশান্ত পরিবেশ; তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় উপর্যুপরি বন্ধ হয়ে যাওয়া, ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা পিছানোর অহরহ দাবি। তদুপরি ডিগ্রী পরীক্ষার ফল প্রকাশে বিলম্ব ইত্যাদি। দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বছরগুলিতে অবস্থার চাপে কর্তৃপক্ষকে কোনো কোনো পরীক্ষা সপ্তম বারের মতও পিছিয়ে দিতে হয়েছে। আর তিন চার বার পরীক্ষা পিছানোর ব্যাপার খুবই মামুলী। এ সব কারণে পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হতে পারছেনা। অন্যদিকে প্রতি বছরই নতুন সেশনের ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। অথচ পূর্বের ছাত্রছাত্রীদের কোর্স শেষ হচ্ছেনা। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই সেশন জটের মত সমস্যা দেখা দিয়েছে।

৭.৩৬. ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়ে সময়মত কোর্স সমাপন করে পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে গেলে এই সমস্যা দেখা দেয়ার কথা নয়। ছাত্র ভর্তির যেমন একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, কোর্স শেষ করার ও পরীক্ষারও তেমনি একটি সুনির্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হবে এবং যথা সময়ে কোর্স সমাপন করে পরীক্ষা দিয়ে শিক্ষাঙ্গন ত্যাগ করবে এটাই রীতি। এই রীতি বা নিয়মে বিঘ্ন ঘটালে, সেশন জটের সমস্যা দেখা দেয়া বিচিত্র নয়। দেশের প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই এই নিয়মের হেরফের হচ্ছে বলে আজ সেশন জট নিয়ে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, তথা সকলকেই কম বেশি সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। শিক্ষাকাল অহেতুক প্রলম্বিত হওয়া এক দিকে ছাত্ররা যেমন চাকুরির বয়স নিয়ে উদ্বিগ্ন, তেমনি অভিভাবকেরা খরচের বোঝা টানতে টানতে অনেকটা হতাশাগ্রস্ত। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে দেশ ও জাতির জন্য তা অকল্যাণকর। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ছাত্রছাত্রীরা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া চুকিয়ে এরা যদি সময় মত কর্মজীবনে প্রবেশ করে তা হলেই তাদের ও দেশের মঙ্গল। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকলের স্বার্থেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সময়মত ভর্তি ও কোর্স সমাপন এবং নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠান ও ফলাফল প্রকাশের ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট করা খুবই দরকার। প্রয়োজনে কঠোর হস্তে এ ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দেশের ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য যা মঙ্গল তা সমস্ত চাপের মুখেও বাস্তবায়িত করতে হবে।

৭.৩৭. শিক্ষক যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোর্স সমাপন করার ব্যাপারে সহায়তা করেন এবং সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে তা হস্তান্তর করার বেলায় আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস সেশন জট হবার সম্ভাবনা অনেক হ্রাস পাবে। যেখানে শিক্ষকের সংখ্যা কম, সেখানে শিক্ষক নিয়োগ অবিলম্বে করতে হবে। কেননা শিক্ষকের অভাবে কোর্স শেষ হওয়া খুবই কঠিন। অতএব আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকট দূরীভূত হোক। একটি উন্নয়নশীল জাতি হিসাবে আমাদের সময়ের মূল্য অবশ্যই দেয়া উচিত। আর সেজন্যই চাই সময়ের কাজ সময়মত হোক।

৭.৩৮. বর্তমান অবস্থা থেকে বের হতে হলে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের শিক্ষক ও ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে বসে শিফট প্রথা চালু করে একই সেশনে একাধিক পরীক্ষা নিতে হবে। এটাকে জরুরী ভিত্তিতে দেখতে হবে, গতানুগতিকভাবে নয়। প্রয়োজনে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৭.৩৯. উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য কর্তৃপক্ষকে দৃঢ় সংকল্প, অনমনীয়তা ও কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে এবং রীতিমত ছাত্র শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক পরিষদ, শিক্ষকদের সমিতি এবং ছাত্রদের প্রতিনিধি সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে দৃঢ় মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চললে কমিশন মনে করে যে সেশন জট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে এমন সেশন জট হবেনা।

৭.৪০. পূর্বেই বলা হয়েছে যে, যেহেতু পরীক্ষা পিছানোর মূলে রাজনৈতিক কারণও রয়েছে সেহেতু এ কথা বলতেই হবে যে রাজনৈতিক দলগুলির অকুণ্ঠিত সমর্থন অত্যন্ত আবশ্যক। কমিশন আশা করে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে এবং সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই দুষ্ট ব্যাধি দূর করতে এগিয়ে আসবে।

গবেষণা

৭.৪১. গবেষণা উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অন্যতম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। গবেষণা শিক্ষককে আধুনিক বিদ্যায় পারদর্শী করে। গবেষণার মাধ্যমে শুধু জ্ঞানের পরিধিই বর্ধিত হয় না বরং শিক্ষাদান কার্যেও দক্ষতা জন্মে। প্রধানত গবেষণার মাধ্যমে শিক্ষকমণ্ডলী তাঁদের সৃজনশীল ক্ষমতা ও মানসিক সজীবতা বজায় রাখতে সক্ষম হন। শিক্ষার্থীদের শক্তি ও প্রেরণা-দানে সক্ষম করার ব্যাপারে গবেষণার মূল্য রয়েছে। কোনো দেশ শক্তিশালী ও প্রগতিশীল হতে চাইলে সে দেশকে অপরিহার্য রূপে মৌলিক ও ফলিত গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতেই হবে।

৭.৪২. শিক্ষাদান ও গবেষণা উভয় কার্যই প্রাধান্য লাভ করতে পারে বিভাগসমূহকে এরূপ শক্তিশালী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে ডিগ্রী কলেজগুলিতেও বিশেষ করে যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর কোর্স চলে, সেখানে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ- সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পি, এইচ, ডি, কার্যক্রম

৭.৪৩. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে অধীত প্রত্যেক বিষয় ও ক্ষেত্রের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া উচিত, তথাপি নানা কারণে বিশেষ করে আর্থিক অপ্রতুলতা হেতু সবগুলি বিষয়ে সমভাবে সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে আলোচনা করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে বিশেষ বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ কোনো ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে তাতে পি-এইচ, ডির জন্য গবেষণা চালাতে পারে এমনভাবে সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। এটা নতুন কোনো প্রস্তাব নয়, সেণ্টার অব একসেলেন্স বলে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলি বিভাগকে সুসজ্জিত করা হয়েছে—বিশেষ করে বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যেখানে ল্যাবরেটরি ইকুইপমেন্ট খুবই দামী এবং তত অর্থ গরীব দেশ জোগাড় করতে পারে না। তাছাড়া কোনো বিষয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগকে সুসজ্জিত করলে, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ বিভাগের গবেষণার জন্য এই বিভাগের সাহায্য নিতে পারে বা অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা এখানে এসে গবেষণা করতে পারবে। উচ্চশিক্ষার জন্য পি-এইচ, ডি ডিগ্রী আমাদের দিতেই হবে যাতে ঐ ডিগ্রীর জন্য বিদেশে যেতে না হয়। বিদেশে অবশ্যই যাবে তবে সেটা পি-এইচ, ডি,-উত্তর শিক্ষার জন্য বা প্রশিক্ষণের জন্য বা সমন্বিত গবেষণার জন্য।

৭.৪৪. এম, এ, এম, এস-সি এবং এম, কম, কোর্সে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা গবেষণা কাজের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের গবেষণা কার্যে নিয়োগের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। এম,এ, এম,এস-সি এবং এম কম, ডিগ্রীধারী ছাত্রদের মধ্যে যারা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে এবং যাদের মৌলিকতার প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাদের ফেলোশিপ এবং যারা পি-এইচ,ডি ডিগ্রী পাওয়ার যোগ্যতা প্রদর্শন করেছে, তাদের উর্ধ্বতন ফেলোশিপ প্রদান করা উচিত। মেধা ও যোগ্যতার স্বীকৃতি লাভ করেছে এমন প্রতিভাসম্পন্ন ও প্রতিশ্রুতিশীল এম,এ,এম, কম, এম,এস-সি, এবং পি-এইচ,ডি ডিগ্রী-ধারীকে যাতে ফেলোশিপ প্রদান করা সম্ভব হয়, সেজন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ফেলোশিপ ও উর্ধ্বতন ফেলোশিপের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তাই কমিশন সুপারিশ করে যে, অনতিবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এই দিকে দৃষ্টি দিবে।

পরীক্ষা পদ্ধতি

৭.৪৫. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির বিপুল সমালোচনা হচ্ছে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য পরীক্ষা পদ্ধতি দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষার পাশ করা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা গ্রহণ কর্মশিক্ষা ও গবেষণাকে বিপদজনকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

৭.৪৬. এ ছাড়া বর্তমানে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীরা ব্যস্ত থাকে। সুতরাং শিক্ষকদের অধ্যাপনা ভাষণে যোগদানের জন্য অথবা ব্যক্তিগতভাবে বা টিউটোরিয়াল অধিবেশনে শিক্ষকদের নির্দেশলাভের জন্য তাদের মনে কোনো আশু তাগিদ থাকে না। তাই সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার পরিপূরক হিসাবে আন্তঃ পরীক্ষার ব্যবস্থা এবং সে আন্তঃপরীক্ষার গুরুত্ব প্রদান করা উচিত।

৭.৪৭. অবশ্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজের ও অধিভুক্ত কলেজসমূহের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করবে। পরীক্ষা, পরীক্ষার পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে এই রিপোর্টের 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়

৭.৪৮. বর্তমানে বাংলাদেশে ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা ২৯১ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা এক লাখের উপর। আর ডিগ্রী কলেজের সংখ্যা ৪৫১ এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছয় লাখের মত। ডিগ্রী কলেজসমূহের সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগগুলিও সংযুক্ত রয়েছে। মোটামুটিভাবে ডিগ্রী কলেজসমূহের ছয় লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ শিক্ষার্থী ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগগুলিতে এবং আড়াই লাখের মত শিক্ষার্থী ডিগ্রী ক্লাসগুলিতে লেখাপড়া করে। অর্থাৎ দেশে ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী মিলে ৭৪২টি কলেজ রয়েছে--যাতে প্রায় সাত লাখের মত শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে--তার মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সাড়ে চার লাখের উপর শিক্ষার্থী ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও ডিগ্রী কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে লেখাপড়া করে এবং এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ আড়াই লাখের মত শিক্ষার্থী ডিগ্রী ক্লাসগুলিতে অধ্যয়ন করে। ২৯১টি ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড--ঢাকা, রাজশাহী কুমিল্লা ও যশোরের আওতাধীন এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত। তদুপরি ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট বিভাগ উপরোক্ত শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত। ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী বিভাগগুলি ঢাকা, রাজশাহী চট্টগ্রাম--এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন এবং তাদের দ্বারা অনুমোদিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রসঙ্গত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কোনো অধিভুক্ত কলেজ নেই।

৭.৪৯. সাধারণত ইণ্টারমিডিয়েট কলেজগুলির অধিকাংশই ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের প্রচেষ্টায় থাকে। তার চেয়েও বেশি সংখ্যক নতুন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ শিক্ষা বোর্ড অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এই পরিস্থিতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষাবোর্ডসমূহের জন্য বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করছে।

৭.৫০. ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত যে, তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়াছে। অনুমোদিত কলেজগুলিতে ছাত্র

ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, পরীক্ষা পরিচালনা এবং তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ফলে কলেজগুলিতে শিক্ষার মানের দ্রুত অবনতি ঘটছে এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে আজ যে অসন্তুষ্টি বিরাজমান তার একটি বিশেষ কারণ।

৭.৫১. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদানের সঙ্গে তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষাদানের কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কলেজগুলিকে অনুমোদন দান এবং অনুমোদন সম্প্রসারণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কলেজগুলিতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং অনুমোদিত কলেজগুলির চূড়ান্ত পরীক্ষা পরিচালনা করে। অনুমোদিত কলেজগুলির চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা, প্রধান পরীক্ষকরূপে কাজ করা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে হয় বলে তাঁদের গবেষণা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের কাজের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক কলেজগুলির বর্তমান পরিদর্শন ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। বছরের পর বছর অনুমোদিত কলেজগুলির সরেজমিনে পরিদর্শন হয় না। এমন কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থারও প্রবর্তন হয়নি যার ফলে কলেজগুলির মান প্রতি বছর অন্তত একবার করে যাচাই করা যায়। প্রতি বছর কলেজগুলির চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফল কলেজের শিক্ষার মানের মাপকাঠি হিসাবে গণ্য করা যায় কিনা গত কয়েক বছরে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অনেকের মনে গভীর সন্দেহের উদ্রেক করেছে। সুতরাং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের অবনতি প্রতিরোধ করতে পারছে না। উপরন্তু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দকে কলেজের চূড়ান্ত পরীক্ষা ইত্যাদির ব্যাপারে নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে হয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের গবেষণা ও শিক্ষাদানের কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

৭.৫২. এই পরিস্থিতিতে আমাদের অভিমত এই যে, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের অনুমোদিত কলেজগুলিকে অবিভুক্ত কলেজ হিসাবে সংযুক্ত রেখে কলেজগুলির সমস্যা যথাযথ ভাবে দেখা ও সমাধান করা সম্ভব হবে না। সুতরাং দেশের সাধারণ কলেজগুলির অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান, পরীক্ষা পরিচালনা, ডিগ্রী প্রদান, কলেজ শিক্ষার জাতীয় মান রক্ষা ইত্যাদির দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন।

৭.৫৩. এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন যে, অনুমোদিত কলেজগুলিকে বর্তমানের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে একেবারে বিযুক্ত না করে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদালয়সমূহের সম্প্রসারণ করে তাদের এবং কলেজগুলির সমস্যাবলী সমাধান করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। তাঁদের মতে বর্তমানের প্রত্যেকটি শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন অতিরিক্ত প্রো-ভাইস-চান্সেলরের ব্যবস্থা করে অনুমোদিত কলেজগুলির অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা ও ডিগ্রী প্রদান, আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা সঙ্গত হবে। এই প্রস্তাবে সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশই উৎসাহবোধ করেন না। তাঁরা মনে করেন যে, বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে সব সমস্যায় জড়িত ও জর্জরিত তাতে উপরোক্ত ভাবে তাদের সম্প্রসারণ করে একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে তারা কলেজগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ ও তাদের সমস্যার সমাধান এবং শিক্ষার মান রক্ষার ব্যাপারে অবদান রাখতে পারবে না। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণই সার হবে।

৭.৫৪ আবার কেউ কেউ সুপারিশ করতে চান যে, বর্তমানের অনুমোদিত কলেজগুলির মধ্যে উন্নত মানের কলেজগুলির অনেকগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সংযুক্ত কলেজ হিসাবে রেখে বাকি অধিকাংশ কলেজের অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির

জন্য পৃথক ব্যবস্থার করা যায়। এ প্রস্তাব গৃহীত হলে বর্তমানের শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা অবশ্য কমে যায়, কিন্তু তাতে তাদের ও যে সকল কলেজ তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে তাদের এবং অন্যান্য কলেজে যে সকল সমস্যা সেগুলির সমাধান হবে না।

৭.৫৫· অন্যদিকে যাঁরা বর্তমানের একেবারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কলেজগুলিকে বিযুক্ত করার ব্যবস্থার পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, কলেজগুলির অনুমোদন, নিয়ন্ত্রণ, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানের জন্য সুষ্ঠু অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত হবেনা, 'কলেজ শিক্ষা কাউন্সিল'—জাতীয় কোনো সংস্থা স্থাপন করে উপরোক্ত দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করা যায়। তাঁদের মত এই যে, শিক্ষাদান ও গবেষণা ব্যতিরেকে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা করা হবে সে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শিক্ষার জাতীয় মান রক্ষার ব্যাপারে বিশেষ অবদান রাখতে পারবেনা। অপর পক্ষে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশেরই ধারণা, 'কলেজ শিক্ষা কাউন্সিল'—জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ডিগ্রী যথাযথ মূল্য ও মর্যাদা পাবেনা। আমাদের মত দেশের পরিস্থিতিতে এবং শিক্ষার মান মর্যাদা নির্ধারণের আলোকে উপরোক্ত ধারণাকে একেবারে অমূলক বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

৭.৫৬· আমরা বর্তমানের সাধারণ কলেজগুলির সকল দিক বিশদ ও বিস্তারিত ভাবে পর্যালোচনা ও বিবেচনা করেছি। যে দিক থেকেই বিবেচনা করা হোকনা কেন, দেশে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। যত সত্বর অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায় ততই উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য মঙ্গল হবে।

৭.৫৭· অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এই উপমহাদেশে নতুন কোনো পদক্ষেপ নয়। বস্তুত পক্ষে এই উপমহাদেশের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়—কলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ—অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপিত হয়েছিল। অর্ধ শতাব্দীরও বেশি অতিবাহিত হওয়ার পরে এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরাসরি শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করা হয়।

৭.৫৮· বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) প্রায় দেড় দশক আগে দেশে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জোর সুপারিশ করেছিল। তখন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, বাংলাদেশ আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড, ভাইস-চ্যান্সেলরদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সঙ্গে একমত ছিল।

৭.৫৯· উপরের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এবং ভৌগোলিক ও যোগাযোগ অবস্থা, ডিগ্রী কলেজ ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রভৃতি বিবেচনা করে আমাদের সুপারিশ হল যে, অনতিবিলম্বে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন অতীব প্রয়োজন।

৭.৬০· অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলি এবং তাদের ও শিক্ষার্থীদের সমস্যাবলী সমাধানের জন্য সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ফলে তাদের আওতাভুক্ত কলেজগুলিতে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী, পঠন ও পরীক্ষা পদ্ধতির মান উন্নয়ন সম্ভব হবে। কলেজগুলির কর্তৃপক্ষ অধিকতর স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গভীরভাবে শিক্ষাদানের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবে বলে আমরা আশা রাখি। এতে শিক্ষার মান বাড়বে।

৭.৬১. আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যেমন আবাসিক ব্যবস্থা, শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জ্ঞানার্জন, যৌথ বা সমষ্টিগত জীবন-যাত্রা ইত্যাদি ব্যবস্থা অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কলেজগুলিতে করা ও রাখা সবক্ষেত্রে সম্ভব নয়। আবার দেশের জন্য যতগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন তার সবগুলি আবসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্থাপন করা সম্ভব নয়। অপর পক্ষে বর্তমানে একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ যে জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন, এ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠা করলেও সে সমস্যার সমাধান হবেনা। এর পরিপ্রেক্ষিতে মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে দেশের সকল অঞ্চলের ও অংশের শিক্ষার্থীদের আবাসিক শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে লেখাপড়া করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অবশিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ও অংশের কলেজগুলিতে ডিগ্রী কোর্সের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে। উপরের ব্যবস্থায় অধুনা একই সঙ্গে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শুধু শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করে তাদের অনুমোদিত কলেজগুলিকে প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা যায়।

৭.৬২. অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের আরো অবনতি ঘটবে বলে যে আশঙ্কা কোনো কোনো মহল থেকে করা হয়, তার সঙ্গত কারণ নেই। বর্তমানের একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অনুরূপ অনমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেট, একাডেমিক কাউন্সিল, এফিলিয়েশন বোর্ড ও কমিটিসমূহ, ডীনদের অফিস, কারিকুলাম ও সিলেবাস বোর্ড, তার অফিস ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটিসমূহ, একজামিনেশন বোর্ড ও কমিটিসমূহ, ডিসিপ্লিন বোর্ড ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের প্রয়োজনীয় পরিষদ, বোর্ড ও কমিটি অবশ্যই থাকবে। এদের সংগঠনে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আওতাধীন কলেজগুলির প্রতিনিধি যেমন থাকবে তেমনি অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিশেষ করে শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি, বাইরে থেকে উপযুক্ত সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং সরকারের প্রতিনিধি এই সকল পরিষদ, বোর্ড ও কমিটিগুলিতে থাকবে। অতএব একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজগুলির শিক্ষার মানের অবনতি ঘটার সম্ভাবনা নেই। অথচ প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন অনুমোদিত কলেজের শিক্ষা মানের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি এরূপ আশঙ্কার কোনো ভিত্তি নেই। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকবে না সত্যি, কিন্তু বর্তমানে একাধারে শিক্ষাদান ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সরাসরি শিক্ষাদান থেকে অনুমোদিত কলেজগুলির লাভবান ও প্রভাবান্বিত হওয়ার কোনো ব্যবস্থাও নেই। অপরদিকে প্রস্তাবিত অনমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল কর্মকাণ্ড ও প্রচেষ্টা অনুমোদিত কলেজগুলির জন্য বজায় থাকবে বিধায় কলেজগুলির মান উন্নত তথা শিক্ষার মান উন্নত হবে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায়।

৭.৬৩. প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পুর্ন হবে আশা করা যায়। এর আয়ের উৎস হবে অনুমোদন ফি, রেজিস্ট্রেশন ফি, পরীক্ষার ফি, সার্টিফিকেট ফি, মার্ক শীট ফি ধরনের ফি এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদেয় অন্যান্য ফি। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন অনুমোদিত সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলি প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে আসবে। সুতরাং এ সকল কলেজ থেকে যা আয় হয় তা অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় পাবে। তদুপরি ক্রমাগত শিক্ষার্থীর ও কলেজের সংখ্যা বেড়ে যাবে বলে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ও বেড়ে যাবে। সুতরাং সঙ্গতভাবে আশা করা যায় যে, প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় নিজের খরচ মোটামুটিভাবে নিজেই বহন করতে পারবে। এই বিষয়ে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৭·৬৪ প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবেঃ

(ক) দেশের সাধারণ ডিগ্রী কলেজের অনুমোদন দান করে নিজের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণে আনা, যাতে দেশের কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন হয়;

(খ) এলাকাধীন শিক্ষায়তনগুলিতে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষাক্রম/পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করা;

(গ) আওতাধীন শিক্ষায়তনগুলির সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা যাতে শিক্ষায়তনগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা করা যায় এবং শিক্ষার যথোপযুক্ত মান বজায় থাকে;

(ঘ) আওতাভুক্ত শিক্ষায়তনের শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত পরীক্ষা পরিচালনা করা, মূল্যায়ন করা এবং পরীক্ষা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ইত্যাদি প্রদান করা;

(ঙ) নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষায়তনগুলিতে যাতে যথোপযুক্ত শিক্ষার মান বজায় থাকে সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং সর্বোপরি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে তার আওতাধীন শিক্ষায়তনগুলির শিক্ষাদানের মানের ক্রমোন্নতি হয়।

৭·৬৫ সুপারিশ

(১) অনতিবিলম্বে দেশে দুটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে প্রথম ডিগ্রী শিক্ষাদানকারী সকল সাধারণ কলেজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণে আনা প্রয়োজন।

(২) দেশের আইন শিক্ষা, শিক্ষক-শিক্ষণ ও চিকিৎসা শিক্ষা এই অনুমোদনকারী বিশ্ব-বিদ্যালয় দুটির আওতায় ও নিয়ন্ত্রণে আসবে না। (প্রকৌশল শিক্ষার জন্য পৃথক ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়েছে)।

(৩) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট/স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বর্তমান শিক্ষা-দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। দেশে বর্তমানে ৪৩টি কলেজে স্নাতক অনার্স কোর্সে এবং ১২টি কলেজে মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা এই রিপোর্টে তিন বছরের প্রথম ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনের সুপারিশ করেছি। সেই সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত স্নাতক অনার্স কোর্স পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট/স্নাতকোত্তর কোর্সের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা বর্তমানের শিক্ষাদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন ও নিয়ন্ত্রণে থাকবে। বলা বাহুল্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাইরে যে সকল কলেজে উপ-রোক্ত কোর্সের ব্যবস্থা রয়েছে তার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ক্রম ও পাঠ্যসূচীর ন্যায় একই রকম ও অভিন্ন থাকবে। পরীক্ষাও একই পদ্ধতি ও নিয়মে একই সময়ে এবং অভিন্ন প্রশ্নপত্রে গৃহীত হবে। এজন্য কোনো কলেজ যদি প্রয়োজনীয় শর্তাদি পালনে অপারগ হয় তা হলে সে কলেজে এসব কোর্সে শিক্ষাদানের অনুমোদন দেয়া সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত হবেনা।

(৪) প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের পদ অলঙ্কৃত করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা হবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে চ্যান্সেলর রূপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ও ক্ষমতার ন্যায়।

(৫) প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক অফিসার (প্রিন্সিপাল একজিকিউটিভ এণ্ড একাডেমিক অফিসার) রূপে একজন ভাইস-চ্যান্সেলর থাকবেন। তিনি হবেন প্রখ্যাত এবং উচ্চ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষাবিদ বা শিক্ষা প্রশাসক। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি) ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ এবং তাঁর চাকুরির শর্তাদি, বেতন ইত্যাদি নির্ধারণ করবেন।

(৬) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার, কন্ট্রোলার অফ একজামিনেশন্স, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইন্সপেক্টর অফ কলেজেস, কারিকুলাম ও পাঠ্যসূচী বিশেষজ্ঞ, মূল্যায়ন কর্মকর্তা প্রভৃতি থাকবেন। কলা, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডীন রাখতে হবে। বিভিন্ন বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত ইন্সপেক্টর নিযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। এটি বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, ডীন ও ইন্সপেক্টর পদসমূহে নিয়োগের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য বিষয়ে উৎকর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার মত হতে হবে। অর্থাৎ সরাসরি শিক্ষাদান করার উপযুক্ততা ও যোগ্যতাও তাঁদের থাকতে হবে। শুধু প্রশাসনিক যোগ্যতাসম্পন্ন হলে চলবে না।

(৭) প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিণ্ডিকেট, অর্থ কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডীনদের অফিস, উপযুক্ত সংখ্যক কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটি, পরীক্ষা কমিটি, ডিসিপ্লিন বোর্ড, এফিলিয়েশন বোর্ড ও কমিটি ইত্যাদি পরিষদ, বোর্ড ও কমিটি থাকবে। এসব পরিষদ, বোর্ড ও কমিটি সংগঠনে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, অনুমোদিত কলেজসমূহের প্রতিনিধি, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের (বিশেষ করে শিক্ষাদানকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের) প্রতিনিধি, সরকারের প্রতিনিধি, বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ এবং প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ থাকবেন। এগুলি এমনভাবে গঠিত হবে যাতে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, বিশ্ববিদ্যা-লয়ের আওতাধীন কলেজগুলির শিক্ষার মান উন্নত করা এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কাজে সহায়ক হতে পারে।

(৮) প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে 'কলেজ শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়' (ইউ-নিভারসিটি ফর কলেজ এডুকেশন) নামে অভিহিত করা যায়। এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানের নাম যোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ সম্পন্ন করতে হবে।

(৯) প্রস্তাবিত অনুমোদনকারী দুটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পাঁচ বছর পরে মূল্যায়ন করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় ভবিষ্যতে আরো অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে কিনা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

৭.৬৬. ইসলামী শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ধারা এদেশে সুপ্রাচীন। এই ধারাটির ক্রমোত্তরণের মধ্য দিয়েই ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৮৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি অনুষদ কাজ করছে—(১) শরীয়াহ্ ও ইসলামী শিক্ষা এবং (২) কলা ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদ। প্রথমোক্ত অনুষদের অধীনে (ক) আল-কোরআন ও উলুমুল কোরআন এবং (খ) উলুমুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়াহ বিভাগ এবং দ্বিতীয়টির অধীনে (ক) ব্যবস্থাপনা ও (খ) হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ—সর্বমোট এই চারটি বিভাগ চালু রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ছাত্র সংখ্যা ৭০০। বাংলাদেশে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এখানে ইসলাম ধর্মীয় বিষয়গুলির সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যেই 'শরীয়াহ্' অনুষদে ইংরেজি ভাষা, লোক প্রশাসন ও অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ও শিক্ষাদান করা হয়। অন্যদিকে, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগেও সম্মান ও সাবসিডিয়ারী কোর্সে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে মৌলিক ইসলামী শিক্ষা ও আরবী ভাষা শিক্ষা দান করা হয়।

৭.৬৭. সুপারিশ

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে ইসলাম ধর্মীয় বিষয়াবলীর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের অন্যান্য শাখারও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সমীচীন। বিশেষ করে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় অনুষদ ও বিভাগ অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

(২) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রখ্যাত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে কার্যকর সংযোগ রক্ষা করে ধর্মীয় বিষয়ে নবতর গবেষণায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

(৩) দেশের মাদ্রাসা শিক্ষার প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সংস্কার ও নবায়নের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বিধান করা উচিত।

(৪) মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং এ শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রয়োজনীয় কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যায় ৮

বিজ্ঞান শিক্ষা

ভূমিকা

৮.১. আধুনিক সভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা সবচেয়ে তাৎপর্যময় ও গুরুত্বপূর্ণ। অধুনা বিশ্বে যেসব জাতি উন্নতির শিখরে, তাদের সাফল্যের মূলে রয়েছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক উৎকর্ষণ ও প্রয়োগ। এর পিছনে রয়েছে তাদের (১) কার্যকরী উচ্চমানের বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থা, (২) পর্যাপ্ত সক্ষম উচ্চমানের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, কারিগর ও অন্যান্য সহায়তাকারী কর্মী, (৩) পর্যাপ্ত উচ্চমানের কঠোর পরিশ্রমী অনুসন্ধিৎসু গবেষক ও উচ্চমানের সর্বতোভাবে সজ্জিত গবেষণাগার, (৪) গবেষণালব্ধ যথোপযুক্ত প্রক্রিয়াকে বাজারজাত করার ও জনসেবায় নিয়োজিত করার সুবন্দোবস্ত এবং (৫) রাজনীতিবিদসহ সর্বস্তরের জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন।

৮.২. এসবের মূলে হল কার্যকর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষা এমন হবে যাতে শিক্ষার্থীরা সত্যিকারভাবে বিজ্ঞান শিখে, বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তাৎপর্য ও প্রয়োগ সমভাবে উপলব্ধি করে। তবেই তারা ভবিষ্যতে হবে উচ্চমানের বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান কর্মী ও গবেষক। সে জন্য চাই বিজ্ঞান শিক্ষার সুব্যবস্থা, পর্যাপ্ত যোগ্য শিক্ষক, যথোপযোগী শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা-সূচী, শ্রেণীকক্ষের সুযোগ সুবিধা, উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা।

বর্তমান অবস্থা

৮.৩. আমরা বর্তমানে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিজ্ঞান পড়ার পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী গ্রহণ করেছি। দলে দলে ছাত্রও ভর্তি করছি এবং বিজ্ঞান শিক্ষাও দিচ্ছি (সারণী দ্রষ্টব্য)। তারপরও দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরাজ করে এক করুণ অবস্থা। বিজ্ঞান জগতে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি। যার কারণ মুখ্যত কার্যকর বিজ্ঞান শিক্ষাদানের অভাব। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষা দান করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানে শিক্ষা-প্রাপ্তহীন শিক্ষক। তাঁরা পরিবেশ পরিচিতি গতানুগতিকভাবে পড়ান। বাস্তব দৃষ্টির অভাবে তাতে পরিবেশ স্বচ্ছ-ভাবে ফুটে ওঠে না এবং শিক্ষার্থীদের বোঝার চেয়ে মুখস্ত করার দিকেই ঝোঁক বেশি হয়ে পড়ে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যা পড়ান হয় তাও ইতিহাস বা সাহিত্যের মত করে—প্রকৃত ধারণা (কনসেপ্ট) ও ব্যবহারিক দিকে দৃষ্টি খুবই কম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে শিক্ষা, নমুনার মাধ্যমে শেখা, নিজে নিজে করে শেখা এবং ছাত্রদের মনে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির তেমন কোনো প্রয়াস নেই। তেমন সাজসরঞ্জাম বা ব্যবহারিক ক্লাসের উপযোগী ল্যাবরে-টরি নেই। অথচ প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে যেমন থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া যারা কয়েক বছর আগেও আমাদের দেশে ছাত্র পাঠাত পড়াশোনার জন্য, তাদের স্কুলগুলির ল্যাবরেটরি এত উন্নত হয়েছে যে এখন সেখানে কম্পিউটার শিখাচ্ছে, আরো অধুনাকালীন যন্ত্রপাতির সাথে সংযোগ ঘটাচ্ছে এবং তাদের পাঠ্যসূচীতে উন্নত দেশের মত নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করছে।

সারণী

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিসংখ্যান (১৯৮৪)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন		স্নাতক বিজ্ঞান (পাস)		স্নাতক বিজ্ঞান (সম্মান)	
		মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
১		২	৩	৪	৫
বিশ্ববিদ্যালয়	..	..	..	৬,৭৭৮	১,০০৯
কলেজ	সরকারী	২২,০৪৫	৪,৩২৭	৮,১৭৯	১,৪৪৫
	বেসরকারী	৮,০৭৮	৭০৪	..	..
মোট		৩০,১২৩	৫,০৩১	১৪,৯৫৭	২,৪৫৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরন		এম. এস. সি.		মোট	
		মোট	মহিলা	মোট	মহিলা
১		৬	৭	৮	৯
বিশ্ববিদ্যালয়	..	২,৯৯৪	৪৩১	৮,৯৭২	১,৪৪০
কলেজ	সরকারী	৭১০	৭৮	৩০,৯৩৪	৫,৮৫০
	বেসরকারী	..	..	৮,০৭৮	৭০৪
মোট		৩,৭০৪	৫০৯	৪৭ ৯৮৪ (৮৩·৩৪%)	৭ ৯৯৪ (১৬·৬৬%)

সূত্রঃ বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো।

৮.৪. শুধু স্কুলই নয় আমাদের কলেজগুলিতে যথোপযোগী ল্যাবরেটরির অভাব রয়েছে, অভাব রয়েছে যন্ত্রপাতির। ফলে অধুনাকালের ব্যবহারিক শিক্ষাসূচী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবর্তন করা যাচ্ছে না, চলছে মোটামুটি সেই সনাতন বাতিল করা এক্সপেরিমেণ্ট। বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি কলেজে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি শিক্ষাদান করা হয়। কিন্তু এই সব কলেজে উচ্চ শিক্ষার উপযোগী ব্যবহারিক ক্লাস করার জন্য ল্যাবরেটরিতে যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অত্যন্ত অপ্রতুল।

৮.৫. স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান পঠন পাঠনের দায়িত্ব প্রধানত কলেজগুলির উপর ন্যস্ত। সেখানে শিক্ষার্থীর ভিড় অনেক বেশি, শিক্ষকের সংখ্যা সে অনুপাতে স্বল্প এবং উপযুক্ত শিক্ষকের সংখ্যা আরো কম। আমাদের দেশের স্নাতক শিক্ষার মান যে কোনো দেশের তুলনায় নীচে উন্নত বিশ্বের তুলনায় তো বটেই। এর কারণ বর্তমান বিজ্ঞান পর্যায়ে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী যেমন হওয়া দরকার তেমন নয় এবং শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই দুর্বল।

৮.৬. যে কয়েকটি সরকারী কলেজে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সেখানে সে সব বিষয়ে শিক্ষকের সংখ্যা খুবই কম। যে সীমিত সংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাঁদের অনেককেই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ানো ব্যতীত, স্নাতক পাস শ্রেণীতেও পড়াতে হয়। এই সব স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো কলেজগুলিতে উন্নতমানের দেশী বিদেশী বিজ্ঞান সাময়িকী বা জার্নাল নেই বললেই চলে। ব্যবহারিক ক্লাসের পাঠ্যসূচীও আধুনিক বলা চলে না ; আধুনিকতা আনতে যে যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য ল্যাব সুযোগ সুবিধা দিতে হবে, তা দিতে পারা যাবে না বলে সে দিকে দৃষ্টি কমই দেয়া হয়।

উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

৮.৭. বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য সাম্প্রতিককালে কিছু কিছু উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার গুরুত্বসহ মাধ্যমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প, চার হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য পরীক্ষাগার ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণের উপকরণ ও পুস্তকাদি সরবরাহ এবং ব্যাপক ভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী উল্লেখযোগ্য। এই প্রকল্পের অংশ হিসাবে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে একটি জাতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র এবং আরো আটটি ট্রেনিং কলেজে অনুরূপ আঞ্চলিক বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

৮.৮. বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো যে সব প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সাম্প্রতিককালে গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে 'ইনস্টিটিউট ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি টিচিং' বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতায় গঠিত 'ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্টেশন' এবং 'বাংলাদেশ এডুকেশন ইকুইপমেন্ট বোর্ড' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠান মূলত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও পলিটেকনিক শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। অন্য দুটি প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপকরণ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখছে।

পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি

৮.৯. মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ইতিমধ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিজ্ঞানের নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় কিছু শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করেও স্কুলে স্কুলে বিতরণ করা হয়েছে। কিন্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এখনো বিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রের অগ্রগতির বিষয়ে সহায়ক গ্রন্থাদি প্রণয়নের জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। প্রকৃতপক্ষে যে সকল শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলিও সকল বিজ্ঞান শিক্ষকের নিকট লভ্য নয়। তার ফলে বিজ্ঞান শিক্ষকের পক্ষে বিজ্ঞানের নানা নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞান মনস্কতা

৮.১০. আমাদের দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার আবির্ভাব অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালে ঘটেছে; তার ফলে এদেশে এখনো বিজ্ঞান শিক্ষা, শিক্ষণ ও গবেষণার যথোপযুক্ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠেনি। সমগ্র জনসমাজের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বিজ্ঞান মনস্কতা বিস্তৃত না হলে এই ঐতিহ্য গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।

৮.১১. বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়; তার সঙ্গে পরীক্ষা নিরীক্ষা, হাতে কলমে কাজ ও অনুসন্ধান গভীরভাবে সম্পৃক্ত। দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ প্রকৃতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং অভিভাবকগণ সম্যকভাবে অবহিত না হওয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষকগণও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশের অভাবে তাঁদের শিক্ষাদান কার্যে যথেষ্ট অবদান ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন না। বিজ্ঞান শিক্ষা শুধু পুঁথির মাধ্যমে লাভ সম্ভব নয়, এজন্য শিক্ষকের যথেষ্ট পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষাদান অনেকাংশে অর্থহীন--এ সকল বিষয়ে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ আজো যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন নন।

৮.১২. সাম্প্রতিককালে দেশের নানা অঞ্চলে কিছু কিছু উৎসাহী বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর উদ্যোগে বেশ কিছু বিজ্ঞান ক্লাব গড়ে উঠেছে। এসকল বিজ্ঞান ক্লাবে তরুণ বিজ্ঞানকর্মীরা নানা বিষয়ে অধ্যয়ন, আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার আয়োজন করে থাকে। এসকল ক্লাবের কাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের পরিপূরক এবং দেশে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও বিজ্ঞান মনস্কতা সৃষ্টিতে ক্লাবগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এম ফিল ও পি-এইচ, ডি ইত্যাদি প্রোগ্রাম

৮.১৩. গবেষণা শিক্ষাকে করে প্রাণবন্ত, গতিশীল, সৃষ্টি করে সৃজনশীলতা এবং সৃষ্টি হয় নতুন জ্ঞান, নতুন চিন্তাধারা যা ধীরে ধীরে গড়ে তোলে নতুন নতুন সামগ্রী। সুতরাং উচ্চশিক্ষার সাথে গবেষণা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একে অন্যের সম্পূরক। এটা সত্যি দুঃখজনক যে, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পড়ান হয় অথচ সেখানে গবেষণা হয় না, গবেষণা করার মত গবেষণাগার নেই—নেই গবেষণা করার মত উপযুক্ত তেমন শিক্ষক। একথা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, উন্নত বিশ্বে বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত কলেজগুলি হল গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু। এখানে জ্ঞান আহরিত হয়, এখানে জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করে, এখানে নতুন জ্ঞান লাভ হয় এবং এখানে জ্ঞানের বিতরণ ঘটে। কিন্তু আমাদের এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব, প্রাণহীন এবং এদের জ্ঞান আহরণ-বিতরণের ক্ষেত্রে অবদান নগণ্য।

৮.১৪. একটা দেশ সব সময় অন্য দেশের উপর নির্ভর করে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রাখতে পারে না। কারণ এতে পরমুখাপেক্ষিতা ও পরনির্ভরতা বেড়ে যায়, নিজেদের আত্মমর্যাদা ও আত্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয় এবং এতে অনেক বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয়, যা যোগাড় করা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। সেজন্যই নিজের পায়ে দাঁড়াতে হয়। আমাদের বিভিন্ন স্তরে শিক্ষক ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী প্রভৃতি যোগান দেয়ার গুরুদায়িত্ব হল বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলির। সেজন্য প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ক্রমে ক্রমে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানরত কলেজগুলিতে উচ্চতর ডিগ্রী, এম. ফিল,

পি-এইচ. ডি. ইত্যাদির প্রোগ্রাম গ্রহণও জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি থেকে এম,ফিল, পিএইচ.ডি. ইত্যাদি উচ্চ ডিগ্রী প্রাপ্তশিক্ষার্থী বেরিয়ে আসবে এবং ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, গবেষণা প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত হবে।

৮.১৫. এটা সত্যি যে, যে অর্থ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়, তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। ব্যবহারিক ক্লাসের সনাতন যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ভৌত সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির জন্যই অর্থ অপর্যাপ্ত। সেই জন্য গবেষণার উদ্দেশ্যে অর্থ পাওয়া যায় না বললেই চলে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। গবেষণা খাতে যথোচিত অর্থ বরাদ্দ করা অত্যন্ত দরকার।

৮.১৬. জ্ঞানের পরিসীমা বৃদ্ধির জন্য, নিজেদের উপর আস্থা আনার জন্য, বিশ্ব জ্ঞান-ভাণ্ডারের সাথে সংযোজনের জন্য এবং সর্বোপরি জ্ঞান বিনিময়ের জন্য শিক্ষক ও গবেষকদের বিদেশ ভ্রমণে উৎসাহিত করতে হবে। তবে পি- এইচ. ডি. করার জন্য বিদেশে যাতে যেতে না হয়, সে বন্দোবস্ত আমাদের দেশেই করতে হবে।

৮.১৭. সুপারিশ

(১) প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষাকে জোরদার করতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার জন্য অর্থের যথাযথ ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং ডিগ্রী কলেজগুলির জন্য যথোচিত বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে এবং এই বাজেট বরাদ্দের উপর বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

(২) প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ন্যূনতম একজন এইচ. এস. সি. পাশ (বিজ্ঞান শাখা, অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ) প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পরিবেশ পরিচিতি বিষয় শিক্ষা যাতে বাস্তবমুখী হয় তার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ খুবই দরকার। এ জন্য পি টি. আই-গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষক রাখতে হবে, যাতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার সময় পরিবেশ পরিচিতি বিষয়টি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পড়ান হয়।

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে, যেখানে ল্যাবরেটরি নেই সেখানে ভাল ল্যাবরেটরি গড়ে তুলতেই হবে যাতে শিক্ষার্থীরা এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে তাদের পাঠ্য বিষয় বুঝতে পারে, কনসেপ্ট জোরদার হয় এবং নিজে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে নিজেদের উপর আস্থা ও আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে পারে। এই আত্মবিশ্বাস পরবর্তী জীবনে বড় মূলধনরূপে কাজ করবে।

(৪) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এডুকেশন ইকুইপমেন্ট বোর্ড ও ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনষ্ট্রুমেন্টেশন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলির কর্মসূচী আরো জোরদার ও বাস্তবমুখী করতে হবে যাতে তারা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করতে সমর্থ হয়। এ ছাড়া 'ইনস্টিটিউ ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজী টিচিং' প্রতিষ্ঠানটি কলেজ, বিশ্ব-

বিদ্যালয় ও পলিটেকনিক শিক্ষকদের জন্য স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। দেশের সামগ্রিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষার অগ্রগতির স্বার্থে এ সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরো ব্যাপক ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ নিয়োগ এবং এগুলির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আবর্তক মঞ্জুরী প্রয়োজন। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলগুলিতে বিশেষ অনুদান দিতে হবে যাতে তারা সকল যন্ত্রপাতি কিনতে পারে এবং ক্লাসে শিক্ষাদানের জন্য যথাযথ ব্যবহার করতে পারে। স্কুলগুলিতে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য ছাত্রদের উপর ল্যাব-ফি ধার্য করা যেতে পারে। বিজ্ঞান পড়াশোনার শর্টকাট বা সহজ পথ নেই। মনে রাখতে হবে এই স্তরের শিক্ষাই ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ভিত।

(৫) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় যে ধরনের ব্যাপক ভিত্তিক প্রকল্প ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে অনুরূপ প্রকল্প উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ও কলেজ শিক্ষা স্তরের জন্য জরুরী ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া প্রয়োজন। এ সকল প্রকল্পে পরীক্ষাগার ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ, উপকরণ ও পুস্তক সরবরাহ এবং শিক্ষকদের ধারাবাহিক ভাবে স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(৬) মাধ্যমিক স্তরের মতই উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরের জন্য শিক্ষক সহায়ক গ্রন্থাদি প্রকাশের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এবং কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে সীমিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এই কাজ এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ যে, এজন্য একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয় বিবেচিত হতে পারে। এই প্রতিষ্ঠান মূল্যবান পাঠ্যপুস্তক ও সহায়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে। বলাবাহুল্য এ ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগও বিস্তৃত করা প্রয়োজন।

(৭) স্নাতক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার মান অবশ্যই বৃদ্ধি করতে হবে। এদের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী আধুনিক করতে হবে। ব্যবহারিক ক্লাসে যাতে যথোপযোগী শিক্ষা দেয়া যায় তার জন্য যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও অন্যান্য সহায়ক সামগ্রীর নিয়মিত সরবরাহ বৃদ্ধি করতে হবে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য যথোচিত আয়তন বিশিষ্ট ল্যাবরেটরি ও শ্রেণীকক্ষ থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রত্যেক বিজ্ঞান কলেজে যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব ওয়ার্কশপ থাকাও দরকার। বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য যথোপযোগী শিক্ষকেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নত বিশ্বের পর্যায়ে উন্নীত না হলেও অন্তত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির তুল্য হওয়া খুবই আবশ্যক।

(৮) স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার মান যাতে ঈপ্সিত পর্যায়ে থাকে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে উচ্চশিক্ষার জন্য যথোপযোগী বই, গবেষণা সাময়িকী, রিভিউ সাময়িকী, বিজ্ঞান বিষয়ে তথ্য বহুল সাময়িকী প্রভৃতি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। ব্যবহারিক ক্লাসগুলি যাতে ঈপ্সিত স্তরে হতে পারে তার জন্য যথোপযোগী যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে। এই সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি ছাড়া কোনো কলেজে বিজ্ঞান খোলা উচিত হবে না। আমরা ছাত্র-চাপ হ্রাস করার জন্য এবং উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারণ করার জন্য সাবেক জেলা পর্যায়ে উন্নত মানের কলেজ

পর্যায়ক্রমে গড়ে তুলতে সুপারিশ করেছি। সেখানেও যথাযথ সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে যাতে বিজ্ঞান খোলা যায়। বিজ্ঞান পঠন-পাঠন একটি ব্যয় বহুল বিষয়, প্রয়োজনীয় উপকরণ ছাড়া এ শিক্ষা দিলে তা দেশের কোনো উপকারে আসে না।

(৯) বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকারকে পর্যাপ্ত অনুদান দিতে হবে। এই অনুদান এমন হতে হবে যাতে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সময়োপযোগী ব্যবহারিক ক্লাস ও গবেষণা চালু রাখতে পারে। বর্তমানে কলেজগুলিতে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা বিরাজমান। তাদের গবেষণা তো দূরের কথা, ব্যবহারিক ক্লাস নেয়ার অর্থ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থাও ভাল বলা চলে না। এ অবস্থা অতি সত্বর দূর করা অত্যন্ত আবশ্যক। স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষাদানে ন্যস্ত কলেজগুলির আর্থিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের জন্য সরকারের একটি কমিটি গঠন করা আবশ্যক। এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন একজন খ্যাতিমান বিজ্ঞানী এবং সদস্য হবেন শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের একজন করে যুগ্ম-সচিব, একজন বিজ্ঞানী/প্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান অধ্যাপক।

(১০) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এম, ফিল, পি-এইচ,ডি, ইত্যাদি উচ্চ ডিগ্রীর প্রোগ্রাম জোরদার করতে হবে। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে চিহ্নিত করতে হবে এবং সে বিভাগগুলির অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে যাতে পি-এইচ,ডি, গবেষণার জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি, ল্যাব সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যায়। প্রতি বছর এই বিভাগের মূল্যায়ন করতে হবে এবং যে বিভাগ সঠিকভাবে গবেষণা চালাতে সক্ষম হবে না, তার অনুদান বন্ধ করতে হবে। অনুদান ও গবেষণার মূল্যায়ন পাশাপাশি চলবে। যে সব অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা পি-এইচ,ডি, ডিগ্রী লাভ করবে তাঁদের বিশেষ সম্মানী দেয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। যে সব শিক্ষক পি-এইচ,ডি করে তাঁদের একাডেমিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করবেন, তাঁদের অনার্জিত বাৎসরিক বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতি দিতে হবে। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ কমিটি গঠন করে যথোচিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। শিক্ষক নয় এমন যাঁরা পি-এইচ,ডি, ডিগ্রী লাভ করবেন এবং যাঁদের চাকুরি নেই, তাঁদের সরকারী কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে। যে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা পি-এইচ,ডি, লাভ করবে তাঁদের উৎসাহ দানার্থে এককালীন আর্থিক পুরস্কার দেয়ার প্রথা চালু করতে হবে।

(১১) উপযুক্ত শিক্ষক বিজ্ঞান শিক্ষার মূল উপাদান। তাঁদের জ্ঞান, চিন্তাধারা এবং বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থী কতটুকু বিজ্ঞান বিষয়গুলি অনুধাবন করতে পারবে। মেধাবী, নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী ও সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকই বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাদান করতে সক্ষম। এ জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিত ব্যাপক প্রশিক্ষণ দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে রিফ্রেসার্স কোর্স-জাতীয় স্বল্পকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে শিক্ষকরা গতিশীল বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সংযোগ রাখতে সক্ষম হন।

(১২) শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা উচিত যাতে তারা দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে বিজ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রথম থেকে সচেতন থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে যাঁরা শিক্ষাদান করেন তাঁরা শিক্ষার্থীদের এরূপ চেতনা গঠনে সাহায্য করবেন। পরবর্তী পর্যায়েও শিক্ষকগণ এই দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সাংস্কৃতিক রূপ, আর্থসামাজিক পর্যায়

প্রভৃতি বিষয়ে তাঁরা ওয়াকিবহাল থাকলেই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে দায়িত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে। বিজ্ঞান শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়ার যে ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে সেখানেও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া দরকার। গবেষণা ক্ষেত্রেও আমাদের দেশের সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

(১৩) মেধাবী তরুণদের কলেজে শিক্ষকতার পেশায় আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গবেষণার সুযোগ প্রসারিত করা দরকার। এই সুযোগ প্রথমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বৃদ্ধি করা আবশ্যক এবং ধীরে ধীরে কলেজগুলিতে দেয়া যেতে পারে। গবেষণায় নিয়োজিত হলে তরুণ শিক্ষকগণ নিজেদের মেধার যথোচিত প্রয়োগ করতে পারবেন, গবেষণাগারে তাঁরা অধিক সময় অতিবাহিত করবেন, নিজেদের বিষয়ে প্রকাশিত দেশ-বিদেশের জার্নাল ও সাময়িকী পাঠে মনোযোগী হবেন এবং ক্লাসে পাঠদানের সময় নিজেদের গবেষণা ও পাঠলব্ধ জ্ঞান সম্বন্ধে অন্তরঙ্গ আলোচনা করবেন। এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, শিক্ষার্থী এই সঙ্গে শিক্ষক ও নিজের বিষয় সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ হয়। ফলে বিজ্ঞান চর্চা ও বিজ্ঞান শিক্ষাদান উভয় দিকে অধিকতর মনোযোগী হতে শিক্ষক অনুপ্রাণিত হন।

(১৪) বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আমাদের দেশে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের নানা শাখায় গবেষণা করা হয়, যেমন বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রভৃতি। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার সঙ্গে এদের গবেষণার নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করা খুবই প্রয়োজন। তা ছাড়া যাতে গবেষণালব্ধ ফল জনসেবায় লাগানো যায় তার জন্য যথাযথ জনসংযোগ থাকা দরকার।

(১৫) বিজ্ঞানকে আর্থসামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে হলে এখানে-সেখানে বিচ্ছিন্ন গবেষণা খুব ফলপ্রসূ হয় না। তাই প্রয়োজনে বিজ্ঞানীদের টীম গঠন করে লক্ষ্য-ভিত্তিক (গোল ওরিয়েন্টেড) গবেষণা করা উচিত। অধুনা বিশ্বে সব দেশেই টীমে গবেষণা চলছে এবং তার সুফলও তারা পাচ্ছে।

(১৬) গবেষণায় কৃতিত্বপূর্ণ অগ্রগতি ও সাফল্যের জন্য পুরস্কার ও জাতীয় স্বীকৃতির আকারে বিজ্ঞান শিক্ষক-গবেষকদের যথোচিত অনুপ্রেরণা দেয়ার সরকারী ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(১৭) বিজ্ঞানের ভূমিকা যাতে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ ও বিবেচিত হয় সে জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যে স্তরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এমন পর্যায়ে বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান-শিক্ষা -প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

(১৮) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য আমদানিকৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি ইত্যাদির উপর আমদানি কর মওকুফ করতে হবে।

(১৯) উচ্চশিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রের মত বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা ভাষা। বাংলাভাষায় বিজ্ঞান চর্চা না করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করা কঠিন। বিদেশী ভাষায় যে কোনো অধ্যায় পড়ার সময় তা মনে মনে অনুবাদ করতে হয় এবং অনুবাদ করার কাজে শিক্ষার্থীর শ্রম ও মেধার অনেকাংশে অপচয় ঘটে। কিন্তু একথাও সত্য যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা এখন পর্যন্ত অপরিণত স্তরে রয়ে গেছে। বাংলা একাডেমী এদিকে কিছুটা মনোযোগ দিলেও বিশেষ একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অন্যান্য নানারকম কাজের সঙ্গে প্রচুর বিজ্ঞান বিষয়ের বইয়ের অনুবাদ করা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিষয়ের বই লেখা ও বইয়ের অনুবাদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা উচিত।

(২০) এই সুপারিশ কার্যকর করা হলেও বিজ্ঞানের বিপুল প্রয়োজনীয় অংশ বাংলায় অনুবাদ করা সম্ভব হবে না। কারণ আজ উন্নত দেশসমূহে বিজ্ঞানের বিবর্তন যে গতিতে সাধিত হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে রচিত বিপুল পরিমাণ গ্রন্থ ও প্রকাশিত সাময়িকী বা জার্নালের দ্রুত অনুবাদ করা অসম্ভব কাজ। সুতরাং উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য ইংরেজি ভাষার দক্ষতা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। এ জন্য স্নাতক (পাস ও সম্মান) প্রথম বর্ষে এক পত্র ইংরেজি (ফাংশনাল ইংলিশ) পাঠদানের ব্যবস্থা করা দরকার। এই পত্রের পাঠক্রম এমন করা উচিত যাতে উচ্চতর শিক্ষা চর্চার জন্য ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞান বিষয়ক বই ও জার্নাল স্বচ্ছন্দে পাঠ ও অনুধাবন করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয়।

(২১) জাতীয় ভিত্তিতে আমাদের একটি বিজ্ঞান যাদুঘর রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিস্তারে বিজ্ঞান যাদুঘরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য বর্তমান বিজ্ঞান যাদুঘরের ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং দেশের নানা অঞ্চলে আঞ্চলিক বিজ্ঞান যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। এমন কি প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি ছোটখাট বিজ্ঞানের সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠা বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২২) বিভিন্ন বিজ্ঞান সমিতি, বিজ্ঞান শিক্ষক সংস্থা এবং বিজ্ঞান সাময়িকী অন্যান্য উন্নত দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রগতিতে মূল্যবান অবদান রেখে থাকে। এ দিকে আমাদের উদ্যোগ আজো অত্যন্ত ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী সহায়তা দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(২৩) লিংকেজ বা সংযোজক প্রোগ্রাম উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কার্যকর করার জন্য খুবই সহায়ক প্রমাণিত হয়েছে। এই প্রোগ্রামের অধীনে উন্নয়নশীল দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ বিভাগ উন্নত দেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সংযোগ স্থাপন করে। এর আওতায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় যুগ্ম পিএইচ,ডি, প্রোগ্রাম চালু, অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ ইত্যাদি করা হয়ে থাকে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ এরূপ

সুযোগ নিয়ে তাদের কার্যক্ষম অনেক বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান প্রোগ্রামের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ বর্তমানে সুইডেনের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রসায়ন ক্ষেত্রে গবেষণা সহযোগিতার জন্য চুক্তিবদ্ধ আছে। এই প্রোগ্রামের আওতায় এখানকার শিক্ষক ও পিএইচ.ডি শিক্ষার্থীরা তাদের স্ব স্ব গবেষণার বিষয়ে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের গিয়ে খন্ডকালীন কাজ করে আসেন ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকরা এদেশে এসে এখানে চালু গবেষণা প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন। অনেক ক্ষেত্রে যাতে এখানের গবেষণার কাজ সুচারুভাবে সম্পাদিত হয়, সেজন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে থাকে। ঢাকা বিশ্বাদ্যিালয়ে এই ধরনের প্রোগ্রাম থেকে কিছু সংখ্যক পিএইচ.ডি শিক্ষার্থী ঐ ডিগ্রী পেয়েছে এবং কিছু সংখ্যক অতি সত্বরই পাবেন। বিভিন্ন অধ্যাপকের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টায়ও এমন যোগাযোগ অতীতে সংঘটিত হয়েছে। অধ্যাপকগণ, বিশ্ববিদ্যালয় নিজে, এমনকি সরকারী স্তরে এ ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত যাতে নিম্নোক্ত প্রোগ্রাম আমাদের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হয়।

অধ্যায় ৯

বাণিজ্য শিক্ষা

ভূমিকা

৯.১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে বাণিজ্য একটি দ্রুত উন্নয়নশীল বিষয় হিসাবে গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা শিল্প বিপ্লব ও বাণিজ্যিক বিপ্লব দুটিই যুগপৎ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা ও শিল্প কারখানার উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাসে দেখা যায় যে, বাণিজ্য শিক্ষা বিষয়ক জ্ঞান বিশেষভাবে এ উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করেছে। লোক প্রশাসনিক ব্যবসা বাণিজ্য ব্যবস্থাপনায়, বাণিজ্যে, শিল্প ও ব্যবসায়, বীমা, ব্যাংক প্রভৃতি পরিচালনায় বাণিজ্য শিক্ষা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে বাণিজ্য শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম।

৯.২. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) সহ অন্যান্য কমিশন সেজন্য বাণিজ্য শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। সাধারণ প্রশাসনিক কাজ, ব্যবসা বাণিজ্য, ব্যাংকিং, বীমা, আমদানি-রফতানি, শ্রম সম্পর্ক, উৎপাদন ব্যয় নিরূপণ, পণ্যদ্রব্য পরিবহন, বাজারজাতকরণ, চাহিদা বর্ধন প্রভৃতি বিষয়ে দক্ষ জনশক্তি সরবরাহ করার জন্য বাণিজ্য শিক্ষায় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত বলে কমিশন মন্তব্য করে।

বর্তমান অবস্থা

৯.৩. বাণিজ্য শিক্ষা আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নিজস্ব গুণেই বিশেষ স্থান করে নিতে চেষ্টা করছে। এখন মেধাবী ছাত্ররা বাণিজ্য শিক্ষায় ভর্তি হওয়ার জন্য ভিড় জমাচ্ছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্ররা অনেক দিনের মর্যাদাসম্পন্ন চিকিৎসা ও প্রকৌশল বিষয়ের ন্যায় বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হচ্ছে। কারণ, এশিক্ষা শুধু অর্থ উপার্জনের পথ খুলে দেয় না, মানসম্মান অর্জনের পথও নির্দেশ করে। উন্নয়নের পঞ্চম ফ্যাক্টর হিসাবে চিহ্নিত 'ব্যবস্থাপনা' বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ-সমূহের বাণিজ্য বিভাগেই শিক্ষা দেয়া হয়। ব্যবস্থাপনা যে জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার উন্নীত করার অন্যতম হাতিয়ার, এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত।

৯.৪. বাণিজ্য শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরে বেশ কিছুকাল কলা ও বিজ্ঞানের সমপর্যায়ে পৃথক বাণিজ্য শাখা নামে একটি আলাদা স্রোত হিসাবে বিদ্যমান ছিল। সাম্প্রতিককালে মাধ্যমিক স্কুলে নবম ও দশম শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে বাণিজ্য শিক্ষায় বাণিজ্যিক পদ্ধতি ও পত্র বিনিময়, বাণিজ্যিক গণিত ও বুক কিপিং, টাইপ-রাইটিং ও বাণিজ্যিক ভূগোল পড়ানোর ব্যবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে একজন শিক্ষার্থী এক শ করে দু শ নম্বরের দুটি পত্র নিতে পারে।

৯.৫. কলেজসমূহে বাণিজ্য শিক্ষার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এখনো একটি আলাদা স্রোত বিদ্যমান। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যের মধ্যে বাংলা, ইংরেজি, হিসাব রক্ষণ, বাণিজ্য নীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্যিক ভূগোল ও ব্যাংকিং পড়ানো হয়। ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে পৌরনীতি, ইতিহাস, গণিত, পরিসংখ্যান এবং টাইপ ও সাঁটলিপির মধ্যে যে কোনো একটি নিতে হয়।

৯.৬. উচচ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৬টি কর্মাশিয়াল ইনস্টিটিউটে আরো একটি সমাপনী কোর্স চালু রয়েছে। এখান থেকে দু'বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা দেয়া হয়। ডিপ্লোমা দেয়া হচ্ছে সাঁটলিপি, টাইপিং, অর্থনীতি, নথিপত্র ব্যবস্থাপনা, ব্যাংকের হিসাব পদ্ধতি, হিসাব রক্ষণ, অফিস মেশিন চালানো, অফিস ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক সংগঠন প্রভৃতির উপর। এ ছাড়াও জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নট্রামস), বগুড়ায় বহুভাষী সাঁটলিপিসহ এ জাতীয় কোর্সে শিক্ষাদান করা হয়। এ একাডেমীর বৈশিষ্ট্য হল একই আঁচড়ে বাংলা, ইংরেজি ও আরবী বহুভাষী সাঁটলিপির উদ্ভাবনা, যা বাণিজ্যিক মহাবিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পাঠ্য বই হিসাবে জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ডের সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অন্যদিকে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচচ শিক্ষা অধিদপ্তর সারা দেশে উক্ত পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে দেশীয় প্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন এবং এ বিষয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

৯.৭. ডিগ্রী পর্যায়ে রয়েছে বি,কম,পাস কোর্স যা বর্তমানে কেবল কলেজে পড়ানো হয়। পাস কোর্সে একাউন্টিং তিন পত্র, ম্যানেজমেন্ট তিন পত্র এবং অর্থনীতি তিন পত্র পড়ানো হয়। রাজশাহী ও চটগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস কোর্সে বীমা বিষয়ে তিন পত্র পড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে। ঢাকা ও চটগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজসমূহে 'বিজিনেস কমিউনিকেশন এণ্ড সেক্রেটারিয়েল প্রাকটিস' নামে একটি পত্র পড়ানো হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজগুলিতে পাস কোর্সে ফিনান্স ও মার্কেটিং চালু করা হয়েছে, কিন্তু এগুলি এখনো জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

৯.৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্যান্য বিষয়ের মত অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ে দুটি আলাদা ধারা বিদ্যমান। একটি সনাতন পদ্ধতি যা কলেজে পড়ানো হয়। অন্যটি কোর্স পদ্ধতি যা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়। চটগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীতে একটি ধারা বিদ্যমান। এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা হয় বছর ভিত্তিতে সম্প্রতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো বাণিজ্য বিভাগ খোলা হয়নি।

৯.৯. বর্তমানে দেশের ১৮টি সরকারী কলেজে হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে এবং ৬টি সরকারী কলেজে এ বিষয়ে মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে ১৪টি সরকারী কলেজে ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে এবং ৫টি সরকারী কলেজে এ বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে।

৯.১০. বাণিজ্য শিক্ষাকে বর্তমানে চারটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন—হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফিনান্স ও মার্কেটিং। এ বিভাগগুলির উদ্দেশ্য এমন জনশক্তি সৃষ্টি করা যারা নিজেদের 'এণ্টারপ্রেনার' হিসাবে গড়ে তুলতে পারে। এণ্টারপ্রেনারের কাজ হল পরিকল্পনা প্রণয়ন, সংগঠন সৃষ্টিকরণ, কাজের নির্দেশ প্রদান, বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং পরিকল্পিত ক্রিয়াকর্ম শৃঙ্খলার সঙ্গে অপ্রতিহত গতিতে চলছে কিনা, তার তদারকিকরণ এবং প্রয়োজনবোধে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন। এই টেকনিক্যাল বিষয়গুলি হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, ফিনান্স ও মার্কেটিং বিভাগসমূহে শেখানো হচ্ছে। বস্তুত বাণিজ্য শিক্ষা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান রাজ্যের এমন শাখা প্রশাখায় নিয়ে যায় যার সাহায্যে তারা 'সেলফ এমপ্লয়মেণ্টের' ব্যবস্থা করতে পারে অথবা বেতনভুক কর্মচারী বা নির্বাহী হিসাবে আকর্ষণীয় পারিশ্রমিকে নিযুক্ত হতে পারে। বাণিজ্য শিক্ষাকার্য বিষয়ক দক্ষতা ছাড়াও গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে সামাজিক দক্ষতা বাড়ায়। কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য মোচনের সরকারী নীতিতে বাণিজ্য শিক্ষা অবদান রাখছে।

৯.১১. আধুনিককালে ব্যবসা বাণিজ্যের রীতিনীতি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটছে। শিল্প, ব্যাংক ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও পরিচালনা ক্ষেত্র ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে। তাই প্রচলিত বাণিজ্যিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন। বর্তমান পাঠ্যসূচী ও শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের পেশাজীবী হিসাবে, নির্বাহী ও কর্মচারী হিসাবে অথবা নিজ প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার কতিপয় সমস্যাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বস্তুত বাণিজ্য শিক্ষা পদ্ধতি কতগুলি মৌলিক সমস্যায় জর্জরিত। এদের মধ্যে রয়েছে দেশে বিদ্যমান বাণিজ্য শিক্ষার অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা, প্রচলিত পাঠক্রমের অনুপযোগিতা, শিক্ষাদান পদ্ধতির অকার্যকারিতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব এবং সর্বাধুনিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ পাঠ্যপুস্তকের স্বল্পতা, তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণের ভাষা ও বাণিজ্যিক কর্মক্ষেত্রে ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বৈপরীত্য।

৯.১২. ১৯৬২ সাল থেকে মাধ্যমিক স্তরে পৃথক বাণিজ্য শাখায় শিক্ষার ব্যবস্থা চলে আসছিল। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ওঠার আগেই ছাত্র-ছাত্রীরা বাণিজ্য শিক্ষা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করত। কিন্তু ১৯৮৩ সালে চালুকৃত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় বাণিজ্য শিক্ষা সংকুচিত করা হয়। মাধ্যমিক স্তর থেকে বাণিজ্য শিক্ষা বন্ধ করার ফলে এই স্তরে মেধাবী ছাত্র থেকে বাণিজ্য বিভাগ বঞ্চিত হচ্ছে এবং ছাত্রছাত্রীরা হঠাৎ করে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে নতুন বিষয় পড়তে এসে অহেতুক মেধা ও সময়ের অপচয় করছে।

৯.১৩. বিশ্বের সর্বত্র বাণিজ্য একটি ব্যবহারিক ও বাস্তবানুগ বিষয় হলেও আমাদের দেশে বিষয়গুলিকে শুধুমাত্র তত্ত্বীয়ভাবে পড়ানো হয়। পরীক্ষা পাশের জন্য শিক্ষার্থীগণ মুখস্থ করে পড়ালেখা করে পরীক্ষা পাশ করছে এবং কার্যক্ষেত্রে তাদের কলা ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চাকুরি যোগাড় করতে হয়। কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে, সে অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়েনি। কলেজগুলিতে লজেস্টিক সাপোর্টও কম, গ্রন্থাগারে উপযুক্ত সংখ্যক বই পুস্তক নেই। শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ নেই বললেই চলে।

৯.১৪. আমাদের দেশের কলেজে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষকগণ তাঁদের কর্মতৎপরতা শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের মধ্যেই সীমিত রাখেন। গবেষণা কার্যক্রমে তাঁদের আগ্রহ খুবই কম। স্থানীয় শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কলেজগুলির বাণিজ্য বিভাগের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়নি। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে শিক্ষার্থীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দেশের এসব শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হয়।

৯.১৫ অনার্স কোর্স চালু আছে এমন কলেজগুলিতেও কোথাও বাণিজ্যের বিভিন্ন শাখায় অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করার কোনো সুযোগ সুবিধা নেই। বাস্তব ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে বাণিজ্য শিক্ষা মোটেই পূর্ণাঙ্গ হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও এ ব্যাপারে পশ্চাদপদ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ থেকে বাণিজ্য ডিগ্রীধারী একজন ছাত্র কোনো ব্যবসা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত হলে সে হাবুডুবু খেতে থাকে। ক্লাসে অতিরিক্ত ছাত্র হেতু কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। এদিকে তেমন নজরও দেয়া হয়নি।

৯.১৬. বাণিজ্য শিক্ষা পুস্তককেন্দ্রিক থাকার একটা বড় কারণ হল কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব। প্রায় কলেজেই একদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের পদ নেই এবং অপর দিকে বছরের পর বছর পদ শূন্যও থাকতে দেখা যায়। এসব কারণে কলেজগুলিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম ক্লাস হয়ে থাকে। ছাত্রদের টিউটোরিয়াল ক্লাস হয় না বললেই চলে। তা ছাড়া গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধাসহ পাঠদানের অন্যান্য উপকরণ কলেজগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক কম। এসব কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনার্স পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে।

৯.১৭. এই সব সমস্যা সমাধানার্থে বাংলাদেশ সরকার বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে ২১.৪৫ কোটি টাকা সম্বলিত একটি প্রকল্প ১৯৮৩ সালে চালু করে। এই প্রকল্পটি পাঁচ কম্পোনেণ্ট ইউনিট সমন্বয়ে গঠিত। এগুলি হল ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাণিজ্য অনুষদগুলি, আই বি এ এবং বি এম ডি সি। নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে সার্বিক ভাবে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন সাধন করা এ প্রকল্পের লক্ষ্য:

(১) ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের আবাসিক ভবন নির্মাণসহ আইবিএ-র ভৌত সুবিধাদির সম্প্রসারণ;

(২) যন্ত্রপাতি, বইপুস্তক, জার্নালসহ নানারকম শিক্ষোপকরণ সরবরাহ;

(৩) শিক্ষক ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পাঠক্রম উন্নয়নের জন্য কারিগরি সাহায্য প্রদান;

(৪) আইবিএ ও বিএমডিসি-র জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তার যোগান দেয়া;

(৫) বৈদেশিক বৃত্তি প্রদানসহ আইবিএ, বিভিন্ন অনুষদ এবং বিএমডিসির শিক্ষকদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

(৬) বাণিজ্য অনুষদ শিক্ষকদের জন্য স্বল্প মেয়াদী ইনডাস্ট্রিয়াল ইন্টার্নিশীপ এবং গ্রীষ্মকালীন সেমিনারের ব্যবস্থা করা; এবং

(৭) কেইস ডেভেলপমেন্ট ও গবেষণা।

৯.১৮. সরকার নিঃসন্দেহে এই প্রশংসনীয় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যে একটি উন্নত ও সময়োপযোগী পাঠক্রম প্রবর্তন, ৮৫ জন শিক্ষকের বিদেশে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা, ৯১.৮৪ লক্ষ টাকার পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ সরবরাহ, বাংলা ভাষায় ৬টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়েছে। তদুপরি ছাত্র শিক্ষকদের জন্য আবাসিক ভবন এবং আইবিএর বর্তমান ভবনের সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এই সব পদক্ষেপ ঠিক পথেই নেয়া হয়েছে। তাই প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে বাণিজ্য শিক্ষার সার্বিক উন্নতি হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

৯.১৯. সুপারিশ

(১) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তু পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য বহুভাষী টাইপ রাইটিং ও বহুভাষী সাঁটলিপি পড়াবার ব্যবস্থা সকল কলেজে থাকা দরকার। এই জন্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জাতীয় বহুভাষী সাঁটলিপি প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমী (নট্রামস), বগুড়াতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা আবশ্যক। এ সকল কার্যকর করার জন্য সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন। জাতীয় ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অনুদানের ব্যবস্থা রাখা দরকার হবে।

(২) সময়োপযোগী যে পাঠক্রম চালু করা হয় তা সময়ের সাথে পরিবর্তন করতে হবে যাতে বাণিজ্য শিক্ষা বাস্তবধর্মী হয়। বর্তমানে বাণিজ্য শিক্ষায় ইন্টার্নিশিপ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৩) ছাত্রছাত্রীদের নির্ধারিত বিষয়ের চলতি গতিধারার সাথে পরিচিত করা এবং তাদের মত প্রকাশের ক্ষমতাকে উন্নয়নের জন্য লেকচার পদ্ধতির সাথে সাথে শিক্ষাদানের অন্যান্য পদ্ধতি যেমন কেইস পদ্ধতি, সেমিনার, মৌখিক, লিখিত ও উপস্থাপনা পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। এতে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্লেষণমূলক সমস্যা সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

(৪) স্নাতক পর্যায়ে বেশি সংখ্যক কলেজে বাণিজ্য শিক্ষা চালু করতে হবে।

(৫) বাণিজ্য শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত যুক্তিসঙ্গত করতে হবে।

(৬) শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বাণিজ্য শিক্ষাদানে নিয়োজিত শিক্ষকদের যেমন চলতি প্রকল্পে দেশে বিদেশে উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা প্রকল্প শেষেও চালু রাখতে হবে। যেহেতু বিদেশী শিক্ষা অনেক ব্যয় সাপেক্ষ এবং আমাদের সাধ্যের বাইরে, সেহেতু আমাদের দেশে পি,এইচ,ডি, কোর্স চালু ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(৭) কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক বইপুস্তক সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে।

(৮) ক্লাসের ছাত্র সংখ্যা যুক্তিসঙ্গত হতে হবে।

(৯) কর্মসংস্থান ও চাকুরির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিল্পপতি ও নিয়োগ-কর্তাদের সঙ্গে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপনের (যেমন আই, বি, এ,তে বিদ্যমান) উদ্যোগ গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন। বাণিজ্য শিক্ষা একটি বাস্তবমুখী কর্মপন্থা হওয়া উচিত।

(১০) উন্নত দেশগুলিতে বাণিজ্য বিভাগ কেবল গ্র্যাজুয়েট সৃষ্টি করে না, তাদের মার্কেটিং করার দায়িত্বও গ্রহণ করে। এর জন্য লজেস্টিক সাপোর্ট ও প্লেসমেন্ট অফিস থাকে। আমাদের দেশেও এ সুযোগ থাকতে হবে।

(১১) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস এডমিনিস্ট্রেশনের ন্যায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও ইনস্টিটিউট অব বিজিনেস এডমিনিস্ট্রেশন স্থাপন করার বিষয় বিবেচনাযোগ্য।

অধ্যায় ১০

আইন শিক্ষা

ভূমিকা :

১০.১. দেশে আইনের শাসন বহাল রাখার ব্যাপারে আইন শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ন্যায়বিচার লাভে জনসাধারণকে সহায়তা করার জন্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রয়োজন। আজকের সমাজে সমসাময়িক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আদর্শগত শক্তির দ্বন্দ্ব ও প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। এটা অনুধাবন করার জন্য আইন ক্ষেত্রে যথাযথ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ব্যাপক জ্ঞান সম্পন্ন উদার ব্যক্তিদের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের সংবিধান সংরক্ষণ এবং এর উৎকর্ষ সাধনের জন্য উচ্চতর আইন শিক্ষাপ্রাপ্ত সুযোগ্য ও সমুন্নত চরিত্রের ব্যক্তিত্ব বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, সমাজে সুবিচার কায়েম করা, বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বজায় রাখা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অধিকার ও দায়িত্বের সীমা নির্দেশ করা এবং আইনগত অন্যান্য কর্মের জন্য বিজ্ঞ আইনজ্ঞদের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। আইনের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে এবং পেশাগত নৈতিকতার উচ্চতর আদর্শ স্থাপন করতে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞদের তুলনা নেই। তাই দেশে আইন শিক্ষাকে তার প্রকৃত প্রেক্ষিতে পর্যালোচনা করার জন্য, আইনকে তার নিজস্ব গতিতে চলতে দেয়ার জন্য এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে যে ধরনের আইন গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা উচিত সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা প্রয়োজন। দুর্নীতি ও অবিচারের কবল থেকে জনজীবন রক্ষা করা, দুর্বল, অসহায় ও নিপীড়িতদের হাতের কাছে আইনের সুফল পৌঁছে দেয়া আইন শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। উল্লিখিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য আইনের শিক্ষা ও আলোচনা জরুরী।

বিরাজমান অবস্থা:

১০.২. বর্তমানে ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে সরাসরিভাবে এবং এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয় ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত আইন কলেজ-গুলিতে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা চালু আছে। এ সমস্ত কলেজে এই আইন শিক্ষা অধ্যয়ন-কালের দিক দিয়ে বিভিন্ন রকমের এবং তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী এক রকম নয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে আইনের কলেজে বর্তমানে প্রথম ডিগ্রীর পর দু'বছরের আইন কোর্সের প্রথা প্রচলিত রয়েছে। অবশ্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রী বা উচ্চতর ডিগ্রীর পর আইন ডিগ্রীর জন্যও দুবছর অধ্যয়ন করতে হয়। এসব কলেজ থেকে দু বছরের এল, এল, বি, ডিগ্রীর পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এল, এল, এম, ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করার ব্যবস্থা রয়েছে। অবশ্য এই এল, এল, এম, ডিগ্রীর জন্য দু'বছরের কোর্স সমাপ্ত করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়।

১০.৩. অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরিভাবে আইন শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন যোগ্য অন্যান্য বিষয়ের মত উচ্চ মাধ্যমিকের পর চার বছরের স্নাতক অনার্স (এল, এল, বি, অনার্স) এবং তারপর এক বছরের মাস্টার্স ডিগ্রীর (এল, এল,এম, ডিগ্রীর) জন্য অধ্যয়ন করা যায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরিভাবে আইন শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তাতেও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যয়নযোগ্য অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় উচ্চ মাধ্যমিকের পরে চার বছরের এল, এল, বি, অনার্স ডিগ্রী এবং তারপর এক বছরের এল, এল, এম, ডিগ্রীর জন্য শিক্ষাদান করা হয়। এই দুই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে তারতম্য রয়েছে। দেশের অন্য দু'টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে—চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই।

১০.৪. গত কয়েক বছরে আইন শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে বলে শিক্ষাবিদ ও আইনজীবীদের অনেকেই সমালোচনা করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আইন শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা প্রধানত আইন শিক্ষার অবনতির কারণ বলে তাঁরা মনে করেন। এ সব আইন কলেজের অনেকগুলিতে যোগ্য পরিবেশ, ব্যবস্থাপনা বা দক্ষ শিক্ষকের অভাব। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত শর্তাদি পূরণ না করেই অধিকাংশ আইন কলেজ স্থাপিত হয়েছে। বাইরের চাপের ফলে অথবা জনপ্রিয়তা লাভের ব্যগ্রতার দরুন স্বীকৃতিদানের শর্তাদি কার্যকরণের ব্যাপারে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিথিলতা প্রদর্শন করছে। আইন কলেজগুলিতে ছাত্র সংখ্যা মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে গেছে এবং কলেজগুলি উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের আকৃষ্ট করতে পারছেনা। বর্তমান আইন কলেজগুলির অন্যতম দুর্বলতা এই যে, সেখানে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কোনো ব্যবস্থা নেই।

১০.৫. এমনকি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ—যেগুলিতে সরাসরিভাবে আইন শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে—সেখানেও আইন অনুষদগুলিতেও বিশেষ কোনো গবেষণা হচ্ছে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন কলেজগুলি বিচার বিভাগ ও আইন ব্যবসায়ের জন্য আইনজ্ঞ তৈরি করছে, কিন্তু আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করার জন্য যে বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন তা সৃষ্টির কোনো প্রয়াস নেই। সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা এবং এর ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য গবেষণা প্রয়োজন। এ পর্যন্ত আমরা উকিল বা আইনজীবী তৈরি করতে হয়ত সক্ষম হয়েছি, আইনবিদ তৈরি করতে পারিনি। আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন তার ব্যবস্থা নেই।

১০.৬. আমাদের আইন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাগত ও গবেষণামুখী দিক এবং ব্যবহারিক ও প্রয়োজনমুখী দিক--আইন শিক্ষার এই দুটি দিকের কোনো দিকই সন্তোষজনকভাবে পূরণ হচ্ছে না। আশা করা হয়েছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাগত ও গবেষণামুখী দিক পূরণের দায়িত্ব বর্তাবে, অন্যদিকে বার কাউন্সিল গঠনের পর আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিক পূরণের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উক্ত কাউন্সিল গ্রহণ করবে। আইন শিক্ষার ব্যবহারিক দিকের উন্নতি বা সমন্বয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার সুযোগে অত্যধিক সংখ্যক ছাত্র ভর্তি করে প্রয়োজনাতিরিক্ত আইন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেধা পরীক্ষা করে আইন কলেজগুলিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়না বলে নিম্নমানের ছাত্ররাও আইন শিক্ষার সুযোগ পায়। এসব নিম্নমানের ছাত্রদের অনেকে পরীক্ষা পাশের জন্য নীতি বহির্ভূত পন্থা অবলম্বন করে এবং আইন শিক্ষার অবনতি ঘটায়। আইন শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রয়োজনানুসারে সুদক্ষ শিক্ষক, আইনজীবী, আইনবিদ, বিচারক তৈরি করা। অথচ এজন্য চিকিৎসা ও প্রকৌশল শিক্ষার ন্যায় বাছাই করে ছাত্র ভর্তির ব্যবস্থা নেই।

১০.৭. **সুপারিশ**

(১) কমপক্ষে প্রথম ডিগ্রীর পর আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি, কোর্সের মেয়াদ বর্তমান দু'বছরের স্থলে তিন বছরের হওয়া আবশ্যক। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বছরের আইন কোর্স প্রচলিত ছিল। কিন্তু সাবেক পাকিস্তানের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স হ্রাস করে দু'বছরে সীমিত করে। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯৪৯ সালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন, ১৯৫৯ সালে সাবেক পাকিস্তানের

শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন আইন কোর্সের মেয়াদ দু'বছর থেকে তিন বছরে বাড়াবার জন্য সুপারিশ করে। ডিগ্রীর এই কোর্স যথাযথভাবে আয়ত্ত করতে হলে তা তিন বছরের কমে সম্ভব হবেনা। কলেজগুলি থেকে এল, এল, বি, ডিগ্রীধারী ব্যক্তিদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এল, এল, এম, ডিগ্রীর মেয়াদ বর্তমানের ন্যায় দু বছর চালু থাকবে।

(২) আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি, কোর্স দুভাগে বিভক্ত হবে। প্রথম অংশের মেয়াদ দুই ও দ্বিতীয় অংশের মেয়াদ এক বছরের হবে এবং প্রতি অংশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা গ্রহণ করবে। প্রথম দুই বছর আইনের ইতিহাস, মৌলিক বিষয়সমূহ ও সূত্রপাঠে ব্যয়িত হবে। তৃতীয় বর্ষে দলিল প্রণয়ন, সওয়াল-জওয়াব, আর্জি-মুশাবিদা, মামলা পরিচালনা বিধি ইত্যাদির ব্যবহারিক বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এল, এল, বি, (অনার্স) কোর্সের মেয়াদ বর্তমানের ন্যায় চার বছর এবং এল, এল, বি, (অনার্স) ডিগ্রীদের জন্য এল, এল, এম, কোর্সের মেয়াদ বর্তমানের ন্যায় এক বছর চালু থাকবে।

(৪) আইনকে যারা বৃত্তিরূপে গ্রহণ করতে চায় এবং যারা বিচার বিভাগে চাকুরি করতে ইচ্ছুক তাদের চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রকৌশল শিক্ষার ন্যায় বাছাই করে ভর্তির বন্দোবস্ত করা সমীচীন হবে। তাদের অবশ্যই কোর্সের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় অংশই সমাপ্ত করতে হবে এবং দ্বিতীয় অংশের পরীক্ষায়ও যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের যথানিয়মে ডিগ্রী প্রদান করা হবে। এ কোর্স সফলতার সঙ্গে সমাপ্তির পর আইন ব্যবসায়ে যোগদান করা যাবে। অবশ্য আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ লাভের যোগ্যতা বার কাউন্সিল নির্ধারণ করবে।

(৫) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আইন অনুষদ এবং আইন কলেজগুলির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন। তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সরাসরি আইন শিক্ষার যে ব্যবস্থা রয়েছে তার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মধ্যে মোটামুটিভাবে সামঞ্জস্য থাকা প্রয়োজন।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল, এল, বি, (অনার্স) ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা আইন ব্যবসা করার অথবা বিচার বিভাগে নিয়োজিত হবার পূর্বে তাদের জন্য আর্টিকেল পিরিয়ড় নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন। তবে এই বিষয়ে উপরে (২)-এতে আইন কলেজগুলিতে এল, এল, বি, কোর্স অধ্যয়নকারীদের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষাদান সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা এখানে চতুর্থ বর্ষে প্রযোজ্য হবে।

(৭) আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আইনে এম, ফিল, এবং ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য উচ্চতর কোর্সকে জোরদার করতে হবে। আইন ও বিচার পদ্ধতির সংস্কার, উন্নতি ও বিকাশ আইন শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ এবং সমাজের নতুন নতুন প্রয়োজনের সঙ্গে আইন শিক্ষা ও তার ব্যবহারিক অনুশীলনের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য আইন গবেষণার প্রয়োজন।

(৮) কোনো কোনো দেশে আইনের শিক্ষাগত ও পেশাগত অধ্যয়নকে পৃথক করে দেখা হয়। উদাহরণস্বরূপ ইংল্যাণ্ডের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেখানে আইন শিক্ষার শিক্ষাগত দিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশাগত দিক কাউন্সিল অব লিগেল

এডুকেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই উপমহাদেশে এই উভয় দিকই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। অন্যভাবে বলা যায় যে, আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে আইন শিক্ষায় আইনের কারিগরি ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত দিকের সঙ্গে শিক্ষাগত দিকও একত্রে পড়াতে ও শেখাতে হয়। ফলে দুটি কঠিন কাজ একত্রে সম্পাদন করতে হয়। আইন শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করার সময় এসব বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের মনোযোগ থাকা দরকার।

(৯) আইন ও তার কার্যকারিতার উপর বর্তমান সভ্য সমাজ নির্ভরশীল। কাজেই যাঁদের উপর আইনের ব্যাখ্যার দায়িত্ব অর্পিত হবে তাঁদের প্রতিটি কাজে থাকতে হবে ন্যায় ও নীতিশাস্ত্রের সর্বোচ্চ মানের স্বাক্ষর, যাতে এই আইন জনসাধারণের মনে শ্রদ্ধা ও আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে আইন শিক্ষায় নৈতিকতার ভূমিকা সম্পর্কে বক্তৃতার ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরূপে গণ্য হওয়া উচিত।

(১০) যে সকল আইন কলেজ প্রকৃতই পাণ্ডিত্য ও সুষ্ঠু শিক্ষার কেন্দ্র, শুধু সেগুলিকে অনুমোদন দান করা উচিত। আইন কলেজের অনুমোদনের ব্যাপারে শিক্ষক, কলেজগৃহ ও স্থান, লাইব্রেরী অন্যান্য সুবিধা এবং টিউটোরিয়াল ও প্রাকটিক্যাল কাজ সম্পর্কে অন্যান্য সাধারণ কলেজের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তাদি প্রযোজ্য হওয়া উচিত।

(১১) আইন কলেজের শিক্ষকগণ শুধু পূর্ণকালীন ও নিয়মিত শিক্ষক বা শুধু খণ্ডকালীন শিক্ষক হবেন না, বরং উভয় শ্রেণীর মিশ্রণে শিক্ষকমণ্ডলী গঠিত হবে। আইন শিক্ষক নিয়োগ কালে তাঁদের প্রকাশিত গবেষণা কর্ম এবং গবেষণা পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে দেখতে হবে।

(১২) উপযুক্ত আইন শিক্ষা কলেজগুলিতে অন্যান্য বেসরকারী কলেজের ন্যায় সরকারী সাহায্য মঞ্জুর করা উচিত।

(১৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শক, আইন অনুষদের প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট আইনজীবী বা আইনবিদ নিয়ে গঠিত বিশেষ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাভুক্ত আইন কলেজগুলির ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন এবং যে সকল আইন কলেজ একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে তিন বছরের মধ্যে ব্যবস্থাপনার নিয়ম পদ্ধতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত করতে পারবে না সে সকল কলেজের অনুমোদন উক্ত তিন বছর সময়সীমা শেষে আর বর্ধিত করা উচিত হবে না।

(১৪) বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন আইন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অনুমোদন দেয়া উচিত হবে কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

(১৫) দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় সরকারী উদ্যোগে উপযুক্ত আইন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা বাঞ্ছনীয়।

(১৬) দেশে একটি ন্যাশনাল 'পোস্টগ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ ল' স্থাপন করা প্রয়োজন।

অধ্যায় ১১

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ভূমিকাঃ প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানব সম্পদের প্রয়োজনীয়তা

১১.১. এটি পরীক্ষিত সত্য যে, প্রযুক্তি প্রয়োগ-ক্ষমতাই উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থ-নৈতিক প্রগতির চাবিকাঠি। জাপান ও অন্যান্য দ্রুত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সার্বিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও উন্নয়নের পেছনে রয়েছে যথোপযুক্ত মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যক্রম। অপরদিকে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিকাশ ঘটেছে সেখানকার প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান গতিধারার সাথে তাল মিলিয়ে স্বাভাবিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। ফলে এ সকল দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে প্রয়োগ ক্ষেত্রের একটি সহজ সুন্দর যোগসূত্র স্থাপনের মাধ্যমে একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে গণ্য হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অবশ্য সম্ভাব্য শিল্পায়ন, কৃষি উন্নয়ন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা ভাবী রূপরেখা সামনে রেখে এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয়ে থাকে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী মানব সম্পদ পরিকল্পনার সাথে জাতীয় উন্নয়ন কাঠামোর সম্পৃক্ততা। এ ধরনের পরিকল্পনার ভিত্তিতেই যথোপযুক্ত মানব সম্পদের চাহিদা নিরূপণ সম্ভব।

১১.২. উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রযুক্তি হস্তান্তরের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে দক্ষ মানব সম্পদের ইতিবাচক ভূমিকা সর্বদা স্বীকৃত। বিদেশী প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা কমানোর জন্য আমদানিকৃত প্রযুক্তি আত্মীকরণ স্থানীয় ভাবে অতিপ্রয়োজন ও পরবর্তী পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য স্থানীয় দক্ষ মানব সম্পদ প্রয়োজন। এই মানব সম্পদের আর একটি গুরু দায়িত্ব গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশজ প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ। আমাদের দেশ অনুন্নত হলেও সমাজের একটি নিজস্ব প্রযুক্তিগত প্রজ্ঞা আছে। এই প্রজ্ঞার মূল্যায়ন করে এর পরিবর্ধন ও আধুনিকী-করণের মাধ্যমে দেশে একটি গতিশীল প্রযুক্তি কৃষ্টি দেশজ প্রযুক্তি উদ্ভাবনে ও আমদানিকৃত প্রযুক্তির নতুন দিগন্ত উন্মোচনে সাহায্য করে।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি এবং বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের সুপারিশঃ

১১.৩. প্রাক-স্বাধীনতাকালে গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৫৯) দেশের বিপুল জনশক্তির কর্ম নৈপুণ্যের যথাযথ ব্যবহারে অর্থনৈতিক ভিত্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে একটি সুষ্ঠু কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এ উদ্দেশ্যে দক্ষ মানব সরবরাহের জন্য দেশে একটি কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। প্রস্তাবিত কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে তিনটি প্রকৌশল কলেজ, তৎকালীন জেলাসমূহের সদরে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও মহকুমা শহরগুলিতে ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের লক্ষ্য সামনে রেখে কমিশন দেশের মানব সম্পদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার নীতিমালা প্রণয়ন করেন। এই নীতিমালা অনুযায়ী দক্ষতার পরিসীমাকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। সর্বনিম্ন পর্যায়ে পড়ে শিল্প ও কৃষিকার্যে নিয়োজিত তথাকথিত দক্ষতাবিহীন শ্রমিক যিনি কেবল কায়িক শ্রমের সাহায্যে কোনো কাজে সহায়তা দান করতে সক্ষম। দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্প ও বাণিজ্যে নিয়োজিত

দক্ষ কারিগর যার দ্বারা উৎপাদন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে। তৃতীয় পর্যায়ে পড়ে কারিগরি অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি যাঁরা দক্ষ কারিগরের কাজের তদারকি করতে পারেন এবং একই সাথে প্রকৌশলীর চিন্তাধারা হৃদয়ঙ্গম করে উক্ত কারিগরের কাছে ব্যক্ত করতে পারেন। চতুর্থ পর্যায়টি এই চার স্তর বিশিষ্ট পিরামিডের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থিত। এর আওতায় পড়ে প্রকৌশলীগণ।

১১.৪. স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠিত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) সর্বস্তরে কর্ম অভিজ্ঞতা এবং বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এবং আশা করে যে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী কর্মজীবনে প্রবেশ করার যোগ্যতা লাভ করবে। এই উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্কুল, বৃত্তিমূলক স্কুল (ভি, টি, আই,), কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টি, টি, সি,) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন কারিগরি, শিল্প, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষকতা, নার্সিং, প্যারামেডিকাল ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

১১.৫. ডিপ্লোমা স্তরে কারিগরি শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে কমিশন এই শিক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষাক্রম ও শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তব ভিত্তিক করার পরামর্শ দেয়। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য উচ্চশিক্ষা ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশের সাথে সাথে এ সকল শিক্ষকের শিল্প কারখানায় বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়। মেধাবী ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের ডিগ্রীস্তরে প্রকৌশল শিক্ষার সুযোগ এবং সরকারী চাকুরিতে পদোন্নতির সুযোগ প্রসারিত করা উচিত বলে মনে করা হয়।

১১.৬. প্রকৌশল শিক্ষার বেলায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশের চাহিদা অনুযায়ী আসন সংখ্যা নির্ধারিত করার সুপারিশ করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর গবেষণা ও পাঠক্রমের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেয়ার জন্য এবং দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প যথাঃ বস্ত্র শিল্প ও পাট শিল্পের জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে স্নাতক কোর্স চালু করার প্রস্তাব করা হয়।

১১.৭. পরবর্তীকালে প্রণীত অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষানীতি (১৯৭৯) উৎপাদনমুখী শিক্ষার ভিত্তি হিসাবে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে চিহ্নিত করে। তৎকালীন বৃত্তিমূলক শিক্ষার নিম্নমানের প্রতি দৃষ্টি রেখে এই নীতিমালায় ভবিষ্যতে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ক্ষেত্র বিশেষে আদর্শ খামার, উন্নতমানের ওয়ার্কশপ বা চিকিৎসা কেন্দ্রকে চিহ্নিত করতে বলা হয়।

১১.৮. প্রকৌশল শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষার প্রচলন করার সুপারিশ সহ বিভিন্ন শিল্প যেমন ইস্পাত, পেট্রোরসায়ন, পাট, বস্ত্র, চিনি, সার, কাগজ, নৌশিল্প প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদ তৈরি করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় স্নাতকস্তরের কোর্স চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়।

১১.৯. স্বাধীনতা-উত্তরকালে প্রণীত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে দেশের আনুষ্ঠানিক বৃত্তি-মূলক কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে আপাতত দৃষ্টি না দিয়ে মান উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধার পূর্ণ সদ্ব্যবহারের প্রতি তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা

(ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা

উদ্দেশ্য

১১.১০. হাতে-কলমে শিক্ষাদান করে শিক্ষার্থীদের দক্ষকর্মী হিসাবে গড়ে তোলা বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই আনুষ্ঠানিক বা উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কায়িক পরিশ্রমে অনীহা অনেক সময় আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এ অবস্থার পরিবর্তন করার অন্যতম পন্থা হল বৃত্তিমূলক শিক্ষা জনসাধারণের মধ্যে প্রসারিত করে যুব সম্প্রদায়কে কর্মমুখী করে তোলা।

১১.১১. এই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হল, শিক্ষার্থীকে স্বাবলম্বী ও উপার্জনক্ষম দক্ষ মানব সম্পদ হিসাবে গড়ে তোলা। এর ফলে সৃষ্ট জনশক্তি কেবল চাকুরির উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রয়োজনবোধে স্বাধীনভাবে আত্মমর্যাদার সাথে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে অতিদক্ষ ও দক্ষ মানের কর্মীর পেশাকে 'ঠিক পেশা' হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় না বলে এদেশে শিল্পোন্নত দেশের ন্যায় নিম্ন পেশা ও দক্ষতার জন্য গঠিত প্রকৃত দক্ষ কর্মী শ্রেণী গড়ে উঠতে পারেনি। এই ধরনের কারিগরি শ্রেণী বা মাস্টার ক্রাফটসম্যান পণ্যের উৎকর্ষ, শিল্পোন্নয়ন ও উচ্চ উৎপাদনশীলতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সামাজিক মর্যাদার অভাব এবং বেতনের নিম্ন কাঠামো এরূপ উচ্চমানসম্পন্ন কারিগরি শ্রেণী গড়ার পক্ষে অনুকূল নয়। অতি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহে উৎপাদনশীল জীবনের সর্বোচ্চ মাপে একজন পেশাদার প্রকৌশলীর সামাজিক মর্যাদা ও বেতন ভাতাদি অপেক্ষা একজন গুণী অতিদক্ষ কারিগরের (মাস্টার ক্রাফটসম্যান) মর্যাদা ও বেতন কোনো অংশেই কম নয়। সে জন্যই সে সব দেশে তরুণ সমাজ এ ধরনের পেশায় নিয়োজিত হতে দ্বিধা করে না।

বিরাজমান অবস্থা

১১.১২. আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় বিশ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে প্রায় তিন লক্ষাধিক মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এদের মধ্যে প্রায় ৫০% উত্তীর্ণ হয়। অন্যদিকে যারা অকৃতকার্য হয় এবং যারা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুল ত্যাগ করে তাদের সংখ্যা বিরাট। প্রধানত এদের পুনর্বাসন ও নিয়োগোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু থাকলেও এদের একটি সামান্য অংশই কেবল এই সুযোগ লাভ করে। কারণ বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রধান দুটি প্রতিষ্ঠান টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টি,টি,সি,) ও ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (ভি,টি,আই,) প্রশিক্ষণ প্রদান ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি যথাক্রমে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং টি,টি,সি,-গুলি জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনে ন্যস্ত।

১১.১৩. এদেশে প্রথম মহাযুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের পুনর্বাসনের জন্য স্থাপিত ৫টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল স্থাপনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার সূচনা হয়। ষাট দশকের প্রথমে ও তখনকার জাতীয় শিক্ষা কমিশন, ১৯৫৯ এর নির্ধারিত নীতিমালা অনুসারে তৎকালীন মহকুমা সদরগুলিতে ভি,টি,আই, স্থাপন শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর এ পর্যন্ত ৫১টি স্থাপিত হয়েছে যার মধ্যে সবকটি বর্তমানে চালু রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফেরত সৈনিকদের পুনর্বাসনের জন্য প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে শ্রম দপ্তর একটি টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ঢাকায় স্থাপন করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ষাট দশকের প্রথম দিকে আরো ৪টি টি,টি,সি, স্থাপিত হয়। বর্তমানে মোট ১২টি টি,টি,সি, আছে। এদের মধ্যে একটি বাদে বাকি সবগুলি সাবেক জেলা সদরে অবস্থিত।

১১·১৪· স্কুল জীবন শেষ করার আগে যারা স্কুল ছেড়ে দেয় তাদের দ্রুত নিয়োগযোগ্য করে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮২ সাল থেকে টিটিসিসমূহে ৬ মাস মেয়াদী নিবিড় মডিউলার কোর্স চালু করা হয়। একই বছরে গঠিত একটি কমিটির সুপারিশক্রমে সুষ্ঠু সমন্বয়, উন্নয়ন ও পরিচালনার স্বার্থে ভি.টি.আই. সমূহকে জনশক্তি ব্যুরোর অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং ১৯৮৪ সালের জানুয়ারী থেকে ভি. টি. আই. সমূহে মডিউলার কোর্স চালু করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু প্রশিক্ষণার্থীরা ২ বছর মেয়াদী কোর্সের সমর্থনে আন্দোলন শুরু করলে প্রায় সম্পূর্ণ এক বছরকাল (১৯৮৪ সাল) টি. টি. সি ও ভি. টি. আই. সমূহে প্রশিক্ষণ দান বন্ধ থাকে এবং ১৯৮৫ সাল থেকে ভি. টি. আই. সমূহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ফিরে যায়। এই আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিলের (জদউপক) সুপারিশক্রমে বাস্তবসম্মত কোর্সের মেয়াদ নিরূপণের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি নিয়োগ করা হয়।

১১·১৫· প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য সিস্টেমস এপ্রোচ প্রয়োগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও.) কয়েকটি দাতাদেশের সহযোগিতায় 'মডিউলস্ অব এমপ্লয়েবল স্কিলস' তথা 'বিনিয়োগযোগ্য দক্ষতা পুঞ্জ' প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সাফল্যের সাথে বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে প্রচলন করেছে। মডিউলের কার্যক্রম এমনভাবে রচনা করা হয় যে, প্রতি মডিউলের প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর কর্মী কোনো বিশেষ কাজ করার দক্ষতা অর্জন করে। এতে যে কোনো মডিউলে প্রশিক্ষণের পর কর্মী একটি কাজের উপযোগী হবে তেমনি পরবর্তী উচ্চতর মডিউলে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে তারও সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। যদি কেউ একটি মডিউল সমাপ্তির পর কিছুদিন কাজ করে পুনরায় পরবর্তী মডিউল গ্রহণ করতে চায় তাও পারবে। এভাবে মডিউলগুলি পর্যায়ক্রমে গ্রহণ করে একজন সুদক্ষ কারিগর হতে পারবে।

১১·১৬· দুর্ভাগ্যক্রমে ১৯৮৪ সাল থেকে ভি.টি.আই. সমূহে এই পদ্ধতি চালু করতে গেলে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। অনেকের ধারণা হয় যে, এই পদ্ধতিতে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ হয় এবং আন্দোলনের মুখে এই ধরনের প্রশিক্ষণ বন্ধ হয়ে যায়। মডিউল কোর্সের একটি দুর্বলতা এই যে, সময়ের স্বল্পতার জন্য আমাদের দেশে প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতায় পশ্চাদপদ প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে প্রশিক্ষণ চর্চায় সম্পূর্ণভাবে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা সম্ভব হয় না। অথচ যে কোনো দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের জন্য এইরূপ অভ্যস্ত হওয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন। এছাড়া মডিউলার পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণের জন্য অধিক কাঁচামাল প্রয়োজন এবং প্রশিক্ষকের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে ভবিষ্যতে এর বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে।

১১·১৭· বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, দক্ষ ও অর্ধ-দক্ষ কর্মীর চাহিদা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ভি.টি.আই. ও টি.টি.সি. থেকে পাশ করা প্রশিক্ষণার্থীগণের অধিকাংশ বেকার থাকছেন। নিয়োগ-কর্তাগণ স্বাভাবিক কারণেই একাডেমিক সনদপত্র অপেক্ষা প্রকৃত দক্ষতার উপর জোর দিয়ে আসছেন। এছাড়া সুনির্দিষ্ট নিয়োগ পদ্ধতির অভাবেও এরা চাকুরিতে যোগদান করতে সক্ষম নন। দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় দক্ষতামান প্রতিষ্ঠিত এবং এর সম্পর্কিত বাস্তব পরীক্ষা সনদ প্রদানের ব্যবস্থার কথা চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। সরকারের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কাউন্সিল (জদউপক) ১৯টি ট্রেডে তিন ধাপ বিশিষ্ট দক্ষতা মান গ্রহণ করেছে এবং আরো বহু দক্ষতামান চূড়ান্তভাবে গ্রহণের পথে। কিন্ত এখনও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এবং কর্মচারী কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণের অভাবে টি.টি.সি/ভি.টি.আই. প্রশিক্ষণার্থীদের বাইরে বিশেষ করে শিল্প শ্রমিকদের পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদ প্রদান সম্ভব হয়নি।

১১·১৮· লক্ষ্য করা গেছে যে, নিয়োগযোগ্য দক্ষতা উন্নয়নে নিয়োজিত টি, টি, সি, ও ভি, টি, আই, সমূহে ক্রমে ক্রমে এমন একটি মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে যে, প্রশিক্ষণার্থীগণ শিল্প কারখানার শ্রমিক না হয়ে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে উচ্চতর শিক্ষণের মাধ্যমে বা অন্য-ভাবে 'সাদাকলার' কর্মী হওয়ার প্রবণতা পোষণ করেন। এর ফলে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। টি.টি.সি. বাদে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের শিল্প-কারখানায় সংযুক্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। অপরদিকে ভি,টি,আই, গুলিতে সাধারণ স্কুল-কলেজের মত দীর্ঘ অবকাশের ব্যবস্থা আছে, যা কলকারখানায় বাস্তব অভিজ্ঞতা দানের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

১১.১৯. উপরে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং টি,টি,সি ও ভি,টি,আই, সমূহের বিরাজমান অবস্থার নিরিখে সরকার নিয়োজিত একটি কমিটি প্রচলিত প্রতি ট্রেডে এক বছর মেয়াদী দুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে বিভক্ত দুই বছর মেয়াদী কোর্সের সুপারিশ করে। এ কোর্সের প্রতি পর্বে থাকবে নয় মাসের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ও তিন মাস মেয়াদী শিল্প কারখানা ভিত্তিক কর্মকালীন প্রশিক্ষণ। যেখানে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দান সম্ভব হবে না সেখানে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ভিতর প্রজেক্ট ভিত্তিক ব্যবহারিক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কমিটি জাতীয় দক্ষতা মানের গ্রেড-৩কে ১ম পর্বের ও গ্রেড-২কে ২য় পর্বের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে টি,টি,সি ও ভি,টি,আই, সমূহের জন্য প্রচলিত ট্রেডসমূহের কোর্স সম্পর্কিত রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয়।

১১·২০ এই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৮৫ সালের জানুয়ারী থেকে টি,টি,সি. ও ভি,টি,আই-তে অভিন্ন কোর্স চালু আছে। জদউপক'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টি,টি,সি, ও ভি,টি,আই, সমূহে সকল ভর্তিপরীক্ষা ও ট্রেড ফাইনাল পরীক্ষা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত হয়। দুটি প্রশাসনিক বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এ দুই ধারার প্রশিক্ষণকে একটি একক ধারায় রূপান্তর এবং অভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রচলন জদউপক'র অন্যতম প্রধান সাফল্য।

১১·২১· বর্তমানে স্কুল ছেড়ে যাওয়া কয়েক লক্ষ ছাত্র বেকার থাকছে। এ অবস্থার জন্য প্রধানত যে কারণটি দায়ী তা হল এককভাবে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের উপর জাতির সম্পূর্ণ দক্ষতা বা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ। ৫১টি চালু ভি,টি,আই,-তে মোট আসন সংখ্যা ৫,১২০। ১২টি টি,টি,সি,-তে মোট আসন সংখ্যা ৫,৭১৫। এছাড়া বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য মানের প্রশিক্ষণে আসন সংখ্যা অপ্রতুল। এই আসন সংখ্যা মোট প্রয়োজনের এক দশমাংশেরও কম। এছাড়া বস্ত্র বিভাগের আর্টিজেন পর্যায়ে টেক্সটাইল শিক্ষার ব্যবস্থা আছে যার মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ৫৫০ অষ্টম শ্রেণী পাশ ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

১১·২২· অভিজ্ঞতার আলোকে দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী এই সকল বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয় এবং মাধ্যমিক পাশ করার সাথে সাথে আনুষ্ঠানিক উচ্চ শিক্ষার আশায় মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। পরে তারা বৃত্তিমূলক কাজকর্ম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করে না এবং কার্যক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য কর্মদক্ষতাও অর্জন করতে সক্ষম হয় না। অনেক সময় কিছু প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না করেই প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করে।

১১·২৩· দেশে বর্তমানে কয়েকশত বেসরকারী বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান চালু আছে। এদের মধ্যে শতাধিক কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। এছাড়া ব্যক্তি মালিকানাধীন ও বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বহু প্রতিষ্ঠান মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে দক্ষকর্মীর চাহিদা মেটানোর আশায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেশের দক্ষকর্মীর উৎপাদনে যথোপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারে। এগুলির

স্বীকৃতি প্রদান, রেজিস্ট্রেশন, কোর্স ও প্রশিক্ষণের মান নির্ধারণ ইত্যাদির সুবিধার্থে জদউপক-এর অনুরোধক্রমে বাংলাদেশ জনশক্তি পরিকল্পনা কেন্দ্র সমীক্ষা চালাচ্ছে। এই সমীক্ষার ভিত্তিতে জাতীয় দক্ষতার সমতা আনয়ন ও প্রশিক্ষণ সমন্বয় করা সম্ভব হবে।

১১.২৪. সার্বিকভাবে দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে যে প্রযুক্তি উন্নয়ন সম্ভব এবং একই সাথে বেকার সমস্যা ও শিল্প উৎপাদনের সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে জাতীয়ভাবে উচ্চতর পর্যায়ে তেমন কোনো নীতিমালা এ যাবত প্রণীত হয়নি। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কেও কোনো বিধি নেই। জাতীয় নীতিমালার অভাব সত্ত্বেও কিছু কিছু পদক্ষেপ ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে, জদউপক-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃত্তিমূলক শিক্ষার সকল আনুষ্ঠানিক কোর্সের চূড়ান্ত পরীক্ষা কারিগরি শিক্ষা বোর্ড গ্রহণ করে। প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ-সূচীও বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে পূর্বের তুলনায় সমন্বয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু উপানুষ্ঠানিক কোর্স ও প্রশিক্ষণ স্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল্যায়ন করে। ফলে এর কোনো নির্ধারিত মান এখনো গড়ে ওঠেনি। তাই এই কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীরা সর্বজন স্বীকৃতি পায় না। সম্প্রতি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ প্রকার প্রশিক্ষণার্থীদের স্বীকৃতি-দানের উদ্দেশ্যে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তব কর্মদক্ষতা অর্জনকারী ব্যক্তিগত অনিয়মিত প্রার্থী হিসাবে বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষা দেবার জন্য কোনো অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করলে বোর্ডের সনদ পাবে ও প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি দান করা হবে।

(খ) কারিগরি শিক্ষার মধ্যম স্তর

উদ্দেশ্য

১১.২৫. ডিপ্লোমা স্তরে কারিগরি শিক্ষার মধ্যম পর্যায়ের জনশক্তি তৈরি করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয় সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়। দেশের প্রযুক্তিগত তথা সার্বিক উন্নয়নে এই জনশক্তি একটি মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে। এরা একদিকে যেমন নিজের হাতে দক্ষতার সাথে কাজ করে ক্রাফটম্যান বা সুদক্ষকর্মীর কাজের সুচারু পরিচালনা করতে পারেন, অপরদিকে তেমনি তাত্ত্বিক জ্ঞানের দ্বারা তাঁরা ডিগ্রী প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের চিন্তাধারা, পরিকল্পনা ও ডিজাইনসমূহ দক্ষকর্মীর কাছে ব্যক্ত করতে সক্ষম। বাস্তব কারিগরি অভিজ্ঞতা ও হাতের কাজের দক্ষতার মূলধন নিয়ে উৎপাদনের সাথে জড়িত কর্মীদের তদারকি করা এই মধ্যম স্তরের কারিগরি জনশক্তির কাছ থেকে আশা করা হয়। এছাড়া তাঁরা ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনিশিয়ান হিসাবে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজ, পরিকল্পনা, নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ডিগ্রী প্রকৌশলীদের সহকারী হিসাবেও কাজ করতে সক্ষম।

বিরাজমান অবস্থা

১১.২৬. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় ঢাকাস্থ আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে তিন বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীকালে এই স্কুল কলেজ পর্যায়ে উন্নীত হলে এতে ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষা প্রবর্তিত হয় এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে চারটি কারিগরি ক্ষেত্রে ১২০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে ঢাকায় প্রথম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। ষাটের দশকে পলিটেকনিক শিক্ষার দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। এই সময়ে দেশে ডিগ্রী প্রকৌশলীর সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। ডিপ্লোমা স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ ত্বরান্বিত হলেও দেশের শিল্পায়নের গতি গত সত্তর দশক থেকে অত্যন্ত মন্থর হয়ে যায় এবং মধ্যম স্তরের জনশক্তির জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র গত ১৫ বৎসরে আশানুরূপভাবে বাড়েনি।

১১·২৭· বর্তমানে ডিপ্লোমা স্তরে ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে প্রকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ও শিল্পভিত্তিক বিভিন্ন কোর্স দেয়া হয়ে থাকে। বর্তমানে এসকল ইনস্টিটিউটে সর্বমোট আসন সংখ্যা ১১,০০০ এবং প্রতি বৎসর ৩,৬৮০ জনকে প্রথম বর্ষে ভর্তি করা হয়। বছরে গড়ে ২,০০০ জন ডিপ্লোমা লাভ করে। এখানে ড্রপ আউটের সংখ্যা প্রায় ৫০%। সম্প্রতি ঢাকায় একটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত। আর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের মধ্যে ৮০% ভাগের ডিপ্লোমাউত্তর কোনো উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এবং খুব কম সংখ্যক শিক্ষকের শিল্পভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। পলিটেকনিকগুলি ছাড়া তিনটি মনোটেকনিক আছে যথাঃ গ্লাস ও সিরামিক ইনস্টিটিউট, গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট এবং সার্ভে ইনস্টিটিউট।

১১·২৮· শিক্ষকগণের মধ্যে ২৬·৫% এর তিন মাস মেয়াদী শিক্ষক প্রশিক্ষণ আছে কিন্তু চীফ ইনস্ট্রাক্টরদের ৮৬% এর কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণে ডিপ্লোমা আছে। তাঁদের মধ্যে ২৬% এর শিল্পে বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য স্থাপিত কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ১৯৭৭ থেকে দশ বছর কাল বিভিন্ন কারণে বন্ধ থাকাতে প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড বহুদিন ধরে স্থগিত থাকে। সম্প্রতি তা পুনরায় চালু করা হয়েছে। এদিকে প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্র/শিক্ষক অনুপাত ২১ঃ১। এ অবস্থা গ্রহণযোগ্য নয়। এটি অন্তত ১০ঃ১ হওয়া আবশ্যক। তবে সুযোগ্য শিক্ষক ও তাঁদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, শিল্পভিত্তিক বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দিকে দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক। কিছুদিন ধরে এ সকল প্রতিষ্ঠানে আরো একটি দুঃখজনক অবস্থা বিরাজ করছে যা বাংলাদেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও প্রযোজ্য। যেমন, প্রতি বছর নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হওয়া। ফলে পলিটেকনিকগুলিতে তিন বছরের কোর্স ৪/৫ বছরে সমাপ্ত হয় না। গত কয়েক বছরের ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে প্রবল সেশনজট সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ ২/৩টি সেশনের ছাত্র ভর্তি করেও পূর্ববর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত না হওয়ায় নতুন ক্লাস আরম্ভ করা সম্ভব হয় না। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রত্যেক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আগামী কয়েক বছরে দুই শিফটে ক্লাস নেয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

১১·২৯· পলিটেকনিকগুলিতে যন্ত্রপাতি কিছুদিন পূর্বে খুবই অপ্রতুল ছিল এবং বেশির ভাগই ছিল ১৫ বছরের অধিক পুরাতন। যন্ত্রাংশের অভাবে অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। প্রাতিষ্ঠানিক বাজেটের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রায় ৬০% খরচ হয় শিক্ষক কর্মচারীর বেতনে এবং মাত্র ২২% দেয়া হয় কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ ক্রয় করতে। এর ফলে প্রতি ছাত্রের জন্য বছরে মাত্র ৩০০—৫০০ টাকা কাঁচামালের জন্য খরচ হয় যা খুবই সামান্য। আন্তর্জাতিক মান হচ্ছে এর প্রায় ৮ গুণ। এর ফলে কেবল চক ব্ল্যাকবোর্ডের মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। বইয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরে দেয়া হয় মাত্র ৩০,০০০ টাকা যা দিয়ে আজকাল ১০০টি কারিগরি বই ক্রয় করা যায় কিনা সন্দেহ। যোগ্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকের অভাবে গ্রন্থাগারগুলির যথেষ্ট ব্যবহারও হয় না। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহের পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মানের মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। বিভিন্ন কারণে এই তারতম্য বিরাজ করছে।

১১·৩০· কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রম মূলত কার্যক্ষেত্রে কাজের দায়িত্বের বিবরণীর উপর নির্ভরশীল। কারিগরি শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব ১৯৬৭ সালের কারিগরি শিক্ষা আইনের ক্ষমতাবলে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত। কিন্তু কারিগরি শিক্ষার জন্য থেকে মধ্যস্তরের কারিগরি দক্ষ জনশক্তি বা টেকনিশিয়ানদের কাজের দায়িত্বের বিবরণীর ভিত্তিতে এই শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়নের সার্বিক কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

১১.৩১. অনুমোদিত প্রণিধান অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষা পাঠক্রম প্রণয়নের দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে বোর্ডের পাঠক্রম অনুধ্যান উপ-কমিটি ও পাঠক্রম অনুধ্যান কমিটির উপর ন্যস্ত। পাঠক্রম উপ-অনুধ্যান কমিটিতে একজন করে এবং পাঠক্রম অনুধ্যান কমিটিতে একজন নিয়োগ সংস্থাসমূহ থেকে মনোনীত প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে কাজ করে থাকেন। এরূপ সদস্যদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতাই বজায় রাখা সম্ভব হয়। নিয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মনোনীত সদস্যগণ পাঠক্রম প্রণয়ন কৌশলে অনভিজ্ঞ এবং নিজ নিজ কাজে ব্যস্ততার দরুন সাধারণভাবেই এই ব্যবস্থায় পাঠক্রম প্রণয়নে বাস্তব কোনো অবদান রাখা তাদের সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে, শিল্প ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশলের বিকাশ ঘটছে। ফলে শিল্প ক্ষেত্রে নিয়োজিত কারিগরি জনশক্তির কাজের কৌশল ও দক্ষতার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম শিল্প কারখানার প্রযুক্তির পরিবর্তনের ধারার সাথে মিল রেখে সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা একান্তভাবে অপরিহার্য।

১১·৩২· আশার কথা এই যে, পলিটেকনিকগুলির সার্বিক অবস্থার উন্নতিকল্পে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট একটি উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রতি বাস্তবায়নের পথে। এই কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পে পলিটেকনিক ও বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বি, আই, টি) গুলি অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ১৫২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। তার মধ্যে বিদেশী সাহায্য পাওয়া যাবে ১১৮ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের অধীনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পাঠক্রম উন্নয়ন, বাংলায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা, যন্ত্রপাতি নবায়ন, প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ি নির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি রয়েছে। এ ছাড়া ছাত্রদের শিল্প কারখানায় বাস্তব অভিজ্ঞতাদানের জন্য বিশেষ কর্মসূচী এবং শিক্ষকদের বাস্তব প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর পলিটেকনিকসমূহে সার্বিক উন্নতি পরিলক্ষিত হবে বলে আশা করা যায়।

১১.৩৩. বাংলাদেশে ডিপ্লোমা পর্যায়ে টেক্সটাইলে প্রযুক্তিগত শিক্ষাদানের জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। অথচ কলকারখানায় সুপারভাইজার, শিফট-ইন-চার্জ প্রভৃতি পদে নিয়োগ ও উন্নতমানের টেকনিশিয়ান গড়ে তুলতে ডিপ্লোমাধারীদের একান্ত দরকার। এক্ষেত্রে দেশে একটি শূন্যতা ও টেক্সটাইল শিল্পখাতে একটি অসামঞ্জস্য বিদ্যমান। অপরদিকে সার্টিফিকেট স্তরে টেক্সটাইল বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশে ছয়টি জেলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট আছে। এখানে মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের টেক্সটাইল বিষয়ে দু বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট কোর্স প্রদান করা হয় এবং কোর্স সমাপ্তিতে সার্টিফিকেট-ইন-টেক্সটাইল সনদ প্রদান করা হয়। এগুলির প্রতিটিতে বৎসরে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এই ইনস্টিটিউটগুলির সার্বিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগের উপর অর্পিত। বস্ত্র বিভাগের প্রকাশনা থেকে জানা যায় যে, সার্টিফিকেট-ইন-টেক্সটাইল কোর্স পাশ করা ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে খুব সমস্যার সম্মুখীন হন। কারণ এ সার্টিফিকেটধারীগণ শিল্প কারখানায় অপারেটিভ পদে কাজ করতে অনিচ্ছুক। অপরদিকে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাদের সুপারভাইজার বা শিফট-ইন-চার্জ পদের জন্য যোগ্য বিবেচনা করা হয় না।

(গ) কারিগরি শিক্ষার উচ্চস্তর

ডিগ্রী প্রকৌশল শিক্ষা

১১.৩৪. প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টিধর্মী পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং গবেষণা ও মূল্যায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন ডিগ্রী স্তরের প্রকৌশলীরা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাথে পরিচিত, দেশের সমস্যা সমাধানের প্রয়োগে ও বস্তুনির্ভর প্রযুক্তি উদ্ভাবনে দক্ষ এই শ্রেণীর কর্মী উন্নয়নশীল দেশসমূহের কর্ম কাণ্ডে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন

করে থাকেন। স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামালের সদ্ব্যবহার, হস্তান্তরকৃত প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ, প্রযুক্তি বাছাই ও নিয়ন্ত্রণকল্পে বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন প্রভৃতি ব্যবস্থাদির বিস্তৃতি ও নির্ভরযোগ্যতার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি, দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সামাজিক জীবনধারায় সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ। এর জন্য দেশের যথেষ্ট সংখ্যক যথাযথ উপলব্ধিসম্পন্ন সুযোগ্য প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদের প্রয়োজন। ডিগ্রী স্তরের প্রকৌশল শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও তথ্যের অনুধাবন নয় বরং সেই সাথে দেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সমন্বয় সাধন করে সমস্যাসমূহের সমাধান খুঁজে বের করার জন্য ও প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের বিভিন্ন নিয়ামক সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করা। গভীর পেশাগত জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সূত্রসমূহ মানুষের সেবায় নিয়োজিত করতে সক্ষম হলেই একজন প্রকৌশলী বা প্রযুক্তিবিদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

বিরাজমান অবস্থা

১১.৩৫. ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকাস্থ আহসানুল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে দেশে ডিগ্রী স্তরে প্রকৌশল শিক্ষাদান শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে প্রকৌশল শিক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে ডিগ্রী দেয়া হয় এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি প্রকৌশল বিষয়াদিতে ডিগ্রী দেয়া হয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ৪টি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি তিনটি প্রকৌশল বিষয়ে ডিগ্রী দিয়ে থাকে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ডিগ্রীর মান স্নাতক স্তর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এছাড়া কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি এবং কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে টেক্সটাইল ও লেদার টেকনোলজিতে ডিগ্রী দেয়া হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ত্তশাসিত এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বি.আই.টি.-গুলি সম্প্রতি স্বায়ত্তশাসিত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। উল্লেখিত অপর দু'টি কলেজ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হয়। কিছুদিন পূর্বেও বি.আই.টি. গুলি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হিসাবে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে ছিল। তবে প্রশাসনিক কার্যক্রম ছাড়া একাডেমিক কার্যক্রমের জন্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আওতাধীন ছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার মধ্যে তৎকালীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির ব্যবস্থাপনায় অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি লক্ষ্য করা হয়। অর্থ, প্রশাসন, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠক্রম পর্যালোচনা ও সাধারণ উন্নয়ন কর্মকান্ডে পূর্বতন কলেজগুলির সীমিত ক্ষমতা থাকার ফলে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, কলেজগুলিতে ৩,২৪০টি আসন থাকা সত্ত্বেও ছাত্র সংখ্যা ছিল ২,১৭৮ জন। প্রথম বর্ষে ভর্তির আসন সর্বমোট ৮৪০টি হওয়া সত্ত্বেও বছরে মাত্র ১৮৪ জন ডিগ্রী লাভ করেছিল এবং এক পর্যায়ে একটি কলেজে কিছুদিনের জন্য ভর্তি বন্ধ ছিল। দালান কোঠা ও অন্যান্য ভৌত ব্যবস্থার যথোপযুক্ত সংস্থান থাকলেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরীক্ষাগারের সরঞ্জামাদি ও কাঁচামালের অপ্রতুলতা একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত করেছিল।

১১.৩৬. ডিপ্লোমা স্তরের পলিটেকনিকগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা আলোচনার সময় পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার কারিগরি শিক্ষা প্রকল্প নামে একটি বিদেশী সাহায্যপুষ্ট বৃহদাকার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যেখানে বি, আই, টি, গুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে। এই প্রকল্পটিতে প্রায় ১৫২ কোটি টাকা ৬ বছরে বিনিয়োগ করা হবে। এর ফলে বি, আই, টি, গুলির জন্য শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষা, ওয়ার্কশপ, কর্মচারী ও গ্রন্থাগারিকদের প্রশিক্ষণ, শিল্পে বাস্তব প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি আমদানি, দালান-কোঠার প্রয়োজনীয় সংস্কার, ছাত্রদের বাস্তব প্রশিক্ষণ, পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত আছে। বি,আই,টি, গুলিও এখন শিক্ষা মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কেন্দ্রীয় কাউন্সিল কর্তৃক একাডেমিক ও প্রশাসনিক নীতিনির্ধারণের আলোকে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এর ফলে আশা করা যায় যে, পূর্বের অনেক

প্রশাসনিক জটিলতা দূর হবে। কমিশন আশা করে, এদেশের প্রকৌশল ও প্রযুক্তির সুষম বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনে, চারটি বিভাগের শিল্পায়নে ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এই বি,আই,টি. গুলি যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

১১.৩৭. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সালে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে জন্ম লাভ করে। এখানে বর্তমানে ৫টি অনুষদের অধীনে ১৩টি বিভাগের বিভিন্ন প্রকৌশল বিদ্যা ছাড়াও স্থাপত্য বিজ্ঞান ও গণিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়াদিতে অবশ্য বর্তমানে কেবল স্নাতকোত্তর (এম,ফিল,) ডিগ্রী দেয়ার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন সংখ্যা স্নাতক পর্যায়ে ২,২৯০, কিন্তু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২,৬৭৫ এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (এম. ফিল. ও পি-এইচ, ডি) আছে ৭৪৯ জন ছাত্রছাত্রী। প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রী পেয়ে আসছে। প্রথম বর্ষে আসন সংখ্যা ৬১২ (স্থাপত্যসহ) এবং গড়ে ডিগ্রী লাভ করে ৫৩৯ জন। অর্থাৎ ড্রপ আউটের ভাগ ৭.৫% মাত্র। বর্তমানে প্রায় ২৩০ জন শিক্ষক আছেন। যাঁদের মধ্যে ৪১% এম, এস, এবং ৩৮% জনের স্নাতক ডিগ্রী আছে। এই প্রতিষ্ঠানের সব ডিগ্রী ই আন্তর্জাতিক মানের বলে বহুদিন ধরে স্বীকৃত। তবে গবেষণা কার্যক্রম এখনো আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য একটি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও একটি জ্বালানি গবেষণা কেন্দ্র আছে।

১১.৩৮. গত ২২ বছর যাবত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিশেষ বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প ছাড়াই উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে। বর্তমানে যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারের সরঞ্জামে আমূল পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও নবায়নের বিশেষ প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এর জন্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বৈদেশিক মুদ্রা নিতান্তই অপ্রতুল। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজের উদ্যোগে উন্নত দেশসমূহের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পাঠক্রম প্রণয়ন ও যৌথ গবেষণা কার্যক্রমের জন্য সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলছে। কিছু কিছু প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং এর দ্বারা একাডেমিক কার্যক্রম ও গবেষণা কর্মকাণ্ডের কিছু উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। শিল্প কারখানায় কার্যরত প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও ব্যবস্থাপকদের জন্য নানা ধরনের শর্ট কোর্স, রিফ্রেশার্স কোর্স প্রভৃতি সাম্প্রতিককালে চালু করা হয়েছে।

১১.৩৯. ডিগ্রী স্তরে টেক্সটাইল টেকনোলজি শিক্ষার জন্য ঢাকায় অবস্থিত কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজি ১৯৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে স্নাতক পর্যায়ে চার বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য বর্তমানে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে। বর্তমানে অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪৭ জন এবং ১৯৮২ সাল থেকে আজ পর্যন্ত ৫৫ জন পাশ করে বের হয়েছে। বাংলাদেশের মোট শিল্পোৎপাদনের প্রায় অর্ধেকের উৎস বস্ত্র ও পাট শিল্প। এই খাতের জন্য যথোপযুক্ত নেতৃস্থানীয় জনশক্তি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। কেবল ডিগ্রী দান করার নিয়মাবলী প্রণয়নের মধ্যে প্রচেষ্টা ক্ষান্ত হয়ে থাকলে এ ব্যাপারে কোনো কার্যকরী উন্নয়ন সাধন হবে না। পর্যাপ্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামের ঘাটতি, কলেজটিকে ভৌত সুবিধাদির অপ্রতুলতা ও ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তির ব্যবস্থার অভাবজনিত কারণে কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন। অথচ বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভরশীল এই শিল্প খাতটিকে যথোপযুক্ত মানব সম্পদের সরবরাহের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা এই শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া আশু প্রয়োজন।

১১.৪০. ১৯৫০ সালে চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি ১৯৭১ সাল পর্যন্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত ছিল। এর পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে নেয়া

হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে এটিকে কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে উন্নীত করা হয়েছে এবং ১৯৭৯-৮০ শিক্ষাবর্ষ থেকে চার বছর মেয়াদী ডিগ্রী কোর্সে প্রথম ২০ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। ১৯৭৪-৮৭ পর্যন্ত ১৩৩ জন ডিপ্লোমা ও ৩৩ জন ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়। বর্তমান ডিগ্রী কোর্সে ৯৭ জন শিক্ষার্থী আছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে যে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অপ্রতুলতার জন্য অনেকেই কোর্স সমাপ্তির আগেই চলে যায়। টেক্সটাইল কলেজটির ন্যায় এটিও দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনমনে অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে প্রতীয়মান হয়। অথচ চামড়া দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রফতানি দ্রব্য। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকার চামড়া বিদেশে রফতানি করা হয়। দেশজ সম্পদের মান উন্নয়ন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে এর প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং এই শিল্প খাতে অভিজ্ঞ ও উচ্চশিক্ষিত নেতৃত্বদানের উপযুক্ত মানব সম্পদের বিশেষভাবে ও জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন। দেশজ সম্পদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে পদক্ষেপ এখনো নেয়া হয়নি।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ও সুপারিশমালা

১১.৪১. সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার মধ্যে মূলত কোনো বিভেদ নেই। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে তরুণ সমাজের উন্নয়নমুখী মূল্যবোধ গঠন করার লক্ষ্যে উভয় ধারার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি সমীচীন নয়। বিশেষ করে আমাদের শিক্ষিত সমাজে যেখানে শ্রমবিমুখতা বিরাজমান সেখানে সাধারণ শিক্ষার সংকীর্ণ সনাতনী ধারণা পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নতিই জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এ ব্যাপারে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে আমাদের সাংস্কৃতিক জীবন ধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে শ্রমজীবী মানুষের দক্ষতা ও শ্রমের স্বীকৃতিদানই হবে আমাদের জাতীয় কর্তব্য। প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য জাতীয় ভিত্তিতে সর্বস্তরে আনুষ্ঠানিক পর্যায় ছাড়াও উপানুষ্ঠানিক বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার বিস্তার প্রয়োজন হবে। এ বিস্তার এমনভাবে হবে যাতে তার প্রভাব কেবল ব্যক্তি জীবনকেই প্রভাবিত করবে না--বরং সমগ্র সমাজের জীবনযাত্রা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক ধারার উপরও প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। এই মাধ্যমেই দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সঠিক প্রক্রিয়ার সূচনা হবে এবং দেশে যথোপযুক্ত প্রযুক্তি পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত

১১.৪২. প্রকৌশল, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পূর্বশর্ত হল শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত নির্মাণ। বিশেষ করে, মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার যথোপযুক্ত ভিত নির্মিত না হলে পরবর্তী পর্যায়ে বৃত্তিমূলক বা পেশাগত শিক্ষা অর্থবহ করে তোলা কঠিন হয়ে পড়ে। বাস্তব সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগে দক্ষতা সৃষ্টি করার পূর্বশর্ত হল শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অনুসন্ধিৎসা ও সৃজনশীল ক্ষমতার বিকাশ সাধন। মাধ্যমিক পর্যায়ে সঠিক পদ্ধতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে এ সকল ক্ষমতার বিকাশ সাধন সম্ভব। উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যন্ত্রচালনার অভিজ্ঞতা সংগ্রহের চেয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক সাধারণ শিক্ষা (এমনকি প্রাথমিক স্তরেরও) শিল্প শ্রমিকের অনেক বেশি উপকারে আসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, অক্ষর জ্ঞান লাভের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে গড়পড়তা শতকরা ৩০ ভাগ, অথচ কেবল এক বছর কর্ম অভিজ্ঞতার ফলে অশিক্ষিত কর্মীর উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে মাত্র ১২ থেকে ১৬ ভাগ। সাম্প্রতিক বিশ্বে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তি উন্নয়নের যে প্রবল ধারার সূচনা হয়েছে তারসাথে তাল মিলিয়ে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখার জন্য প্রকৌশলী, প্রযুক্তিবিদ ও টেকনিশিয়ানদের বিজ্ঞান শিক্ষা যথোপযুক্ত হওয়া একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়।

সুপারিশ :

১১.৪৩. শিক্ষার সকল স্তরে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিভিন্ন দিক বিশেষ গুরুত্ব সহকারে শিক্ষা দান করা উচিত। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিজ্ঞান শিক্ষার পরিধি ও মান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন

১১.৪৪. আধুনিক বিশ্বে প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান উন্নয়নের ধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য সকল স্তরেই শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা, পরিবর্ধন ও পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি গতিশীল স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

১১.৪৫. শিল্প ক্ষেত্রে প্রযুক্তি বিকাশের প্রেক্ষাপটে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবদান নিশ্চিত করতে হলে কারিগরি শিক্ষাকে শিল্প কারখানার সাথে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট নীতিমালা নির্ধারণের ভিত্তিতে পাঠক্রম প্রণয়ণ করা অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য শ্রম ও জনশক্তি উন্নয়ন মন্ত্রীকে সভাপতি করে ২৮ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় প্রশিক্ষণ কাউন্সিল ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে। দেশের চারটি বি,আই,টি, (বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির) জন্য শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (কাউন্সিল অব ইনস্টিটিউট) গঠন করা হয়েছে। এর মূল দায়িত্ব ডিগ্রী পর্যায়ে প্রকৌশল শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। শিক্ষা বিষয়ক কর্মকাণ্ড ইনস্টিটিউটটির একাডেমিক পরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সার্বিকভাবে প্রকৌশল শিক্ষার নীতি নির্ধারণের ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত। কিন্তু নীতি বাস্তবায়ন প্রস্তুতির সাথে সমন্বয়, বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া এবং সৃষ্ট কারিগরি ডিপ্লোমা স্তরের জনশক্তির গুণগত মানের নিরিখে কারিগরি শিক্ষা মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই বলা চলে। এই অবস্থা নিরসনের জন্য এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রযুক্তির বিকাশের প্রেক্ষাপটে পলিটেকনিক থেকে মধ্য স্তরের কারিগরি জনশক্তির সৃষ্টির মাধ্যমে সঠিক অবদান রাখতে হলে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্তরের কার্যক্রমের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন।

সুপারিশ :

১১.৪৬. (১) ডিপ্লোমা স্তরের কারিগরি শিক্ষার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন। এই কাউন্সিলের মূল লক্ষ্য হবে, কারিগরি শিক্ষাকে শিল্প কারখানার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট দর্শনের ভিত্তিতে এ স্তরের শিক্ষার জন্য সুষ্ঠু নীতিমালা প্রণয়ন। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর সচিবালয় হিসাবে কাজ করবে। এই কাউন্সিলে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের মাধ্যমে মূল লক্ষ্যে পৌছাতে সমর্থ হবে :

- দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করে এই স্তরের জন্য শিক্ষার নীতি নির্ধারণ ;
- কারিগরি দক্ষ জনশক্তির কাজের বিবরণী প্রণয়ন এবং প্রযুক্তির বিকাশের সাথে তাল মিলিয়ে এর নবায়ন ;
- নীতি বাস্তবায়ন প্রস্তুতি পদ্ধতি প্রণয়ন ;
- কারিগরি শিক্ষার নীতি এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার উপর গবেষণা কার্য পরিচালনা এবং গবেষণা কার্যে উৎসাহ প্রদান ;

- কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে কার্য পরিচালনার গৃহীত বিধি এবং মান নির্ধারণ (নর্মস এণ্ড স্ট্যাণ্ডার্ড);
- কারিগরি শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের পদ্ধতি উদ্ভাবন; এবং
- কারিগরি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিতরণ।

(২) বি, আই, টি, গুলিকে আরো কার্যকর ও জোরদার করতে হবে এবং কোনো কোনো বিষয়ে 'সেন্টার অফ একসেলেন্স' হিসাবে গড়ে তুলতে হবে যেন এগুলি বিভিন্ন বিভাগের শিল্পায়নে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় প্রয়োজন অনুসারে প্রযুক্তি বাছাই, উন্নয়ন ও প্রয়োগে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

শিক্ষকের স্বল্পতা

১১.৪৭· প্রকৌশল, প্রযুক্তি, বৃত্তিমূলক প্রভৃতি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক নেই। যেখানে ভৌত অবকাঠামোর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করে এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয় সেখানে শিক্ষকের অভাবে সকল উদ্যোগ ও উদ্দেশ্য ব্যাহত করা অনভিপ্রেত। কারিগরি শিক্ষক নিয়োগে প্রচলিত বাধা -নিষেধ মুখ্যত এর জন্য দায়ী। এ ছাড়া প্রকৌশলী ও কারিগরি শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করার উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার তুলনায় অন্যত্র সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশি। কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষক সঠিক অনুপাতও রক্ষিত হচ্ছে না। ছুটি বা নানাবিধ কারণে শিক্ষক অনুপস্থিত থাকলে তার জন্য অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকে না বলেও এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থার নিরসন বাঞ্ছনীয়।

১১·৪৮· **সুপারিশ**

(১) কারিগরি শিক্ষক নিয়োগে কোনো প্রকার বাধা নিষেধ আরোপ না করা।

(২) যোগ্য শিক্ষক আকর্ষণের নিমিত্ত বিশেষ বেতনক্রম এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।

(৩) কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র শিক্ষক অনুপাত নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়:

(ক) ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষা-১০ : ১

(খ) বৃত্তিমূলক শিক্ষা -৮ : ১

(৪) ছুটি ও অন্যান্য কারণে অনুপস্থিতির ফলে যাতে কাজকর্ম ব্যাহত না হয় তার জন্য সকল প্রকার শিক্ষক পদের ১০% অতিরিক্ত পদসৃষ্টি করা প্রয়োজন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ:

১১.৪৯· ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়নসহ শিক্ষক প্রশিক্ষণ, তাঁদের উচ্চতর শিক্ষা লাভে উদ্বুদ্ধ করা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নবায়ন ও শিক্ষা পদ্ধতির আধুনিকীকরণের দিকে গুরুত্ব আরোপ করা একান্ত প্রয়োজন। বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা ব্যবস্থা বিস্তারের জন্য এটা অপরিহার্য। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষণের পরিধি ও ব্যাপকতা নির্ভর

করবে শিক্ষক কোন স্তরে শিক্ষাদান করছেন। অর্থাৎ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক ও মোটামুটি মধ্যম মেয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। অপরপক্ষে প্রকৌশল পর্যায়ে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হবে। তবে নতুন নতুন শিক্ষাদান উপকরণ ব্যবহার করার স্বার্থে মাঝে মাঝে শিক্ষকদের সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ দান করা প্রয়োজন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবে স্থাপিত ঢাকাস্থ কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজটি ও বগুড়াস্থ ভি, টি, টি, আইকে আরো কার্যকর ও গতিশীল করার জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বর্ধিত বেতন ও সুযোগ সুবিধা এবং দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করা দরকার। এ ধরনের প্রশিক্ষণ ও উচ্চতর যোগ্যতা লাভ করা ক্রমে ক্রমে শিক্ষকদের জন্য আবশ্যকীয় যোগ্যতা হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

সুপারিশ

১১.৫০ কারিগরি ও বৃত্তিমূলক ক্ষেত্রে যে দুটি শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আছে তাদের দক্ষতা ও কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা বাঞ্ছনীয়। প্রকৌশলী শিক্ষকদের জন্যও অনুরূপ মেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান প্রযুক্তি নির্ধারণ

১১.৫১. প্রযুক্তি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন হয়। অধুনা অনেক দেশে দূরশিক্ষণ, টি, ভি, ও ভি, ডি, ও-এর সাহায্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কারিগরি শিক্ষাদানের বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ শিক্ষকের অভাব দূর করা সম্ভব। দেশে টি ভি, নেট ওয়ার্ক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী এবং প্রকৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব হবে। এর জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার রূপরেখা এখনই প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কম্পিউটারের ব্যবহার ও কম্পিউটার নির্ভর কিছু পাঠ্যসূচী এখনই প্রবর্তন করা উচিত। সুতরাং এ ব্যাপারে কালক্ষেপ না করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ আশু প্রয়োজন।

১১.৫২. শ্রেণীকক্ষে ও পরীক্ষাগারসমূহে ব্যবহারিক শিক্ষাদান পদ্ধতি আরো পরিবর্ধন এবং ছাত্রছাত্রীর প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে এর সকল প্রয়োগ সম্পর্কে গবেষণা ও নতুন ধ্যান-ধারণা প্রবর্তন করা উচিত। শিল্প কারখানায় নিয়োজিত দক্ষ কর্মী, অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান ও প্রকৌশলীগণের পরামর্শের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের এই দিকটি আরো অর্থবহ করে তোলার প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীর সৃজনশীলতা বিকাশের ও উদ্যোগী প্রশিক্ষণার্থীকে তার তাত্ত্বিক জ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে তারা বাস্তব সমস্যাসমূহের সমাধানে ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সৃষ্টিধর্মী অবদান রাখতে পারবে।

সুপারিশ

১১.৫৩. শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাদান প্রযুক্তি আধুনিকীকরণের জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন। কম্পিউটার ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদান পদ্ধতি কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রচলনের ব্যবস্থা করতে হবে। একই সঙ্গে পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকীকরণও করতে হবে। এক্ষেত্রে দূরশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

ছাত্র ভর্তি ও নির্বাচন পদ্ধতি

১১.৫৪ বৃত্তিমূলক, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীর সাধারণ মান ও বিজ্ঞান শিক্ষার ভিত মূল্যায়নের পাশাপাশি স্বাভাবিক প্রবণতা, কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, কায়িক শ্রমের প্রতি মনোভাব প্রভৃতি পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজন হবে বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পন্থায় প্রণীত নির্বাচন পদ্ধতি। অবশ্য বিভিন্ন স্তরের প্রশ্নমালা ও নির্বাচন পদ্ধতি ভিন্ন হবে।

সুপারিশ

১১.৫৫ কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সকল পর্যায় ছাত্র-ভর্তি ও নির্বাচন পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত হতে হবে যাতে ছাত্রের সাধারণ মান, বিজ্ঞান শিক্ষার যোগ্যতা এবং স্বাভাবিক প্রবণতা পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়।

শিল্প সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পারস্পরিক সম্পর্ক

১১.৫৬. শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতষ্ঠানে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল ছাত্র ও শিক্ষক উভয়েরই প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে পলিটেকনিক ও বি, আই, টি-গুলির ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে এ ব্যবস্থা কেবল বিদেশী সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প চলাকালীন সময় চালু থাকবে বলে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করছেন। সকল স্তরে এ ধরনের প্রশিক্ষণের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনবোধে যথাযথ আইন প্রণয়ন করে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা প্রয়োজন। শিক্ষানবিশী কার্যক্রমের জন্য ১৯৬২ সালে প্রণীত আইন অবিলম্বে সংশোধন করা প্রয়োজন। বর্তমানে আইন বলবৎ থাকা সত্ত্বেও এর কার্যকর প্রয়োগ হচ্ছে না। এ আইন সংশোধন করে কেবলমাত্র অনুমোদিত বৃত্তিমূলক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রী প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণরত ব্যক্তিদেরই বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষানবিশ হিসাবে শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে শিল্প কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের একটি কার্যকর যোগসূত্র গড়ে উঠবে।

সুপারিশ

১১.৫৭. শিল্প ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করা প্রয়োজন। এ জন্য একটি আশু পদক্ষেপ হবে সকল স্তরে বাধ্যতামূলক শিক্ষানবিশী কার্যক্রম চালু করা। এর জন্য প্রয়োজন ১৯৬২ সালের শিক্ষানবিশী আইনের আমূল সংশোধন এবং একটি যুগোপযোগী আইনের প্রবর্তন।

কলেজ অব লেদার টেকনোলজী ও টেক্সটাইল কলেজ

১১.৫৮. এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর যোগ্যতা, যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ও শিল্প অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের জন্য আশু পদক্ষেপ নিতে হবে। দেশের কাঁচামাল সঠিক প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সেই সাথে রফতানি বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তারের জাতীয় প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এ দুটি প্রতিষ্ঠানের দ্রুত উন্নতি। এ ব্যাপারে সরকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প

প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্যোগ একান্তভাবে কাম্য। আশু প্রয়োজন মিটানোর জন্য বিদেশ থেকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য শিক্ষক আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা প্রয়োজন।

১১.৫৯. এ ছাড়াও দেশে ডিপ্লোমা টেক্সটাইল টেকনিশিয়ান উৎপাদনের জন্য বস্ত্র বিভাগের অধীনস্থ জেলা টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহের একটি বা দুটিকে উন্নীত করে সেখানে ডিপ্লোমা স্তরে টেক্সটাইল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

সুপারিশ

১১.৬০. কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ও টেক্সটাইল কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য জরুরী ভিত্তিতে শিক্ষকদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনমত সাময়িকভাবে বিদেশ থেকে শিক্ষক আনার ব্যবস্থা করা উচিত। এই উভয় ক্ষেত্রে ডিপ্লোমা স্তরে শিক্ষাদান প্রচলন করা প্রয়োজন।

টি, টি, সি, ও ভি, টি, আই-সমূহে অবকাশহীন কার্যক্রম প্রবর্তন

১১.৬১. টি,টি,সি এবং ভি,টি,আইগুলির প্রশিক্ষণার্থীদের একই শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি এবং একই বোর্ডের অধীনে (কারিগরি শিক্ষা বোর্ড) চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হয়। কিন্তু দু'রকমের প্রতিষ্ঠান দুটি পৃথক মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকার ফলে তাদের অবকাশ যাপনের নিয়মাবলী ভিন্ন প্রকারের। যথা-টি,টি,সিসমূহ অবকাশবিহীন দপ্তরের নিয়ম অনুসারে চলে। পক্ষান্তরে ভি,টি,আইসমূহ অবকাশ দপ্তরের নিয়ম অনুসারে চলে। ফলে ভি,টি,আই-এর চেয়ে টি,টি,সি-র প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। প্রশিক্ষণে এই প্রকার বৈষম্য বাঞ্ছনীয় নয়। অধিকন্তু পলিটেকনিকসমূহেও অবকাশ দপ্তরের নিয়মে চলায় কার্যকরী দিন কম থাকে এবং গত কয়েক বৎসর যাবত সেশন জটের মারাত্মক সমস্যায় জর্জরিত। এ ছাড়াও পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিগত জটিলতার জন্য এই কার্যক্রম বিলম্বিত হচ্ছে।

সুপারিশ

১১.৬২. টি,টি,সি ও ভি,টি,আই-তে প্রশিক্ষণে সমমানের কার্যকারিতা অর্জনের লক্ষ্যে ভি,টি,আই সমূহে অবকাশবিহীন কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। একই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে পলিটেকনিকসমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরীক্ষা গ্রহণের সময় সংক্ষিপ্তকরণের জন্য বাস্তব ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

টি,টি,সি ও ভি,টি, আই-এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষকর্মীদের নিয়োগ বিধি

১১.৬৩. সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কোনো অনুমোদিত নিয়োগবিধি নেই। ফলে যোগ্য-অযোগ্য বিচার না করে নিয়োগ কর্তার ইচ্ছামত কর্মী নিয়োগ করা হয়। অথচ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সনদপত্র থাকা সত্ত্বেও টি,টি,সি ও ভি,টি,আই এর প্রশিক্ষণার্থীদের অনেক সময় নিয়োগ করা হয় না।

সুপারিশ

১১.৬৪. সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে দক্ষকর্মী নিয়োগের একটি অনুমোদিত নিয়োগবিধি থাকা বাঞ্ছনীয়।

বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ

১১.৬৫. বাংলা ভাষায় বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল বিষয়ক পুস্তক রচনা করা একান্তভাবে আবশ্যক। এ ব্যাপারে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি প্রকল্প আছে যার মাধ্যমে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলির জন্য বাংলায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হবে। তবে নব্য উন্নত দেশ অর্থাৎ জাপান, কোরিয়া, চীন, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল স্তরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দান করা উৎপাদনমুখী শিক্ষার একটি বড় উপাদান। এর জন্য সে সব দেশে ব্যাপক সার্বক্ষণিক কার্যক্রম চালু আছে এবং অনুবাদ ও সৃজনশীল পুস্তক রচনা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। আমাদের দেশে এ ধরনের প্রচেষ্টা চালাতে হলে একটি কারিগরি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা বোর্ড স্থাপন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রস্তাবিত বোর্ডের কর্মকাণ্ডে থাকবে বিদেশী কারিগরি পুস্তক অনুবাদ, দেশীয় প্রয়োজনে অভিযোজন ও পরিবর্ধন এবং নিজেদের শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুন পুস্তক রচনার ব্যাপারে যথাযথ আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান। এর জন্য প্রয়োজন হবে উচ্চমানের দক্ষ পেশাদারী অনুবাদক যাঁরা নিজেরা প্রয়োজনীয় পরিভাষা প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত এবং অন্যান্য উৎসাহী অনুবাদক ও লেখককে সাহায্য ও পরামর্শ দিতে সক্ষম। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের ন্যায় প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যাপক ভিত্তিতে বাংলা ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভর্তুকির মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। যেসমস্ত এশীয় দেশসমূহ এ ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। উল্লেখযোগ্য যে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ কাজ সমাধা করা এবং পুস্তকসমূহের অভিন্ন মান ও পরিভাষা বজায় রাখা কখনো সম্ভব হবে না।

১১.৬৬. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অপ্রতুল উপকরণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নরত কারিগরি শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে বি,আই,টি ও পলিটেকনিকগুলিতে পরীক্ষাগারের উপকরণ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থাপন-সহ একটি বড় উন্নয়ন প্রকল্প না থাকায় পরীক্ষাগারসমূহের আধুনিকীকরণ সম্ভব হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এবং নতুন উদ্ভাবিত উপকরণের প্রয়োগযোগ্যতা নিরূপণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং দেশের সম্ভাবনাময় প্রকৌশলী ও স্থপতিদের আধুনিক প্রযুক্তি-বিদ্যার সাথে পরিচিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য একটি উন্নয়ন প্রকল্প অবিলম্বে হাতে নেয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। কলেজ অব লেদার টেকনোলজী ও টেক্সটাইল কলেজ-গুলির জন্যও এই ধরনের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

১১.৬৭. **সুপারিশ**

(১) বাংলা ভাষায় কারিগরি শিক্ষার সকল পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য একটি কারিগরি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা বোর্ড স্থাপন করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এ বিষয়ে নেতৃত্ব দিতে পারে।

(২) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরীক্ষাগারসমূহের উপকরণের অপ্রতুলতা দূরীকরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বি.আই.টি. তে এর জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। এর জন্য একটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করার মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রার সংস্থা করার প্রয়োজন।

কারিগরি জনশক্তির সঠিক চাহিদা নিরূপণ

১১.৬৮. বিভিন্ন স্তরে কারিগরি জনশক্তির সঠিক চাহিদা নিরূপণ একটি অবশ্য কর্তব্য। সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থার স্বার্থে প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান ও দক্ষ কর্মীর সংখ্যানুপাত নিরূপণ করা উচিত। বাংলাদেশে বাস্তবে এই অনুপাত ১:৩:২। একটি দ্রুত উন্নয়নশীল দেশে কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের জন্য উচ্চমানের প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানের অনুপাত বেড়ে যেতে পারে। তবুও আমাদের দেশে দক্ষ কারিগরের স্বল্পতা অনস্বীকার্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় আর্থসামাজিক ব্যবস্থার নিরিখে চাহিদা নিরূপণ করা প্রয়োজন। অন্যান্য ক্ষেত্রে জাতীয় ভাবে উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রার দিকে দৃষ্টি রেখে চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ ধরনের মানব সম্পদ পরিকল্পনা কেবল মাত্র একটি দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতেই করা সম্ভব। সঠিক মানব সম্পদ চাহিদা নির্ণয় করে এই অসঙ্গত অনুপাতের পরিবর্তন করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সুপারিশ

১১.৬৯. একটি দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় উন্নয়ন ও উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে কারিগরি মানব সম্পদের চাহিদা নিরূপণ জাতীয় ভিত্তিতে করা উচিত। এর মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের কারিগরি জনশক্তির সঠিক অনুপাত নির্ধারণ করা সম্ভব হবে।

বেসরকারী কারিগরি প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ

১১.৭০. দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেসরকারী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির বৃহত্তর ভূমিকা পালনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সময় এসেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে এগুলির রেজিস্ট্রেশন, স্বীকৃতি, অনুদান প্রদান ইত্যাদির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা ও বিধি প্রণয়ন আশু প্রয়োজন। কোর্সের মান নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত হবে। সকল দক্ষতা উন্নয়ন ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একই অভিন্ন শৃংখলার আওতায় আসা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে একটি নিয়ন্ত্রীকরণ অধ্যাদেশ বা আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

সুপারিশ

১১.৭১. বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিধি প্রণয়ন এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান সাপেক্ষে অনুদান প্রদান করা প্রয়োজন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ও দক্ষতার জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান

১১.৭২. উন্নত ও দ্রুত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এ ধরনের বা আরো অধিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মীকে বৃত্তিমূলক পেশায় মাস্টার ক্রাফটসম্যান ও টেকনিশিয়ান পর্যায়ে মাস্টার টেকনিশিয়ান নামে জাতীয় স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং আর্থসামাজিক মূল্যায়নে তাঁরা প্রকৌশলীর সমমানের স্বীকৃতি পেয়ে থাকেন। আমাদের দেশেও অনুরূপ স্বীকৃতিদানের সময় এসেছে।

সুপারিশ

১১.৭৩. জাতীয় ভিত্তিতে মাস্টার ক্রাফটসম্যান ও মাস্টার টেকনিশিয়ান নির্বাচন ও তাঁদের আর্থসামাজিক স্বীকৃতি দান করা উচিত। এর জন্য প্রয়োজন দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য গুণের পরিমাপ ও মূল্যায়নের জন্য একটি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এ দায়িত্ব পালন করবে।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও তার আত্মীকরণ

১১.৭৪. বিশ্বের প্রযুক্তি বিজ্ঞানের প্রবল ধারার সাথে তাল মিলিয়ে চলা এবং তা থেকে দেশের উন্নয়নে প্রয়োগযোগ্য অংশ আত্মীকরণের জন্য স্নাতক, স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও সৃষ্টিধর্মী প্রযুক্তি গবেষণার প্রয়োজন আজ প্রশ্নাতীত। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদিও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আন্তর্জাতিক মানের বলে স্বীকৃত হয়ে আসছে, সেখানে গবেষণা কার্যক্রম ও প্রযুক্তির নতুন নতুন ধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কার্যকরী ব্যবস্থা এখনো উচ্চ মানের নয়। এর জন্য আশু ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের সুযোগ থেকে আমাদের দেশ অনেক পিছিয়ে যাবে। এর জন্য প্রকৌশল বিশ্ব-বিদ্যালয় ছাড়াও বি.আই.টি, কলেজ অব লেদার টেকনোলজী ও টেক্সটাইল কলেজগুলিতে শিক্ষকদের গবেষণা কাজে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করতে হবে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তি আত্মীকরণের নিমিত্তে কম্পিউটার প্রকৌশল, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সৌর শক্তি প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের নব নব চিন্তাধারা প্রযুক্তি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ ছাড়া যে সমস্ত শিল্প আমাদের দেশে খুব সম্ভাবনাময় যেমন, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, পেট্রো-রসায়ন, সার ইত্যাদিতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ এবং এ সকল বিষয় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দেশের আর্থিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এই সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি চর্চার জন্য নতুন কোনো ভৌত অবকাঠামো আলাদাভাবে তৈরি করার কথা চিন্তা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এগুলির সূচনা করা সমীচীন হবে বলে মনে হয়। এতে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর গবেষণার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে এবং উচ্চমানের সৃষ্টিধর্মী প্রকৌশলী তৈরির পথ সুগম হবে।

সুপারিশ

১১.৭৫. অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আত্মীকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে প্রকৌশল শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও বি.আই.টি. গুলিতে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ ও উৎসাহ প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন। সম্ভাবনাময় প্রাগ্রসর বিষয়গুলিতে স্নাতকোত্তর শিক্ষা গবেষণার জন্য প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়গুলির মধ্যে কম্পিউটার প্রকৌশল, বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সৌর শক্তি প্রযুক্তি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

অধ্যায় ১২

কৃষি শিক্ষা

ভূমিকা

১২·১· কৃষি শিক্ষা বলতে ভূমি কর্ষণ তথা ভূমি প্রস্তুতকরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকারের শস্য উৎপাদন থেকে শুরু করে ফলমূল, হাঁস-মুরগী, পশু-পাখি, মৎস্য, বৃক্ষ প্রভৃতির উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত শিক্ষা বোঝায়। তাই এ সবের সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা যথা—কৃষি, পশু চিকিৎসা, পশু পালন, কৃষি প্রকৌশল, মৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি ও বনবিজ্ঞান কৃষি শিক্ষার আওতাভুক্ত। কৃষি একাধারে যেমন একটি ফলিত বিজ্ঞান তেমনি একটি প্রায়োগিক ও পেশামূলক শিক্ষা এবং ব্যবসাও বটে। এর পরিধি ও ক্ষেত্র সুদূর প্রসারী। আধুনিক কৃষি শিক্ষায় এসব দিকেই সুষম দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

কৃষি/কৃষি শিক্ষার গুরুত্ব

১২·২· বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কৃষির গুরুত্ব সর্বাধিক এবং অত্যন্ত ব্যাপক। কৃষি উৎপাদনের উপর ভিত্তি করেই এ দেশের জাতীয় আয়-ব্যয়, বাজেট প্রণয়ন ও উন্নয়ন নীতি পরিকল্পনা করা হয়। এ দেশে শ্রম বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র কৃষি। কর্মসংস্থানে কৃষি খাতের গুরুত্ব অত্যধিক। কৃষির উন্নতি বিধানের মাধ্যমেই এ দেশে শ্রমের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব।

১২·৩· বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয় তার অধিকাংশই কৃষিজাত। অতএব এদেশের মুদ্রামান কৃষি উৎপাদনের উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। দেশে বিদ্যমান খাদ্য ঘাটতি কৃষির উপর নির্ভরশীলতা সাম্প্রতিককালে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত সামগ্রিকভাবে খাদ্য ঘাটতি পূরণ সম্ভব নয়।

১২·৪· কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে কৃষি সংক্রান্ত উপকরণ সরবরাহের উপর। আধুনিক কৃষি উপকরণসমূহের যথাযথ প্রয়োগবিধির সাথে কৃষকদের পরিচিতিদানের মাধ্যমে তার প্রয়োগকে একদিকে যেমন নিশ্চিত করা যায়, অন্যদিকে তেমনি কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার পথও সুগম হয়ে আসে। বস্তুত লাগসই প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ বিধান ও ব্যবস্থাপনার সাধনই দেশজ কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত।

১২·৫· কৃষির উন্নতি নির্ভর করে উন্নত মানের জ্ঞান আহরণ ও তার সার্থক প্রয়োগের উপর। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার এমন বিন্যাস প্রয়োজন যাতে কৃষি বিজ্ঞান শিক্ষার স্থান সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট থাকে। কৃষিতে নিয়োজিত দেশের বিরাট জনসংখ্যাকে সচেতন, সুদক্ষ ও উৎপাদনক্ষম জনশক্তিতে রূপান্তরিত করাই এই শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ জন্য শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদিকে যেমন সার্বজনীন তথা গণমুখী রূপে ঢেলে সাজাতে হবে, অপর দিকে তেমনি শিক্ষার সকল স্তরে কৃষি শিক্ষার প্রভাবকে নিশ্চিত করতে হবে। কৃষি ও কৃষিবিদদের ফলপ্রসূ সমন্বয়ের মাধ্যমে দেশের কৃষি ব্যবস্থার অগ্রগতির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এ ধরনের সমন্বিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কৃষি ক্ষেত্রে অভিপ্রেত রূপান্তর আনয়ন সম্ভব।

কৃষির বর্তমান অবস্থা

১২·৬· বাংলাদেশের কৃষকসমাজ, ঔপনিবেশিক আমলের কৃষি ব্যবস্থার যে সকল সমস্যায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছে তা থেকে আজও তাদের মুক্তি ঘটেনি। তাই দেশের পশ্চাদপদ কৃষির অবস্থা বিবেচনায় নিতে হলে কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদদের সমস্যাই সবার আগে আসে।

১২·৭· কৃষি উৎপাদনের নিয়ামকসমূহ হচ্ছেঃ কৃষক, কৃষকের খামার, মূলধন, প্রয়োজনীয় উপকরণ, কৃষি পণ্যের বাজার, আবহাওয়া ইত্যাদি। অন্যান্য দেশের কৃষকদের তুলনায় বাংলাদেশের কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র জীবন যাপন করেন। তাঁরা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত এবং তাঁদের আর্থ-সামাজিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। বছর বছর বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কৃষি উপকরণের অনিশ্চিত বাজারদর ও খাদ্য ঘাটতি দেশে মারাত্মক অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করছে। ফলে ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাদারগণ ক্রমাগত ভূমিহীন হয়ে পড়ছে। এ ছাড়াও প্রত্যেক শ্রেণীর কৃষককেই শিক্ষা সংকট, সঠিক নেতৃত্বের অভাব, শ্রমের অনুপযুক্ত ব্যবহার, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ইত্যাদি সমস্যার শিকার হতে হচ্ছে।

১২·৮· বাংলাদেশের কৃষি খামারের আকার ও আয়তন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খন্ড জমি, মৃত্তিকা ক্ষয়, সনাতন ভূমিস্বত্ব প্রথা এবং জমির ত্রুটিপূর্ণ ব্যবহারের ফলে কৃষকরা প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এ ছাড়াও নিম্নমানের উৎপাদনশীল গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী ও এদের রোগ বালাই, পশু খাদ্য ও প্রজনন ব্যবস্থাপনার অভাব এবং মাছ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবও কৃষকদের প্রতিনিয়ত মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন করছে। সামগ্রিকভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাব এ দেশে কৃষি উন্নতিকে নিদারুণভাবে ব্যাহত করছে।

১২·৯· মূলধন ও মূলধনের অন্তর্ভুক্ত কৃষি উপকরণগুলি (সার, বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ-ব্যবস্থা, হালের বলদ ইত্যাদি) যথাসময়ে সংগ্রহ করতে না পারা এবং শিক্ষার অভাবে নতুন উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ব্যবহারের সম্যক জ্ঞান না থাকায় কৃষকগণকে সব সময় জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে সংগত কারণেই উৎপাদন কমে যাচ্ছে। বিদ্যমান ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থাপনার ফলে কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

কৃষি শিক্ষার বর্তমান ব্যবস্থা

১২·১০· আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রকৃতি পাঠের মাধ্যমে গাছপালা, মাটি ও আবহাওয়া সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে। পাঠদান পদ্ধতি আকর্ষণীয় না হওয়ার এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব থাকায় এ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মনে তেমন একটা রেখাপাত করতে পারে না।

১২·১১· বর্তমানে এগারটি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এ, টি, আই,) এবং একটি উচ্চতর কৃষি সম্প্রসারণ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (হাইটি) আছে। এ, টি, আই, গুলিতে দু'বছর মেয়াদী সার্টি-ফিকেট কোর্সে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সার্টিফিকেটধারী সরকারী চাকুরিরত ব্লক-সুপারভাইজার-দের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য হাইটিতে এক বছর মেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এসব প্রশিক্ষণে কৃষি সম্প্রসারণ বিষয়ে জোর দেয়া হয়ে থাকে।

১২·১২· স্নাতক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষার জন্য এদেশে একটি পৃথক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও দুটি অধিভুক্ত কলেজ রয়েছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কৃষি বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি শুধুমাত্র কৃষিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর জন্য গাজীপুরে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) নামে একটি ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে। কৃষি, পশু চিকিৎসা, পশু পালন, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ-বিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি এবং মৎস্যবিজ্ঞান এই ছয়টি অনুষদে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, নানাবিধ বাস্তব অবস্থার কারণে এখানে তাত্ত্বিক শিক্ষার সংগে প্রায়োগিক জ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান ঈপ্সিত পর্যায়ে উন্নীত করা সম্ভব হয়নি।

১২.১৩. বর্তমানে বনবিজ্ঞান শিক্ষার যে ব্যবস্থা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনপ্রাপ্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানে রয়েছে, তাতে দু'ধরনের স্নাতক ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। কৃষি নির্ভর এই দেশের সার্বিক শিক্ষা পদ্ধতিতে কৃষি শিক্ষা প্রাধান্য না পাওয়ায় প্রচলিত শিক্ষানীতি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে অবদান রাখতে পারেনি। অধিকন্তু উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন শিক্ষায় তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় তা বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করছে।

সুপারিশ

১২.১৪. জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় কৃষি শিক্ষার সুষ্ঠু প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত সুপারিশ সমূহ পেশ করা হলঃ

প্রাথমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা

১২.১৫. প্রাথমিক শিক্ষাই শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। কৃষিকর্মের প্রতি দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের শ্রদ্ধাশীল ও উৎসাহী করে তুলতে হলে বাল্যকাল থেকেই এদের জন্য পাঠ্যসূচীতে কৃষি বিষয়ক জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে যখন বর্ণ-মালা শিক্ষা দেয়া হয় তখন বিভিন্ন উদাহরণ, উপমা ও ছড়া-গানে কৃষি বিষয়ক জনপ্রিয় রচনাদি ও তথ্যাদি পরিবেশন করতে হবে। পরবর্তী শ্রেণীসমূহে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে, বিজ্ঞান ও জীব বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীতে, এমন কি গণিতে, গ্রামীণ জীবনের কর্মকান্ডে, পরিবেশ ও সমস্যা সম্পর্কে কৌতূহল উদ্দীপক বিষয়াদির সন্নিবেশ ঘটাতে হবে। প্রাথমিক পর্বের শিক্ষাতেই বিভিন্ন শস্য, ফল-মূল, শাক-সব্জী, গাছ-পালা, গৃহপালিত পশু ও পাখি, মাছ ও কৃষি যন্ত্রপাতির সঙ্গে এদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। শ্রেণীকক্ষ বহির্ভূত শিক্ষার অংশ হিসাবে বাগানে, মাঠে ও কৃষি খামারে বিরাজমান সাধারণ প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে এদের একাত্ম করে তুলতে হবে। এর ফলে, আশা করা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর যারা আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাবে না তারা জীবিকার সংগ্রামে বহির্মুখী না হয়ে গ্রামীণ ও কৃষি কর্মকান্ডের সঙ্গেই নিজেদের জড়িয়ে রাখতে বেশি আগ্রহী হবে। আর যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে তারা কৃষি বিষয়ক পাঠ্যসূচীতে অধিকতর যত্নশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা

১২.১৬. মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা অন্তর্ভুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীকে কৃষির সকল বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান এবং কোনো একটি বিষয়ে হাতে কলমে বিশেষ জ্ঞান দান করা। ফলে পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না পেলেও সে পেশা হিসাবে কৃষিকে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারবে। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে সকল শিক্ষার্থীকে মৃত্তিকা, শস্য ও ফলমূল, গাছপালা, পশু সম্পদ এবং মৎস্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি পরিচিতি, পুষ্টি বিজ্ঞান, কৃষি ব্যবস্থাপনা ও অর্থ সংস্থান ও পণ্য বিপণন ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান দিতে হবে। মাধ্যমিক কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের জন্য বিজ্ঞান/কৃষিতে স্নাতক শিক্ষকদের কৃষি বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয়। এই প্রশিক্ষণ বি, এড, কোর্সে প্রচলন করা যেতে পারে অথবা এতদলক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ব-বিদ্যালয়েও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১২.১৭. নিম্নবর্ণিত চারটি বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃষি শাখায় নিতে হবেঃ—

১। কৃষি বিজ্ঞান

২। রসায়ন বিজ্ঞান

৩। পদার্থ বিজ্ঞান।

৪। গণিত

প্রস্তাবিত কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের পাঠ্যসূচীতে খাদ্যশস্য, কৃষিতত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, কৃষি যন্ত্রপাতি, শস্য সংরক্ষণ, বন বিজ্ঞান, কৃষি অর্থনীতি, হাঁস-মুরগী ও পশু পালন, পশু চিকিৎসা ও মৎস্যবিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

১২·১৮· দেশের অনেক কলেজের নিজস্ব জমি ও পুকুর আছে। আর যে সমস্ত শিক্ষায়তনে জমি নেই সেগুলিতে এর ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবহারিক কৃষি শিক্ষার জন্য এগুলির প্রয়োজন। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এমনভাবে কৃষির ব্যবহারিক পাঠ বিন্যস্ত করতে হবে যাতে তারা কৃষকের জমি, পুকুর, গো-সম্পদ ও গৃহস্থালি থেকে তাদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেতে পারে। এভাবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা সমাপনান্তে যারা প্রকৌশল, চিকিৎসা, ফলিত বিজ্ঞান ও অন্যান্য শাখায় উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণে ব্রতী হবে তারা কৃষি ও কৃষকের সমস্যা তথা গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকবে। ভবিষ্যতে তারা যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে তখন গ্রামীণ জীবন সম্পর্কে তাদের কোনো অনীহা থাকার কথা নয়। এভাবে শিক্ষা গ্রহণ শেষে যারা উচ্চতর কৃষি শিক্ষা নিতে আসবে, উন্নততর জ্ঞান আহরণে এটি তাদের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি হিসাবে কাজ করবে। যারা এ পর্যায়েই তাদের শিক্ষা-জীবন শেষ করবে তাদের কেউবা পরিণত হবে দক্ষ কৃষকে, কেউবা মুক্ত বিপণন ব্যবস্থায় গ্রামীণ পরিবেশে তাদের কর্মসংস্থান খুঁজে নেবে। অনেকে আবার স্থানীয় সরকারী ও বেসরকারী কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সহকারী হিসাবেও নিয়োজিত হতে পারবে।

কৌশলী স্তরে কৃষি শিক্ষা

১২·১৯· দেশে প্রচুর সংখ্যক কৃষি বিষয়ক কৌশলী (টেকনিশিয়ান) তৈরির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কৃষক ও সম্প্রসারণ বিজ্ঞানীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে যারা কৃষি, পশু সম্পদ ও মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মে নিয়োজিত থাকে তারা এই কৌশলী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তবে পেশাগত বিশেষত্বের কারণে তাদের কর্মস্থল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে হয়ে থাকে। গ্রামে মাঠ কর্মী হিসাবে, গবেষণা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানীর সহকারী হিসাবে এবং কৃষি শিক্ষা কিংবা কৃষি বিষয়ক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানের সহকারী হিসাবে তারা কাজ করে থাকে। বর্তমানে এদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিদপ্তরে এদের চাহিদা রয়েছে।

১২·২০· কৃষির যে কোনো বিষয়ে কৌশলী পর্যায়ে অধ্যয়নের জন্য প্রার্থীকে মাধ্যমিক বিভাগে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হতে হবে। কৃষিতে কৌশলী পর্যায়ে শিক্ষাক্রম দু'বছর/তিন বছর মেয়াদী হতে পারে। এদের পাঠক্রম এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে তারা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা কিংবা গবেষণা বিজ্ঞানীদের নিয়ন্ত্রণে থেকে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব দক্ষতার সাথে সমাধা করতে পারে। একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, বাংলাদেশে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কৃষি সমস্যাবলী শুধু বিপুল ও ব্যাপকই নয়, জটিল তথা গভীরও বটে। সঠিক পরিচর্যার অভাবে এই সমস্যাবলী ক্রমাগত জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করছে। বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে এর মোকাবেলা করতে হলে আগামী দিনে কৃষক পর্যায়ে এমন কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে যা কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধিকে নিশ্চিত করার পাশাপাশি এর সম্মুখধারাকে অব্যাহত রাখবে।

উচ্চতর কৃষি শিক্ষা

১২·২১· দেশের কৃষি শিক্ষাকে দ্রুত আধুনিক করে গড়ে তুলতে হলে প্রচুর সংখ্যক কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট তৈরি করা প্রয়োজন। বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকাস্থ বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট ও পটুয়াখালি কৃষি কলেজ থেকে বছরে প্রায় ৭০০ কৃষি গ্র্যাজুয়েট তৈরির সুযোগ আছে। গাজীপুরে ইপসা নামক কৃষি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবলমাত্র স্নাতকোত্তর পর্বের শিক্ষাক্রম চালু রয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায় দেশে কৃষি বিষয়ক গ্র্যাজুয়েট ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পুরোদমে কৃষি বিষয়ক শিক্ষাসূচী অনুসরণ করা হলে

প্রতিষ্ঠানগুলিতে কৃষি শিক্ষক ও অধ্যাপকের চাহিদা মেটাতে গিয়ে এই ঘাটতির পরিমাণ আরো বেড়ে যাবে। এরূপ পরিস্থিতিতে এখন থেকেই পরিকল্পিতভাবে অধিক পরিমাণে কৃষি গ্র্যাজুয়েট তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া দরকার।

১২·২২· বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পর্বে বর্তমানে কৃষি, পশু চিকিৎসা, পশু পালন, কৃষি প্রকৌশল ও কারিগরি, কৃষি অর্থনীতি ও গ্রামীণ সমাজ বিজ্ঞান ও মৎস্যবিজ্ঞানে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী প্রদান করা হচ্ছে এবং অধিভুক্ত কৃষি কলেজ দু'টি থেকে শুধুমাত্র কৃষিতে চার বছর মেয়াদী স্নাতক ডিগ্রী প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। বন বিজ্ঞানেও অনুরূপভাবে শুধুমাত্র চার বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স চালু থাকবে। এখানে গুরুত্ব সহকারে বলা দরকার যে এ ধরনের স্নাতক কোর্সের মেয়াদ ও মানে কোনো প্রকার তারতম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। এদের প্রতিটি বিষয়ে যারা স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক সে সকল শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক (বিজ্ঞান) ও উচ্চ মাধ্যমিক (বিজ্ঞান/কৃষি-পূর্ব বিজ্ঞান) সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হতে হবে। কৃষি বিষয়ক স্নাতকদের সম্পর্ক যেহেতু গ্রামীণ উৎপাদন ও জীবন ধারার সংগে বিশেষভাবে জড়িত, সেহেতু স্নাতক পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ সকল অনুষদেরই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হওয়া দরকার। তাছাড়া স্নাতক পর্যায়ে তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি প্রায়োগিক জ্ঞানের উপর বেশি জোর দিতে হবে এবং প্রায়োগিক শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে। অধিভুক্ত কলেজ দুটিতে বর্তমানে শিক্ষা ও গবেষণার যে সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা অপর্যাপ্ত। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

১২·২৩· স্নাতকোত্তর পর্যায়ে (মাস্টার্স ডিগ্রী) জন্য শিক্ষাসূচী হবে এক বছর মেয়াদী। ঐই পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি গবেষণা প্রদান করতে হবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্নাতক পর্বের মেধাবী শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাবে। এ পর্যায়ে যারা অধ্যয়ন করবে সাধারণত তাদের কর্মক্ষেত্র হবে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ে যাদের মধ্যে বিশেষ মেধার পরিচয় পাওয়া যাবে তাদের জন্য পি এইচ, ডি-র সুযোগ থাকবে এবং পি এইচ, ডি-র সুযোগ সুবিধা জোরদার করতে হবে। দেশের কৃষি সমস্যাবলী এসব গবেষণার বিষয়বস্তু হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গাজীপুরের সালনায় স্নাতকোত্তর কৃষি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি বিভাগে পি,এইচ,ডি কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে। এসবের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা সুবিধার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। গবেষণাগারে দেশের কৃষি উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং নতুন নতুন লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দিতে হবে।

১২·২৪· কৃষির বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিপুল সংখ্যক কৃষি বিজ্ঞানীর চাহিদা পূরণের জন্য বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিভুক্ত কলেজসমূহে যথাযথ সুযোগ সৃষ্টি করে বর্তমান আসন সংখ্যা চাহিদা অনুযায়ী বৃদ্ধি করা যেতে পারে। এর পরও যদি কৃষির সার্বিক উন্নয়নে আরো অধিক সংখ্যক কৃষি গ্র্যাজুয়েট প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে নতুন কৃষি কলেজ বা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। জনশক্তির পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের অধিকতর চাহিদা পূরণের জন্য সরকার কর্তৃক গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশের শর্ত পূরণ সাপেক্ষে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সূত্র নং এ ১২/১ইউ-১৩/৮১/১৫০(১০) এড্‌, তারিখ ৮ই এপ্রিল, ১৯৮১তে লিপিবদ্ধ করা আছে) দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ক কোর্স চালু করা যেতে পারে।

১২·২৫· ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের সংগে একমত হয়ে আমরা সুপারিশ করি যে, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, মৃত্তিকাবিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অনার্স ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স চালু করা বাঞ্ছনীয়।

কৃষি প্রশিক্ষণ

১২·২৬· গ্রাম বাংলায় শিক্ষার নিম্নমান ও জনগণের কুসংস্কারাচ্ছন্নতা কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করছে। চিরায়ত কৃষি প্রযুক্তি পরিবর্তন ও নতুন প্রযুক্তি ধারণের মাধ্যমে কৃষিকে আধুনিক করতে হলে বয়স্ক শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সুতরাং সাক্ষরতা কার্যক্রমকে অবশ্যই কৃষি ও গ্রামীণ জীবনমুখী হতে হবে। এ শিক্ষার আয়োজন মহল্লা ও গ্রাম ভিত্তিতে গড়ে উঠতে পারে। প্রতি গ্রামে যেখানে স্কুল বা মাদ্রাসা রয়েছে প্রথমে সেই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যার পর গ্রামের জনগণের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষার আসর বসতে পারে। এতে সাধারণ অক্ষর জ্ঞান ও হিসাব বিজ্ঞানসহ আধুনিক কৃষি উপকরণ, কৃষি ঋণ ও কৃষি উৎপাদন, পশু পালন/চিকিৎসা, মৎস্য ও কৃষিজ উৎপন্নের সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ সম্পর্কিত অতি সাম্প্রতিক তথ্যাবলী আলোচিত হতে পারে। এই শিক্ষা প্রচারের জন্য দূরশিক্ষণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের ব্লক সুপারভাইজারের পাশাপাশি পশু পালন/চিকিৎসা, মৎস্য ও অন্যান্য বিভাগের মাঠকর্মীদের নেতৃত্বে প্রতি গ্রামে ও ব্লকে এ শিক্ষাক্রম চালু হতে পারে। এ ছাড়া গ্রামের বাছাইকৃত আদর্শ কৃষকদের নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য উপজেলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্রগুলিকে উপজেলা কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে সুপরিকল্পিতভাবে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১২·২৭· প্রাথমিক স্কুলে কৃষি সম্পর্কে জ্ঞানদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের প্রাথমিক ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসাবে কৃষি পড়তে হবে।

১২·২৮· মাধ্যমিক স্তরে কৃষি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা হবে কৃষি শিক্ষার ডিগ্রীধারী অথবা এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞান স্নাতক ডিগ্রীধারী। কৃষি কৌশলীর শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের যোগ্যতা হতে হবে কৃষি শিক্ষায় ডিগ্রী। তবে এক বছরের বিশেষ প্রশিক্ষণসহ কৃষিতে কৌশলী পর্যায়ের সার্টিফিকেটধারী এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেতে পারেন।

১২·২৯· কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ও মাঠকর্মীদের আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার রূপান্তর সম্পর্কে নিয়মিতভাবে অবহিত রাখার জন্য চাকুরিকালীন বিবিধ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, সাভারস্থ পশুসম্পদ অধিদপ্তরের অফিসার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং জয়দেবপুরস্থ সার্ডি এবং মৎস্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহে অনুরূপ প্রশিক্ষণের সুযোগ-সুবিধা ও আসন সংখ্যা বাড়াতে হবে। এছাড়া প্রতিটি কৃষি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ও কৃষি কলেজে এ ধরনের প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার।

১২·৩০· দেশের কৃষি বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার সুষম প্রসার ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির পাঠক্রম, শিক্ষার্থীর যোগ্যতা, মেয়াদ, শিক্ষামান ইত্যাদি ব্যাপারে ন্যূনতম নীতিমালার ভিত্তিতে সমন্বয় সাধনের জন্য অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে একটি সমন্বয়মূলক সংস্থা গঠন করা যেতে পারে।

১২·৩১· মাতৃভাষার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা প্রদান করতে হবে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় বইপত্রের ব্যবস্থা করা দরকার।

অধ্যায়-১৩

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা

১৩.১. বাংলাদেশের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়। বিভিন্ন পর্যায়ে চিকিৎসা শিক্ষার মানের ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটছে। এজন্য সামগ্রিক শিক্ষা পরিমন্ডলে দেশের বর্তমান অবস্থা কিছুটা দায়ী হলেও চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক জটিলতাই এর মূল কারণ। চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই অচল অবস্থার অবসান সম্ভব নয়। চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবিলম্বে স্বাস্থ্য প্রশাসন থেকে পৃথক করা প্রয়োজন।

১৩.২. দেশে জনকল্যাণমুখী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রয়োজনও এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান ব্যবস্থায় হাসপাতাল কেন্দ্রিক নিরাময়মূলক চিকিৎসা শিক্ষার উপর অধিক জোর দেয়া হয়। রোগ প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও তদসম্পর্কিত সামাজিক সমস্যাবলীর শিক্ষার উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপিত হয়নি। ডিগ্রী পূর্ব পর্যায়ে ও রেজিস্ট্রেশনের আগে যে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু আছে তাও সন্তোষজনক নয়।

১৩.৩. বর্তমানে দেশে চিকিৎসক, সেবক-সেবিকা, চিকিৎসা কৌশলী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। যে কোনো ব্যাপক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা গ্রহণের পথে এটা বিরাট অন্তরায়। দেশের প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যাও অপ্রতুল।

১৩.৪. নিম্নেবর্ণিত পরিসংখ্যান থেকে পূর্বে উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। চিকিৎসক আছেন প্রতি ৬,২০০ অধিবাসীর জন্য ১ জন। দেশে সমস্ত বিষয়ে বিশেষজ্ঞের মোট সংখ্যা ১,০৫০ জন। দন্ত চিকিৎসকের সংখ্যা ৫১০ জন। এছাড়া অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা কৌশলীদেরও স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় প্রতিটি ক্ষেত্রে তীব্র স্বল্পতা রয়েছে।

১৩.৫. পরবর্তী সারণী থেকে তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় আমাদের দেশে চিকিৎক ও অন্যান্যদের ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা করা যায়।

১৩.৬. **সারণীঃ** তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞের ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা।

	তৃতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার শুরুতে সংখ্যা	পাঁচশালা পরিকল্পনার লক্ষ্য
গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসক	১৬,০০০	২২,৫০০
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ	১,০৫০	২,১০০
দন্ত চিকিৎসক	৫১০	৭৫০
সেবাকর্মী	৬,৫০০	১০,২০০
মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট	৩,৬০০	৪,৬০০
গবেষণাগার কৌশলী	১,৩০০	২,০০০
রঞ্জনরশ্মি কৌশলী	৩৫০	৭০০
ফার্মাসিস্ট (ডিপ্লোমা)	৫,০০০	৮,৫০০
স্যানিটারী	১,২৬৫	১,৫০০
সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক	১,৮৭০	৪,৫০০
স্বাস্থ্য সহকারী	১৫,০০০	২৩,০০০

পূর্বোক্ত সারণী থেকে প্রতীয়মান হয় যে বর্তমানে চিকিৎসক, বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজনের মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে।

১৩·৭· বর্তমান ব্যবস্থার মাধ্যমে আগামীতে যে বিপুল সংখ্যক বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি করার প্রয়োজন আছে, তা সম্ভব নয়। কিন্তু স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রসার ও জনগণকে প্রতিরোধ ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সুবিধা আরো অধিকভাবে দেয়া সম্ভব হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মী তৈরি হলে। কাজেই প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ জরুরী ভিত্তিক করা প্রয়োজন।

১৩·৮· দেশের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষই গ্রামে বাস করে। অথচ গ্রামের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা অত্যন্ত অপ্রতুল। চিকিৎসক ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর গ্রামে যাবার অনীহা রয়েছে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও কমিউনিটি মেডিসিন যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। ফলে শিক্ষাকালে চিকিৎসা কর্মীগণ গ্রামে বিদ্যমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও গ্রামীণ জনগণের বিশেষ সমস্যাদি সম্বন্ধে যথেষ্ট জানতে পারেন না। গ্রামীণ স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে এ অজ্ঞতার জন্য গ্রামে চিকিৎসকের আলাদা ও কঠিন একটি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের শিক্ষা যথেষ্ট নয়।

১৩·৯· পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতা যে অনেক রোগের অন্যতম কারণ হতে পারে, সে সম্পর্কে যথেষ্ট বক্তব্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত নেই। পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যাধিসংক্রান্ত সমাজ বিজ্ঞানও শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পায়নি।

১৩·১০· আমাদের দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির উপর যথাযথ প্রাধান্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় দেয়া হয়নি। এর কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে প্রধানত বিদেশী চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন করে শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদের দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এতে চিকিৎসা কর্মীগণ আরো কার্যকরভাবে আমাদের চিকিৎসা সমস্যাদির সম্মুখীন হতে পারবেন।

১৩·১১· বিশ্বে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রোগ নির্ণয় ও নিরাময় উভয় ক্ষেত্রেই অগ্রগতি হয়েছে। এই উন্নতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্তি ভিত্তিক। এদেশে প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতির অনেক স্থানে অভাব রয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এর ফলে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের চিকিৎসা ব্যবস্থার মানের তুলনায় আমাদের চিকিৎসা কর্মী ও চিকিৎসা ব্যবস্থার মানের ক্রমাবনতি ঘটছে। চিকিৎসা কর্মী ও ব্যবস্থার মানের উন্নতি করতে হলে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, এ গুলির যথাসাধ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও এগুলির ব্যবহারে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী তৈরি প্রয়োজন।

১৩·১২· চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার মানের সঙ্গতি রক্ষা শুধুমাত্র বই-পত্র ও সাময়িকী দ্বারা সম্ভব নয়। , কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রগতি ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি ভিত্তিক। এ জন্য শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের কয়েক বছরের ব্যবধানে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা দরকার।

১৩·১৩· বর্তমানে জ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসারের কারণে এক ব্যক্তির পক্ষে চিকিৎসার সকল শাখায় পারদর্শিতা অর্জন সম্ভব নয়। অথচ চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষ শাখার প্রয়োজনীয় সম্প্রসারণ দেশে হয়নি। কিছু কিছু বিশেষজ্ঞ বিভাগ যেমন বায়োকেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়লজি, ভাইরোলজি শুধুমাত্র আই, পি, জি, এম, আর, এ সীমাবদ্ধ। এর ফলে স্বাস্থ্য কর্মীদের মানের তুলনামূলক অবনতিই যে ঘটছে তাই নয়, জনগণ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৩·১৪· দেশের চিকিৎসা সমস্যাদির সমাধানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা নির্ণয়ের জন্য এদেশেই গবেষণা প্রয়োজন। অথচ গবেষণা পদ্ধতি শিক্ষার ব্যবস্থা কার্যক্রমে নেই। শিক্ষকদেরও গবেষণায় উৎসাহিত করার ব্যবস্থা নেই।

১৩·১৫· বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থায় চিকিৎসকদের নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও যথেষ্ট নয়। এতে চিকিৎসকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য প্রতিযোগিতামূলক ক্যারিয়ার প্লানিং-এর ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৩·১৬· চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় যদি আমাদের দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য ও তৎসম্পর্কিত পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক সমস্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয় ও প্রত্যক্ষভাবে এসব সমস্যা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রাখা হয়, তা হলে ভবিষ্যৎ চিকিৎসকগণ দেশের সমস্যা সমাধানের জন্য যোগ্যতর ভাবে গড়ে উঠবেন এবং গ্রামের দিকে আকৃষ্ট হবেন। এই সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সব স্বাস্থ্যকর্মীর সম্পর্কে এই সমস্ত যুক্তি প্রযোজ্য। মোটকথা, চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে বাস্তবভিত্তিক করতে হবে, প্রসার করতে হবে ও উন্নতমানের করতে হবে, যেন আমরা আরো অধিক সংখ্যক স্বাস্থ্যকর্মী পেতে পারি—যারা সমাজ সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, দক্ষ ও উন্নত মানের।

আদর্শ ও উদ্দেশ্য

১৩·১৭· চিকিৎসা শিক্ষার আদর্শ ও উদ্দেশ্য হবেঃ

(ক) আমাদের দেশের বিশেষ স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তৈরি করা—যাঁরা সমাজ ও মানুষের সেবায় উদ্বুদ্ধ হবেন এবং যাঁদের মান উন্নত হবে। এই উদ্দেশ্যে চিকিৎসা শিক্ষাকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে।

(খ) ডাক্তারের সংখ্যার সঙ্গে সেবক-সেবিকার সংখ্যা বর্তমানে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। চিকিৎসা কৌশলী ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীও স্বল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় তৈরি করতে হবে। এদের উপযুক্ত মান বজায় রাখতে হবে।

(গ) সেবক-সেবিকা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর নিজ নিজ বিষয়ে উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এতে তাদের কাজে উৎসাহ বাড়বে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসা শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টির প্রয়োজনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার যথাযথ সম্প্রসারণ প্রয়োজন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সুফল দেশের জনগণকে পৌঁছে দেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, বিশেষজ্ঞদের প্রশিক্ষণ ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশমালা

এম, বি, বি, এস, কোর্স

১৩·১৮· ভর্তির যোগ্যতাঃ চিকিৎসা কলেজগুলিতে মেধা ও প্রবণতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা ও অংকশাস্ত্র সহ বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ ছাড়া চিকিৎসা ও সমাজসেবার প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবণতা যাচাই করার জন্য ব্যবস্থা থাকতে হবে।

কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম

১৩·১৯· বর্তমান কোর্স ও শিক্ষা কার্যক্রম পাঠ্য-পুস্তকের উপর বেশি নির্ভরশীল। দেশের প্রকৃত স্বাস্থ্য সমস্যা ও বিশেষ রোগসমূহ সম্পর্কে কার্যক্রমে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ব্যবহারিক শিক্ষার উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সঙ্গে কার্যক্রমের সম্যক পরিচিতি ঘটানোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। বায়ো-কেমিস্ট্রি, মাইক্রোবায়লজী, কমিউনিটি মেডিসিন, আচরণ বিজ্ঞান ইত্যাদির উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এম, বি, বি, এস, কোর্সের দৈর্ঘ্য পাঁচ বছর চালু থাকবে। সম্পূর্ণ কোর্স দুই ভাগে বিভক্ত করা হবে। দুই বছর প্রি-ক্লিনিক্যাল এবং তিন বছর ক্লিনিক্যাল।

প্রি-ক্লিনিক্যাল কোর্সের পঠিতব্য বিষয়সমূহ

১৩·২০· এ্যানাটমী, ফিজিওলজী, ফার্মাকোলজী, বায়ো-কেমিস্ট্রি, সাইকোলজী, সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বায়োস্ট্যাটিসটিক্স বিষয়সমূহ পড়ান হবে। এই শিক্ষাদান কোর্স দুই বছর চলবে। তবে উক্ত বিষয়গুলি ব্যবহারিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে সংক্ষিপ্ত করতে হবে। সাইকোলজী, সমাজ বিজ্ঞান ও প্রাথমিক বায়োস্ট্যাটিসটিক্স শিক্ষাদান প্রথম বছরে সীমাবদ্ধ থাকবে। বিভিন্ন বিষয়ে কত সময় শিক্ষাদান করা হবে তা বিষয়গুলির গুরুত্বের সঙ্গে সমতা রেখে নির্ধারণ করতে হবে। সম্পূর্ণ শিক্ষাদান সময় না বাড়িয়েই নতুন বিষয়বস্তুসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ক্লিনিক্যাল কোর্সের পঠিতব্য বিষয়সমূহ

১৩·২১· তৃতীয় বর্ষেঃ (ক) মাইক্রবায়লজী ও ইমিউনোলজি, (খ) প্যাথলজী, (গ) প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিন, (ঘ) টক্সিকোলজী ও ফরেনসিক মেডিসিন, (ঙ) মেডিসিন, (চ) সার্জারী।

১৩·২২· চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষেঃ (ক) মেডিসিন, (খ) সার্জারী, (গ) স্ত্রী-রোগ বিদ্যা ও ধাত্রীবিদ্যা, (ঘ) প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিন।

১৩·২৩· এ্যানাটমীঃ প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষেই এ্যানাটমী শিক্ষা সম্পন্ন হবে। পাঠক্রমের মধ্যে মানবদেহের গঠন, স্নায়ুতন্ত্রের এ্যানাটমী, এমব্রয়লজী ও হিসটোলজী অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। বিষয়গুলি শিক্ষার জন্য বক্তৃতা, আলোচনা, প্রতিপাদন (ডেমনেস্ট্রেশন) ও ব্যবহারিক কাজ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হবে। মানব শরীরের গঠন সম্পর্কে ছাত্ররা শব-ব্যবচ্ছেদ করে শিখবে। বর্তমানে তাত্ত্বিক আলোচনার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। এই রীতি পরিবর্তন করে হাতে-কলমে শিক্ষাদান ও ব্যবহারিক ও প্রয়োগগত দিকের উপর অধিক জোর দিতে হবে।

১৩·২৪· ফিজিওলজীঃ এই বিষয়ে শিক্ষাদান প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষেই সম্পূর্ণ হবে। পাঠক্রমে মানবদেহের ফিজিওলজীর প্রয়োগগত দিকের উপর গুরুত্ব দেয়া উচিত। তাত্ত্বিক শিক্ষাকে যথাসম্ভব জীবন্ত ও মানবদেহের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা সম্পূর্ণ করে তুলতে হবে। বক্তৃতা ও হাতে-কলমে শিক্ষা ছাড়াও আলোচনা ও ডেমনেস্ট্রেশনের সাহায্যে শিক্ষাকে আরো জোরদার করা প্রয়োজন হবে।

১৩·২৫· প্রাণ-রসায়ন (বায়োকেমিস্ট্রি)ঃ পৃথিবীর উন্নত দেশসমূহের চিকিৎসা শিক্ষায়তন-গুলির মত আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও পৃথক ও স্বনির্ভর প্রাণ-রসায়ন বিভাগ থাকা উচিত। প্রাণ-রসায়নের মূল বিষয়গুলি ছাড়াও রোগ-ব্যাধির সঙ্গে প্রাণ-রসায়নের সম্পর্ক সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করা উচিত। বিভিন্ন ব্যাধির উৎপত্তির কারণ, সেই সঙ্গে ব্যাধির

কারণে দেহে যে সমস্ত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তা জানা দরকার। খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক শিক্ষাদানের উপরও গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে প্রাণ-রসায়ন শিক্ষাদান সম্পন্ন হবে।

১৩·২৬· **আচরণ বিজ্ঞানঃ** বর্তমান যুগে আচরণ বিজ্ঞানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুত একজন স্বাস্থ্যকর্মীর সাফল্য অনেকাংশে নির্ভর করে মানবদেহ, মন ও পারিপার্শ্বিকতার পারস্পরিক সম্বন্ধ সম্পর্কে তার জ্ঞানের উপর। কাজেই মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের যথোপযুক্ত জ্ঞানদান করতে হবে।

১৩·২৭· **প্রাথমিক বায়োস্ট্যাটিসটিক্সঃ** এই বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান প্রতিরোধ বিজ্ঞান ও কমিউনিটি মেডিসিনের জন্য অপরিহার্য। এছাড়া ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য চিকিৎসকদের প্রস্তুত করার এটি প্রথম পদক্ষেপ।

১৩·২৮· **ফার্মাকোলজীঃ** বিভিন্ন ধরনের ঔষধাদির রাসায়নিক রূপ ও গুণাগুণ, দেহের অভ্যন্তরে ঔষধাদির পরিবর্তন, ক্রিয়াকলাপ, দেহ প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব, বিভিন্ন রোগে ঔষধাদির প্রয়োগরীতি (সাধারণ ফার্মাকোলজী, ফার্মাকোডিনামিক্স, ফার্মাকোথেরাপিউটিক্স) এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। অত্যাবশ্যকীয় ঔষধের বিষয় পাঠ্যসূচীতে থাকবে এবং তার ব্যবস্থাপনা সম্বন্ধে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করতে হবে। ফিজিওলজী, প্রাণ-রসায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার আলোকে এই বিষয়ে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। ঔষধাদির কাজ সম্বন্ধে উপলব্ধি সহজতর করার জন্য ঔষধাদি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাত্রদের প্রদর্শন করা এবং তাদের নিজেদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দেয়া বাঞ্ছনীয়। শিক্ষাদানের উপকরণ এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত ঔষধাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের সম্যক জ্ঞান হয়।

১৩·২৯· এ্যানাটমী, ফিজিওলজী, বায়োকেমিস্ট্রি, আচরণ বিজ্ঞান প্রাথমিক বায়োস্ট্যাটিসটিক্স ও ফার্মাকোলজী প্রথম ও দ্বিতীয় বছরে পাঠ শেষ করা দরকার। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন হতে পারে।

১৩·৩০· **প্যাথলজীঃ** সাধারণ প্যাথলজী, হিস্টলজী, ক্লিনিক্যাল প্যাথলজী এই পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তৃতীয় বর্ষে এই শিক্ষা দেয়া যেতে পারে। বিভিন্ন রোগে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গে পরিবর্তন ঘটে এবং সেজন্য মানবদেহের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের বৈকল্য ঘটে—এ সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞানদান প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, প্রতিপাদন . প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে অংশ গ্রহণ ছাড়াও ছাত্রদের ক্লিনিকো-প্যাথলজীক্যাল কনফারেন্স, পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষা, সেমিনার ইত্যাদিও শিক্ষা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১৩·৩১· **টক্সিকোলজী ও ফরেনসিক মেডিসিনঃ** বর্তমানে যে পাঠ্যসূচী আছে তাতে আরো হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। শিক্ষার্থীদের আরো অধিক সংখ্যক মেডিকো-লিগ্যাল পোস্ট-মর্টেম পরীক্ষায় উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৩·৩২· মাইক্রোবায়লজী, প্যাথলজী, সাইটোবায়লজী, টক্সিকোলজী ও ফরেনসিক মেডিসিন পড়ানোর পর তৃতীয় বর্ষ শেষে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

১৩·৩৩· **প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিনঃ** রোগ প্রতিরোধের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে এম,বি,বি,এস কোর্সের শেষ বছরে প্রতিরোধমূলক শিক্ষাকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৩·৩৪· জনস্বাস্থ্য পরিচালনা, জনসংখ্যা পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান এই বিষয়গুলিকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

১৩·৩৫· তাত্ত্বিক শিক্ষা যথাসম্ভব সীমিত করে বাস্তবমুখী শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়া উচিত। এজন্য সামাজিক স্বাস্থ্য কর্মসূচী ও হাতে-কলমে কাজে অংশ গ্রহণের উপর জোর দিতে হবে। পঞ্চম বর্ষের শেষে শিক্ষার্থীদের চূড়ান্ত মূল্যায়ন হওয়া উচিত।

মেডিসিনঃ নিম্নোক্ত বিষয়গুলি মেডিসিনের অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

১৩·৩৬· (ক) ইমিউনোলজীক্যালও জেনেটিক রোগসমূহ. (খ) সংক্রামক ব্যাধি, (গ) কার্ডিওলজী, (ঘ) গ্যাস্ট্রএন্টারলজী, (ঙ) নিউরোলজী, (চ) নেফ্রলজী, (ছ) হেমাটলজী, (জ) এনডোক্রাইনোলজী ও মেটাবলিক রোগসমূহ, (ঝ) রেসপিরেটরী রোগসমূহ, (ঞ) রিউমাটলজী, (ট) মেডিক্যাল অনকোলজী, (ঠ) শিশুরোগ বিদ্যা, (ড) মানসিক রোগ বিদ্যা, (ঢ) চর্ম ও যৌন ব্যাধি।

১৩·৩৭· আমাদের দেশের রোগসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠক্রম প্রস্তুত করতে হবে। রোগীদের শয্যাপার্শ্বে, রোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধানসমূহের শিক্ষাদান, ক্লিনিকো-প্যাথলজীক্যাল কনফারেন্স, সেমিনার ইত্যাদির উপর আরো জোর দিতে হবে। সামাজিক পরিবেশে মেডিসিন শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রের বহির্বিভাগে কিছুদিন কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

১৩·৩৮· প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের জন্য মেডিসিনে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসায় যন্ত্রপাতির ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এইসব যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাদি (যেমন, এনডোস্কোপী, আলট্রাসনগ্রাফী, ইকোকার্ডিওগ্রাফী, ই,ই,জি,ই,এম,জি) সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা শিক্ষার্থীদের থাকা প্রয়োজন। এজন্য এই সমস্ত পরীক্ষা ও চিকিৎসার প্রক্রিয়ায় কিছু সময় জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা পাঠক্রমে থাকা দরকার।

১৩·৩৯· মানসিক ব্যাধি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সজাগ করা এবং সে সম্বন্ধে তাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রতিটি চিকিৎসা কলেজ হাসপাতালে মানসিক ব্যাধি বহির্বিভাগ ও হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকা উচিত। অনেক রোগ মানসিক সমস্যা উদ্ভূত এবং অন্যান্য অনেক রোগে মানসিক সমস্যার দৈহিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাধারণ চিকিৎসকেরাও তাঁদের দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের অনেক রোগীর সম্মুখীন হন। সে কারণে মানসিক ব্যাধি সমূহ সম্বন্ধে ছাত্রদের যথোপযুক্ত জ্ঞানদান করা প্রয়োজন। এজন্য কিছু সময় মানসিক ব্যাধি বিভাগে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

১৩·৪০· এম,বি,বি,এস, কোর্সের শেষ তিন বছরে মেডিসিনে শিক্ষাদান করা দরকার। প্র্যাকটিক্যাল, যন্ত্রপাতির সাহায্যে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা, ক্লিনিক্যাল বৈঠক ইত্যাদিকে বাধ্যতামূলকভাবে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং, সব বিষয়ে মূল্যায়নের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

সার্জারীঃ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ সার্জারীর অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) সাধারণ সার্জারী, (খ) অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত সার্জারী, (গ) বিশেষ বিভাগসমূহ, যেমন চক্ষু ব্যাধির সার্জারী, নাক, কান ও গলার সার্জারী।

১৩.৪১ সার্জারী শিক্ষা দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলির উপর ভিত্তি করে হতে হবে। এজন্য সার্জারী চিকিৎসার উপযোগী রোগীদের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কিত সার্জারীর উপর আরো গুরুত্ব দিতে হবে। শল্য চিকিৎসার বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিচিতি ও তাদের ব্যবহার প্রণালী শিক্ষার উপরও জোর দেয়া উচিত। ক্লিনিক্যাল বৈঠক, সমন্বিত সিম্পোজিয়াম, ক্লিনিকোপ্যাথলজীক্যাল কনফারেন্স ইত্যাদিও সার্জারী চিকিৎসা শিক্ষার অংশ হওয়া উচিত। ব্যাপক সামাজিক পরিবেশে সার্জারী চিকিৎসার বিশেষ দিকগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিতি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সে কারণে সার্জারী চিকিৎসার বহির্বিভাগে শিক্ষার্থীদের কার্যকালের অর্ধেক সময় নিকটস্থ গ্রাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাটান উচিত। সেখানে বাস্তব সামাজিক পারিপার্শ্বিকে সার্জারী চিকিৎসার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে তারা শিক্ষা লাভ করবে।

১৩.৪২ সার্জারী চিকিৎসার প্রতিটি বিভাগে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সার্জারী চিকিৎসাবিদদের সাহায্য করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অস্ত্রোপচার সমূহে অংশগ্রহণ করা উচিত। ছোটখাট অস্ত্রোপচার, যেগুলি সাধারণ চিকিৎসকগণকে প্রায়ই করতে হয়, সেগুলি হাতে-কলমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। রোগসমূহের জরুরী অবস্থা বিশেষত আমাদের দেশে যেসব জরুরী অবস্থা বেশি দেখা যায়, সেগুলি নির্ণয়ে চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার জন্য জরুরী রোগ বিভাগে শিক্ষার্থীদের কিছুকাল বাধ্যতামূলকভাবে কাজ শিখতে হবে।

১৩.৪৩ চক্ষুব্যাধির সার্জারী ও নাক, কান ও গলার রোগের সার্জারীর শিক্ষাদান পৃথকভাবে হওয়া উচিত। এখানেও শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষাদানের উপর অধিক জোর দেয়া দরকার।

১৩.৪৪ কতকগুলি রোগ সম্বন্ধে সমন্বিত আলোচনা সভা ও সেমিনার করে যুক্তভাবে শিক্ষাদান করার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

রেডিওলোজীঃ রোগ নির্ণয় বিষয়ের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রদের যথেষ্ট জ্ঞানদান করা প্রয়োজন, যাতে তারা এই বিদ্যার সাহায্যে সাধারণ রোগসমূহ নির্ণয়ে সক্ষম হয় এবং রেডিওগ্রাফ মূল্যায়নের মাধ্যমে রোগ নির্দেশ করতে পারে।

১৩.৪৫ **স্ত্রী-রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা**ঃ স্ত্রী-রোগ ও ধাত্রীবিদ্যার শিক্ষাদান চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষ এ দু'বছরব্যাপী হওয়া উচিত। হাতে-কলমে প্রত্যক্ষ শিক্ষাদানের উপর আরো জোর দেয়া উচিত। এজন্য স্ত্রী-রোগ চিকিৎসার বহির্বিভাগে ও পাঠকক্ষে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক শিক্ষা দিতে হবে। মানুষের বংশ বৃদ্ধির প্রক্রিয়া ও জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতিটি দিক সম্পর্কে ছাত্রদের ভালভাবে শিক্ষিত করা উচিত। স্ত্রী-রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপের সাথে সাথে সার্জারী, মেডিসিন, শিশুরোগ ও স্পেশাল মেডিসিনে সমন্বিত শিক্ষাদান করা উচিত। এ্যানেসথেসিয়া, ব্লাড ট্রান্সফিউশন ইত্যাদি বিষয়েও বক্তৃতা ও প্রতিপাদনের ব্যবস্থা করা উচিত।

১৩.৪৬ প্রস্তাবিত চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার তালিকাঃ

(ক) **প্রাক-ক্লিনিক্যাল কোর্স**

প্রথম বর্ষঃ এ্যানাটমী
ফিজিওলজী
বায়োকেমিস্ট্রি

ফার্মাকলজী

আচরণ বিজ্ঞান (মনোবিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞান)

প্রাথমিক বায়োস্ট্যাটিসটিক্স।

দ্বিতীয় বর্ষঃ এ্যানাটমী

ফিজিওলজী

বায়োকেমিস্ট্রি

ফার্মাকলজী।

(খ) ক্লিনিক্যাল কোর্স

তৃতীয় বর্ষঃ মাইক্রবায়লজী

প্যাথলজী

প্রতিরোধমূলক ও ফরেনসিক মেডিসিন

টক্সিকোলজী ও ফরেনসিক মেডিসিন

মেডিসিন

সার্জারী।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষঃ মেডিসিন

সার্জারী

স্ত্রী-রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা

প্রতিরোধমূলক ও কমিউনিটি মেডিসিন।

চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ষঃ গ্রামীণ ব্যবহারিক শিক্ষা (তিন মাস)।

১৩·৪৭ স্নাতক ডিগ্রী পরবর্তী প্রশিক্ষণকাল—এক বছর, মেধার ভিত্তিতে পছন্দ অনুযায়ী বিষয়ে ছয় মাস এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে ছয় মাস।

গ্রামীণ ব্যবহারিক চিকিৎসা শিক্ষা

১৩·৪৮· গ্রামের জনগণের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সমস্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করা উচিত। কারণ এটা করা হলে গ্রামের জনগণের মধ্যে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্য সহজতর হবে এবং জনগণ চিকিৎসকদের সেবা আরো ভালভাবে পাবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাকালের একটা নির্দিষ্ট সময় উপযুক্ত শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে গ্রাম্য চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে কাজ করা উচিত। সেখানে মেডিসিন, শল্যবিদ্যা, শিশু চিকিৎসা বিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা, কমিউনিটি মেডিসিন ইত্যাদি বিষয়ের সমন্বিত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। এই কার্যকালে ছাত্ররা সমাজ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা যেমন প্রতিষেধক টিকাদান ও অন্যান্য স্বাস্থ্য কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে।

১৩·৪৯· সার্বক্ষণিকভাবে গ্রামে সমন্বিত চিকিৎসা শিক্ষা পদ্ধতি চালু করা এই উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হবে। পরীক্ষামূলকভাবে সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষক নিয়ে এক বা দু'টি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে এই ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা

১৩·৫০· বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মেধা ও জ্ঞান সঠিকভাবে করা সম্ভব হয় না। এজন্য মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন।

১৩·৫১· শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাতের হার ১ঃ৫ হওয়া উচিত। বর্তমান মূল্যায়ন পদ্ধতিকে সংশোধন করতে হবে। এজন্য লিখিত পরীক্ষা অবজেকটিভ ও সমাধান ধরনের হতে হবে। মৌখিক, প্র্যাকটিক্যাল ও ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় আরো গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সব পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন সমভাবে করার জন্য মৌখিক পরীক্ষায় পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নমালা থাকা উচিত।

১৩·৫২· বিশেষ মেধাবী শিক্ষার্থীদের পরিশ্রম ও মেধার স্বীকৃতিস্বরূপ পদক, প্রশংসা-পত্র ও অন্যান্য পুরস্কার দানের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল

১৩·৫৩· ব্যবহারিক প্রশিক্ষণকাল এক বছরের হওয়া উচিত। এর মধ্যে ছয় মাস সদ্য ডিগ্রীপ্রাপ্ত চিকিৎসকগণ মেধার ভিত্তিতে স্ব স্ব নির্বাচিত বিভাগে প্রশিক্ষণ লাভ করবে এবং বাকি ছয় মাস পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার মাধ্যম

১৩·৫৪ আমাদের দেশের চিকিৎসা বিদ্যা আন্তর্জাতিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিবর্তনশীল। উপযুক্ত মানের ও আধুনিক তথ্য সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িকী বর্তমানে বাংলায় নেই। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখতে গেলে অদূর ভবিষ্যতে ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা প্রয়োজন। তবে পাঠ্যপুস্তক ও সাময়িকী বাংলায় প্রস্তুত করার প্রচেষ্টায় আরো জোর দেয়া প্রয়োজন, যাতে ভবিষ্যতে বাংলাকেই মাধ্যমে হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

১৩·৫৫· **পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা**

ডিপ্লোমা — ডিগ্রী — মেম্বারশিপ ও ফেলোশিপ পরীক্ষা

বিশেষ বিষয়সমূহে

(ক) মৌলিক বিষয়সমূহে
এম ফিল ও পি, এইচ. ডি

(খ) ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহে — কলেজ অব ফিজিসিয়ান্স ও
মাস্টার ডিগ্রী ও পি, এইচ, ডি — সার্জন্স

১৩·৫৬· বর্তমানে যে সকল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিতে সুযোগ-সুবিধা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। চিকিৎসা কলেজগুলির বিভিন্ন বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রী ও ফেলোশীপ কোর্স শিক্ষাদানের উপযুক্ততা যাচাই করে সেগুলিতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ চালু করার উৎসাহ দেয়া প্রয়োজন।

১৩·৫৭· বর্তমানে দেশে কয়েকটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন ও রিসার্চ একমাত্র ইনস্টিটিউট যেখানে বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাদান, কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য ইনস্টিটিউটসমূহ যেমন হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট, চক্ষুরোগ ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে একটি বা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাদান করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান ও তার বিভিন্ন বিভাগের ইতিমধ্যেই যা উন্নতি হয়েছে তাতে আরো কিছু বিষয়ে যেমন, গ্যাস্ট্র এনটারলজী, নেফ্রোলজী, নিউরোলজী ইত্যাদি বিষয়ে সম্প্রসারিত বিভাগ থাকলে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার পরিধি আরো বিস্তৃত হবে।

ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ

১৩·৫৮· দেশের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিনের স্থান অনস্বীকার্য। ১৯৬৫ সালে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য এ প্রতিষ্ঠানটি বর্তমান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের একাংশে স্থাপিত হয়। পরে ইনস্টিটিউটকে বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ইনস্টিটিউটেই চিকিৎসা বিদ্যার অনেক বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা-দান ও রিসার্চের ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে একমাত্র মৌলিক বিষয়সমূহ (যেমন, এ্যানাটমী ফিজিওলজী, বায়োকেমিস্ট্রি, ফার্মাকলজী, প্যাথলজী, মাইক্রোবায়োলজী) ও ক্লিনিক্যাল বিষয়সমূহের অধিকাংশ বিষয়ে (যেমন, মেডিসিন, সার্জারী, স্ত্রী-রোগ ও ধাত্রীবিদ্যা, চক্ষুরোগ, নাক-কান-গলার রোগ) এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ বিভাগসমূহে (যেমন গ্যাস্ট্র এ্যানটারলজী, নেফ্রোলজী, কার্ডিওলজী, নিউরো মেডিসিন, নিউরোসার্জারী, সাইকিয়াট্রি) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের চিকিৎসা কলেজগুলির শিক্ষকদের অর্ধেকেরও বেশি এবং জেলা পর্যায়ে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলে এই ইনস্টিটিউটে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। কাজেই শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ তৈরির এই ইনস্টিটিউটের অবদান একক। এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম আরো উন্নত ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

১৩·৫৯· নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রতিষ্ঠানটিকে যথাযথ অবদান রাখার জন্য গড়ে তুলতে হবে:

(ক) পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল শিক্ষা, (খ) অন্য হাসপাতালে চিকিৎসা করা সম্ভব নয় এরূপ জটিল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা, (গ) স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা (ঘ) সাধারণ চিকিৎসকদের ও চিকিৎসা কলেজ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স কোর্স চালান, (ঙ) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে শিক্ষক বিনিময়।

দন্ত চিকিৎসা শিক্ষা

১৩·৬০· দন্ত চিকিৎসা শিক্ষার বিরাজমান পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। দেশে দন্ত চিকিৎসকদের দারুণ স্বল্পতা আছে। সেজন্য আরো দন্ত চিকিৎসা কলেজ স্থাপন করা দরকার। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে চিকিৎসা কলেজগুলির দন্ত চিকিৎসা বিভাগগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্রদের দন্তরোগ সম্বন্ধে শিক্ষাদান করা উচিত যাতে তারা সাধারণ দন্তরোগসমূহের চিকিৎসা করতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দন্তরোগ চিকিৎসা ও শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও স্থানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৩.৬১. ঢাকা দন্ত চিকিৎসা কলেজকে চিকিৎসা কলেজগুলির মত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত হবে।

১৩.৬২. ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি মেধা ভিত্তিক হওয়া উচিত। শিক্ষকদের নিয়োগ চিকিৎসা কলেজগুলির মত একই নীতিতে হওয়া উচিত।

সেবাবিদ্যা শিক্ষা

১৩.৬৩. সেবাকর্মে নিযুক্ত স্বাস্থ্য-কর্মীদের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কার্যক্রম প্রয়োজনীয়ঃ

(ক) সেবাকর্মে নিয়োজিত কর্মীদের প্রতিটি স্তরের কাজ ও ভূমিকার মধ্যে পরিষ্কার বিভাগ থাকা উচিত।

(খ) সেবক-সেবিকাদের চাকুরির ব্যবস্থা ও শিক্ষায় সেবাকর্মীদেরই নেতৃত্ব দেয়া উচিত।

(গ) যোগ্য সেবাকর্মীদের শিক্ষাদান ত্বরান্বিত করা উচিত।

১৩.৬৪ বর্তমানে বাংলাদেশে ৩৮টি সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে (৮টি মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন ও ৩০টি জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন)। এ সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ৩৮০০ ছাত্রী-সেবিকা বর্তমানে প্রশিক্ষণরত আছে। সেবিকাদের ৪ বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণ, তন্মধ্যে ৩ বছর জেনারেল নার্সিং ও এক বছর মিডওয়াইফারী। প্রশিক্ষণ শেষে বাংলাদেশ নার্সিং কাউন্সিল কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত হয়ে তাঁরা হাসপাতাল ও হেলথ কমপ্লেক্সগুলিতে চাকুরিতে নিয়োজিত হন। বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ে (যেমন, মানসিক ব্যাধি, অর্থপেডিক, বক্ষ ব্যাধি ইত্যাদি) এক বছর মেয়াদী পূর্ণাঙ্গ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয়েছে। এ ছাড়াও ঢাকাস্থ একটি মাত্র সেবা মহাবিদ্যালয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষক ও প্রশাসক তৈরির জন্য ডিগ্রী কোর্স দেয়া হচ্ছে (বি, এস-সি নার্সিং ও বি, এস-সি পাবলিক হেলথ নার্সিং)। ডিপ্লোমা লাভের পর তিন বছর চাকুরির অভিজ্ঞতা অর্জন করলে ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

১৩.৬৫. নিচে প্রস্তাবিত মেডিক্যাল কাউন্সিলের আওতাধীনে নার্সিং মহাবিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত করা উচিত। অন্যান্য সব সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নার্সিং অনুষদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

১৩.৬৬. ছাত্র ভর্তি মেধাভিত্তিক হওয়া উচিত এবং সেবা শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগে এস, এস, সি, পাশ হওয়া উচিত। প্রার্থীর বয়স সীমা অনূর্ধ্ব ২২ বছর হওয়া উচিত এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকা আবশ্যক। প্রশিক্ষণরত ছাত্রীরা সেবিকা হিসাবেও কাজ করেন। কাজেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাদের যথাযোগ্য বাসস্থান, আহার, চিকিৎসা, শরীর-চর্চার ব্যবস্থা থাকা উচিত। গ্রন্থাগার ও পাঠাগারে ব্যবস্থাও যথাযোগ্যভাবে করতে হবে। যেহেতু ছাত্রী সেবিকারা কাজও করেন, সেহেতু তাদের মাসিক বৃত্তি অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও দ্রব্যমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান করে নির্ধারণ করা উচিত। প্রতি বার বেতন স্কেল পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিবর্তন করা প্রয়োজন। মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তিদান প্রয়োজন।

১৩.৬৭. ছাত্রী শিক্ষক অনুপাত বৃদ্ধি করা আবশ্যক (২০ঃ১)। শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির ব্যবস্থা করা উচিত। ব্যবহারিক শিক্ষার অনুকূলে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনার উন্নতি করতে হবে। মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন সেবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিকে কলেজে রূপান্তর করে নার্সিং কোর্সকে পরিবর্ধন করে ডিগ্রী (বি, এস-সি) প্রদানের ব্যবস্থা করা উচিত।

১৩·৬৮· সেবা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি মেধাভিত্তিক এবং তা মহাবিদ্যালয়ের ভর্তি কমিটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত। ভর্তি পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক এবং পেশাগত ও সাধারণ বিষয়ে হওয়া উচিত।

ভর্তি পরীক্ষার নম্বর বন্টনঃ

লিখিত	৫০% (পেশাগত বিষয় ৭৫% ও সাধারণ জ্ঞানে ২৫%)
মৌখিক	৩৫%
প্রিলিমিনারী ফাইনাল নার্সিং পরীক্ষা ও মিডওয়াইফারী সমতুল কাউন্সিল পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর।	১৫%
সর্বমোট নম্বর	১০০

১৩·৬৯· লাইব্রেরী, পরীক্ষাগার ও শিক্ষার অন্যান্য বাস্তব প্রয়োজনসমূহের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা উচিত। বাসস্থান, খেলাধূলা ও স্বাস্থ্য রক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির অনুপাতে বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা দরকার।

১৩·৭০· বি, এস-সি কোর্সের মূল বিষয়গুলি যা আন্তঃ বিষয় হিসাবে পড়ানো হয়, তা প্রি-রেজিস্ট্রেশন বিষয় হিসাবে চালু করলে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্যের হার কমানো যেতে পারে। এতে শিক্ষকদের সময় ও সরকারী অর্থ অপচয় দুই-ই কম হবে। পরীক্ষা লিখিত ও মৌখিক সেমিস্টার পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। প্রতি কোর্স শেষে এর বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশ্ন পত্রের ধারা বদলিয়ে রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন করতে হবে।

১৩·৭১· যতদিন পর্যন্ত নার্সিং-এ বাংলায় পাঠ্যপুস্তক তৈরি না হয় ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন, কারণ নার্সিং-এর যাবতীয় বই ও জার্নাল বিদেশ থেকে প্রাপ্ত এবং ইংরেজি ভাষায় লিখিত। তাছাড়া ইংরেজি জানা থাকলে বিদেশে এদের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ বাড়বে।

১৩·৭২ বর্তমানে চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে দ্রুত অগ্রগতির কারণে এই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় দক্ষ চিকিৎসক ও অন্যান্য কর্মীদের স্পেশালাইজেশন বা একটি বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কারণ জ্ঞানের ও প্রযুক্তির প্রসারের ফলে একাধিক ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও স্পেশালাইজেশন অপরিহার্য। সমস্ত উন্নত দেশে অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের সঙ্গে নার্সিং-এও স্পেশালাইজেশন বিশেষ প্রসারিত হয়েছে। আমাদের দেশে বিভিন্ন বিশেষ বিষয়ে (যেমন, অর্থপেডিক, কার্ডিওভাসকুলার, শিশু নেফ্রোলজী, গ্যাস্ট্রএনটারলজী, সাইকিয়াট্রি ইত্যাদি বিষয়ে) ডিপ্লোমা কোর্স (এক বৎসরের) চালু করা উচিত। কয়েকটি বিষয়ে এই কোর্স ইতিমধ্যে চালু হয়েছে। এই কোর্সগুলিকে আরো গুরুত্ব দেয়া ও প্রসার করা উচিত। যে কোনো এক বা একাধিক বিষয়ে স্পেশালাইজেশনকে বি.এস-সি কোর্সের পূর্বশর্ত হিসাবে গণ্য করা উচিত। দেশে ক্রমবর্ধমান স্পেশালাইজড চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও ইউনিটসমূহে সেই বিশেষ

বিষয়ে স্পেশালাইজড সেবিকাদের নিয়োগ করা উচিত। এতে রোগী সেবার মান ও সেবিকা শিক্ষার মান দুই-ই বৃদ্ধি পাবে। স্পেশালাইজড সেবিকাদের পদোন্নতি ও টাইম স্কেলের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্যারা-মেডিক্যাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ

১৩·৭৩· নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে কৌশলী কোর্স চালু রাখা প্রয়োজনঃ

(১) রেডিওলোজী কৌশলী কোর্স

(২) রেডিওথেরাপী কৌশলী কোর্স

(৩) দন্ত চিকিৎসা বিদ্যা কৌশলী কোর্স

(৪) কম্পাউন্ডারদের জন্য কোর্স

(৫) স্বাস্থ্যরক্ষা পরিদর্শকদের জন্য কোর্স

(৬) ব্লাড ব্যাংক কৌশলী কোর্স

(৭) যন্ত্রপাতি কিউরেটার

(৮) গবেষণাগার কৌশলী কোর্স

এই কোর্সগুলি এস, এস, সি, পরীক্ষা পাশের পর তিন বছরের হওয়া উচিত। প্রার্থীদের অন্ততঃ দ্বিতীয় বিভাগে এস, এস, সি, উত্তীর্ণ হতে হবে। ভর্তি মেধার ভিত্তিতে হওয়া প্রয়োজন। এই কোর্স উত্তীর্ণ হলে চিকিৎসা কৌশলে সার্টিফিকেট দেয়া হবে (স্তর-১)।

১৩·৭৪· প্রত্যেক বিষয়ে আরো বিশেষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা রাখার জন্য সেবাবিদ্যা শিক্ষার ন্যায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। তা নিম্নে বর্ণিত নকশা অনুযায়ী হওয়া উচিতঃ

স্তর—২   কোর্সের সময় দৈর্ঘ্য—৩ বছর

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে প্রারম্ভিক দক্ষতা
(১) প্রথম স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা
(২) বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ

চিকিৎসা কৌশলে বি, এস-সি, ডিগ্রী

স্তর—৩   কোর্সের সময় দৈর্ঘ্য—২ বছর

(১) দ্বিতীয় স্তরে শিক্ষকতার জন্য যোগ্যতা
(২) বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ

চিকিৎসা কৌশলে এম, এস-সি, ডিগ্রী

১৩·৭৫· প্যারা-মেডিক্যাল কর্মীদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগ, যেমন কৃষি বিদ্যা, প্রকৌশল বিদ্যা ইত্যাদি সমপর্যায়ের কোর্সের ব্যবস্থার সঙ্গে মিল রেখে করা উচিত। সেবা বিদ্যার ন্যায় চিকিৎসা কৌশলীদেরও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক ও

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত। অন্যথায় এদের কাজের উৎসাহ থাকবে না। বর্তমানে মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে চিকিৎসা কৌশলীদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত।

চিকিৎসা শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা

১৩.৭৬ চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি ইনস্টিটিউট এবং ৮টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে। এইগুলি হলঃ

ইনস্টিটিউটসমূহ

(১) ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ।

(২) ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিও ভাসকুলার ডিজিজেস।

(৩) ইনস্টিটিউট অফ ডিজিজেস অফ চেস্ট এন্ড হসপিটাল।

(৪) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ প্রিভেন্টিভ এন্ড সোসাল মেডিসিন।

(৫) ইনস্টিটিউট অফ অপথালমলজী।

(৬) ইনস্টিটিউট ফর রিহেবিলিটেশন অফ দি ডিসেবল্ড।

মেডিকেল কলেজসমূহ

(১) ঢাকা মেডিকেল কলেজ।

(২) স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ।

(৩) ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ।

(৪) বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ।

(৫) চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

(৬) সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ।

(৭) রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

(৮) রংপুর মেডিকেল কলেজ।

১৩.৭৭. বর্তমানে চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল এই ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের অধীন। অর্থ বরাদ্দ, শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ ইত্যাদি, ছাত্র ভর্তি ও সাধারণ পরিচালনার ভার সরকারের উপর। এ ছাড়া, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালগুলিকে সাধারণ চিকিৎসার হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এতে শিক্ষক ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছে। কারণ রোগীদের চিকিৎসার কাজে তাদের নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে। এদিকে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষকের তুলনায় অতিমাত্রায় সংখ্যাধিক শিক্ষার্থীর এবং হাসপাতালগুলি সাধারণ রোগীর অত্যধিক ভীড়ের চাপের সম্মুখীন। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষকেরা তাঁদের প্রাথমিক কর্তব্য অর্থাৎ শিক্ষাদান ও গবেষণা কার্যে খুব কম সময় দিতে সক্ষম। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে স্বনির্ভরতার অভাব সকল সফল শিক্ষাদান ও গবেষণার পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া ঘন ঘন বদলীর কারণে শিক্ষকগণ কোনো প্রতিষ্ঠানেই দীর্ঘস্থায়ী কাজ ও পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারছেন না।

১৩·৭৮· দেশে চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। চিকিৎসা শিক্ষার জন্য শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় তৈরি করার উদ্দেশ্যে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষার যথোপযুক্ত সম্প্রসারণ এবং এ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির অত্যন্ত প্রয়োজন। বর্তমানে যে সকল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলিতে সুযোগ-সুবিধা আরো বাড়াতে হবে। চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিভাগে মাস্টার্স ডিগ্রী ও ফেলোশিপ কোর্স শিক্ষাদানের ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা চালু করার উৎসাহ দানের প্রয়োজন রয়েছে। সর্বোপরি, মেডিকেল/হেলথ সায়েন্স এবং বিভিন্ন বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

১৩·৭৯· দেশের চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অধিভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে যুক্ত। ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজেদের সমস্যাদি নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত যে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে তাদের প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। বস্তুত-পক্ষে এই সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন নেতৃত্ব পাচ্ছে-না তেমনি এদের উপর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণও অত্যন্ত সিথিল।

১৩·৮০· এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, দেশে চিকিৎসা শিক্ষার বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এবং নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার কাঠামো পদ্ধতিতে এই শিক্ষার যথোপযুক্ত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্ভব নয়। তাই আমাদের অভিমত হল যে, দেশে কৃষি শিক্ষা ও প্রকৌশল শিক্ষার ন্যায় চিকিৎসা শিক্ষার জন্যও পৃথক, স্বতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রয়োজন।

১৩·৮১· বর্তমানে দেশে চিকিৎসা ক্ষেত্রে ৬টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট রয়েছে। এর মধ্যে ইনস্টিটিউট অফ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিসিন এন্ড রিসার্চ একটি মাত্র ইনস্টিটিউট যেখানে বহু বিভাগ ও বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষাদান কোর্স ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। অন্যান্য ইনস্টিটিউটসমূহ, যেমন, হৃদরোগ ইনস্টিটিউট, বক্ষ ব্যাধি ইনস্টিটিউট, চক্ষুরোগ ইনস্টিটিউট ইত্যাদিতে একটি বা একাধিক নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়। এই সকল ইনস্টিটিউটকে স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করা উচিত।

১৩·৮২· পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষা হচ্ছে চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায় উচ্চতর স্তরের শিক্ষা। এই শিক্ষা যাঁরা দিবেন, সেই শিক্ষকদের অবশ্যই উচ্চতম যোগ্যতা ও মানের হতে হবে। এই শিক্ষকদের শুধুমাত্র পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক হিসাবে আলাদাভাবে নিয়োগ করতে হবে।

১৩·৮৩· এ সকল কারণে আমরা মনে করি যে, উচ্চ চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থায় রূপান্তরিত করা প্রয়োজন। পৃথিবীর অনেক স্থানে এমনকি আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি অথবা সমমানের স্বায়ত্তশাসিত ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কয়েকটির নাম দেয়া যেতে পারে—থাইল্যান্ডে মাহিদাল মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি, পাকিস্তানে আগাখান মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি, ভারতে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (ডিগ্রী দেয়ার ক্ষমতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমপর্যায়ের) ইত্যাদি।

১৩·৮৪· আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, সকল উচ্চ চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে অর্থ বরাদ্দ-সহ স্বায়ত্তশাসন দেয়া প্রয়োজন। এতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ শিক্ষাদানেই সীমাবদ্ধ থাকবে এবং তাদের হাসপাতালগুলিতে পরিচালনা শিক্ষার প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হবে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির হাসপাতালসমূহকে সাধারণ চিকিৎসার হাসপাতাল থেকে পৃথক করা প্রয়োজন। সাধারণ চিকিৎসা হাসপাতালের লক্ষ্য হবে রোগীদের চিকিৎসা যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করা। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাসপাতালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে শিক্ষাদান করার জন্য নির্বাচিত রোগী থাকবে। এইসব রোগীর বিভিন্ন দিক অনুসন্ধান করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা যাবে।

১৩·৮৫. সুপারিশ

(১) দেশে চিকিৎসা শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন, চিকিৎসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অর্থের সংস্থান ও তাদের মধ্যে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থাপনা, চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন, চিকিৎসা শিক্ষা কার্যক্রমে নেতৃত্বদান ও নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা পরিচালনা নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসা শিক্ষার জাতীয় মান রক্ষা এবং ডিগ্রী প্রদান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের ন্যায় একটি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা স্থাপন অত্যাবশ্যক। এই সংস্থাকে 'বাংলাদেশ জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিল' (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর মেডিক্যাল এডুকেশন) নামে অভিহিত করা যায়।

(২) সুপারিশকৃত বাংলাদেশ জাতীয় চিকিৎসা শিক্ষা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদ অলংকৃত করবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। উপরোক্ত কাউন্সিল ও তার আওতাধীন চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক এবং তাদের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা হবে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে চ্যান্সেলররূপে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্পর্ক ও ক্ষমতার ন্যায়।

(৩) প্রস্তাবিত কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক অফিসার (প্রিন্সিপাল এক-জিকিউটিভ এন্ড একাডেমিক অফিসার) রূপে একজন ভাইস-চেয়ারম্যান থাকবেন। তিনি হবেন প্রখ্যাত এবং উচ্চ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষাবিদ। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি) ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ এবং তাঁর বেতন ও চাকুরির শর্তাদি নির্ধারণ করবেন।

(৪) কাউন্সিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন থাকবে।

(৫) বর্তমানে চালু সকল মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহকে প্রয়োজনীয় আইনের মাধ্যমে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা শিক্ষার ইনস্টিটিউটরূপে পরিণত করতে হবে।

(৬) এই সকল প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা দরকার হবে।

(৭) প্রস্তাবিত চিকিৎসা শিক্ষার ইনস্টিটিউটসমূহ পরিচালনার ব্যাপারে, আর্থিক ব্যাপারে, শিক্ষক নিয়োগে, শিক্ষার্থী ভর্তিতে এবং পরীক্ষা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হবে। এই সকল বিষয়ের জন্য প্রস্তাবিত আইনের আওতায় প্রয়োজনীয় বিধি নিয়ম, কমিটি, বডি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(৮) প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা শিক্ষা ইনস্টিটিউটের বর্তমান চিকিৎসা শিক্ষা অনু-ষদকে বিভিন্ন বিষয়ের অনুষদে বিভক্ত ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন।

(৯) প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসিত ইনস্টিটিউটসমূহে এম, বি, বি, এস ও পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স, নার্সিং ও অন্যান্য প্যারা-মেডিক্যাল কোর্স চালু থাকবে। ইনস্টিটিউটসমূহ তাদের বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রম ও কোর্সসমূহ চালিয়ে যাবে।

(১০) প্রস্তাবিত স্বায়ত্তশাসিত চিকিৎসা ইনস্টিটিউটসমূহ নিজেরাই নিজেদের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ডিগ্রী প্রদান করবে। তবে বর্তমানের ইনস্টিটিউটসমূহ ও বর্তমানের কলেজগুলির মধ্যে কোনটি কখন ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হবে তা কাউন্সিল নির্ধারণ করবে।

(১১) প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটসমূহের হাসপাতালগুলিকে সাধারণ হাসপাতাল থেকে পৃথক করা অপরিহার্য। সাধারণ হাসপাতালগুলি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকবে। চিকিৎসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য পৃথক পূর্ণাঙ্গ সাধারণ হাসপাতালের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান মেডিকেল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের হাসপতালে সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক বেড আলাদাভাব নির্ধারিত রাখা যেতে পারে।

(১২) প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটসমূহের হাসপাতাল, গ্রন্থাগার এবং নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা অত্যন্ত উচ্চমানের হওয়া উচিত। আন্তর্জাতিক পর্যায়ের জ্ঞানের আদান প্রদান চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহে উচ্চশিক্ষার জন্য অপরিহার্য।

(১৩) প্রত্যেকটি ইনস্টিটিউটের প্রধান নির্বাহী ও একাডেমিক কর্মকর্তা (চীফ একজিকিউটিভ ও একাডেমিক অফিসার) রেক্টর নামে অভিহিত হবেন। তিনি হবেন উচ্চ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন চিকিৎসা শিক্ষাবিদ।

(১৪) দেশের বিকল্প চিকিৎসা শিক্ষাকে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের আওতাধীনে আনা উচিত।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা

১৩·৮৬· আমাদের দেশে বহুকাল ধরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা চলে আসলেও এর শিক্ষার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা খুব বেশি দিনের নয়।

১৩·৮৭· হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বপ্রথম ১৯৬৬ সালে একটি হোমিওপ্যাথিক বোর্ড স্থাপিত হয়। ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ হোমিওপ্যাথিক প্রাকটিশনার অর্ডিন্যান্স জারি করা হয়। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী হোমিওপ্যাথিক বোর্ডের গঠন প্রণালী ও কার্যাবলী পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। বোর্ডটির প্রধান কার্যাবলী নিম্নরূপঃ (১) হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দান, (২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান নিশ্চিত করা, (৩) সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা, (৪) শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতির সাধন করা, (৫) উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সাময়িকী প্রকাশ করা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

১৩·৮৮· বর্তমানে দেশে ৩৭টি হোমিওপ্যাথিক কলেজ রয়েছে—তন্মধ্যে ২২টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। মাত্র ১৭টি কলেজের নিজস্ব ভবন রয়েছে। অধিকাংশ কলেজই সান্ধ্যকালীন এবং কোনো কোনো কলেজে সান্ধ্যকালীনের সঙ্গে দিবাকালীন শিক্ষাও চালু আছে। শিক্ষকদের সংখ্যা ৫১৩ জন-এদের মধ্যে অধিকাংশই খন্ডকালীন। মৌলিক চিকিৎসা বিষয়াদি পড়ান এম. বি. বি. এস. এবং এম. এস. সি. ডিগ্রীধারী ব্যক্তিবর্গ এবং হোমিওপ্যাথি বিষয়সমূহে পাঠদান করেন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকবৃন্দ। অর্থাভাবে কলেজগুলিতে পূর্ণকালীন শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হচ্ছেনা।

১৩·৮৯· বর্তমানে দুই ধরনের কোর্স চালু আছে। এগুলি নিম্নরূপঃ

ডিপ্লোমা কোর্সঃ ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা দ্বিতীয় বিভাগে এস. এস. সি। বিষয়সমূহঃ পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জীববিদ্যা, এনাটমি, ফিজিওলজী, স্ত্রী-রোগ ও প্রসূতিতত্ত্ব, প্যাথলজী সার্জারী, চিকিৎসা আইন, মেটেরিয়া মেডিকা, ভেষজ বিদ্যা, হোমিও দর্শন, অর্গানন অব মেডিসিন, জনস্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি। কোর্সটি চার বছরের।

ডিগ্রী কোর্সঃ ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা—বিজ্ঞানসহ দ্বিতীয় বিভাগে এইচ, এস, সি। বর্তমানে শুধু ঢাকার একটি কলেজে এই কোর্স চালু আছে। কোর্সটি পাঁচ বৎসরের। ডিগ্রী কোর্সে মনোবিদ্যাসহ কতিপয় অতিরিক্ত বিষয় পড়ানো হয়।

১৩·৯০· সুপারিশ

(১) পূর্ণকালীন শিক্ষক নিযুক্তি বিশেষ করে ডিগ্রী কোর্সের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক সুনিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারণ করা।

(২) বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকদের ন্যায় হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলির শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তাঁদের বেতন কাঠামোর শতকরা ৭০ ভাগ সরকার কর্তৃক প্রদান করা।

(৩) বিজ্ঞানাগার ও গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

(৪) হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলির নিজস্ব ভবন নির্মাণসহ সংলগ্ন টিচিং হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) জনস্বাস্থ্যের খাতিরে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিক্ষাকে জাতীয় পর্যায়ে স্বীকৃতি দান করা।

(৬) দেশের বাকি তিনটি বিভাগীয় সদরে পর্যায়ক্রমে টিচিং হাসপাতালসহ তিনটি সরকারী হোমিও কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

(৭) হোমিও শিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

(৮) হোমিওপ্যাথির সঙ্গে দেশে প্রচলিত অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্র—এলোপ্যাথি, কবিরাজী ইউনানীর সহযোগিতা গড়ে তোলা। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা করা যেতে পারে।

(৯) সরকার কর্তৃক হোমিওপ্যাথিক বোর্ডটিকে এরূপভাবে গড়ে তোলা যেন আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, পরিচালনা, পাঠ্যবই রচনা, সাময়িকী প্রকাশসহ প্রয়োজনীয় সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করা সম্ভব।

(১০) ভবিষ্যতে এলোপ্যাথিক কলেজগুলির ন্যায় হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

(১১) দেশে আন্তর্জাতিক মানের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুতের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতা লাভে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা

পরিচিতি

১৩·৯১· বাংলাদেশে দেশীয় চিকিৎসা হিসাবে দুটি পদ্ধতি চালু রয়েছে—একটি হচ্ছে ইউনান তথা গ্রীসের প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আরব ও অন্যান্য মুসলিম মনীষীগণ অনুশীলিত ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি, অপরটি সুপ্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি। সাধারণভাবে পদ্ধতিদ্বয় যথাক্রমে হাকিমী ও কবিরাজী নামে পরিচিত। এই উভয় চিকিৎসা পদ্ধতি বাংলাদেশে যুগ যুগ ধরে বহুল প্রচলিত রয়েছে।

সরকারী স্বীকৃতি

১৩·৯২· সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ১৯৬৫ সালের ইউনানী, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আইনের অধীনে ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা পদ্ধতি সর্বপ্রথমে সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭২ সালে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের

একটি এড-হক কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৮৩ সালে সরকার বাংলাদেশ ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ প্রবর্তন করে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করে। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী বোর্ডের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপঃ

(১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান ;

(২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মান নিশ্চিতকরণ;

(৩) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার্থীদের পরিচালন এবং ডিপ্লোমা, ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট প্রদান ;

(৪) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন প্রদান ;

(৫) উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক ও রেফারেন্স গ্রন্থ প্রকাশ ;

(৬) শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন ;

(৭) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ফার্মাকোপিয়া প্রণয়ন ও প্রকাশ ; এবং

(৮) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধের মান নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি।

বর্তমান অবস্থা

১৩.৯৩. বর্তমানে বাংলাদেশে আইনানুযায়ী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ছয়টি ইউনানী ও পাঁচটি আয়ুর্বেদিক কলেজ রয়েছে। ইউনানী কলেজগুলির মধ্যে সিলেট ইউনানী কলেজটি সরকারী, অন্যদিকে আয়ুর্বেদিক কলেজগুলি সবই বেসরকারী।

১৩.৯৪. উপরোক্ত কলেজসমূহে বহির্বিভাগ চিকিৎসাকেন্দ্র চালু রাখা বাধ্যতামূলক হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক অনটনহেতু কয়েকটি কলেজে এখনো এ-ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। একই কারণে কলেজগুলিতে এখনও সীমিত সংখ্যক শয্যা বিশিষ্ট ইনডোর হাসপাতাল চালু সম্ভব হচ্ছে না।

১৩.৯৫. কলেজগুলিতে বর্তমানে চার বছরের ডিপ্লোমা কোর্স চালু রয়েছে এবং সবগুলিই দিবাকালীন। শিক্ষকদের সংখ্যা ৮৫ জন। তন্মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ পূর্ণকালীন ও এক-চতুর্থাংশ খন্ডকালীন। কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এম. বি. বি. এস ও এম. এস-সি. ডিগ্রীধারী একাধিক শিক্ষকও রয়েছেন। বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৬০০।

সরকারী অনুদান

১৩.৯৬. সিলেট তিব্বিয়া কলেজের ব্যয়ভার সরকার বহন করে। অবশিষ্ট পাঁচটি ইউনানী ও সমুদয় আয়ুর্বেদিক কলেজ বেসরকারী। বেসরকারী ১০টি কলেজকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছরে বোর্ডের মাধ্যমে মোট ৩,১০,০০০ (তিন লক্ষ দশ হাজার) টাকা অনুদান দেয়া হয়। চলতি ১৯৮৭-৮৮ অর্থ বছরে উক্ত বেসরকারী কলেজসমূহের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারী অনুদান হচ্ছে ৪,৩০,০০০ টাকা।

সরকারী উন্নয়ন প্রকল্প

১৩.৯৭. বর্তমান পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় দেশীয় চিকিৎসা পদ্ধতির (ইউনানী-আয়ুর্বেদিক) উন্নয়ন নামে একটি প্রকল্প স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একজন প্রকল্প পরিচালকের তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ঢাকায় একটি সরকারী ইউনানী ও আয়ুর্বেকিদ ডিগ্রী কলেজ ১০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালসহ ১৯৮-৮৯ শিক্ষা বর্ষে চালু হবে বলে আশা করা যায়। এতে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক উভয় শাখার জন্য ৫০ জন করে ছাত্র-

ছাত্রী ভর্তি করা হবে। হাসপাতালসহ কলেজটির ভবন ঢাকার মিরপুরে নির্মাণাধীন রয়েছে। এ ছাড়া এতে থাকবে একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা ইনস্টিটিউট ও ঔষধ প্রস্তুত ইউনিট। উক্ত ডিগ্রী কলেজের জন্য ইতিমধ্যে সাত জন লেকচারার নিয়োগ করা হয়েছে এবং শীঘ্রই আরো ৩ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে জানা গেছে। উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে তিন জন লেকচারারকে এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছে এবং আরো তিন জনকে অতি শীঘ্রই প্রেরণ করা হবে বলে জানা গেছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

১৩·৯৮· ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ চার বছর এবং সংশ্লিষ্ট কলেজেরে আউটডোরে ছয় মাসের ইন্টার্নিশিপ। ভর্তির জন্য ন্যূনতম যোগ্যতা ২য় বিভাগে এস. এস. সি বা তৎসমমানের মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পাশ। পাঠ্য বিষয়সমূহ হচ্ছে (১) সাধারণ বিজ্ঞান (পদার্থ, রসায়ন, প্রাণী ও উদ্ভিদ বিদ্যা) (২) চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস (৩) ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মূলনীতি (৪) ভেষজ বিজ্ঞানের মূলনীতি (৫) এনাটমি (৬) ফিজিওলজী (৭) ভেজষ পরিচয় ও দ্রব্যগুণ (৮) ফার্মাসিউটিকস (৯) ফার্মাকোলজী (১০) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও সামাজিক চিকিৎসা (১১) প্যাথলজি (১২) চিকিৎসা আইন (১৩) প্রসূতি বিদ্যা ও শিশুরোগ (১৪) ইউনানী/আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা· (১৫) ব্যবহারিক রোগ নির্ণয় (১৬) স্ত্রী রোগ, (১৭) সার্জারী ও (১৮) ইএনটি।

ভাবী-ডিগ্রী কোর্স

১৩·৯৯· মেয়াদ ৫ বৎসর ও সংশ্লিষ্ট কলেজের ইনডোর হাসপাতালে ছয় মাসের ইন্টার্নিশিপ। ভর্তির জন্য নিম্নতম যোগ্যতা-বিজ্ঞানে ২য় বিভাগে এইচ এস সি পাশ। সরকার ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা অনুষদ খোলার অনুরোধ জানিয়ে ডিগ্রী কোর্সের বিস্তারিত পাঠ্যসূচী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেছে।

ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়নের অন্তরায়সমূহ

১৩·১০০· আমাদের দেশে ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার সুষ্ঠু বিকাশ ও সম্প্রসারণের পথে বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে—যেমন, সরকারী পর্যায়ে ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার উন্নয়নের নিমিত্ত মন্ত্রণালয়ে কোন পৃথক সেল না থাকা, বাংলা ভাষায় পাঠ্য ও রেফারেন্স গ্রন্থের স্বল্পতা, অপর্যাপ্ত সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, উন্নতমানের চিকিৎসা সরঞ্জাম ও উপকরণের অভাব, সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপদ্ধতিতে গবেষণা প্রশিক্ষণের নিমিত্ত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান না থাকা, সর্বোপরি সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভাব।

প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যা

১৩·১০১· বর্তমানে চালু ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় ডিপ্লোমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একমাত্র সিলেট তিব্বিয়া কলেজের সমুদয় ব্যয় সরকার বহন করে। অবশিষ্ট কলেজগুলি বোর্ডের মাধ্যমে সরকারী অনুদানের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এই অনুদানের পরিমাণ খুবই নগণ্য। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের ভবন, উপযুক্ত প্রশিক্ষক ও সরঞ্জামের প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ না হওয়া হেতু শিক্ষার মান যথোপযুক্ত নয়।

১৩·১০২· সুপারিশ

(১) ইউনানী ও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা ও ঔষধের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য সরকারী উদ্যোগে গবেষণা পরিষদ গঠন।

(২) দেশের সরকারী স্বীকৃতি প্রাপ্ত ইউনানী/আয়ুর্বেদীয় কলেজগুলিকে পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ সাপেক্ষে কলেজগুলিতে পর্যাপ্ত সরকারী অনুদান প্রদান করা এবং পূর্ণকালীন শিক্ষকদের বেতন কাঠামো নির্ধারিত করা।

(৩) সরকার কর্তৃক ইউনানী-আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষার আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা, পাঠ্যবই রচনা, সাময়িকী প্রকাশসহ প্রয়োজনীয় সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠান করা।

(৪) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মৌলিক তত্ত্ব ও সংক্ষিপ্ত ভেষজ পরিচিতি এম, বি, বি, এস, কোর্সের পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

(৫) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক কলেজ থেকে পাশকরা হাকিম-কবিরাজগণকে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট প্রদান করার আইনগত অধিকার প্রদান করা।

(৬) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষেত্রে অধিকতর আগ্রহ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতির চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-কর্মীদের প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৭) দেশজ ঔষধ শিল্পের সার্বিক বিকাশের সহায়ক হিসাবে ঔষধি গাছ-গাছড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, চিহ্নিতকরণ এবং বিপণনের জন্য সরকারী প্রচেষ্টায় দেশের প্রতিটি বিভাগে একটি করে ঔষধ উদ্যান প্রতিষ্ঠা করা।

(৮) ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক ঔষধের মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

অধ্যায়-১৪

শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক

ভূমিকা

১৪·১· বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক স্তরে (ইবতেদায়ি-সহ) শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি, মাধ্যমিক স্তরে ৩০ লাখের মত, দাখিল থেকে উপরের মাদ্রাসায় সাড়ে সাত লাখের মত, কলেজে প্রায় সাত লাখ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিয়াল্লিশ হাজারের মত এবং পেশাগত ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ষাট হাজার। শিক্ষা প্রসারের ফলে আগামী কয়েক বছরে এ সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত, দক্ষ ও কার্যক্ষম সুনাগরিক হিসাবে গড়তে হলে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তকের উপর। শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন যে এক বিরাট দায়িত্ব তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এজন্যই অতীতে শিক্ষা কমিশন ও কমিটিগুলি এ সম্বন্ধে তাদের সুবিবেচিত অভিমত রেখেছে।

শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী

১৪·২· ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার দায়িত্ব ছিল শিক্ষা দপ্তরের (ডি,পি,আই-এর) এবং পরবর্তীতে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ডের। আর নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের উপর।

১৪·৩· সাধারণত শিক্ষা দপ্তর (ডি.পি.আই) ও টেক্সটবুক বোর্ড শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা প্রশাসক সমন্বয়ে গঠিত টীম দ্বারা প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈরি করাত এবং সময়ে সময়ে সেসব রদ-বদলের মাধ্যমে সময়োপযোগী করে চাহিদা মেটাত।

১৪·৪· অন্যদিকে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রত্যেকে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে স্থায়ী সাব-কমিটির সাহায্যে পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের পর প্রচলন করার ব্যবস্থা করত। এই বিষয়ভিত্তিক সাব-কমিটিগুলি ছাড়াও প্রত্যেকটি শিক্ষা বোর্ডে একটি করে একাডেমিক কমিটি ছিল।

১৪·৫· ১৯৬২ সাল থেকে একাধিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হবার পর থেকে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে অভিন্নতা ও সমতা আনয়নের জন্য দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড মিলে সম্মিলিতভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে চারটি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি—যাঁরা শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ-সমন্বয়ে কমিটি গঠন ও কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিন্ন ও একই মানের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত। এ ব্যবস্থা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশ অনুসারে প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৫) গঠিত হয়। এই কমিটি তিন বছর ধরে দেশের বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার জন্য সাত খণ্ডে বিস্তারিতভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী তৈরি করে। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শিক্ষা

কমিশন (১৯৭৪) শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ব্যুরো স্থাপন করার জন্য সুপারিশ করে। এই ব্যুরোর উদ্দেশ্য বিভিন্ন শিক্ষাস্তরের জন্য সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন নয়, বরং বিভিন্ন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালনা এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দান।

১৪·৬· সম্ভবত এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮১ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীনে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

বর্তমান অবস্থা

১৪·৭· বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে বাংলাদেশ টেক্সট-বুক বোর্ডের সঙ্গে একত্রিভূত করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড গঠন করে। বর্তমানে ১ম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীসমূহে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডের শিক্ষাক্রম উইং-এর উপর ন্যস্ত আছে। এই উইং-এর বর্তমান কার্যাবলীঃ

(১) প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সকল শ্রেণীর জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা, সংস্কার, পরিমার্জন ও নবায়ন।

(২) পরিবর্তিত শিক্ষাক্রম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন বা পুনর্লিখনের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নয়ন, পঠন-পাঠন সামগ্রী ও শিক্ষক-প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন।

(৩) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির মান উন্নয়ন।

(৪) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকর করার জন্য উন্নয়ন প্রকল্পাধীন অন্যান্য কার্যাবলী।

১৪·৮· উপরোক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য বর্তমানে শিক্ষাক্রম উইং-এ ছয়টি ইউনিট রয়েছেঃ

(১) প্রাথমিক ইউনিট

(২) মাধ্যমিক ইউনিট

(৩) উচ্চ মাধ্যমিক ইউনিট

(৪) কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ইউনিট

(৫) মাদ্রাসা শিক্ষা ইউনিট

(৬) শিক্ষক-প্রশিক্ষণ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ইউনিট।

শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও পরিমার্জন থেকে পাঠ্যপুস্তকের ডামি প্রস্তুতকরণ পর্যন্ত সমুদয় কাজ এই উইং-এর আওতাভুক্ত।

১৪·৯· **সুপারিশ**

(১) আমরা আমাদের এই রিপোর্টে ১ম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে যেসব বিষয় পড়ান হবে তা চিহ্নিত করেছি এবং এই বিষয়গুলির পারস্পরিক পঠন-পাঠনের আপেক্ষিক সময় অথবা পরীক্ষায় কত নম্বর থাকবে তার নির্দেশনা দিয়েছি। এর মূল উদ্দেশ্য হল এক বিষয়ের তুলনায় অন্যান্য বিষয়ে কতটুকু গুরুত্ব দিতে হবে তা ইঙ্গিত করা। পাঠ্যসূচী প্রণয়নকালে বিশেষভাবে এই অনুপাত মনে রাখতে হবে। আরো স্মরণ রাখতে হবে, শিক্ষার্থীর

বয়সানুপাতে শিক্ষার্থীর গ্রহণ ক্ষমতা, তার শিক্ষা আত্মীকরণের ক্ষমতা এবং তার সময়ের কত অংশ পঠন-পাঠনের দেয়। পাঠ্যসূচীতে বিষয়গুলির পাঠ্যবস্তু এমনভাবে সমন্বিত করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের বয়সানুপাতে এটা বোঝা না হয়ে দাঁড়ায় এবং সহজভাবে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। জনমত যাচাইয়ের সময়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভারী পাঠ্যসূচী অর্থাৎ অনেক বেশি বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। এমনকি শ্রেণী উপযোগী নয় এমন বস্তুর শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ এসেছে। যাঁরা পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন এবং পাঠ্যপুস্তক লেখেন তাঁদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে কোন স্তরের জন্য পুস্তক তাঁরা লিখছেন এবং কত বছরের শিক্ষার্থীদের জন্য এটা প্রণয়ন করা হচ্ছে। সমস্ত বিষয়ের যোগফল মিলিয়ে দেখতে হবে তা শ্রেণী ও স্তরের উপযোগী কিনা এবং শিক্ষার্থীর বহন করবার ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা।

(২) চিরকালের উপযোগী শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা কখনো সম্ভব নয়। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি পায়, সামাজিক চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করার জন্য পাঠ্যসূচী, এমনকি শিক্ষাক্রমও পরিবর্তন ও পরিমার্জিত করতে হয়। সেইজন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সবসময় পর্যালোচনার ব্যবস্থা থাকবে এবং তার জন্য স্থায়ীভাবে নিম্ন পর্যায়ে প্রতি স্তরে এবং উচ্চ পর্যায়ে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি থাকবে। এই কমিটিসমূহের কাজের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিষদ থাকবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটিসমূহের নিয়মিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করার অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক বছর বা ঘন ঘন তাদের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বদলাতে হবে। এর অর্থ এই যে, সময়মত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, সংশোধন ও সংযোজন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পরিষদ কর্তৃক গৃহীত, প্রণীত বা নির্ধারিত পাঠক্রম ব্যতীত পুস্তক রচনা বা অনুমোদন করা উচিত হবে না।

(৩) বিজ্ঞান, কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ব্যবহারিক ক্লাসের দিকে বিশেষ জোর দিতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বোঝে এবং হাতে-কলমে কাজ শেখে। বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিল্প ও ব্যবসার চাহিদা অনুসারে শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাসূচী প্রণীত হয়। এই স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর বিভিন্ন কমিটিতে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করা বিশেষ প্রয়োজন। কৃষি শিক্ষার বেলায়ও ঐ একই কথা। পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে ঐ কোর্সের ব্যবহারিক শিক্ষা সরাসরি কাজে লাগে। এসবের জন্য চাই নিয়মিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞ। শ্রেণী শিক্ষক, অভিজ্ঞ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটি প্রত্যেক বিশেষ ক্ষেত্রে থাকা দরকার। শিক্ষাকে কর্মমুখী করতে হলে, শিক্ষাকে আর্থ-সামাজিক কাজে লাগাতে হলে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করতে হলে ঐসব দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। গতানুগতিক ধারায় চললে তেমন কিছু ফল লাভ হবে না। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা আলোচনাকালে একথা বলা হয়েছে যে, এই শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, কাজের ভিত্তিতে এদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং এই কাজ তাদের খুব ভাল করে শিখতে হবে এবং সেজন্য শিক্ষকদের ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সচেতন থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে তাঁদেরও যাঁরা এদের পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচী কমিটি সংশ্লিষ্ট অনুষদ এবং পরিশেষে একাডেমিক পরিষদ প্রতি বছর, এমনকি প্রয়োজনবোধে যে কোনো সময় প্রত্যেকটি বিষয়ের পাঠ্যসূচী বিবেচনা করে থাকে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার এমনি পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত অর্থাৎ বিভিন্ন কমিটি ও সমন্বয়ের জন্য পরিষদ থাকা দরকার যাতে প্রয়োজনে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী পর্যালোচনা করা যায়। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন একটি বিরাট দায়িত্ব। এই গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি নিয়োগ একান্ত দরকার।

(৫) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক সঠিকভাবে প্রণীত হল কিনা তা যাচাই করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজনে একটি গবেষণা কোষ স্থাপন করা যেতে পারে এবং নিয়মিত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা যেতে পারে।

(৬) এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ "আমাদের বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদান পদ্ধতি অত্যধিক পরিমাণে নির্ধারিত মানের এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে স্থানীয় স্বার্থ বা প্রয়োজন মিটাবার ব্যবস্থা নেই। অনুরূপভাবে স্থানীয় জনসমাজের পেশা বা জীবন ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আকর্ষণীয় বিষয়গুলির ব্যাপক প্রয়োগের ব্যবস্থাও এই শিক্ষা পদ্ধতিতে অনুপস্থিত। এর অর্থ এই যে, আমাদের শিক্ষকগণ অতিরিক্ত মাত্রায় কেন্দ্রীয় ভিত্তিতে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহের উপর নির্ভর করেন এবং শিক্ষাদানের ব্যাপারে গ্রামসমূহ ও আশেপাশের জনসমাজের সম্পদ ও জীবনধারা হতে উপকরণ সংগ্রহে যথার্থভাবে সচেষ্ট নন। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় এর অর্থনীতি স্বভাবত কৃষিনির্ভর। এ ছাড়া দেশকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য শিল্পায়িত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে থাকবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের সময় আমাদের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি এবং শিল্প ব্যবস্থার কথা মনে রাখতে হবে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে স্থানীয় জনসমাজের সম্পদ, পেশা ও জীবন ধারা হতে উপকরণ সংগ্রহ করে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকেরা সচেষ্ট থাকেন।"

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

১৪·১০· পৃথিবীর সর্বত্র পাঠ্যপুস্তক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদানের সর্বপ্রধান উপকরণরূপে স্বীকৃত হয়ে থাকে। যে সকল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে কম অথবা যে সকল দেশে পাঠযোগ্য অতিরিক্ত বই-পুস্তক প্রয়োজনমত পাওয়া যায় না, সে সকল দেশে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অনেক বেশি। এই উভয় অবস্থা আমাদের দেশে বিরাজমান। সুতরাং আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন খুবই বেশি এবং সেই জন্য ন্যায়-সঙ্গত দামে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠ্যপুস্তক সহজলভ্য করা দরকার।

১৪·১১· উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রণয়ন ও সরবরাহ বহু বছর যাবত আমাদের দেশে উদ্বেগের কারণ হয়ে রয়েছে। এর প্রধান সমস্যা হলঃ (ক) পাঠ্যপুস্তক রচনায় আগ্রহী বিশেষজ্ঞদের একত্র সমাবেশ করা, (খ) শিক্ষাদানের উপযোগী নির্ভুল পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখকদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেয়া, (গ) প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে যেগুলি সর্বোত্তম সেগুলি বাছাই করা এবং বাছাইকৃত পুস্তকগুলি এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে তাদের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংহত ও প্রগতিশীল জ্ঞানের পরিবেশন করা হয় এবং (ঘ) যথোপযোগী ছাপাখানার অপ্রতুলতা। এখানে বিজ্ঞানের পুস্তক ছাপানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। চিহ্ন, সংকেত, বিভিন্ন ধরনের অক্ষর প্রভৃতির বেশ অভাব। বাজারে রসায়নের যতগুলি পুস্তক আছে, সব গুলিতেই বহু আন্তর্জাতিক চিহ্ন ও সংকেত দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তদুপরি, বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের মূল্য এমন হয়ে যায় যে, সেটা সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

১৪·১২· এর উপর কাগজের মূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রণ ব্যয় বৃদ্ধি লেগেই আছে। এ সব বিবেচনা করে ১৯৫৪ সালে স্কুল টেক্সটবুক বোর্ড গঠন করা হয়। এই বোর্ড শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসরে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করতে থাকে। বোর্ড কোন কোন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহায়তাও পায়।

বর্তমান অবস্থা

১৪·১৩· পূর্বেই বলা হয়েছে যে ১৯৮৩ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ডের সংগে একত্রিত করে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড গঠন করে। বর্তমানে ১ম শ্রেণী থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব এই জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ডের টেকস্টবুক উইং-এর উপর ন্যস্ত।

১৪·১৪· **সুপারিশ**

(১) বর্তমানে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর জন্য প্রত্যেক বিষয়ে সাধারণত একটি করে পাঠ্যপুস্তকের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা শিক্ষানীতির দিক দিয়ে অযৌক্তিক বলে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) তাদের রিপোর্টে মত ব্যক্ত করেছে। সামান্য কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া এ সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে হয়না। তদুপরি পরিবেশিত অনেক পাঠ্যপুস্তকে প্রয়োজনীয় উৎকর্ষের অভাব এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সহায়ক গ্রন্থাদিরও গুরুতর অনটন বিদ্যমান। এর ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে উপলব্ধি, প্রয়োগ ও সৃজনশীলতার প্রসারের পরিবর্তে গতানুগতিকতা ও বোধহীন মুখস্থ বিদ্যার প্রসার ঘটছে।

(২) পাঠ্যসূচী অনুযায়ী তৈরি পাঠ্যপুস্ককের পান্ডুলিপি যে শিক্ষা বছরে প্রবর্তন করা হবে, তার অন্তত দু'বছর আগেই তৈরি হওয়া উচিত বলে যে সুপারিশ বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) রেখেছিল, সে ব্যাপারেও বিশেষ কোনো অগ্রগতি হয়নি। সে বিষয়ে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। তদুপরি পুস্তক যে শ্রেণীর জন্য প্রণীত ও নির্বাচিত তা সে শ্রেণীর কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যও তাদের মাঝে বিতরণ করা উচিত। এ বিষয়ে শিক্ষাবিদ ও লেখকের মতামতও গ্রহণ করা যায়। এদের মধ্যে বিষয় বিশেষজ্ঞ থাকা বাঞ্ছনীয়। এরপর প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে সেগুলি প্রকাশ করলে ত্রুটিমুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

(৩) পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও বাংলাদেশ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড শিক্ষাক্রম অধ্যয়ন পরিকল্পনা এবং গাইড ও রেফারেন্স পুস্তক ও শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করবে। শিক্ষা সহায়ক পুস্তক, শিক্ষকদের জন্য নির্দেশক পুস্তক এবং বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কিত অতিরিক্ত উপকরণ প্রকাশের কাজও বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

(৪) পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনায় নিযুক্ত অথবা এসব কাজে উৎসাহী ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 'পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার' স্থাপন করা উচিত। এই সকল গ্রন্থাগারে অন্যান্য দেশে ব্যবহৃত পাঠ্য পুস্তকের যথেষ্ট সংখ্যক নমুনা থাকবে। সেই সংগে থাকবে প্রয়োজনীয় অনুবাদ পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত প্রবন্ধ সম্বলিত সাময়িক পত্রিকা এবং শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত কতিপয় বিষয় সংক্রান্ত অভিধান।

(৫) দেশের প্রকাশকদের সৃষ্টিশীল ও গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকারী অর্থানুকূল্যে উন্নতমানের যথোপযুক্ত বইয়ের ন্যূনতম বিক্রি নিশ্চিত করতে হবে এবং অধিক সংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে ও সম্ভাব্য অন্যান্য সকল উপায়ে ব্যাপক পাঠাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

(৬) টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব ও প্রকাশনা স্বত্বের মালিকানা বোর্ডের থাকা উচিত। পুস্তক প্রণয়নের জন্য ন্যায্য পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। বিক্রয় মূল্য, ছাপার কাগজ ইত্যাদি বিষয়ে নির্ধারিত শর্তানুযায়ী পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রকাশকদের দেয়ার রেওয়াজ চালু রাখতে হবে। সে সকল

প্রকাশক ও প্রকাশনা সংস্থাকে নির্বাচিত করা উচিত যাদের উপযুক্ত ছাপাখানা, দক্ষ কর্মচারী ও পুস্তক পরিবেশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। পুস্তকের ন্যায্যমূল্য বজায় রাখার জন্য এবং কাগজ, ছবি ও ছাপার দিক দিয়ে উন্নতমানের পুস্তক প্রকাশের জন্য প্রয়োজনবশত টেক্সটবুক বোর্ড নিজেরাই পুস্তক মুদ্রণ, প্রকাশনা ও বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণের বর্তমান রীতি চালু রাখতে পারে। অনুমোদিত পুস্তকের বেলায়ও ছাপার কাগজ, বিক্রয় মূল্য, বিতরণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় শর্তাবলী এমনভাবে নির্ধারণ করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিম্নমূল্যে উন্নতমানের পাঠ্য-পুস্তক যথাসময়ে এবং বছরের সব সময় পায়।

(৭) একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য বিভিন্ন রকম প্রতিভার দরকার। এই কারণে কতিপয় ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করার পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। প্রথমে দরকার যে বিষয়ে পুস্তক রচনা হবে সেই বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন ভাল লেখক, যিনি স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষায় পাঠ্যসূচী অনুসারে বিষয়বস্তু পেশ করতে সক্ষম। তারপর দরকার শ্রেণী শিক্ষক-যিনি তার শ্রেণী শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতার আলোকে বিষয়বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখবেন শিক্ষার্থীর জন্য ঐ ভাব, ভাষা ও পরিবেশন উপযোগী কিনা। সর্বশেষ থাকবেন বিশেষজ্ঞ যিনি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে দেখবেন যে সমস্ত উৎপাদন সন্নিবেশিত হয়েছে তা যথার্থ কিনা। এই-ভাবে রচনার পর পুস্তকটির গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করে দেখা উচিত। এজন্য কিছু সংখ্যক পুস্তক কিছু কিছু স্কুলে ও কতক শিক্ষকদের বিনামূল্যে দিয়ে পরীক্ষা করা দরকার। তারপর বহুল পরিমাণে ছাপানো উচিত হবে। এতে পুস্তকের গুণগত মান প্রকাশ ও বাচনিক ভঙ্গি গ্রহণযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

(৮) ছাত্র-ছাত্রীদের বাজারের নিকৃষ্ট ধরনের অর্থ ও নোট বই ব্যবহারের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মানের যাতে ক্ষতি সাধিত না হয় সেজন্য টেকস্টবুক বোর্ডের উচিত হবে পাঠ্যপুস্তকে অথবা গাইড পুস্তকে প্রয়োজনীয় শব্দার্থ, ব্যাখ্যা, আদর্শ প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে রাখার যাতে শিক্ষার্থীরা বাজারের নোট বইয়ের আবশ্যকতা অনুভব না করে। এ ব্যাপারে শ্রেণী-কক্ষে শিক্ষকের দায়িত্ব অপরিসীম। গাইড পুস্তক ছাড়াও শিক্ষক নির্দেশিকা ইত্যাদি প্রণয়ন, বিতরণ, নিয়ন্ত্রণ করা টেক্সটবুক বোর্ডের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

(৯) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ্যপুস্তকের ও রেফারেন্স পুস্তকের পাঠাগার স্থাপন করা প্রয়োজন। এ সকল পাঠাগার থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত সময়ের জন্য কিংবা সারা বছরের জন্য পাঠ্যপুস্তক ধার দেয়া যেতে পারে। এ সকল পাঠ্যপুস্তকের বাঁধাই ভাল হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ধার দেয়ার সময় ভাল কাগজের মোড়ক ব্যবহার করলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ সকল পুস্তক তিন-চার বছর পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের বেতনের সংগে দেয় পাঠ্যপুস্তকের চাঁদা গ্রহণের মারফত এ ব্যবস্থার জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বাংলাদেশ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের গঠন

১৪·১৫· বাংলাদেশ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রতিনিধিত্বমূলক হওয়া উচিত। এটি স্বায়ত্ত-শাসিত সংস্থা হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে থাকবে। পুস্তক লিখন ও গ্রন্থাকার নির্বাচন এবং পুস্তক নির্বাচন ইত্যাদি ব্যাপারে বোর্ড সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে কাজ করে যাবে। বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ দানের জন্য বোর্ড বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সমন্বয়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করবে।

উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক

১৪·১৬· আমরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্য ও ব্যবহারের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্য জাতীয় পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের ন্যায় কোনো একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপনের প্রস্তাব করি না। ইতিমধ্যে বাংলা একাডেমীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক

প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং বাংলা একাডেমী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা এ ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। শিক্ষার সকল পর্যায়ে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনা একটি অতি জটিল ও ব্যয়সাধ্য কাজ। কাজের গুরুত্ব বিবেচনায় এজন্য পর্যাপ্ত অর্থ প্রয়োজন। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে খুব অল্প ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তক নির্ধারিত করে দেয়া হয়। সাধারণত এ পর্যায়ে কতকগুলি পুস্তক পড়বার জন্য পরামর্শ ও উপদেশ দেয়া হয়। এ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা থেকে অনেক কম বলে পাঠ্যপুস্তকের বেলায় দুর্নীতির বড় একটি সুযোগ থাকে না। তথাপি আমরা আশা করি যে, শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে এ সকল পুস্তক তাদের নিকট স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবেন।

১৪·১৭· উচ্চমানের পুস্তকের জন্য যথাযথ আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও লেখকদের উচ্চস্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করতে হবে। এজন্য একটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। সুলভ মূল্যে পাওয়ার জন্য বিদেশের প্রয়োজনীয় ভাল বই চুক্তি সাপেক্ষে এই কেন্দ্রে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে।

অধ্যায় ১৫

শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষার উপকরণ

শিক্ষাগৃহ

১৫·১· আমাদের দেশে শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, বর্তমান শিক্ষাগৃহের সম্প্রসারণ ঘটছে, কোথাও কোথাও নতুন ভবন তৈরি করা হচ্ছে। সেই সাথে ছাত্রাবাস ও অন্যান্য গৃহও নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নির্মাণ কাজ ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে চলতে পারছে না এবং অদূর ভবিষ্যতে আরো বেশি সংখ্যক শিক্ষাগৃহ তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে নির্মাণ ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্ত শিক্ষা প্রসারের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনের সঙ্গে বর্তমান ব্যয় বরাদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষাগৃহ ও শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। আমাদের বিদ্যালয় ভবনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত।

১৫·২· শিক্ষাগৃহ সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) অত্যন্ত মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ রেখেছে। আমরা সেই কমিশনের মতামত সমর্থন করি। আমরা বলতে চাই যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহ নির্মাণ কার্যে যে অর্থ ব্যয়িত হবে তা থেকে যেন সর্বাধিক ফল লাভ করা সম্ভব হয় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও আমাদের সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ইমারত নির্মাণের জন্য বর্তমানের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা গৃহে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর স্থানসংকুলানের উদ্দেশ্যে আধুনিক সকল প্রকার কারিগরি সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করা দরকার।

১৫·৩· শিক্ষাগৃহের ডিজাইন ও নির্মাণ কার্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শিক্ষাগৃহ নির্মাণ করার সময় যে সকল সমস্যার দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার মধ্যে রয়েছেঃ (১) শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ও শ্রবণ শক্তি, শ্রেণীকক্ষের আয়তন ও আকার নির্ধারণ এবং সর্বাধিক আলো-বাতাসের জন্য জানালার স্থান ও আয়তন, (২) শ্রুতির সুবিধা ও শিক্ষার্থীর নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রেখে শ্রেণীকক্ষের গঠন বৈশিষ্ট্য ও আসবাবপত্র নির্ধারণ এবং (৩) শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি-শক্তির উপর যাতে কোনো প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয় সেজন্য স্বাভাবিক আলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে রংয়ের ব্যবস্থা করা। যাঁরা আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য গৃহ নির্মাণ করবেন তাঁদের উচিত হবে উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতির দিকে দৃষ্টি রাখা।

১৫·৪· শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখে সারা দেশের জন্য শিক্ষাগৃহ নির্মাণের একটি নির্দিষ্ট মান স্থির করাও প্রয়োজন। শিক্ষাগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কিত সমস্যাদি এবং গৃহ নির্মাণের জন্য স্থানীয় মাল-মসলার উন্নতি সাধন সম্পর্কে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, গৃহ নির্মাণ গবেষণা সংস্থা এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে গবেষণা চালানো প্রয়োজন। যে সকল মাল-মসলা এদেশে সহজ প্রাপ্য ও দীর্ঘ স্থায়ী, সেগুলির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই শিক্ষাগৃহ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রসার সাধন সম্ভব। উপযুক্ত শিক্ষাগৃহ নির্মাণের ব্যাপারে শিক্ষকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। তাঁরা এ ব্যাপারে স্থপতিকে সাহায্য করতে পারেন। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে কোর্স থাকা বাঞ্ছনীয়।

১৫·৫· প্রাক স্বাধীনতাকালে শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট শিক্ষাগৃহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ও সংস্কারের কাজে নিয়োজিত ছিল। স্বাধীনতা উত্তরকালে শিক্ষাক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়ন ও প্রসার লাভ করতে থাকলে বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের

কাজ শুরু হয়। এই সকল উন্নয়ন প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া সমগ্র দেশে বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গণ-পূর্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

১৫.৬. শিক্ষাগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কারিগরি জনশক্তি ও জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ১৯৮৩ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষা অধিদপ্তর, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট পদসমূহ সমন্বয়ে ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট নামে একটি একীভূত সংস্থা স্থাপিত হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্মাণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার এবং আসবাবপত্র সরবরাহ এই সংস্থার প্রধান কাজ। এছাড়া বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের জন্য সরকারী অনুদান মঞ্জুরীর পূর্বে প্রস্তাবিত কাজের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ও যাচাই করাও এই বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয়।

১৫.৭. জনমত যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট স্থানীয় জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা না করেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এতে ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের কাজকর্মে অনেক ধরনের ত্রুটিবিচ্যুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। তা ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বা পরিকল্পনার ব্যাপারে স্থানীয় উদ্যোগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও উন্নয়নের কাজে ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টের সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সমন্বয় ও সংযোগের অভাব দেখা দিচ্ছে।

১৫.৮. সুপারিশ

(১) সঙ্গত কারণেই কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কাজে স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত অন্যান্য কোনো দালান বা ভবন নির্মাণের চেয়ে শিক্ষাগৃহ নির্মাণ বা তার অবস্থানের উপর স্থানীয় জনসাধারণের প্রভাব ও আগ্রহ খুব বেশি। কারণ স্থানীয় উদ্যোগ এ ধরনের প্রচেষ্টাকে সার্থক করে তুলতে সহায়তা করে। স্থানীয় অধিবাসীদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেই শিক্ষাগৃহ নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কর্মকান্ডকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তাই প্রশাসনের স্বার্থে এবং বিদ্যালয়ের কল্যাণে স্থানীয় জনসাধারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, প্রশাসনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং এ সকল কাজের কর্তৃপক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

(২) ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্টকে স্বতন্ত্রভাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। ঢাকা ভিত্তিক এই পরিদপ্তরের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যস্ত ও পুনর্গঠিত আঞ্চলিক/বিভাগীয় শিক্ষা পরিদপ্তরগুলির সঙ্গে একত্রীভূত করা প্রয়োজন। এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপরোক্ত পরিদপ্তরগুলিতে আত্মীকরণ করা যায়। বস্তুতপক্ষে এই পরিদপ্তরের যা দায়িত্ব ও কর্তব্য তা সুপারিশকৃত আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরিদপ্তরগুলি থেকে আলাদা করার ন্যায়সঙ্গত কারণ নেই। বিকল্প হিসাবে স্বতন্ত্র কোনো সংস্থা রাখতেই যদি হয় তাহলে গণপূর্ত বিভাগে একটি স্বতন্ত্র শাখা খোলার ব্যবস্থা করা যায় যার দায়িত্ব ও কর্তব্য শিক্ষা বিভাগের নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সীমাবদ্ধ থাকবে। গণপূর্ত বিভাগ এই সুপারিশকৃত শাখা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ে ম্যানেজিং কমিটি, কলেজের গভর্নিং বডি প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুমোদনক্রমে নির্মাণ, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি কাজ সমাধান করবে।

(৩) কাজের মানোন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কমিটি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান বা স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিও শিক্ষাগৃহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ তদারক করবেন। তজ্জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন কাজে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে হবে।

(৪) নির্মাণ কাজ, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজের মূল্যায়নের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্যায়ন ও মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে। এই কমিটিতে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে থাকতে পারেন।

(৫) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শ্রেণীকক্ষ, গবেষণাগার ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সর্বাধিক সদ্ব্যবহারের দিকে নজর রাখার জন্য একজন শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে দায়িত্ব দেয়া উচিত। তার দায়িত্ব হবে তার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীকক্ষ, লেকচার হল, ল্যাবরেটরি ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেয়া ও সময়-তালিকা নির্ণয় করা। বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ডীন ও বিভাগীয় প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি শ্রেণীকক্ষ, লেকচার হল, টিউটোরিয়াল কক্ষ ইত্যাদি নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং সময়-তালিকা নির্ণয় করবেন। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার কিভাবে করা হচ্ছে তা সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সে তথ্যের ভিত্তিতে স্থান ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করতে পারেন। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক শ্রেণী ও ল্যাবরেটরির জন্য একটি সময়-তালিকা তৈরি করা যায়। এভাবে ক্লাসের সময়-তালিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে এবং নতুনভাবে ক্লাসের ব্যবস্থা করে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা যাবে।

শিক্ষার উপকরণ

১৫·৯· শিক্ষার উপকরণ সম্পর্কেও বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ মতামত ও সুপারিশ রেখেছে। জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের (১৯৭৯) সুপারিশও প্রণিধানযোগ্য। আমরা তাদের মতামতও সমর্থন করি।

১৫·১০· আমাদের দেশে বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। অথচ বিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে এবং বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীর কাছে সহজে বোধগম্য করে তোলার জন্য চাই উপযুক্ত ল্যাবরেটরি ও সেই সাথে পর্যাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ। এই উদ্দেশ্যে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতীত অন্যান্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও সরঞ্জামের 'প্রটো-টাইপ' উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও ডিজাইন এবং এই সকল উপকরণের মান নিয়ন্ত্রণ করাই এই সংস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মাধ্যমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের বৈজ্ঞানিক উপকরণ নির্মাণ, উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে এই সংস্থা উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। ইতিমধ্যে এই সংস্থা দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, শিক্ষামূলক চার্ট ও রসায়ন-সামগ্রী সরবরাহ করছে। এছাড়া বাংলাদেশ দূর-শিক্ষণ ইনস্টিটিউট শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ তৈরি করে বিদ্যালয়গুলিতে সরবরাহ করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের তত্ত্বাবধানে ইনস্টিটিউট অব সায়েন্টিফিক ইনস্ট্রুমেন্টেশন নামে একটি সংস্থাও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংরক্ষণের কাজ করছে।

১৫·১১· দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার প্রসারের সাথে সাথে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণেরও চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে আমদানি করা যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনতে হবে। তাই জটিল গবেষণা উপকরণ ছাড়া সবকিছুই দেশে প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। স্থানীয়ভাবে তৈরি উপকরণাদি ব্যবহারের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করবে যা দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। এতে দেশে প্রযুক্তি যেমন গড়ে উঠবে, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে।

১৫·১২· শিক্ষা উপকরণ তৈরিতে স্থানীয় উদ্যোগের উপর গুরুত্ব আরোপ করে প্রয়োজনবোধে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নির্মাণে উৎসাহিত করতে হবে এবং সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। লক্ষণীয় যে জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহ, বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান সম্মেলনে তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবক কর্তৃক দেশীয় উপকরণে তৈরি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষার সরঞ্জামাদি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে চলছে। এ ধরনের উদ্ভাবনীমূলক কাজে ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য উদীয়মান বিজ্ঞানীদের উৎসাহিত করার জন্য এ সকল সরঞ্জামাদি চিহ্নিত করে শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। শিক্ষা উপকরণ বোর্ড এসব উপকরণের মানোন্নয়ন ও উৎপাদনের ব্যবস্থা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে পারে। এসব প্রচেষ্টা কার্যকরী করতে হলে সরকারী উদ্যোগ ও সহায়তা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সরকারী উদ্যোগে বেসরকারী পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উপকরণ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

১৫·১৩· বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড একটি উৎপাদনমুখী সরকারী প্রতিষ্ঠান। এর উৎপাদিত উপকরণ বিক্রয়, সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি মেনে চলতে হবে যাতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নিয়মিতভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাতে পারে, অন্ততপক্ষে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর জন্য এই সংস্থাকে একটি বার্ষিক উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য নির্ধারিত সরকারী বাজেটের একাংশ বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা মেটানোর জন্য ব্যয় করা যেতে পারে। এতে করে বোর্ডের উৎপাদন চালু থাকবে এবং উপকরণের মান বৃদ্ধি, তথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সরবরাহ নিশ্চিত করা যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে পরিমাণ অর্থ উক্ত উৎপাদনের জন্য ব্যয় করা হবে, বোর্ড সেই অনুপাতে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করবে। এই ব্যবস্থার দ্বারা বোর্ড শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত ও বিক্রয়ের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ক্রেতা-বিক্রেতার সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, তাতে পারস্পরিক কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং মত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ হবে। বোর্ড শিক্ষা উপকরণের মূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করবে যেন বোর্ডের কার্য সম্পাদন খরচ নির্বাহে প্রয়োজনীয় তহবিলও আপনা-আপনি গড়ে উঠতে সহায়ক হয়। একটি গতিশীল ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের দায়িত্ব হবেঃ

(ক) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা নিরূপণ করা, কি ধরণের যন্ত্রপাতি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা পরীক্ষা করা, ভবিষ্যতে এগুলির সদ্ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান করা।

(খ) বহুল ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দেশে নির্মাণের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখা। শিক্ষার্থীর আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে স্বল্প মূল্যের শিক্ষার উপকরণ উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও উৎপাদন করার প্রচেষ্টা করা।

(গ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুযায়ী এবং দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির চাহিদা মাফিক নির্দিষ্ট শিক্ষা উপকরণ ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বোর্ডের ওয়ার্কশপে উৎপাদন করা এবং যন্ত্রপাতির তালিকা প্রণয়ন ও বিতরণ করা।

(ঘ) বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য বোর্ডের অধীনে কর্মরত কারিগরগণকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং শিক্ষার উপকরণ ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা।

(ঙ) বিদেশ থেকে আমদানিকৃত উন্নত যন্ত্রপাতির প্রটোটাইপ প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে উৎপাদন ও দেশজ প্রযুক্তির উন্নয়নে সাহায্য করা।

(চ) যন্ত্রপাতি নির্মাণ ও মেরামতের জন্য যে দক্ষ কারিগরের প্রয়োজন তার জন্য প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করতে হবে। জাতীয় কারিকুলাম কর্তৃপক্ষ ও টেক্সটবুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ এবং বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ডের পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে কারিকুলামের উপযোগী যন্ত্রপাতি নির্মাণ সম্ভব হয় এবং উৎপাদিত যন্ত্র কারিকুলামের উপযুক্ত হয়।

১৫·১৪· একইভাবে কৃষি, কারিগরি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ও আধুনিক যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেসব যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করা সম্ভব সেসব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য সরকারী উদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন। এর ফলে আমদানির উপর নির্ভরশীলতা কমে আসবে এবং প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচাতে সাহায্য করবে। কৃষি, কারিগরি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেশের অভ্যন্তরে নির্মাণ ও সরবরাহ সুনিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐসব যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য যথোচিত বৈদেশিক মুদ্রা বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

১৫·১৫· শিক্ষামূলক চার্ট, মানচিত্র, মডেল ও অন্যান্য শিক্ষোপকরণ প্রস্তুত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষা অঞ্চল পর্যায়ে অডিও-ভিসুয়েল শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা উচিত। এই সকল কেন্দ্র শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র ও ফিল্মস্ট্রীপ নিয়মিত প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। শিক্ষার উপকরণ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এর নিচে উদ্ধৃত মতামত ও সুপারিশমালা অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমরা মনে করিঃ

> 'বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি পদ্ধতি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যয়বহুল যন্ত্রপাতির পরিবর্তে চলচ্চিত্র ও স্লাইড ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কেও চিন্তা করতে হবে। যেখানে প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি পাওয়া যায় না, অথচ সামান্য কাজে ব্যবহারের পক্ষে এগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল সেখানে আলোকচিত্রের সাহায্যে মহড়া দানের সন্তোষজনক সুবিধাদি রয়েছে। বিশেষ পরিকল্পনা ও সুষ্ঠু পরিচালনার ব্যবস্থা থাকলে একই চলচ্চিত্র ও স্লাইড একই বছরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষক কর্তৃক ব্যবহৃত হবার পরে ও পরবর্তী বছরে আবার ব্যবহৃত হতে পারে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলচ্চিত্র অথবা স্লাইড প্রদর্শনীর যন্ত্র থাকে সেখানে তা বহু শিক্ষক ও বহু বিভাগের প্রয়োজন সারা বছর ধরে মিটাতে সক্ষম হয়।'

ভাল ব্লাক বোর্ড, ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি উপকরণ ছাড়া স্কুল-কলেজে উন্নতমানের শিক্ষাদান সম্ভব নয়। এ সমস্ত উপকরণের ব্যাপক উৎপাদনের জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহদান প্রয়োজন।

অধ্যায় ১৬

গ্রন্থাগার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগার

১৬.১ গ্রন্থাগার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিন্ড স্বরূপ এ সত্যটি সাবেক আমলের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টসমূহে স্বীকৃতি লাভ করেছিল এবং সকল স্তরের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উন্নয়নের বহু সুপারিশ সে রিপোর্টসমূহে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।

১৬.২. উন্নয়ন প্রকল্পে হয় গ্রন্থাগার বাদ পড়েছে কিংবা উন্নয়ন বরাদ্দের ন্যায্য অংশ পায়নি। ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ব্যাপারে গ্রন্থাগারের জন্য অনেক ক্ষেত্রে কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি, যেখানে যা রাখা হয়েছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা অপরিসর, তাই গ্রন্থাগারে স্থানাভাব সর্বত্র। বই ও সাময়িকীর ব্যয় বরাদ্দ, গ্রন্থাগার কর্মীদের যোগ্যতা ও সংখ্যা বা গ্রন্থাগারের আসবাব সামগ্রী ইত্যাদি এতই অপ্রতুল যে অধিকাংশ স্কুল কলেজে গ্রন্থাগার বলে কিছু নেই বললেও চলে। যেখানে যা আছে তাও প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার উন্নয়ন শিক্ষার এক বিশেষ অঙ্গ। আমাদের শিক্ষার মানোন্নয়ন করতে হলে যথোপযোগী গ্রন্থাগার অবশ্যই গড়তে হবে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার

১৬.৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে কমিশনের সুপারিশের পুনরাবৃত্তি করে আমরা বলতে চাই যে, বইয়ের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি ও মর্যাদা বোধ জাগানো এবং পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকদের, পরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তায়। কিন্তু এ দায়িত্ব পালিত হচ্ছে না। সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন এখন সম্ভব না হলেও বর্তমানে প্রত্যেক উপজেলা/থানা সদরে গ্রন্থাগার স্থাপন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ভ্রাম্যমান বইয়ের শিবির রূপে ব্যবহার করা যায়। সরকারী উদ্যোগে ছোটদের জন্য মনোরম বই ও সাময়িকী প্রকাশনা ও তা স্বল্প মূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬.৪. উপজেলা/থানা গ্রন্থাগার স্থাপন ও চালাবার ব্যয় ভার বহন করবে জাতীয় সরকার। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে পরিবেশনের জন্য বই কেনা এবং পরিবেশনের আনুষঙ্গিক ব্যয়ের একটি অংশ (আনুমানিক ৫০%) যোগাবে যৌথভাবে উপজেলা কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপজেলা/থানা গ্রন্থাগার থেকে সরাসরি বই পরিবেশন চলবে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে ক্রমান্বয়ে দেশের প্রত্যেকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের সভাপতিত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি এ ব্যবস্থার তদারকি করবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার

১৬.৫. মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার একান্ত অবহেলিত। বইয়ের স্বল্পতা, স্থানাভাব গ্রন্থাগারিকের অভাব, সর্বোপরি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মনে বই পড়ার প্রেরণার অভাব মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির করুণ চিত্রের পরিচয় প্রদান করে। তাই বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪)

সুপারিশের আলোকে দেশের সর্বত্র সুষ্ঠুভাবে নির্ধারিত নিম্নমানের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারগুলিকে গড়ে তোলার দিকে আশু দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগারের ব্যর্থতার সুনিশ্চিত পরিণাম হবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার প্রয়াসের ব্যর্থতা।

১৬·৬· মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ব্যাপারে আমরা পরিমাণ জ্ঞাপক নিম্নতম নির্দেশের প্রয়োজন অনুভব করছি। প্রসঙ্গত বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এ বিষয়ে যে সব সুপারিশ করেছিল আমরা সেই কমিশনের সাথে একমত হয়ে নিম্নরূপ সুপারিশ করছি:

(১) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের আয়তন কমপক্ষে এক হাজার বর্গফুট হবে। প্রয়োজন বোধে আলাদা গ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ করতে হবে। নীল নকশা তৈরির বেলায় মনে রাখতে হবে যে ভবিষ্যতে ভবনটির সম্প্রসারণের প্রয়োজন অপরিহার্য হবে। অধিকাংশ বই পুস্তক খোলা শেলফে বিন্যস্ত হবে, ভবনটির মেঝে হবে আর্দ্রতা ও কীটরোধক, সূর্যের কিরণ ও তাপের সরাসরি প্রবেশ থাকতে হবে এবং ভবন নির্মাণের পূর্বে আসবাব পত্রের আকার, সংখ্যা ও অবস্থান ছকে নিতে হবে।

(২) বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক আসবাবপত্রের সমাবেশ হতে হবে গ্রন্থাগারে।

(৩) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা কর্তৃপক্ষের নমুনা স্বরূপ পরিকল্পিত গ্রন্থাগার ভবনের একাধিক বিকল্প নীল নকশা তৈরি করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পূর্বাহ্নে বিতরণ করবেন। এ নমুনা নকশায় আসবাব সরঞ্জামের আকার, আকৃতি ও অবস্থান দেখানো হবে।

(৪) বই সাময়িকীর জন্য বাৎসরিক ব্যয় বরাদ্দ হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে মাথা পিছু স্বল্প মূল্যের একখানা বই কেনার মত হার। বই মেরামত, বাঁধাই ও আনুষঙ্গিক ব্যয় এ অংকের সামিল থাকবে।

(৫) গ্রন্থাগার খোলা থাকবে বিদ্যালয় বসার এক ঘণ্টা পূর্ব থেকে ছুটির এক ঘণ্টা পর পর্যন্ত। প্রত্যেক শ্রেণীর সাপ্তাহিক কর্মসূচীতে কমপক্ষে দুটি পিরিয়ড গ্রন্থাগারে ব্যয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

(৬) কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একজন পূর্ণকালীন গ্রন্থাগারিক এবং একজন পূর্ণকালীন ক্যাটালগার সহকারী থাকবে যার যোগ্যতা হবে মাধ্যমিক পাশ এবং গ্রন্থগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত।

কলেজ গ্রন্থাগার

১৬·৭· দেশের কলেজগুলির গ্রন্থাগার বিষয়েও বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) যথাযথ বক্তব্য রেখেছে। দেশের কলেজের গ্রন্থাগারগুলি মূলত মাধ্যমিক বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির মতই। সরকারী কলেজের গ্রন্থাগারগুলি একটু ভাল হলেও বেসরকারী কলেজগুলির গ্রন্থাগারের দুর্দশা অত্যন্ত প্রকট। অনেক কলেজ ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, কোনো কোনো কলেজে অনার্স কোর্স, এমন কি কিছু সংখ্যক কলেজে মাস্টার্স ডিগ্রী ক্লাস খোলা হয়েছে। কিন্তু ঐ কলেজগুলির গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের বস্তুত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

১৬·৮· উপরোক্ত শিক্ষা কমিশনের ন্যায় আমরাও মনে করি যে, কলেজ গ্রন্থাগারগুলি উন্নয়নের জন্যও নিম্নতম মান স্থির করার প্রয়োজন আছে। মান নির্দেশের জন্য কলেজগুলিকে মোটামুটিভাবে বড় কলেজ, মাঝারি কলেজ ও ছোট কলেজ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১৬·৯· বড় কলেজের গ্রন্থাগারের আয়তন চার হাজার বর্গ ফুট, মাঝারি কলেজের গ্রন্থাগারের আয়তন তিন হাজার বর্গফুট এবং ছোট কলেজের গ্রন্থাগারের আয়তন দুই হাজার বর্গফুট হওয়া উচিত।

১৬·১০· বই ও সাময়িকীর জন্য ব্যয় বরাদ্দ হবে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সংখ্যার ভিত্তিতে ছোট বড় সকল কলেজের জন্য মাথাপিছু একটি নির্দিষ্ট হার। এর মধ্যে থেকে বই মেরামত, বাঁধাই এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। নতুন বিভাগ খুললে পর্যাপ্ত বইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে হবে।

১৬·১১· কলেজ গ্রন্থাগারে উপযুক্ত শেলফের ব্যবস্থা থাকবে। কলেজ গ্রন্থাগার সকাল ৮টা থেকে রাত্র ৯টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা রাখতে হবে। কলেজ গ্রন্থাগার পরিচালনায় থাকবেন উপযুক্ত ও যোগ্যতা সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, ক্যাটালগার ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। গ্রন্থাগারিক ও সহকারী গ্রন্থাগারিকের বেতন স্কেল ও মর্যাদা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে বর্ধিত করা প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

১৬·১২· বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে তাও খুব সন্তোষজনক বলা যায় না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলির কার্যকারিতা ও দুর্বলতার খতিয়ান তৈরি করা দরকার। প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি উপযুক্ত ও অধিক সময়ের জন্য খোলা রাখা ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রন্থাগার থাকা উচিত। যাতে শিক্ষার্থীরা অবসর সময়ে ও ছুটির পরে পড়াশুনা করতে পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতীব প্রয়োজন।

১৬·১৩· বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে আমরা নিম্নরূপ সুপারিশ করছিঃ

(১) বই ও সাময়িকীর ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। বৃদ্ধির পরিমাণ বিচারের ব্যাপারে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধীত বিষয়ের সংখ্যা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সংখ্যা, বর্তমান বই সম্পদের পরিমাণ, নিত্য ব্যবহার্য ও কদাচিৎ ব্যবহৃত বই সাময়িকীর অনুপাত, বই সাময়িকীর মূল্যে বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের আয়তন বিচার করা উচিত। অধিকতর বাজেট বরাদ্দের দাবিই এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। এই কাজে সেই সকল শিক্ষকের প্রয়োজন যারা নিজ বিষয়ের অত্যাধুনিক অগ্রগতির সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং গ্রন্থাগারিককে সীমাবদ্ধ সম্পদের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারেন।

(২) গবেষণা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য রেফারেন্স গ্রন্থাগারিক এবং উপযুক্ত সংখ্যক রেফারেন্স সহকারী নিযুক্ত করা এবং গ্রন্থাগারকে আন্তঃগ্রন্থাগার বিনিময়ের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য ও সুযোগ সুবিধা দেয়া আবশ্যক।

(৩) প্রয়োজনীয় বিদেশী বই, সাময়িকী এবং আনুষঙ্গিকভাবে ব্যবহৃত গ্রন্থাগার সামগ্রী আমদানির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারকে অধিকতর সুযোগ সুবিধা প্রদান করা আবশ্যক। দেশের আমদানি নীতি, শুল্ক আইন ও বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ নীতিতে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের এবং অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণারত প্রতিষ্ঠানের জন্য আনুকূল্যের ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয়।

(৪) গ্রন্থাগারে উম্মুক্ত তাকের প্রচলন করে স্বেচ্ছামত বই পত্রাদি পড়ার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। অবশ্য এমন অনেক বই আছে যেগুলি দুষ্প্রাপ্য ও অত্যন্ত মূল্যবান। তবুও এমন একটি সূত্র খুঁজে বের করতে হবে যদ্বারা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান বইও সত্যিকারের প্রয়োজনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিকট সহজলভ্য হয়। আমরা বিশ্বাস

করি যে, শিক্ষকগণ যদি নিজেরাই নিয়মিত গ্রন্থাগারে যান তবে তাঁরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারবেন এবং শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মানের উন্নতি বিধান করতে সফল হবেন।

রেন্টাল প্রথা

১৬.১৪ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সকল স্তরের গ্রন্থাগারে বই-পুস্তক ধার দেয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এর জন্য প্রয়োজনবশত ফি নেয়ার ব্যবস্থা থাকতে পারে।

গণ-গ্রন্থাগার

১৬.১৫ এদেশে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার একটি সরকারী প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল পঞ্চাশের কোঠায়। ১৯৫৪ সালে ঢাকায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম ও খুলনায় আরো দুটি সরকারী গণ-গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। সবশেষে রাজশাহীতে বিভাগীয় সদরে চতুর্থ সরকারী গণ-গ্রন্থাগার খোলা হয়। এসব গ্রন্থাগার তদারকের জন্য জনশিক্ষা পরিদপ্তরে একজন অফিসার নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বিভাগীয় সদরগুলিতে গ্রন্থাগারের জন্য বর্তমান ব্যয় ও বই বরাদ্দ পর্যাপ্ত নয়।

১৬.১৬ আশা করা গিয়েছিল যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে যে অনুদান দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছে তা ক্রমাগত বাড়বে এবং দেশে বহু নতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু সে আশা সফল হয়নি।

১৬.১৭ অধিকাংশ সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী গ্রন্থাগার বিকাল বা সন্ধ্যার দিকে দু'তিন ঘন্টা খোলা থাকে। উপস্থিত পড়ুয়ারা পত্র-পত্রিকা পড়ে। চাঁদা-দাতা সদস্যরা বই ধার পায়। সাহায্য বা অনুদান অপ্রতুল; তাই পর্যাপ্ত সংখ্যায় নতুন বই কেনা সম্ভব হয় না বলে চাহিদা পূরণ হয় না। বেসরকারী গ্রন্থাগারগুলিতে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক খুবই বিরল, প্রায় সবাই খন্ডকালীন কর্মচারী। এই পরিস্থিতিতে বেসরকারী গণ-গ্রন্থাগারের বিস্তারের জন্য সরকারী অনুদান ও উৎসাহ প্রদান প্রয়োজন। এছাড়াও ভ্রাম্যমান গণ-গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। উপজেলা সদরকে এ সকল গ্রন্থাগারের কেন্দ্র করে নির্ধারিত নিয়ম ও সময় অনুযায়ী এ জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে সকল অঞ্চলে বই-পুস্তক সরবরাহ ও ধারের ব্যবস্থা করা যায়।

১৬.১৮ উন্নত দেশে গণ-গ্রন্থাগার বলতে বোঝায় আইন ভিত্তিক ট্যাক্স নির্ভর সাংস্কৃতিক সেবা প্রতিষ্ঠান, যাতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার অবাধ, সর্বস্তরের জনগণ যেখানে জীবন ব্যাপী শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরা গণ-গ্রন্থাগার ব্যবহার করবে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণ-গ্রন্থাগারের বিস্তার যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার বাসস্থানের কাছে গণ-গ্রন্থাগারের বই পেতে পারেন। তজ্জন্য গণ-গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে কর ধার্য, অধুনা প্রতিষ্ঠিত গণ-গ্রন্থাগার পরিদপ্তরের পুনর্গঠন ও জোরদার এবং গণ-গ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র

১৬.১৯ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। উন্নতমানের পুস্তক লেখা ও প্রকাশনার জন্য উৎসাহদান ও পদক্ষেপ গ্রহণ জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের দায়িত্বরূপে পরিগণিত হতে পারে। এজন্য সরকারকে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। বহু পুস্তক লেখক, প্রকাশক ও মুদ্রণ শিল্পের সহযোগিতা এ ব্যাপারে অপরিহার্য।

জাতীয় গ্রন্থাগার

১৬.২০ জাতীয় গ্রন্থাগার হবে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র এবং বহির্বিশ্বের সাথে দেশের সাংস্কৃতিক সেতুস্বরূপ। একে যে কপিরাইট ডিপোজিটের অধিকার দেয়া হয়েছে তা সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে বাস্তবায়নের জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম

প্রধান দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হবে জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশনা এবং জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গ্রন্থপঞ্জি প্রকাশ। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং একে স্বায়ত্ত শাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে গড়তে হবে। এই প্রসঙ্গে আমরা আরো সুপারিশ করি যে, ঢাকায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারসহ দেশের অন্য তিনটি বিভাগীয় সদরে স্থাপিত গণ-গ্রন্থাগারগুলিকেও কপিরাইট ডিপোজিটের অধিকার দেয়া উচিত হবে। জাতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনও আবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার

১৬·২১· জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। বিজ্ঞান, চিকিৎসা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য জাতীয় বিজ্ঞান গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এদিকে সরকারের ও সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করছি।

জাতীয় আরকাইভস

১৬·২২· জাতীয় আরকাইভসকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান করে একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাও অত্যাবশ্যক। রাষ্ট্র ও নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্ব-পূর্ণ রেকর্ড এবং জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও গবেষণার জন্য এসবের সুষ্ঠু বিন্যাস ও পরিবেশন হবে এ প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব। দেশের অফিস আদালতে এবং প্রশাসনিক বিভিন্ন সংস্থায় অহরহ যে দলিলাদি সৃষ্টি হচ্ছে তা কালে অবহেলা ও অযত্নে নষ্ট হয়। যা নষ্ট হয় না তাও স্তূপীকৃত অবস্থায় পড়ে থাকে বলে প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। অপ্রয়োজনীয় নথি-পত্রের স্তূপ থেকে যথাবিহিত পরীক্ষার পর মূল্যবান দলিলগুলি আলাদা করার এবং তার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা দরকার।

১৬·২৩· জাতীয় আরকাইভস সম্পর্কে একটি সুষ্ঠু কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত। দেশের ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যবাহী লিখিত উপকরণসমূহ সংরক্ষণ করে তা গবেষকদের ব্যবহারোপযোগী করার উদ্দেশ্যে সুষ্ঠু কার্যক্রমের প্রয়োজন। জাতীয় আরকাইভস কমিশন এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ

১৬·২৪· আমাদের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য কয়েক হাজার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণের পক্ষে বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। আমরা সুপারিশ করি যে, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীর নগর ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে গ্রন্থাগার বিভাগ খোলা হোক এবং ঢাকায় একটি গ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক। তদুপরি দেশের শিক্ষক শিক্ষণ কলেজগুলিতে গ্রন্থাগার বিভাগের কোর্স সংযোজন করা যেতে পারে। সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকদের পদ মর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিত।

জাতীয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক

১৬·২৫· যাতে আমাদের দেশে সীমিত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার হয়, তার জন্য বিভিন্ন গ্রন্থা-গারের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক গঠন করা দরকার, যাতে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক-গণ বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করতে পারে।

১৬·২৬· গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম শিক্ষকদের সমতুল্য হওয়া দরকার, যাতে ধীরে ধীরে এই পেশাতে মেধাবীরা আকৃষ্ট হয়। মনে রাখা দরকার যে, উপযুক্ত মেধাবী গ্রন্থাগারিকই উন্নতমান গ্রন্থাগার (যা উন্নতমান শিক্ষাদানের 'অপরিহার্য অংশ) গড়ে তুলতে সক্ষম।

অধ্যায় ১৭

শিক্ষক-শিক্ষণ

ভূমিকা

১৭·১· শিক্ষার্থীদের পরে শিক্ষকগণই হচ্ছেন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহত্তম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষ বিধানে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

১৭·২· একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, শিক্ষকগণই যে কোনো শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থান করেন। এ কারণেই শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতির প্রসঙ্গটি একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবেই বিবেচনা ও গুরুত্ব লাভ করে। এ প্রস্তুতির প্রয়োজনে শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান ও শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কিত পর্যাপ্ত জ্ঞান ও কুশলতা অর্জন করতে হয়। দুঃখজনক হলেও একথা সত্য যে স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের শিক্ষকদের মান এবং তারই অবশ্য অনুষঙ্গ হিসাবে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষ শিক্ষাদান এখন একটি দুর্বলতর প্রসঙ্গ। মা-বাবা, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, এমনকি, শিক্ষকগণও শ্রেণীকক্ষের কার্যকারিতার উপর আস্থাভাজন থাকতে পারছেন না। শ্রেণীকক্ষের সম্পূরক নয় বরং অনেকটা বিকল্প হিসাবেই এসেছে গৃহ-শিক্ষকতা এবং তা ক্রমাগতভাবে পল্লবিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে শিক্ষাঙ্গনের বাইরে অধিক মূল্যে শিক্ষাদানের বিচিত্র প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। এ প্রবণতা দুর্ভাগ্যজনক এবং পরিণামে তা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার যাবতীয় আয়োজন বিপর্যস্ত করতে পারে। এ বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্য আমাদের অবশ্যই শ্রেণীকক্ষের প্রতি সাগ্রহ ও সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। অন্য কথায়, শ্রেণীকক্ষের শক্তি ও মান বৃদ্ধি করা আশু প্রয়োজন। একটি সুশিক্ষিত পেশাগত যোগ্যতা সম্পন্ন নিবেদিত শিক্ষক-সমাজই এ গুরু দায়িত্বটি পালন করতে পারেন।

১৭·৩· শিক্ষার সর্বস্তরে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও গুণগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে একটি সুশিক্ষিত পেশাগত প্রস্তুতিসম্পন্ন শিক্ষক সম্প্রদায় আবশ্যক। বস্তুত শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায় শিক্ষকের কোনো বিকল্প নেই, শিক্ষার উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম, ভবন ইত্যাদি যাবতীয় বস্তুগত আয়োজন শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার পরোক্ষ সহায়ক উপাদান মাত্র। কাজেই শিক্ষাকে জাতীয় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে কাজ করতে হলে শিক্ষক ও তাঁর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে। শিক্ষকদের সংখ্যাগত বৃদ্ধি ও গুণগত উৎকর্ষ-দুইই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। কালানুক্রমে শিক্ষাকে তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে হলে তাকে ক্রমাগতভাবেই তার উৎপাদিত সর্বোত্তম মানবীয় সম্পদকে আত্মীকরণ ও পুনর্বিনিয়োগ করতে হবে।

১৭·৪· শিক্ষার সর্বস্তরেই সুযোগ্য শিক্ষকের অভাব আজকের দিনে একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষণ-প্রাপ্ত শিক্ষক সরবরাহ ও শিক্ষকের মোট চাহিদার মধ্যে একটি বড় রকমের ব্যবধান রয়েছে। তুলনামূলকভাবে মাধ্যমিক স্তরেই শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশেষ করে, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়সমূহের শিক্ষকের অভাব তীব্রতর। অধিকন্তু দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বিদ্যালয়সমূহে সাধারণ মানের শিক্ষকও সহজলভ্য নয়। এ ধরনের বিদ্যালয়গুলি যোগ্য শিক্ষকদের তেমন আকর্ষণ করতে পারে না। ফলে গ্রামীণ শিশু-কিশোর-তরুণদের শিক্ষার ভার অপেক্ষাকৃত নিম্ন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের উপর ন্যস্ত রয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিরাজমান অবস্থা

১৭·৫· বর্তমানে দেশে শিক্ষক-শিক্ষণের চারটি ধারা বিদ্যমানঃ (ক) প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক, (খ) মাধ্যমিক, (গ) কারিগরি ও বৃত্তিমূলক এবং (ঘ) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক শিক্ষক-প্রশিক্ষণ।

উল্লিখিত চারটি ধারায় শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত রয়েছে। নিচের সারণীতে প্রতিটি ধারায় শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা ও মোট আসন সংখ্যা দেখানো হলঃ

সারণী-১ঃ শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা প্রদত্ত ডিগ্রী ও আসন সংখ্যা

প্রতিষ্ঠানের নাম	সংখ্যা	প্রদত্ত ডিগ্রী/ডিপ্লোমা	বাৎসরিক প্রশিক্ষণার্থী গ্রহণ ক্ষমতা	ধারা
প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (পি, টি, আই,)	৫৩	সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন	১০,১৪০	প্রাথমিক
টিচার্স ট্রেনিং কলেজ	১০	বি, এড,		
ময়মনসিংহ।		বি, এড, ও এম, এ ইন-এডুকেশন	৩,৫০০	মাধ্যমিক
রাজশাহী		বি, এড, ও এম, এড		মাধ্যমিক
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড)।	১	বি, এড,	৩,২০০	মাধ্যমিক
শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।	১	ক ডিপ্লো-ইন-এডুকেশন খ এম, এড গ এম, ফিল,* ঘ পি এইচ, ডি**	১৫০ ২০০	প্রাথমিক ও মাধ্যমিক
টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ।	১	ক ডিপ্লোমা-ইন টেকনিক্যাল এডুকেশন খ বি, এস, সি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন	৮০	কারিগরি
ভোকেশন্যাল টিচার্স ট্রেনিং	১	ক সার্টিফিকেট-ইন-ভোকেশনাল টিচার্স এডুকেশন খ ডিপ্লোমা-ইন-ভোকেশনাল টিচার এডুকেশন (১)	১২০	বৃত্তিমূলক
শারীরিক শিক্ষা কলেজ	২	ক জুনিয়র ডিপ্লোমা-ইন ফিজিক্যাল এডুকেশন	৪০০	শারীরিক শিক্ষা
		খ ব্যাচেলর অব ফিজিক্যাল এডুকেশন (বি, পি, এড)	১৫০	মাধ্যমিক (শারীরিক শিক্ষা)
মোট	৬৭			

প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ

প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়

১৭.৬. আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তির বয়স অনূর্ধ্ব ছয় বছর। এর পূর্ববর্তী স্তর, বিশেষ করে ৩—৫ বছর বয়ঃপরিক্রমই প্রাক-প্রাথমিক স্তর হিসাবে চিহ্নিত। এ স্তরের শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বর্তমানে দেশে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বহুসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নার্সারি/কিন্ডারগার্টেন/প্রিপারেটরী ইত্যাদি নামে

(১) Survey on Teacher Education NIEAER & UNESCO 1986.
* এখনও ছাত্র ভর্তি শুরু হয়নি।
** প্রতি বৎসর গড়ে ৭ জন।

পরিচিত হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এগুলি আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে। প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের জন্য সরকারী ব্যবস্থাধীনে এ যাবত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। তবে সরকারের পরিচালনাধীন বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অল্পবয়সী শিশুদের জন্য একটি করে শিশু শ্রেণী রয়েছে।

১৭.৭. একথা সত্য যে, বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দিনে দিনে বহুগুণিত হচ্ছে এবং এগুলি অভিজাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজের বিত্তবান শ্রেণীর সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। লক্ষণীয় যে, শিক্ষা বিভাগের কোনো অনুমোদনের অপেক্ষা না রেখেই এ প্রতিষ্ঠানগুলি স্থাপিত হচ্ছে এবং এদের শিক্ষাক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রেও শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক আজ পর্যন্ত কোনো নীতিমালা প্রণীত হয়নি। শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারেও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত কোনো স্বীকৃত বিধি নেই। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে শিক্ষণ বিহীন নিম্নমানের শিক্ষকগণ এ সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি অনুসৃত হয় না বলেই এ সকল প্রতিষ্ঠানে বিকাশমান শিশুদের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষার পরিবেশ নির্মিত হচ্ছে না। এ অবস্থা আকাঙ্ক্ষিত নয়।

সুপারিশ

১৭.৮. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাব ও দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধিকে একটি সামাজিক সত্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে হবে। তবে জাতীয় আকাঙ্ক্ষার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলার প্রয়োজনে এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাক্রম, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবলীর প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। সাধারণভাবে, এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার উপযোগিতা ও উৎকর্ষ বিধান করা একান্ত প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে আমাদের সুপারিশ হচ্ছেঃ

(১) প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শিক্ষক নিয়োগ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধি প্রণীত হওয়া প্রয়োজন।

(২) এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কর্মপূর্ব ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে বিশেষ কার্যক্রম প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষণ কার্যক্রমে অবশ্যই শিশু মনোবিজ্ঞান ও আধুনিক শিশু শিক্ষা পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপিত হবে।

প্রাথমিক পর্যায়

১৭.৯. পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ সময় সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত গুরু ট্রেনিং স্কুল/প্রাইমারী ট্রেনিং সেন্টার/মোয়াল্লেম ট্রেনিং স্কুলসমূহের অবলুপ্তি ঘটে এবং তার স্থলে প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউট-সমূহের (পি,টি,আই) সৃষ্টি হয়। বর্তমানে দেশে ৫২টি সরকারী পি,টি,আই এবং একটি বেসরকারী পি,টি,আই এক বছর মেয়াদী সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সি,ইন,এড) কোর্স প্রদান করছে। প্রতি বছর এ সকল ইনস্টিটিউট থেকে দশ হাজারেরও বেশি শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেন। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত উক্ত কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নিম্নরূপঃ

ক. সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এস.এস.সি;

খ. বহিরাগত মহিলাদের ক্ষেত্রে এস.এস.সি (দ্বিতীয় বিভাগ);

গ. বহিরাগত পুরুষ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এইচ.এস. সি/ফাযিল (এস.এস সি/আলীম ও এইচ.এস.সি/ফাযিল পরীক্ষার যে কোনো একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ)।

১৭.১০. বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত তথ্যানুসারে২ বর্তমানে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ১.৯০ লক্ষ শিক্ষক কর্মরত রয়েছেন। এদের মধ্যে ২৮.৫ হাজার (১৫%) শিক্ষক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নন। স্বাভাবিক ক্ষয় ও অপচয় জনিত কারণেও শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। অধিকন্তু দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের লক্ষ্য অর্জনে আরো বহুসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এ রিপোর্টের প্রাথমিক শিক্ষা অধ্যায়ে প্রস্তাবিত সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার পক্ষে সরকার কর্তৃক অনুকূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা আরো বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে।

১৭.১১. ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে এ স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করা হয়। পুনর্বিন্যস্ত ব্যবস্থায় সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় এইচ.এস.সি (এস.এস.সি অথবা এইচ.এস.সি'র যে কোনো একটিতে দ্বিতীয় বিভাগ)। তবে এ যাবৎ প্রশিক্ষণবিহীন কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাধীনে কিছু সংখ্যক পি.টি.আই'তে প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করার ব্যবস্থা রাখা হয়। অধিকন্তু, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অপচয়রোধে পি.টি.আই'গুলিতে বহিরাগত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ব্যবস্থা রহিত করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষকদের উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যাপারটিও বিবেচনা লাভ করে। একটি আশু ব্যবস্থা হিসাবে কিছু সংখ্যক পি.টি.আই'তে হায়ার সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন কোর্স এবং অদূর ভবিষ্যতে চারটি পি.টি.আই'তে বি.এড (প্রাইমারী কোর্স) প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সুপারিশ

১৭.১২. প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে উপরোক্ত পদক্ষেপসমূহ কল্যাণবহ হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, অনুকূল প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ তথা প্রয়োজনীয় সুবিধাবলী সৃষ্টি ব্যতিরেকে এ সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষণ কার্যক্রমের সার্বিক উন্নতি ও গতিশীলতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নকল্পে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গৃহীত হওয়া প্রয়োজনঃ

(১) পি.টি.আই. প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধনে সর্বাগ্রে শিক্ষকমণ্ডলীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মান উন্নয়ন এবং পদসমূহের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে এ সকল প্রতিষ্ঠানে পর্যায়ক্রমে যথোপযুক্ত বেতনক্রমে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীসহ প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষক পদে নিয়োগ এবং তাদের যথা-যোগ্য বেতন-ভাতাদি প্রদান করতে হবে।

(২) শিক্ষার সাম্প্রতিক গতিধারা ও নবতর উদ্ভাবনার সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজনে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য দেশে ও বিদেশে পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে প্রেষণের ভিত্তিতে যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে তাও সম্প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন।

(৩) শিক্ষকগণ যোগ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের পথ সুগম করতে হবে। পেশাগত ক্ষেত্রে উন্নতি তাঁদের মনোবল দৃঢ় ও পেশায় এক-নিষ্ঠতা সৃষ্টি করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতাসম্পন্ন অধিক সংখ্যক কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে উল্লেখিত পর্যায়ের কর্মকর্তার সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষায় স্নাত-কোত্তর মানের শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের চাহিদা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

---

(২) শিক্ষা পরিসংখ্যান ১৯৮৭, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো, নীলক্ষেত, ঢাকা।

(৪) পি.টি.আই.সমূহে প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যুগোপযোগী নয় এবং ক্রমে তা শিক্ষা ও শিক্ষণের আধুনিক গতিধারার সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলছে। অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক বিষয়ের তুলনায় তত্ত্বীয় বিষয়গুলি মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়েছে। অধিকন্তু, শিক্ষণকালের সঙ্গে সঙ্গতিহীন এ শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীর কাছে গুরুভার হিসাবে বিবেচিত। কাজেই প্রচলিত এই শিক্ষাক্রমের সংস্কার ও নবায়ন একটি আশু ও জরুরী প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(৫) শিক্ষণ কার্যক্রম একটি অব্যাহত প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রারম্ভিক শিক্ষা লাভের পর পর্যায়ক্রমিকভাবে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন (নেইপ) তার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত পি.টি. ইনস্টিটিউটে নিয়মিত ভিত্তিতে কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। উল্লেখিত ব্যবস্থার সম্পূরক হিসাবে বর্তমানে স্থানীয় পর্যায়ে যে গুচ্ছ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে তাও চালিয়ে যেতে হবে।

(৬) পি.টি.আই.সমূহের শিক্ষণ কার্যক্রমে সমন্বয়ের অভাব প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বড় দুর্বলতা হিসাবে চিহ্নিত। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে একটি পরিদর্শন ও সমন্বয় কোষ গঠিত হওয়া প্রয়োজন। পরিচালক (প্রশিক্ষণ)-এর অধীনে এ কোষটি কাজ করবে।

(৭) শিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ও শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে পি.টি.আই.সমূহের বস্তুগত সুবিধাবলী নিশ্চিত করতে হবে।

মাধ্যমিক পর্যায়

১৭.১৩. ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৫৭ সালে ঢাকায় প্রথম নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। একই শতকের শেষ দিকে কুমিল্লা ও রংপুরে আরো দু'টি নর্মাল স্কুল স্থাপিত হয়। নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের জন্য শিক্ষক প্রস্তুতিই ছিল এ ধরনের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্ব। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ স্থাপিত হয় ১৯০৯ সালে। বর্তমানে দেশে দশটি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে। এদের মধ্যে চারটিকে কলেজ অব এডুকেশন থেকে টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পরিবর্তিত করা হয়। প্রতি বছর প্রায় ৩৫০০ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক এ কলেজগুলি থেকে বেরিয়ে আসেন। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহ ছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট।

১৭.১৪. দেশের ৯৮৫৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ১,০২,৩১১ জন শিক্ষকের মধ্যে প্রায় ৩৫% প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। অথচ দেশের দশটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ এবং শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের বাৎসরিক গ্রহণ ক্ষমতা ৩,৮৫০ জন। ফলে বহুসংখ্যক শিক্ষক আরো বেশ কিছুকাল প্রশিক্ষণবিহীন থেকে যাবেন এবং এর ফলে মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান ও কার্যক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। এছাড়া মাদ্রাসাসমূহে নিযুক্ত সাধারণ বিষয়সমূহের শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। বাংলাদেশ দূর-শিক্ষণ ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৮৫ সালে প্রবর্তিত দূর-শিক্ষণ কর্মসূচী শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের চাহিদা মেটাতে পারলেও দীর্ঘকাল ধরে জমে ওঠা প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানে আরো বহু বৎসর লেগে যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক শিক্ষার্থী গ্রহণ ক্ষমতা ৩২০০।

১৭·১৫· উল্লিখিত তথ্য থেকে শিক্ষক-শিক্ষণ জনিত সমস্যার ব্যাপকতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভ করা চলে। সাম্প্রতিককালে মাধ্যমিক শিক্ষার মানের ক্রমাবনতির সঙ্গে একটি সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে শিক্ষণের মান ও উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠেছে। এর থেকে সাধারণভাবে মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার নিম্নোক্ত দুর্বলতাগুলি লক্ষ্য করা যায়ঃ

শিক্ষার আধুনিক গতিধারার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির প্রত্যক্ষ ও কার্যকর সংযোগ ঘটেনি। স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তরকালে শিক্ষার সংস্কার ও পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যে সকল উদ্যোগ গৃহীত হয় শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিতে তার লক্ষণীয় ছায়াপাত ঘটেনি। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) মন্তব্য লক্ষণীয়—'কলেজগুলির বর্তমান পাঠক্রমের একটি বড় ত্রুটি হল পেশাগত বিষয়গুলির পাঠ্যসূচী অত্যন্ত সেকেলে ও অবাস্তব'৩। অধিকন্তু কলেজগুলির শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। গণিত ও বিজ্ঞান পাঠক্রমের ক্ষেত্রে এ দুর্বলতা অধিক লক্ষণীয়।

১৭·১৬· উল্লিখিত দিকগুলি ছাড়াও কলেজসমূহের পাঠক্রমে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। তত্ত্বীয় জ্ঞানের উপর অধিকতর জোর দেয়ার ফলে শিক্ষাদানের প্রায়োগিক কৌশলসমূহ অনুশীলনের পর্যাপ্ত সুযোগের অভাব ঘটে। তত্ত্বীয় শিক্ষাদান পদ্ধতিও প্রধানত বক্তৃতা নির্ভর এবং এতে আধুনিক ভাবধারার যথেষ্ট প্রতিফলন ঘটেনি।

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে শিক্ষকের অভাব একটি বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক কলেজেই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিষয়—শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। নিয়োজিত শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনেকক্ষেত্রে আশানুরূপ নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নে প্রদত্ত সারণীতে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির বর্তমান অবস্থা (১৯৮৬)৪ তুলে ধরা হলঃ

সারণী—২ঃ দেশের শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে সৃষ্ট পদের সংখ্যা ও নিয়োজিত শিক্ষকগণঃ

শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ	পদের সংখ্যা	বর্তমানে নিয়োজিত শিক্ষকদের সংখ্যা	শূন্য পদ
ঢাকা ..	২৯	২৯	—
ময়মনসিংহ (পুরুষ) ..	২৯	১৪	১৫
ময়মনসিংহ (মহিলা) ..	২৯	১৪	১৫
কুমিল্লা ..	২৭	১৩	১৪
রাজশাহী ..	২৯	১৮	১১
খুলনা ..	২৭	৯	১৮
চট্টগ্রাম ..	২৭	১৫	১২
ফেনী ..	২৭	৬	২১
যশোর ..	২৭	৫	২২
রংপুর ..	২৭	১১	১৬
মোট :	২৭৮	১৩৪	১৪৪

(৩) বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ পৃষ্ঠা ৬৭।

(৪) বাংলাদেশের সমকালীন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাঃ একটি নমুনা জরিপ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৬।

১৭.১৭. উপরের সারণী থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে অনুমোদিত পদের মধ্যে মাত্র ৪৮% শিক্ষক নিয়োজিত রয়েছেন। এ অবস্থা অভিপ্রেত নয়। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে শিক্ষকদের উচ্চতর পদের অভাবও সমস্যার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যেকটি কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ ছাড়া মাত্র একজন সহযোগী অধ্যাপকের পদ রয়েছে। ফলে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পদোন্নতি লাভ করে তাঁদের সাধারণ কলেজে চলে যেতে হচ্ছে। এ সকল কলেজে নিয়োজিত শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে কোনো পরিকল্পিত কার্যক্রম নেই বললে চলে। কলেজসমূহে বস্তুগত সুযোগ-সুবিধাও আশানুরূপ নয়। শ্রেণীকক্ষ, আবাসিক ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, পরীক্ষাগার ইত্যাদি ছাত্রসংখ্যা ও শিক্ষা কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের সমন্বয় বিধানও শিক্ষা কার্যক্রমের উন্নয়নের প্রয়োজনে সুপারভিশন বা পরিদর্শনের নিয়মিত কোনো ব্যবস্থা নেই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিগত কয়েক বছরে কলেজগুলিতে ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে ধর্মঘটজনিত শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রবণতা লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনও ঘটেছে যে, মোট প্রশিক্ষণকালের অংশ বিশেষ সম্পন্ন করেছেন এমন ছাত্র-শিক্ষকদেরও ডিগ্রী প্রদান করা হয়েছে।

মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়নঃ সুপারিশ

১৭.১৮. মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের সমস্যাসমূহ নিরসনের প্রয়োজনে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ জরুরী ভিত্তিতে গৃহীত হওয়া প্রয়োজনঃ

(ক) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের জন্য বর্তমানে প্রচলিত দশ মাসব্যাপী (জুলাই থেকে এপ্রিল) বি, এড, ডিগ্রী কোর্স কার্যকর প্রশিক্ষণ লাভে পর্যাপ্ত নয়। এ দুর্বলতা নিরসনে একটি আশু ব্যবস্থা হিসাবে এ স্তরের শিক্ষণ কালকে এক পঞ্জিকা বর্ষে (জুলাই থেকে জুন) উন্নীত করা প্রয়োজন। অধিকন্তু, দীর্ঘকালীন ছুটি প্রশিক্ষণ-কালকে যাতে হ্রাস করতে না পারে সে উদ্দেশ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিকে অবকাশ বিহীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে গণ্য করা সমীচীন। এর ফলে শিক্ষকগণ অর্জিত ছুটির সুবিধা লাভ করবেন।

(খ) প্রত্যেকটি শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে প্রতিটি পদে যত দ্রুত সম্ভব বিষয়-সংশ্লিষ্ট যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষকের বহু সংখ্যক পদ শূন্য থাকার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ কলেজ থেকে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষককে বদলীসূত্রে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজে নিয়োগ এবং কর্মরত অবস্থায় তাঁদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এ ছাড়া, প্রবীণ যোগ্য শিক্ষকদের ধরে রাখার জন্য অধিক সংখ্যক উচ্চতর পদ (সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক) সৃষ্টি করা সমীচীন।

(গ) শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নের জন্য দেশে ও বিদেশে পরিকল্পিত উপায়ে নিয়মিত কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে পারে। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান কার্যক্রম ছাড়াও শিক্ষকগণ বিভিন্ন গবেষণামূলক ও অনুসারক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করবেন। শিক্ষকদের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ শিক্ষা ছুটিও প্রদান করা যেতে পারে।

(ঘ) বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের মধ্যে এবং শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউটে পরস্পর স্বতন্ত্র ভর্তির জন্য নির্বাচনী পরীক্ষার প্রচলন রয়েছে। এ পরীক্ষার প্রমিত প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগে প্রণীত ও আদর্শায়িত একই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে নির্বাচনী পরীক্ষা গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত।

(ঙ) ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্তদের বিশেষ করে, স্নাতক পর্যায়ে যাদের গণিত, পদার্থ, রসায়নবিদ্যা ও ইংরেজি পাঠ্য বিষয় থাকে তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা আবশ্যক। অধিকন্তু, মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানের উৎকর্ষ সাধনে শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে প্রবেশকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতার মান ক্রমান্বয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীতে উন্নীত করা যায়। একটি আশু বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে উচ্চতর ডিগ্রীধারীদের জন্য অগ্রিম বেতন বৃদ্ধির সুযোগ থাকতে পারে।

(চ) শিক্ষার আধুনিক ভাবধারা এবং শিক্ষণ ক্ষেত্রে নবতর উদ্ভাবনার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর নবায়ন করা আশু প্রয়োজন। উল্লিখিত শিক্ষাক্রমকে অবশ্যই মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে মৌল বিষয়ে অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন করা প্রয়োজন। শিক্ষাক্রমে যথাসম্ভব তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয়বস্তুর সুষম বিন্যাস এবং যথোপযুক্ত সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

১৭·১৯ এ উদ্দেশ্যে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষণের প্রস্তাবিত শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা প্রদান করা হলঃ

আবশ্যিক বিষয়সমূহ

(১)	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা	... পূর্ণপত্র
(২)	শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষাদর্শন	... পূর্ণপত্র
(৩)	শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রযুক্তি	... পূর্ণপত্র
(৪)	শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক শিক্ষা	... পূর্ণপত্র
(৫)	শিক্ষা মূল্যায়ন	... অর্ধপত্র
(৬)	স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা	... অর্ধপত্র

নৈর্বাচনিক বিষয়

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম সম্পৃক্ত এবং শিক্ষার্থী কর্তৃক স্নাতক পর্যায়ে পঠিত বিষয়-সমূহের মধ্য থেকে দু'টি বিষয় (বিষয়-ভিত্তিক জ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতি) পড়তে হবে।

ঐচ্ছিক বিষয়

একটি ঐচ্ছিক বিষয় পাঠের ব্যবস্থা থাকবে। এ বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে অতিরিক্ত নম্বর পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে।

শিক্ষাদান অনুশীলন

১৭·২০ শিক্ষণ কার্যক্রমে শিক্ষাদান অনুশীলনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। শিক্ষণার্থীদের ন্যূনপক্ষে ৬০টি পাঠের অনুশীলন করতে হবে। অধিকন্তু বিদ্যালয়ে পাঠ্যানুশীলন কার্যক্রম আরম্ভ হওয়ার পূর্বে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজসমূহে অনুশীলন, ভূমিকাভিনয়, সমালোচনা-মূলক পাঠ ও প্রদর্শন পাঠ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

ব্যবহারিক কাজ

১৭·২১· শিক্ষাক্রমে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কাজের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয় বিধানের প্রয়োজনে প্রতিটি পাঠ্যবিষয়ে নির্ধারিত কাজের ব্যবস্থা থাকবে। মৌলিক প্রবন্ধ রচনা, প্রজেক্ট, মুদ্রাক্ষর গবেষণা, শিক্ষোপকরণ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি ব্যবহারিক কাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এ কাজের জন্য প্রতি বিষয়ে মোট নম্বরের ১০% বরাদ্দ থাকবে।

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১৭·২২· সকল শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার একই নীতি ও পদ্ধতি অনুসৃত হবে। এ ব্যবস্থানুযায়ী বি, এড, পরীক্ষার জন্য মোট নম্বর হবে ১০০০। বিষয় অনুসারে এ নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	অন্তঃপরীক্ষা			বহিঃ পরীক্ষা			সর্বমোট
		তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	মোট	তত্ত্বীয়	ব্যবহারিক	মোট	
১।	শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা	৪০	১০	৫০	৫০	—	৫০	১০০
২।	শিক্ষার ইতিহাস ও শিক্ষাদর্শন	৪০	১০	৫০	৫০	—	৫০	১০০
৩।	শিক্ষাদান পদ্ধতি ও শিক্ষা প্রযুক্তি	৪০	১০	৫০	৫০	—	৫০	১০০
৪।	শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক শিক্ষা	৪০	১০	৫০	৫০	—	৫০	১০০
৫।	শিক্ষা মূল্যায়ন	২০	৫	২৫	২৫	—	২৫	৫০
৬।	স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষা	২০	৫	২৫	২৫	—	২৫	৫০
৭।	নৈর্বাচনিক (২টি বিষয়)	৪০	১০	১০০	৫০	—	১০০	২০০
		৪০	১০		৫০			
		৮০	২০		১০০			
৮।	সামগ্রিক মৌখিক	—	—	—	১০০	—	১০০	১০০
৯।	ব্যবহারিক পাঠদান	—	১০০	১০০	—	১০০	১০০	২০০
	মোট :	২৮০	১৭০	৪৫০	৪৫০	১০০	৫৫০	১০০০
১০।	ঐচ্ছিক (শিক্ষা গবেষণা ব্যতীত)	৪০	১০	৫০	৫০	—	৫০	১০০

শিক্ষা গবেষণা বিষয়ে ৮০ নম্বর থিসিসের জন্য এবং ২০ নম্বর বহিঃ পরীক্ষকের উপস্থিতিতে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট থাকবে।

১৭ ২৩· উপরের ছক অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ে আভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরীক্ষার নম্বরের অনুপাত ৫০ : ৫০ (অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার মোট নম্বর ৪৫০ এবং বহিঃস্থ পরীক্ষার মোট নম্বর ৪৫০), তবে সামগ্রিক মৌখিক পরীক্ষার জন্য ১০০ নম্বর পৃথকভাবে নির্ধারিত থাকবে। এ মৌখিক পরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত থাকবেন একজন বহিঃপরীক্ষক এবং

কলেজে দুই জন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষক। কলেজের প্রশিক্ষণার্থী অধিক হলে কলেজ/কর্তৃপক্ষের সুপারিশক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে এ মৌখিক পরীক্ষা নেয়ার জন্য একের অধিক মৌখিক পরীক্ষকদল নিয়োজিত থাকবেন। মৌখিক পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান বিষয়ক প্রশ্ন ছাড়াও বি, এড, কোর্সে পঠিত সকল বিষয়ের উপর সাধারণ প্রশ্ন করা হবে এবং পরীক্ষার্থীদের উত্তরদানের মান বিচার করে পরীক্ষকগণ সর্বসম্মতভাবে নম্বর প্রদান করবেন।

১৭·২৪· প্রত্যেক কলেজে অধ্যক্ষের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী স্থায়ী পরীক্ষা কমিটি গঠন করতে হবে। এই কমিটি সকল আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। অন্তঃপরীক্ষার মূল্যায়নের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপঃ

(১) আবশ্যিক বিষয়সমূহ এবং নৈর্বাচনিক দুটি বিষয়ের তত্ত্বীয় বিষয়বস্তু দুটি অংশে বিভক্ত করে দুটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিটি পরীক্ষার মোট নম্বর হবে ২০। অর্ধপত্রের জন্য একটি অন্তঃপরীক্ষা (২০ নম্বর) অনুষ্ঠিত হবে।

(২) আভ্যন্তরীণ ব্যবহারিক অংশের মূল্যায়নের জন্য শ্রেণী শিক্ষকের নির্দেশে প্রশিক্ষণার্থীগণ নির্ধারিত কাজে অংশ গ্রহণ করবে। এগুলির মান যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে শ্রেণীশিক্ষক ব্যবহারিক অংশের নির্ধারিত নম্বরের মধ্যে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীদের নম্বর প্রদান করবেন। এ নম্বর তিনি অবশ্যই বহিঃপরীক্ষার আগেই পরীক্ষা কমিটিকে জমা দেবেন এবং কমিটি যথানিয়মে ও সময়ে এ ফল প্রকাশ করবে।

(৩) পরিদর্শকদের মূল্যায়নের রেকর্ডের গড় যথাযথভাবে বিবেচনাপূর্বক পরীক্ষা কমিটি কলেজের সকল শিক্ষকের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত বিশেষ সভায় প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারিক পাঠদান বিষয়ক আভ্যন্তরীণ নম্বর চূড়ান্ত করবেন।

(৪) প্রশিক্ষণার্থীগণ ইচ্ছা করলে একটি নৈর্বাচনিক বিষয়ে অধ্যয়ন করতে পারেন। এ বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর থেকে ৪০ নম্বর বাদ দিয়ে যদি কোনো অতিরিক্ত নম্বর থাকে তা পরীক্ষার্থীর মোট নম্বরের সংগে যোগ হবে। শিক্ষা গবেষণা ব্যতীত প্রতিটি ঐচ্ছিক বিষয়ে দুটি অন্তঃপরীক্ষা (২০+২০) অনুষ্ঠিত হবে। ১০ নম্বর ব্যবহারিক কাজের জন্য নির্ধারিত থাকবে। বহিঃপরীক্ষায় ৫০ নম্বর তত্ত্বীয় মূল্যায়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকবে। শিক্ষা গবেষণা বিষয়ে প্রত্যেক পরীক্ষার্থী একটি থিসিস জমা দেবেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়োজিত একজন বহিঃপরীক্ষক ও একজন আভ্যন্তরীণ পরীক্ষক এ থিসিস ৮০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করবেন। বাকি ২০ নম্বরের জন্য পরীক্ষকগণ পরীক্ষার্থীদের থিসিসের জন্য মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

(৫) মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষক-শিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব প্রকট। একটি আশু ব্যবস্থা হিসাবে শিক্ষণের মৌল বিষয়সমূহে পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা যায়।

(৬) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রশিক্ষণবিহীন উচ্চ মেধা ও যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে নির্বাচন দান করে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ প্রদান করতে হবে। এ ব্যবস্থায় বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি পাবে।

(৭) শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজের শিক্ষার্থীদের নৈতিক আচরণের মান বৃদ্ধিকল্পে অঙ্গীকার-পত্র ও ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করতে হবে।

(৮) বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা অনুষদ সম্পর্কিত বিধিসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষণীয়। শিক্ষণের মানের সমতা নিশ্চিতকরণে বিধিসমূহের সামঞ্জস্য বিধান একান্ত প্রয়োজন।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষক প্রশিক্ষণ

১৭·২৫· কারিগরি ও বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পালন করছে যথাক্রমে দুটি প্রতিষ্ঠান টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (১৯৫৫) স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অধীনে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ খোলা হয়। ষাটের দশকের শুরুতে পলিটেকনিকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পায়। ফলে ঢাকা পলিটেকনিকের অধীনে শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগকে কেন্দ্র করে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি টেকনিক্যাল এডুকেশন কলেজ। এ কলেজে পলিটেকনিকে কর্মরত প্রকৌশল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য এক বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন এবং দুই বছর মেয়াদী বি, এড, (টেকনোলজী) কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরবর্তীকালে কলেজটির নামকরণ করা হয় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ। বর্তমানে এ কলেজে নিম্নবর্ণিত শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

শিক্ষণ কার্যক্রম

ক্রমিক নং	ডিগ্রী/ডিপ্লোমা	শিক্ষণকাল	প্রবেশকালীন শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন	১(এক) শিক্ষাবর্ষ	প্রকৌশল ডিপ্লোমা বা সমমান সম্পন্ন যোগ্যতা।
২	বি,এস,সি-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন	২(দুই) শিক্ষাবর্ষ	ডিপ্লোমা ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন বা সমমানের যোগ্যতাসহ প্রকৌশল ডিপ্লোমা।
৩	সংক্ষিপ্ত কোর্স	অনূর্ধ্ব ৪ সপ্তাহ	পলিটেকনিক /ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের জন্য।

১৭·২৬· একথা অনস্বীকার্য যে, দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে পলিটেকনিক শিক্ষকদের পেশাগত জ্ঞান ও কুশলতা দানে কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাব এ কলেজটিতে শিক্ষণের মানকে ক্ষুন্ন করছে। উল্লেখ্য যে, কলেজে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সর্বমোট ৩২টি শিক্ষক পদের মধ্যে ১৪টি পদই বর্তমানে শূন্য রয়েছে। শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যাও প্রকট।

১৭·২৭· পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বগুড়ায় অবস্থিত ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (১৯৮২) বৃত্তিমূলক বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষণে নিয়োজিত রয়েছে। আধুনিক ও উন্নতমানের সাজ-সরঞ্জাম সমৃদ্ধ এ ইনস্টিটিউটে বৃত্তিমূলক ৮টি ট্রেডে শিক্ষক-শিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমানে এতে দুটি পর্যায়িত শিক্ষণ কার্যক্রম চালু আছেঃ

(১) বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ সার্টিফিকেট কোর্স

(২) বৃত্তিমূলক শিক্ষক-শিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্স

প্রতিটি কোর্সেরই ব্যাপ্তিকাল এক বছর। ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, কমিউনিটি স্কুল, টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার ইত্যাদিসহ শিল্প কারখানায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নিয়োজিত শিক্ষকগণ উক্ত শিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন।

১৭·২৮· বৃত্তিমূলক শিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দু'টি প্রধান অন্তরায় হচ্ছেঃ

(১) ইন্ডাস্ট্রিয়াল এ্যাটাচমেন্ট জনিত অসুবিধা তথা শিক্ষণার্থী গ্রহণে শিল্প-কারখানা সমূহের আগ্রহের অভাব এবং (২) শিক্ষাদান অনুশীলন কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে পর্যবেক্ষণ ও অনুসারক কার্যক্রমের অভাব।

১৭·২৯· বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটের মোট গ্রহণ ক্ষমতার ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ লাভ করছে। ফলে অত্যন্ত উন্নতমানের শিক্ষোপকরণ ও ভৌত সুবিধাবলীর পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে যে সকল প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে আসে সে সকল প্রতিষ্ঠান একই সঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষককে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য পাঠাতে পারে না। উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক-স্বল্পতা এ জন্য মুখ্যত দায়ী।

সুপারিশ

১৭·৩০· কারিগরি

(১) টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে কারিগরি তথা পলিটেকনিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে সুবিধা রয়েছে তার পূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পলি-টেকনিকসমূহ প্রশিক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক পাঠাতে পারে না বলেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন পলিটেকনিক শিক্ষকদের গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে না, অন্যদিকে তেমনি কলেজের প্রাপ্ত সুবিধাবলীরও সদ্ব্যবহার হচ্ছে না। এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা নিরসনে সর্বাগ্রে পলিটেকনিকসমূহে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করতে হবে।

(২) টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে শিক্ষকের শূন্য পদ অবিলম্বে পূরণ করা প্রয়োজন। দ্রুত উন্নয়নশীল আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতি অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে শিক্ষকদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ থাকবে।

(৩) প্রবীণ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ধরে রাখার উদ্দেশ্যে এ কলেজটিতে অধিক সংখ্যক উচ্চতর শিক্ষকের পদ (সহযোগী অধ্যাপক · অধ্যাপিকা) সৃষ্টি করতে হবে।

১৭·৩১· বৃত্তিমূলক

(১) ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে শিক্ষাদান ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে যে সকল প্রতিষ্ঠানে (ভোকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার) 'জাতীয় গ্রেড ৩ ও ২ কোর্স' প্রদান করা হয় তাদের শিক্ষকদের জন্য নিয়মিত কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২) শিল্প-কারখানায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতায় আকর্ষণ সৃষ্টিকল্পে উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদানের সুবিধা দিতে হবে।

(৩) ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ফিডার প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও কার্যকর সংযোগ গড়ে তোলা প্রয়োজন। একটি শক্তিশালী অনুসরণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ সংযোগ গড়ে তোলা যায়।

শারীরিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১৭·৩২· বর্তমানে দেশের দু'টি কলেজে (ঢাকা ও রাজশাহী) শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ দু'টি কলেজে যথাক্রমে স্নাতক পাশ ও এইচ, এস, সি, পাশ ব্যক্তিদের বি, পি, এড ও জুনিয়র ডিপ্লোমা-ইন-ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিগ্রী/সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অতীতে এ কলেজগুলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ১৯৭৭ সালে কলেজগুলিকে সংস্কৃতি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বর্তমানে কলেজগুলি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে।

১৭·৩৩· কিন্তু কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি আজ পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হিসাবে থেকে গেছে। অধিকন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহেই শারীরিক শিক্ষা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ নিযুক্তি লাভ করেন। এ দ্বৈত ব্যবস্থা কলেজগুলির পরিচালন ব্যবস্থায় নানা জটিলতা সৃষ্টি করছে।

১৭·৩৪· শিক্ষোপকরণ, ব্যায়ামাগার, সুইমিংপুল ইত্যাদি সুবিধার অপ্রতুলতা কলেজগুলি শিক্ষণের মানকে ক্ষুণ্ণ করছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাবও এ ক্ষেত্রে সংকট বৃদ্ধি করছে। উল্লেখ্য যে, এ কলেজগুলিতে আজ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষকদের পর্যায়-ভুক্ত শিক্ষকের পদ বিদ্যমান রয়েছে।

সুপারিশ

১৭·৩৫· প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে কলেজ দুটিকে পুনরায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করতে হবে। অবিলম্বে উপযুক্ত শিক্ষাগত মানসম্পন্ন শিক্ষক নিযুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ ও বিশ্ববিদ্যালয়

১৭·৩৬· আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমের মূল ধারাটির সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সংযোগ ও সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়। উচ্চ শিক্ষার ধারায় শিক্ষক-শিক্ষণ সমাজ বিজ্ঞানের অঙ্গীভূত একটি বিষয় হিসাবে পরিগণিত নয়। শিক্ষক-শিক্ষণ তথা শিক্ষকের প্রস্তুতিমূলক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-নিরপেক্ষ একটি কার্যক্রম হিসাবেই বিবেচিত।

১৭·৩৭· বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণের একটি নিবিড় যোগসূত্র বিদ্যমান। সে সকল দেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাক্রমে আর সব বিষয়ের মত শিক্ষক-শিক্ষণও একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হওয়া আশু কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) বক্তব্য সুস্পষ্ট।আমরা এখানে তা উদ্ধৃত করছিঃ

> 'যেহেতু শিক্ষক-শিক্ষণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় হাতিয়ার, সেজন্য আমাদের দেশেও স্বতন্ত্র বিভাগ খুলে বিষয়টিকে ডিগ্রী কোর্স রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডার-গ্র্যাজুয়েট ও পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে প্রবর্তন করা উচিত।'

১৭·৩৮· উল্লিখিত বিষয়ে আমাদের সুপারিশ নিম্নরূপঃ

(১) শিক্ষক-শিক্ষণে প্রথম ডিগ্রীধারী অভিজ্ঞ ও মেধাবী শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রীকোর্স (এম এড ও ডক্টরেট) প্রবর্তন করতে হবে। এ ছাড়াও শিক্ষক-শিক্ষণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (শিক্ষা প্রশাসন, ভাষা শিক্ষণ ইত্যাদি) প্রয়োজনানুযায়ী এক শিক্ষা বর্ষ মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তন করা যেতে পারে।

(২) শিক্ষক-শিক্ষণে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের পাঠক্রমে শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের দেশের শিক্ষা নিয়ে গবেষণা করা খুবই দরকার।

(৩) শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী সঞ্জীবনী কোর্স, গ্রীষ্মকালীন ইনস্টিটিউট ইত্যাদি সংগঠনের ক্ষেত্রেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর.), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১৭.৩৯. ১৯৬০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন এবং শিক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানের চর্চা ও বিস্তারই ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। বর্তমানে এ ইনস্টিটিউটে শিক্ষক-শিক্ষণে ডিপ্লোমা (প্রথম ডিগ্রী) ও এম. এড কোর্স চালু রয়েছে। দুটি কোর্সই এক বৎসর মেয়াদী। এ ছাড়া গবেষণা ভিত্তিক ডক্টরেট কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে।

১৭.৪০. ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এর প্রতিষ্ঠাকালীন মূল উদ্দেশ্যগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি। একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চমানের গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নবতর জ্ঞানের বিস্তারে ইনস্টিটিউটের কার্যকর ভূমিকাই আমাদের কাম্য। এ উদ্দেশ্যে আমাদের সুপারিশ হচ্ছেঃ

(১) এম এড. কোর্সে ভর্তির জন্য কর্ম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মেধাবী শিক্ষক ও প্রশাসকদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(২) অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের জন্য শিক্ষণের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে (শিক্ষা প্রশাসন, ভাষা শিক্ষণ, গণিত শিক্ষণ, উপদেশ ও নির্দেশনা ইত্যাদি) ডিপ্লোমা প্রবর্তন করা প্রয়োজন।

(৩) সর্বোপরি, ইনস্টিটিউটকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ গবেষণা ও পরীক্ষণের কাজ চালিয়ে যেতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। গবেষণার ফলাফল প্রকাশেও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে।

কর্মকালীন শিক্ষক-শিক্ষণ

১৭.৪১. শিক্ষক-শিক্ষণ একটি ক্রমান্বিত অব্যাহত ধারা হিসাবে স্বীকৃত। প্রস্তুতিমূলক কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে শিক্ষকের কর্মকালীন তথা জীবন ব্যাপী প্রশিক্ষণের এই ধারাটি অব্যাহত থাকে। একজন শিক্ষক তাঁর পেশাজীবনে কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ লাভ করেন একবার মাত্র, কিন্তু কর্মকালীন প্রশিক্ষণ লাভ করেন বহুবার এবং শিক্ষক-জীবনে এটি একটি নিরন্তন প্রক্রিয়া হিসাবে পরিগণিত।

১৭.৪২. পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে জেলা সদরে অবস্থিত কিছুসংখ্যক প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (পি, টি, আই) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের জন্য সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচলিত ছিল। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের ব্যাপক চাহিদার কারণে উক্ত কার্যক্রম কিছুকাল পরেই বন্ধ হয়ে যায় এবং সকল পি, টি, আই, তে কর্মপূর্ব প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পুনঃ প্রবর্তিত হয়। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। তবে প্রতিটি উপজেলায় ২০-২৫ টি স্কুল সমন্বয়ে এক-একটি স্কুল-গুচ্ছের জন্য একজন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পরিচালনায় গুচ্ছ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এ কার্যক্রমের সার্থকতা মূল্যায়ন সাপেক্ষ।

১৭.৪৩. প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্ব ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশনের উপর ন্যস্ত রয়েছে। এছাড়া নেইপ, পি, টি, আই শেষ পরীক্ষা (সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন) পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে।

১৭.৪৪. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এবং শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীন ও ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্র (পরে বাংলাদেশ শিক্ষা সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট) স্থাপিত হয়। ১৯৮২ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড রিসার্চ (নিয়েমার)-এর সংগে একীভূত হয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেশন এক্সটেনশন এন্ড রিসার্চ (নিয়েয়ার) এ পরিণত হয়। নিয়েয়ারের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলঃ (১) ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তাদের (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান, কলেজের অধ্যক্ষ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও স্বায়ত্ত-শাসিত শিক্ষা সংস্থাসমূহের শিক্ষা কর্মকর্তা প্রভৃতি) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ এবং (২) মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক স্বল্প মেয়াদী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ-প্রদান। বর্তমানে নিয়েয়ার ঊর্ধ্বতন শিক্ষা কর্মকর্তা ও কলেজ পর্যায়ের শিক্ষকদের যথাক্রমে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষাক্রম ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্বল্প মেয়াদী কর্মকালীন প্রশিক্ষণ দান করছে। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েয়ারের উপর ন্যস্ত থাকছে না। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত 'সমন্বিত বিজ্ঞান শিক্ষা কার্য-ক্রমের' অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা রয়েছে।

১৭.৪৫. উল্লিখিত বিবরণী থেকে একথা প্রতীয়মান হবে যে, আমাদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আদৌ পরিকল্পিত ও সুব্যবস্থিত নয়। অধিকন্তু প্রচলিত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কেও প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। এ অবস্থার উন্নতিকল্পে আমাদের সুপারিশ হচ্ছেঃ

(১) বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থায় উপজেলা ভিত্তিক গুচ্ছ প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বহিঃসংস্থা কর্তৃক মূল্যায়নের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ কার্যক্রমের দুর্বলতা নিরসন এবং শক্তি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(২) উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের শিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে। 'নেইপ' এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

(৩) নিয়েয়ার-এর উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠু পালনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত 'কোড' ও শিক্ষকদের যোগ্যতা সম্পর্কিত অভীক্ষা অনুযায়ী উচ্চমানের পান্ডিত্য, অভিজ্ঞতা ধীশক্তিসম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) নিয়েয়ার-এর বোর্ড অব গভর্নর্স কর্তৃক একটি সমীক্ষণ কমিটি গঠনপূর্বক তার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা প্রয়োজন।

(৫) নিরন্তর গবেষণা ও প্রকাশনার ভিত্তিতে সমগ্র শিক্ষক-শিক্ষণ কার্যক্রমকে উন্নীত করার প্রয়োজনে নিয়েয়ার ও নেইপ-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সামর্থ্য ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৬) মাধ্যমিক শিক্ষকদের কর্মকালীন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনে দেশের টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে।

(৭) প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকল্পে নেইপ-এর শিক্ষকমন্ডলীতে অধিক সংখ্যক উচ্চতর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিবিধ প্রসঙ্গ

ক. শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা

১৭.৪৬. একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা যথোচিত গুরুত্ব লাভ করছে না। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা আবশ্যিক হলেও গবেষণার বিষয় হিসাবে শিক্ষা সংক্রান্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা তাতে স্থান পায় না। ফলে তা নিছক একটি পদ্ধতিগত অনুশীলনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি, শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালন যে সকল প্রতিষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য সে সকল প্রতিষ্ঠানেও গবেষণা কার্যক্রমটি গুরুত্ব সহকারে গৃহীত হয় না। যথোপযুক্ত গবেষণালব্ধ তথ্যের অভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনায় বিপত্তি ঘটে।

১৭.৪৭. শিক্ষা বিষয়ক গবেষণার অভাব দূর করার জন্য আমরা নিম্নলিখিত সুপারিশ করিঃ

(১) নিয়েয়ার ও আই. ই. আর-এ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা প্রয়োজন।

(২) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থাকে শিক্ষা সংক্রান্ত জরিপ, সমীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অনুসারক ইত্যাদি গবেষণামূলক কার্যক্রমে গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের শক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাতে হবে।

(৩) উন্নতমানের ও বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ গবেষণা ও পরীক্ষামূলক কার্যক্রমকে জাতীয়ভাবে পুরস্কৃত করতে হবে।

(৪) যে সকল শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর জন্য গবেষণা একটি আবশ্যকীয় বিষয় সে সকল প্রতিষ্ঠানে গবেষণা পরিচালনায় বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি শিক্ষাদান ও অনুসরণ করতে হবে।

(৫) গবেষণালব্ধ তথ্য ও ফলাফলকে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গবেষণা সমৃদ্ধ পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করবে।

(৬) শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহের পৃষ্ঠপোষকতায় শিক্ষকদের গবেষণামূলক নিবন্ধাবলী ও রচনাবলী প্রকাশের জন্য উন্নতমানের জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

খ. বিজ্ঞান শিক্ষক

১৭.৪৮. বর্তমানে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাব প্রকট। প্রাথমিক স্তরে একই শিক্ষককে সকল পাঠ্য সব বিষয়ে পাঠদান করতে হয় বলে বিজ্ঞান শিক্ষাদানের বিষয়টি তেমন গুরুত্ব লাভ করে না। প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও কুশলতার অভাবে শিক্ষকগণ বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি শিশুদের যথার্থ মনোযোগ সৃষ্টি করতে পারছেন না। মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদানের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এ অবস্থার আশু নিরসন কর্তব্য।

১৭·৪৯· সুপারিশ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকমন্ডলীতে অন্তত একজন বিজ্ঞান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে এইচ. এস. সি (বিজ্ঞান)। এ উদ্দেশ্যে পি.টি.আই'সমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান শাখায় এইচ.এস.সি পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(২) মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষকদের শূন্য পদ পূরণে আশু কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য বিজ্ঞান শিক্ষকদের অগ্রিম বেতন বৃদ্ধিসহ উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করা প্রয়োজন। অধিকন্তু টিচার্স ট্রেনিং কলেজসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুল বিষয়সহ বি. এস. সি. পাশ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(৩) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক জ্ঞান ও কুশলতার সঙ্গে পরিচিতির প্রয়োজনে বিজ্ঞান শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন 'বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্বসহ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্প' কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে।

(৪) মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচীর সাথে সঙ্গতি রেখে বি. এড. কোর্সের পাঠক্রমের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করতে হবে।

গ. কৃষি শিক্ষক

১৭·৫০· প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃষি বিষয় চালু করার জন্য কৃষি শিক্ষার সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা প্রাপ্তদের যথাক্রমে পি.টি.আই ও বি.এড কোর্সে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অন্তত একজন কৃষি শিক্ষক থাকা প্রয়োজন।

ঘ. প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষক

১৭·৫১· বর্তমানে দেশে প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষক তৈরির কোনো ব্যবস্থা নেই, অথচ বেশ কিছুসংখ্যক প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই, ই, আর) ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক তৈরির দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে।

ঙ. শিক্ষক-শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিল

১৭·৫২· শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ইতিমধ্যে একটি শিক্ষক-শিক্ষণ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। নিয়েমার এ কাউন্সিলের সচিবালয়। প্রায় দু' বৎসরাধিককাল আগে গঠিত এ কাউন্সিল এ যাবৎ কোনো কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়নি। এটি কোনোক্রমেই আকাঙ্ক্ষিত নয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনা ও সমন্বয় বিধানের স্বার্থে উক্ত কাউন্সিলের যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

চ. শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন

১৭·৫৩· শিক্ষক-শিক্ষণ তথা সমগ্র শিক্ষক সমাজকে জাতীয় জীবনে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ২রা বৈশাখ শিক্ষক দিবস পালিত হওয়া উচিত।

অধ্যায় ১৮

পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষার ভূমিকা

১৮·১· প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে পরীক্ষা পদ্ধতি যুক্ত। সেকালে সীমাবদ্ধ সহজ-সরল শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি সহজ-সরল পরীক্ষা প্রচলিত ছিল। সে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন শিক্ষক স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করে, অধীত বিষয়াদিতে তাদের পারদর্শী করে তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকতেন। শিক্ষাদান, মূল্যায়ন সনদ প্রদান ইত্যাদি সব কিছুই তিনি একা নিয়ন্ত্রণ করতেন। তাঁর সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীত বলেই সমাজ গ্রহণ করে নিত। দীর্ঘ দিনের সাহচর্যের ফলে তিনি শিক্ষার্থীকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেতেন এবং প্রয়োজনবোধে কেবল মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে অধীত বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতেন, আর তার ভিত্তিতে তিনি শিক্ষার্থীকে সনদ প্রদান করতেন।

১৮·২· পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক পরীক্ষা— এই দুই ব্যবস্থার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার একটা যুক্তিসঙ্গত মূল্যায়ন অনেকাংশে সম্ভব। কিন্তু এক ব্যক্তি-নির্ভর এ পরীক্ষা ব্যবস্থার অসুবিধাও বিদ্যমান। ব্যক্তির নিজের শিক্ষা, পরিবেশ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ করে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক ও সামাজিক অবস্থা পরীক্ষার ফলাফলকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করতে পারে। শিক্ষকের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও ভুল-ত্রুটি শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা মূল্যায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। এ ব্যবস্থায় বিষয়জ্ঞানের অত্যন্ত অল্প অংশই মূল্যায়িত হতে পারে এবং প্রশ্নোত্তরের স্থায়ী রেকর্ড রাখা সম্ভব নয়।

১৮·৩· ক্রমে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিপুলভাবে বাড়তে থাকে এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষার স্থলে উদ্ভূত হয় সম্প্রসারিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা। এক শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করে বহু শিক্ষক-সমবায়ে সংগঠিত বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। জনগণ যখন বুঝতে পারল যে, শিক্ষাই হচ্ছে সামাজিক-অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও মুক্তির চাবিকাঠি, তখন শ্রেণীভিত্তিক ব্যক্তিনির্ভর শিক্ষার স্থান গ্রহণ করল বৃহত্তর সমাজ-ভিত্তিক গণশিক্ষা।

১৮·৪· এরূপ ব্যাপক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য পূর্বে উল্লেখিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অত্যন্ত অনুপযোগী বলেই ভিন্নতর ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হয়। শিক্ষা সম্প্রসারণের এই স্তরেই প্রবর্তিত হয় লিখিত পরীক্ষা ব্যবস্থা। সম্প্রসারিত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অন্তঃপরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রবর্তিত হয় জাতীয়ভিত্তিক বা বিরাট অঞ্চলভিত্তিক সাধারণ বহিঃপরীক্ষা-পাবলিক এগজামিনেশন। এ ধরনের পরীক্ষায় বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের ফলে এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত হয় স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের সার্বিক দায়িত্ব ন্যস্ত হয় এসব বহিঃস্থ সংস্থার উপর।

১৮·৫· আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রধানত পরীক্ষার মাধ্যমেই জানা যায় শিক্ষার পূর্ব নির্ধারিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি পরিমাণ অর্জিত হয়েছে। এ অর্থে পরীক্ষা হল একটি মূল্যায়ন পদ্ধতি।

১৮·৬· শিক্ষা প্রক্রিয়াকে তিনটি স্তরে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমটি হল শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ, দ্বিতীয়টি সেই লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচন ও উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ধারণ এবং তৃতীয়টি এ প্রচেষ্টা থেকে কি ফল পাওয়া গেল তা বিচার করা। সবই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও জীবন-দর্শনে অনুপ্রাণিত শিক্ষার ব্যবস্থার উপরে। কাজেই সামগ্রিকভাবে শিক্ষা-প্রক্রিয়ার মূল্যায়নই পরীক্ষার যথার্থ ভূমিকা। এই মূল্যায়ন কেবল শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মূল্যায়ন নয়, শিক্ষার উদ্দেশ্যের সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষক ও পাঠ্যসূচীসহ

সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাফল্যেরও মূল্যায়ন। গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পরীক্ষার এই ভূমিকাটি কেবল আংশিক ভাবে সাধিত হয়। তাই বিজ্ঞান-সম্মত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিজ্ঞান-সম্মত মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য। শিক্ষা-দর্শন ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের সফল প্রচেষ্টা সুষ্ঠু ও যুক্তিনির্ভর মূল্যায়ন পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার উপযুক্ত লক্ষ্য নির্ধারণ এবং বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্যের। বিজ্ঞান সম্মত মূল্যায়ন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে শিক্ষাদর্শনবিদ ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী পেয়ে থাকেন সঠিক তথ্য। আর এ তিনটি প্রক্রিয়ার সফল ও সমন্বিত প্রয়োগে উদ্ভাবিত হয় উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা।

১৮.৭. প্রচলিত পরীক্ষা-ব্যবস্থা বিগত দেড়শ' বছরে ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছে। এই সময়ে পরীক্ষা সংস্কারের যে সকল প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়, তা তেমন ফলপ্রসূ হয়নি। বরং পরীক্ষার সমস্যাগুলি ক্রমে অধিকতর জটিল ও ব্যাপক রূপ পরিগ্রহ করে। এর মূল কারণ ঔপনিবেশিক আমলে যে মূল্যবোধগুলির ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা প্রাধান্য লাভ করে, শিক্ষার মৌল লক্ষ্যগুলিকে নিষ্প্রভ করে এবং শিক্ষাকে পরীক্ষা কেন্দ্রিক করে তোলে, সে সকল মূল্যবোধ (যথা চাকুরি বা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশাধিকার) সমাজ জীবনে স্বাধীনতা উত্তরকালেও অপরিবর্তিত থেকে যায়।

১৮.৮. ফলে সহজাত ক্ষমতাগুলির সৃষ্টিশীল বিকাশের মাধ্যমে পরিপূর্ণ জীবনের জন্য প্রস্তুতি শিক্ষার এই সার্বজনীন ও জাতীয় লক্ষ্য সমাজ জীবনে এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিফলনের জন্য যে সকল মৌলিক পরিবর্তনের দরকার সে সবের জন্য কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। পরীক্ষা পাশই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য থেকে যায় এবং তা এখনও আছে। উপরন্তু বৃহত্তর সমাজ জীবনে মূল্যবোধের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের প্রভাব প্রতিফলিত হয় পরীক্ষার দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তারে।

১৮.৯. পাবলিক এগজামিনেশন বা বহিঃপরীক্ষার প্রাধান্যের আরেকটি কারণ হল অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে আস্থার অভাব। বিভিন্ন সময়ে অন্তঃ-পরীক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদানের যে চেষ্টা করা হয়েছে তা কিছু কালের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়। আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্যাটি শিক্ষকের নিরপেক্ষতার সঙ্গে জড়িত হলেও বস্তুত এও একটি সামাজিক সমস্যা। এ কথা অনস্বীকার্য যে বর্তমানে সামাজিক পরিবেশ শিক্ষকের যে সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা নির্ধারণ করে তা শিক্ষকের দায়িত্ব পালনে বিশেষ করে ক্ষমতাধরদের চাপের মুখে সহায়ক নয়।

১৮.১০ আরো একটি কারণে শিক্ষার মূল ও সৃষ্টিমুখী লক্ষ্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তা হল বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার অকৃতকার্যদের সংখ্যার উচ্চহার। এর ফলে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মনে সৃষ্ট ভীতি ও আতঙ্ক বর্তমান পরীক্ষা ব্যবস্থার সমালোচনা সঞ্চার করে। তা সত্ত্বেও পরীক্ষা-পাশই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী কক্ষের শিক্ষার গুরুত্ব আরো হ্রাস পাচ্ছে এবং শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রচেষ্টা পরিচালিত হচ্ছে পরীক্ষা পাশের জন্য বিভিন্ন কৌশল ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে। এ প্রসঙ্গে গৃহশিক্ষক নিয়োগ ও নোট বই ব্যবহারের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরীক্ষার উদ্দেশ্য

১৮.১১. পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪), বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮), জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ (১৯৭৯) এবং পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছে। এ সকল কমিশন ও কমিটির

অভিমত অত্যন্ত সুচিন্তিত বলে বর্তমান কমিশন মনে করে এবং কমিশনের মতেও পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনায় নিচে উল্লেখিত উদ্দেশ্যগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনঃ

(ক) নির্ধারিত শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থী কি পরিমাণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছে, তা নির্ধারণ।

(খ) শিক্ষার্থীর ভাবাবেগ, মানসিক বিকাশের গতিধারা, প্রবণতা, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্র, ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীলতা, কর্মকুশলতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মূল্যায়ন।

(গ) উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির যোগ্যতা নির্ণয়।

(ঘ) শিক্ষার্থীর জ্ঞান, ধারণা ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অসম্পূর্ণতা নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(ঙ) শিক্ষাদানের মান নির্ধারণ এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার বিচার বিশ্লেষণ ও প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন।

(চ) শিক্ষাক্রম, পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তকের ক্রমোন্নয়নে সহায়তা দান।

(ছ) শিক্ষাদানে শিক্ষকের ভূমিকার কার্যকারিতা নিরূপণ, শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে সহায়তা করা এবং প্রয়োজনবোধে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস করা।

(জ) শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের মান নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানও নির্ধারণ করা এবং দুর্বল শিক্ষার্থী ও নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উন্নত করার প্রচেষ্টা চালানো।

(ঝ) সমগ্র দেশের বা একটি অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং শিক্ষার্থীর মান যাচাই করা।

(ঞ) শিক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রতি জনগণের আস্থা সঞ্চার।

১৮·১২· শিক্ষা ব্যবস্থায় পরীক্ষা ও মূল্যায়নের ভূমিকা বিবেচনা করলে দেখা যায় এগুলি মূলত দু'ধরনের। এক ধরনের ভূমিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট বাছাই সংক্রান্ত, অন্য ধরনের ভূমিকা শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার মানোন্নয়নের সহায়তা সংক্রান্ত।

১৮·১৩· পরীক্ষা ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার ত্রুটি যেমন সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত ও অর্থহীন করে তুলতে পারে, তেমনি শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি না ঘটলে বিচ্ছিন্ন ভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা দুঃসাধ্য। এজন্য শিক্ষাদানের সহায়ক ব্যবস্থাদির উন্নতি করা প্রয়োজন এবং শিক্ষকগণ যাতে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে উন্নত মূল্যায়ন পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রমাগত শিক্ষা ফলাফল যাচাই করতে পারেন এবং তার ভিত্তিতে প্রতিটি শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব, পারদর্শিতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা দান করতে পারেন তার ব্যবস্থা প্রয়োজন।

১৮·১৪· এই লক্ষ্যে আভ্যন্তরীণ বা শ্রেণীকক্ষের পরীক্ষায় নিম্নলিখিত দিকসমূহ যথাযথভাবে প্রতিফলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়ঃ

(ক) প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও উপলব্ধি অর্জন,

(খ) ভাবাবেগ, প্রবণতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং

(গ) কর্মকুশলতা ও প্রায়োগিক দক্ষতা।

শিক্ষার এ সকল লক্ষ্য কি পরিমাণে অর্জিত হচ্ছে তার ধারাবাহিক মূল্যায়ন শিক্ষাদান পদ্ধতির অপরিহার্য অঙ্গ। মূল্যায়নের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দক্ষতা বৃদ্ধি তাঁদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার অঙ্গ হওয়া প্রয়োজন।

১৮·১৫· পরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত হল শ্রেণীকক্ষকে পাঠদানের মানে উন্নয়ন। এজন্য শিক্ষার সকল স্তরে জরুরী ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজনঃ

(ক) উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা,

(খ) শিক্ষকদের উপযুক্ত ও নিয়মিত প্রশিক্ষণ,

(গ) শিক্ষকের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদার উন্নতি বিধান,

(ঘ) উপযোগী শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে ও যথাসময়ে সরবরাহের ব্যবস্থা,

(ঙ) প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের ব্যবস্থা,

(চ) শ্রেণীকক্ষে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও শিক্ষকদের মধ্যে দায়িত্ববোধ সঞ্চারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং

(ছ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক ঘন ঘন পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকা।

পরীক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান পরিস্থিতি

১৮·১৬· বাংলাদেশে যেকোনো পরীক্ষাই বর্তমানে প্রায় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। এর কারণ, পরীক্ষার্থীরা ব্যাপক আকারে পরীক্ষায় অসাধু উপায় অবলম্বন করছে। পরীক্ষার্থীদের এই দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতাকে কেউ রোধ করতে পারছে না। আগে যে পরীক্ষার্থীরা নকল একেবারে করত না তা নয়, কিন্তু তখন নকল করলেও দু-চার জন করত। এখান সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষায় দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে। পরীক্ষায় দুর্নীতির এ ব্যাপারটি যে একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দলবদ্ধভাবে পরীক্ষায় নকল করাকে—যাকে এখন অনেকে 'গণ টোকাটুকি' বলে—প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির একটা অনিবার্য বিষফল হিসাবে সকলে স্বীকার করে নিয়েছে। এজন্য পরীক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদের, বিশেষ করে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের, পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত। পরীক্ষা শিক্ষার লক্ষ্য নয় বরং লক্ষ্যে পৌঁছার একটা সোপান মাত্র।অতএব পরীক্ষার একটি সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবেচনার পূর্বে আমাদের মনে রাখতে হবে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি পরিমাপের জন্যই পরীক্ষা পদ্ধতির সৃষ্টি।

১৮·১৭· প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন অবৈধ কার্যকলাপ এবং দুর্নীতির অবকাশ রয়েছে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে উত্তরপত্র পরীক্ষা এবং ফলাফল প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন স্তরে অবৈধভাবে ফলাফল পরিবর্তনের ঘটনাও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচিত কেন্দ্রে কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ প্রায় লক্ষাধিক পরীক্ষক, টেবুলেটর ইত্যাদি এবং প্রায় পাঁচ হাজার অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন স্তরে জড়িত থাকেন। পরীক্ষা প্রশাসনে এত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট থাকায় পরীক্ষা কার্যের গোপনীয়তা বিঘ্নিত হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে দুর্নীতির প্রকোপও বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরীক্ষায় অপচয় ও দুর্নীতি সাধারণ সমালোচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

১৮·১৮· পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি (১৯৮৫) যে প্রতিনিধি সভাসমূহের ব্যবস্থা করেছিল তাতে পরীক্ষায় ব্যাপক অসদুপায় অবলম্বন, গণ টোকাটুকি এবং বিভিন্ন দুর্নীতির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর পরীক্ষায় যে সকল দুর্নীতির কারণ চিহ্নিত করেছে কমিশন সেগুলি সম্বন্ধে ঐক্যমত পোষণ করে। সে আলোকে এ কমিশনের মতে কারণগুলি হচ্ছেঃ (১) রাজনৈতিক অস্থিরতা, (২) সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, (৩) বিপর্যস্ত অর্থনীতি, (৪) শ্রেণীকক্ষে নিম্নমানের শিক্ষাদান, (৫) শিক্ষক, অভিভাবক ও পরীক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের

মধ্যে অনেকের সততার অভাব, (৬) যত্রতত্র পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপন, (৭) পরীক্ষা পাশের সম্ভাবনাহীন ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষা দেয়ার অনুমতিদান, (৮) ব্যাপক প্রাইভেট কোচিংয়ের প্রবণতা, (৯) স্থানীয় প্রশাসনের ঔদাসীন্য বা শৈথিল্য, (১০) পরীক্ষার পদ্ধতিগত দুর্বলতা এবং (১১) পরীক্ষার দুর্বল ব্যবস্থাপনা।

১৮·১৯· শিক্ষা একটি চলমান প্রক্রিয়া, মানুষের দৈহিক ও মানসিক সর্বাঙ্গীন বিকাশ তার লক্ষ্য। সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় এবং তার সাথে গড়ে ওঠে পরীক্ষা ব্যবস্থা। বহু যুগ থেকে আমাদের দেশে পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এ ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইদানীংকালেও চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে এ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন ও সংস্কারের উদ্যোগ একাধিকবার গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন, ১৯৭৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি এবং ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা পদ্ধতির সার্বিক পর্যালোচনা করে শিক্ষা ও পরীক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সুপারিশ রাখে। এ সুপারিশ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে এ সব উদ্যোগ শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনমনে সচেতনা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে।

১৮·২০· বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্য বিরাজমান এবং এই নৈরাজ্য প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় আমাদের পরীক্ষা ক্ষেত্রে। পরীক্ষা ক্ষেত্রে ত্রুটি সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থায় বিরূপ প্রভাব বিস্তার করছে। আমাদের পরীক্ষা বলতে গেলে এখনও সেই সনাতনী ব্যবস্থা—এতে প্রধানত তথ্য মুখস্থ করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, সামাজিক চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে, পরিবর্তন হয়েছে আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির। কিন্তু শিক্ষাদান এবং মেধামূল্যায়ন ব্যবস্থার বিশেষ অগ্রগতি হয়নি। ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথাযথভাবে গড়ে উঠেনি। তারা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। আর্থিক দৈন্য, শিক্ষক-স্বল্পতা এবং সেই সাথে শিক্ষা উপকরণের অভাব শিক্ষাদানকে বিঘ্নিত করছে। তবে ইদানীংকালে যা সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হ'ল মূল্যায়ন পদ্ধতি বা পরীক্ষা ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা। পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা, প্রশ্নপত্রের ধরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, ফলাফল নির্ধারণের রীতি ইত্যাদি মেধা মূল্যায়নে ত্রুটিপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

১৮·২১· শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা একজন বিশেষজ্ঞ বিচারকের কাজ। এ ধরনের কাজ করার জন্য শিক্ষকগণের সুযোগ-সুবিধা, মর্যাদা ও বেতন সমাজের অন্যান্য পেশার সমতুল্য হওয়া প্রয়োজন। এ কথাগুলি বলার উদ্দেশ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের দায়িত্ব অবশ্যই যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপর ন্যস্ত করতে হবে। আমাদের দেশে অধুনা গণটোকাটুকির ব্যাপক প্রসারের পরও কতিপয় ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। অতএব শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করার পূর্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থাৎ তার শিক্ষকগণের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধার মূল্যায়ন করতে হবে। এ ব্যাপারে শহরাঞ্চলের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলের সরকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের, ঢাকা শহরের সঙ্গে অন্যান্য শহরের এবং ক্যাডেট কলেজগুলির সঙ্গে অন্যান্য কলেজগুলির যে বৈষম্য রয়েছে তা দূর করার জন্য সযত্ন ও সচেতন প্রয়াস প্রয়োজন।

সুপারিশ

১৮·২২· সুপারিশমালা প্রণয়নের পূর্বে বাংলাদেশে এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন ও কমিটি কর্তৃক পেশকৃত পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত রিপোর্টসমূহ কমিশন বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনা করেছে। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) এবং

এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি (১৯৭৮) সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছে। বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি রিপোর্টে (১৯৭৮) মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা সংস্কার ও উন্নয়নের প্রসঙ্গে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) সুপারিশমালার ভিত্তিতে একটি কর্মসূচী দেয়া হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অবিলম্বে এ দু'টি পরীক্ষার সংস্কার সাধন করতে তাগিদ দেয়া হয়। জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ তাঁদের 'অন্তবর্তীকালীন শিক্ষা নীতি' রিপোর্টেও (১৯৭৯) পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে স্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য রেখেছে। ১৯৮২ সালের ২০শে জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষা সংস্কারকল্পে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। পরীক্ষা সংস্কারের উপায় ও পন্থা উদ্ভাবন, বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, বিদ্যার্জন প্রবণতা ও বাচনিক যুক্তি পরিমাপ করার জন্য আদর্শায়িত নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা তৈরির জন্য এ টাস্কফোর্স গঠন করা হয়। এ বিষয়ে টাস্কফোর্স শিক্ষা বোর্ডগুলির সহায়তায় যথারীতি গবেষণা চালায়। স্কুলের বিষয়-শিক্ষক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যরত বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী পরিমাপ বিশেষজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞবর্গের সহযোগিতায় মাধ্যমিক স্তরের উপযোগী দু'টি অভীক্ষাপুঞ্জ প্রস্তুত করা হয় এবং দেশের সব অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বশীল দু'টি বিপুল নমুনার উপর প্রয়োগ করে এ দু'টি অভীক্ষাপুঞ্জ আদর্শায়িত করা হয়।

১৮·২৩· ১৯৭০ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরীক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কারের জন্য যে পরীক্ষা সংস্কার কমিটি নিযুক্ত করেন তার রিপোর্টেও পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত রাখা হয়েছে। সাবেক পাকিস্তান সরকারের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টও (১৯৫৯) এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য।

১৮·২৪· উপরোক্ত রিপোর্টসমূহ বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা ছাড়া আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের পরীক্ষা পদ্ধতিও আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির রিপোর্ট (১৯৮৫) যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

১৮·২৫· উপরের বিশ্লেষণ ও জনমত যাচাইয়ের প্রেক্ষিতে এবং বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপট সামনে রেখে শিক্ষার প্রত্যেক স্তরের পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতির ব্যাপারে এই কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত ও সুপারিশ নিচে লিপিবদ্ধ করা হ'ল।

প্রাথমিক স্তর

১৮·২৬· শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। একটি দেশের অক্ষর-জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তথা শিক্ষা-হার মূলত প্রাথমিক শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। আমাদের দেশে সকল শিশুর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এখনও সম্ভব হয়নি। তবে গত দু'এক দশকের তুলনায় বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে প্রায় অর্ধ-লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু আছে। কিন্তু এই পর্যায়ে পর্যাপ্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থা নেই। তাই এই পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অগ্রগতির নিয়মিত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

১৮·২৭· প্রাথমিক স্তরে এতকাল শিক্ষকগণ পাঠ্যপুস্তক প্রদত্ত প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নিজেদের তৈরি প্রশ্নমালার সাহায্যে মূল্যায়ন করে এসেছেন। এ সকল মূল্যায়নের রেকর্ড যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হ'ত না। সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ড প্রবর্তনের প্রশংসনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ হ'লঃ

(ক) সারা বছরব্যাপী শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করতে হবে। তবে বার্ষিক পরীক্ষাসহ বছরে অন্তত তিনটি পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতির রেকর্ড তার অভিভাবকের নিকট প্রেরণ করে তাঁর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

(খ) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড অবিলম্বে প্রাথমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্নের ব্যাংক তৈরি করবে, এবং প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তা সরবরাহ করবে। শিক্ষকগণ প্রশ্ন ব্যাংকের প্রশ্ন অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করবেন।

(গ) পরীক্ষায় রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত/নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে। এ দুই ধরনের প্রশ্নের মোটামুটি অনুপাত হবে ৫০ ঃ ৫০।

(ঘ) চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের একটি আভ্যন্তরীণ কমিটি করবে। কিন্তু পঞ্চম শ্রেণীর শেষে শিক্ষার্থীদের জন্য আভ্যন্তরীণ কমিটি কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষা ছাড়াও মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। এই মৌখিক পরীক্ষার জন্য গঠিত কমিটিতে পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক সদস্য হিসাবে থাকবেন।

(ঙ) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রবর্তিত ক্রমপুঞ্জিত রেকর্ড কার্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে।

(চ) পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গুচ্ছ (ক্লাস্টার) ভিত্তিতে প্রান্তিক পরীক্ষা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(ছ) পঞ্চম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের থেকে অন্তত ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা জেলাভিত্তিক হতে পারে তবে এর সার্বিক উন্নতি সাধন, মূল্যায়ন এবং ফলাফল ঘোষণা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রদত্ত বৃত্তির হার ও সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

১৮.২৮. বর্তমানে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকগণের তৈরি প্রধানত রচনামূলক প্রশ্নমালার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। পূর্বে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। বর্তমান নানা কারণে অধিকাংশ স্কুলেই তিনটি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। দুটি বা একটি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় এবং এই পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হয়। স্বভাবতই মূল্যায়ন ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের সাফল্য ও অসাফল্যের দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে না এবং শিক্ষা আদান-প্রদান প্রচেষ্টায় আশানুরূপ গতি সঞ্চারিত হয় না। এক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ হলঃ

(ক) প্রাথমিক স্তরের অনুরূপ ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ড প্রবর্তন ও কার্যকর করতে হবে। ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন কার্ডে অবশ্যই বছরে তিনটি পরীক্ষার অর্থাৎ দুটি সাময়িক এবং একটি বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফল রেকর্ড করতে হবে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড যৌথভাবে এ ব্যবস্থা কার্যকর করার দায়িত্ব পালন করবে। স্কুল পরিদর্শন এবং একাডেমিক পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির অনুষদ সদস্যদের সহায়তা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। যেহেতু বর্তমানে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলি চাকরিপূর্ব ও দূরশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেহেতু এ ধরনের দায়িত্ব পালনের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে।

(খ) পরীক্ষায় রচনাধর্মী ও সংক্ষিপ্ত/নৈর্ব্যক্তিক উত্তরমূলক প্রশ্ন ব্যবহৃত হবে। এই দুই ধরনের প্রশ্নের মোটামুটি অনুপাত হবে ৫০ ঃ ৫০।

(গ) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেকস্টবুক বোর্ড এবং শিক্ষা বোর্ডসমূহ যৌথ উদ্যোগে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরের সকল শ্রেণী ও সকল বিষয়ের জন্য নমুনা প্রশ্ন-ব্যাংক তৈরি করবে এবং স্কুলগুলিতে তা ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করবে।

(ঘ) বার্ষিক পরীক্ষার অপরিহার্য অংগ হিসাবে মৌখিক পরীক্ষা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। স্কুল শিক্ষকমণ্ডলীর আভ্যন্তরীণ কমিটি এই পরীক্ষা পরিচালনা করবে, অষ্টম শ্রেণীর শেষে মৌখিক পরীক্ষায় পার্শ্ববর্তী স্কুলের শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদ এবং জেলা শিক্ষা অফিসার বা তাঁদের প্রতিনিধিগণের মধ্যে অন্তত একজন থাকবেন।

(ঙ) অষ্টম শ্রেণীর শেষে বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। প্রত্যেক স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে অন্তত ১০% শিক্ষার্থীকে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। বৃত্তির হার ও সংখ্যা বাড়াতে হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

১৮·২৯· মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দু'টি উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা এ দু'টি পরীক্ষার গুণগত মনের উপর নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার মান এবং সেই সাথে নির্ভর করে এই সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ অগণিত কর্মজীবীর দক্ষতার মান। বছরে এই পরীক্ষা দু'টিতে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৭ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। কয়েক শত কেন্দ্রে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র নির্বাচনে কোনো নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে অনুসৃত হয় না। পরীক্ষা অনুষ্ঠান কেন্দ্রে কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ শিথিল, পরীক্ষা কক্ষে পরিদর্শন প্রায়শ দুর্বল ও অকার্যকর এবং পরীক্ষায় নকল প্রায় ক্ষেত্রে অবাধে চলছে। ছাত্র অভিভাবক, এমনকি শিক্ষকগণকেও পরীক্ষার দুর্নীতিতে অভিযুক্ত হতে দেখা যায়।

১৮·৩০· আমাদের পরীক্ষা পদ্ধতি পাশ-ফেল ভিত্তিক। সব বিষয়ে পাশ করলে তবেই একজন পরীক্ষার্থীকে কৃতকার্য বলে গণ্য করা হয়। সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়েও শুধু এক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে একজন পরীক্ষার্থীকে অকৃতকার্য বলে ঘোষণা করা হয়। এভাবে গড়ে প্রায় ৫০% পরীক্ষার্থী পাশ করে। এই হিসাবে প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। তাদেরকে পরবর্তী বছরে নতুনভাবে সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। প্রতি বছর এত বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর অকৃতকার্যতা জাতীয় অপচয়। সময় ও অর্থের অপচয় ছাড়াও এই পরিস্থিতি পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মনে যে মানসিক যাতনার সৃষ্টি করে তা অপরিমেয়।

১৮·৩১· আমাদের পরীক্ষা মূলত বহিঃপরীক্ষা। বোর্ডসমূহ এই পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তাই পরীক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মেধা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের নিজস্ব শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা থাকে না বললেই চলে। নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষকদের আওতায় থেকে বছরের পর বছর ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা গ্রহণ করে সেই শিক্ষকদের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলাফলে প্রতিফলিত হয় না।

১৮·৩২· বর্তমান পদ্ধতিতে মূলত রচনাধর্মী প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের প্রশ্ন সংখ্যায় কম হওয়ায় সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন নির্বাচন করে তা সহজে মুখস্থ করা যায় এবং পরীক্ষার হলে তা নকলও করা যায়। এ ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নকল প্রবণতার জন্য দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। জ্ঞানের ব্যাপ্তি ও মেধার তীক্ষ্ণতা যাচাই এবং সেই সাথে দুর্নীতিরোধের ক্ষেত্রে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য ১৯৮৫ সালে পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি সুস্পষ্ট সুপারিশ রাখে।

১৮·৩৩· সঠিকভাবে প্রশ্ন প্রণীত না হওয়ার দরুন পরীক্ষায় প্রায়শই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন প্রণয়ন অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দায়িত্বসম্পন্ন ও টেকনিক্যাল কাজ। অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্তৃক প্রণীত প্রশ্নেও ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়ে। অনেক সময় এমন প্রশ্ন করা হয়, যার উত্তর পরিষ্কারভাবে দেয়া সম্ভব নয় বা যার উত্তরের দৈর্ঘ্য বরাদ্দ নম্বরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা রচিত প্রশ্ন বিশেষজ্ঞ দ্বারা যাচাই করার পর ব্যবহার করা হলে, তা পরীক্ষার মান উন্নয়নে নিঃসন্দেহে সহায়ক হবে। এই বিবেচনায় ১৯৮৫ স্যালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলার সুপারিশ করেছে। উক্ত কমিটি মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে যে সমস্যাগুলির উল্লেখ করা হল তা নিরসনের জন্য যে সুপারিশমালা পেশ করেছিল তা বাস্তবায়ন বাঞ্ছনীয়।

অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার সমন্বয়

১৮·৩৪· কমিশন পরীক্ষার যে সকল উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছে সে সকল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন বিষয়ভিত্তিক লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে সম্ভবপর নয়। এই দায়িত্ব পালনে অন্তঃপরীক্ষার ভূমিকাই প্রধান। তাই পরীক্ষা চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণে অন্তঃপরীক্ষাকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেয়া নীতিগতভাবে উচিত। তবে এজন্য পূর্বশর্ত হ'ল দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা এবং সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন।

১৮·৩৫· কেউ কেউ মনে করেন যে, অন্তঃপরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন কর্মের উদ্দেশ্য সংশিলষ্ট শিক্ষকবৃন্দ তথা পরীক্ষকগণের দ্বারা প্রায় নিশ্চিতভাবে বিনষ্ট হবে। কারণ অন্তঃপরীক্ষায় নিজ নিজ ছাত্রদের প্রতি তাদের পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকবে। তাঁরা এই দায়িত্বের অবমাননা করবেন না আশা করা যায়। কোনো ব্যক্তির সততায় বিশ্বাস স্থাপন করা সাধারণত উক্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস অর্জনে উৎসাহিত করে থাকে। উপরোক্ত অবস্থা সৃষ্টির রক্ষাকবচ হিসাবে শিক্ষকগণ অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করবেন। কোনো ক্লাসের পরীক্ষার্থীরা যে শিক্ষার্থীকে দুর্বল বলে জানে তাকে বেশি নম্বর দিয়ে কোনো শিক্ষকই ক্লাসের মোকাবিলা করতে সক্ষম হবেন না। কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যদি তাঁদের নিজেদের ছাত্রদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন বা অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান করেন এবং তাঁদের মূল্যায়ন বহিঃপরীক্ষার মূল্যায়নের সঙ্গে পুনঃ পুনঃ সামঞ্জস্যহীন হয় তাহলে তাঁদের মূল্যায়নের উপর সংশিলষ্ট কারো আস্থা থাকিতে পারে না। এমনকি তাতে সর্বসাধারণের আস্থাও থাকবে না। ফলে এজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্নাম হবে। তাই নিজেদের সুনাম ও অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষার্থীগণকে অন্তঃপরীক্ষায় উপযুক্তভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

১৮·৩৬· অবশ্য উপযুক্ত অন্তঃপরীক্ষা পদ্ধতি উন্নয়নও আবশ্যক এবং সীমিত দু'একটি পরীক্ষার উপর নির্ভর না করে সারা বছরব্যাপী পরীক্ষা, অভীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ক্রমপুঞ্জিত মূল্যায়ন রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। তবে বছরে অন্তত দু'টি লিখিত অন্তঃপরীক্ষা নিতে হবে। অন্তঃপরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করার দায়িত্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সভাপতিত্বে শিক্ষক-পরিষদ অথবা কমপক্ষে পাঁচজন সিনিয়র শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত অন্তঃপরীক্ষা কমিটির উপর অর্পিত হবে। আন্তঃপরীক্ষার সমস্ত রেকর্ড শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সযত্নে সংরক্ষণ করবেন।

১৮·৩৭· অন্তঃপরীক্ষা শিক্ষার্থীদের সময়ানুবর্তী এবং নিয়মিতভাবে পড়াশোনা করতে মনোযোগী করে তুলবে। অন্তঃপরীক্ষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৃংখলার উপর অনুকূল প্রভাব পড়বে বলে আশা করা যায়। তাই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বহিঃপরীক্ষার সাথে অন্তঃপরীক্ষার ফলাফলকেও গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। অন্তঃপরীক্ষা এবং বহিঃপরীক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায়

পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে একমত পোষণ করে এ কমিশন মনে করে যে, অন্তঃপরীক্ষাকে ঈপ্সিত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফলাফল যাতে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয় সেজন্য সনদে দুই পরীক্ষার ফলই উল্লেখ থাকা দরকার। এই বিষয়ে কমিশনে মতামত প্রকাশ করা হয় যে, স্কুল/কলেজ তাদের স্বস্ব ছাত্রদের অন্তঃপরীক্ষার সনদ এবং শিক্ষা বোর্ড বহিঃপরীক্ষার সনদ পৃথকভাবে প্রদান করবে। তবে এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে যে, স্কুল/কলেজকে অন্তঃপরীক্ষার ফল পরীক্ষার ফর্মের সাথে শিক্ষা বোর্ডে পাঠাতে হবে এবং শিক্ষা বোর্ড সনদে একই সঙ্গে পৃথকভাবে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফল লিপিবদ্ধ করবে।

১৮·৩৮· এই মতামতের প্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে অন্তঃপরীক্ষার ও বহিঃপরীক্ষার ফল পৃথক পৃথক সনদে জারি করা যায়। তবে পরীক্ষার ফর্মের সাথে অন্তঃপরীক্ষার ফল স্কুল/কলেজ অবশ্যই শিক্ষা বোর্ডে পাঠাবে। পর্যায়ক্রমে অন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষার ফল একই সনদে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে অন্তঃপরীক্ষায় যথার্থ গুরুত্ব আরোপিত হয়।

১৮·৩৯· **বৃত্তিঃ** বর্তমানে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের জন্য পৃথক পৃথক মেধা তালিকা প্রস্তুত করে। ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে মোটামুটিভাবে বৃত্তিগুলির সুষম বন্টন হচ্ছে। নীতিগতভাবে মেধা যাচাইয়ের জন্য পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা নেয়ার যুক্তি রয়েছে। তবে বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার ও উন্নয়ন হলে পরীক্ষা পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা এবং মেধা যাচাইয়ের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। একটি পৃথক বৃত্তি পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হবে এবং এই জন্য অতিরিক্ত খরচ হবে। এসব কারণে এ কমিশন পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) মত মনে করে যে বৃত্তি প্রদানের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের প্রথা চালু রাখা যুক্তি সংগত।

পরীক্ষা পদ্ধতিঃ প্রশ্নপত্রের ধরন

১৮·৪০· বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ধরন মূলত রচনাধর্মী। এ ধরনের প্রশ্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়। বিশেষ করে এতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সূচীর সব বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেয় না, বরং শ্রেণীকক্ষে পাঠদান সময়ে কেবল সম্ভাব্য প্রশ্নের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকে বলে অনেকে মনে করেন। এর প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশের মতে প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন করলে শ্রেণীকক্ষে সব বিষয়ে সমানভাবে গুরুত্ব পাবে। ইতিপূর্বে পূর্বতন কমিশন ও কমিটি তাদের রিপোর্টেও এই ত্রুটি চিহ্নিত করেছে। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) রিপোর্টে যে সকল উন্নয়নশীল দেশের তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সে দেশগুলিতেও পরীক্ষা সংস্কারের ধারায় দীর্ঘ রচনাধর্মী প্রশ্নের আধিক্যের বদলে নৈর্ব্যক্তিক, সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক এবং রচনাধর্মী প্রশ্নের সুষম ব্যবহার দেখা যায়। আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলিতেও পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে এরূপ পরিবর্তনের ধারা পরিলক্ষিত হয়।

১৮·৪১· এ কমিশন এ বিষয়ের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে। কমিশনের মতে ও বর্তমান পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয়ে রচনাধর্মী নৈর্ব্যক্তিক এবং সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের নম্বর নিম্নোক্তভাবে বন্টন করা যায়ঃ

বিষয়	রচনাধর্মী	নৈর্ব্যক্তিক ও সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক
ভাষা ও সাহিত্য	৫০%	৫০%
অন্যান্য	৪০%	৬০%

তবে রচনাধর্মী ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নে যে মান বন্টন দেখানো হল সময়ে সময়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে তার যথাযথ পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নে উপরের সুপারিশ গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনঃ (ক) একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বিষয় শিক্ষকদের সহযোগিতায় প্রশ্ন-প্রণয়নের দায়িত্বে থাকবেন, (খ) দুরূহতার সমতা রক্ষা করে প্রতি বিষয়ে অনেকগুলি প্রশ্নপত্রের সেট তৈরি করে রাখতে হবে, (গ) যে কোনো প্রশ্ন চূড়ান্তকরণের পূর্বে প্রাক-পরীক্ষণের মাধ্যমে তা আদর্শায়িত করতে হবে এবং (ঘ) প্রতিটি বিষয়ে একটি করে প্রশ্ন ব্যাংক গড়ে তোলার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১৮·৪২· অন্তঃপরীক্ষার জন্য আদর্শ মানের প্রশ্নমালা শিক্ষা বোর্ডগুলি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এ সকল প্রশ্নমালার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের অন্তপরীক্ষা পরিচালনা এবং প্রান্তিক পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করবে। এ সমস্ত প্রশ্নমালার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণও অনুরূপ প্রশ্নমালা তৈরি করে শ্রেণীতে প্রয়োগ করবেন।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও ফলাফল প্রকাশের সময়সীমা

১৮·৪৩· পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হলে—(১) উত্তরপত্র মূল্যায়ন সহজতর হবে, (২) পরীক্ষার ফলাফলও অধিকতর নির্ভরযোগ্য হবে এবং (৩) দুর্নীতি হ্রাস পাবে। ফলাফল নির্ধারণে প্রতি উত্তরপত্র নম্বরের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে। উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য শুধুমাত্র অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ করা উচিত। মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। রচনাধর্মী প্রশ্ন ছাড়া অন্যান্য প্রশ্নের জন্য আদর্শ উত্তর সরবরাহ করা আবশ্যক।

১৮·৪৪· বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে যে সময় লাগে তা কমাবার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করা একান্ত দরকার। পরীক্ষা পদ্ধতিতে যে ধরনের সংস্কার কমিশন সুপারিশ করেছে তা বাস্তবায়িত হলে পরীক্ষা গ্রহণ এবং উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় বর্তমান সময়ের চেয়ে কমে যাবে। তদুপরি যেখানে সম্ভব, পরীক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। সময় কমাবার পদক্ষেপ কার্যকর করার জন্য পরীক্ষার বিস্তারিত ক্যালেন্ডার প্রকাশ করতে হবে। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের নির্ধারিত সময়সীমা যাতে বজায় থাকে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণ

১৮·৪৫· প্রচলিত পরীক্ষাপদ্ধতিতে একজন পরীক্ষার্থীকে সকল বিষয়ে পাশ করতে হয়। কোনো একটা বিষয়ে অকৃতকার্য হলে পরবর্তীতে তাকে আবার নতুন বছরে সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায় যে, একজন পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সে বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পরীক্ষার্থীর জন্য সকল বিষয়ে একসঙ্গে পরীক্ষা দেয়া আবশ্যিক নয়। পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) জনমত যাচাই-জরিপেও দেখা গিয়েছে যে, অধিকাংশের মতে পরীক্ষার্থী যে বিষয়ে অকৃতকার্য হয়, কেবল সে বিষয়ে তাকে পরীক্ষা দিতে দেয়া উচিত। কমিশন পরীক্ষা কমিটির (১৯৮৫) এই মত সমর্থন করে। কিন্তু এই সুযোগ-সুবিধা দুটি বিষয় পর্যন্ত যারা ফেল করবে তাদের প্রদান করে পরবর্তী পর পর দুটি পরীক্ষা পর্যন্ত পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেয়া যায়। পর পর তিনটি পরীক্ষায় তিন বছরের মধ্যে ঐ শিক্ষার্থী পাশ করতে না পারলে আবার সকল বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। তবে সনদে পরীক্ষার প্রাপ্ত বিভাগের সঙ্গে ফলাফলের পাশে পরীক্ষার্থী যে বছরে যে বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে তার উল্লেখ থাকবে। স্বভাবতই এই শ্রেণীর পরীক্ষার্থী মেধা তালিকায় স্থান পাবে না এবং বৃত্তির জন্যও বিবেচিত হবে না।

১৮·৪৬· যদি কোনো একটি বিষয়ে কোনো পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর অন্যান্য বিষয়গুলিতে প্রাপ্ত নম্বরের গড়ের তুলনায় অন্তত শতকরা ৩০ নম্বরের কম হয়, কেবল মাত্র সেই বিষয়টিতে উত্তর পত্রের পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা উচিত কিনা বিবেচনা করা যেতে পারে। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত পুনঃনিরীক্ষার প্রথা চালু থাকবে।

১৮·৪৭· বর্তমানে পরীক্ষার ফলাফল উন্নয়নের জন্য পুনরায় পরীক্ষা দেয়ার যে ব্যবস্থা আছে তা চালু থাকা উচিত। প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ প্রথা, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগ ইত্যাদি চালু থাকবে। বর্তমানে প্রচলিত মেধা ভিত্তিক ফল প্রকাশের প্রথাও চালু থাকতে পারে।

পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা

১৮·৪৮ পরীক্ষা উন্নয়ন এবং পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালনের জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা স্থাপন করা অত্যাবশ্যক। ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটিও দেশে একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছে। পরীক্ষা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যা গবেষণার মাধ্যমে সুন্দর ও যথাযথভাবে গড়ে তোলা যায়। ধারাবাহিক গবেষণার মাধ্যমে দেশের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে তোলা সম্ভব। দেশের শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এই সংস্থার মূল দায়িত্ব হবেঃ

(ক) প্রশ্ন ব্যাংকের জন্য বিজ্ঞানসম্মত নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ;

(খ) উন্নত ধরনের প্রশ্নপত্রের ব্যাংক হিসাবে কাজ করা ;

(গ) কালে প্রশ্নব্যাংকের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করা ;

(ঘ) বহিঃপরীক্ষা ও অন্তঃপরীক্ষা এবং তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল সমন্বয়-রীতি নির্ধারণ ;

(ঙ) পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃঙ্খল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি ও সংস্কার ;

(চ) উত্তরপত্র মূল্যায়নে কম্পিউটার ব্যবহার করা ;

(ছ) উত্তরপত্র মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষা ও মানের সমন্বয় বিধানের উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন ;

(জ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষক ও প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ ;

(ঝ) গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও শিক্ষাদান পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পরামর্শ দান ;

(ঞ) পরীক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীল বিকাশের অন্যান্য দিক মূল্যায়নে প্রয়োজনীয় আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরি করা এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা ; এবং

(ট) নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রস্তুতি এবং পরবর্তীকালে অভিজ্ঞতার আলোকে এর পরিবর্তনের জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই গবেষণা সংস্থার পরামর্শমত গ্রহণ করা হবে।

এই সংস্থার পূর্ণরূপ ধারণ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হতে পারে। তাই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে দেশের বর্তমান শিক্ষা বোর্ডগুলি সমন্বিতভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা নতুন ধরনের প্রশ্নপত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে পারে।

পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন এবং পরীক্ষা পরিচালনা

১৮·৪৯· পরীক্ষা কেন্দ্র নির্বাচন এবং পরীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা সুপারিশ করা হলঃ

(ক) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে. তবে প্রতি উপজেলায় একটি মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র থাকবে এবং তা সাধারণত উপজেলা সদরে স্থাপিত হবে। প্রত্যেক উপজেলায় উচ্চ মাধ্যমিক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে যাচাই করার প্রয়োজন হবে।

(খ) পরীক্ষার্থীরা নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে পারবে না।

(গ) বিশেষ কারণ ব্যতীত পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করার অনুমতি দেয়া যাবে না। পরীক্ষার্থীর কেন্দ্র পরিবর্তনের প্রবণতা দৃঢ় হস্তে বন্ধ করা দরকার।

(ঘ) পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির জন্য গণমাধ্যমগুলি ব্যবহার করা উচিত।

(ঙ) পরীক্ষা কেন্দ্রের সুশৃংখল পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত কার্যকর তদারকি এবং পুলিশ প্রহরা থাকা আবশ্যক।

(চ) বর্তমানে পরীক্ষায় দুর্নীতি সংক্রান্ত যে আইন প্রচলিত আছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

(ছ) বর্তমানে বিভিন্ন পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে। এই অবস্থা নিরসনের জন্য দীর্ঘ অবকাশের মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ করা সমীচীন।

১৮·৫০· জেলা পর্যায়ে নিম্নলিখিত সদস্যবিশিষ্ট জেলা পরীক্ষা সমন্বয় কমিটি নামে একটি কমিটি গঠিত হবেঃ

(ক) জেলা প্রশাসক	...	আহবায়ক
(খ) পুলিশ সুপার/মেট্রোপলিটন এলাকার ক্ষেত্রে পুলিশ কমিশনারের প্রতিনিধি।	...	সদস্য
(গ) উপজেলা পরিষদসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ		
(ঘ) জেলার সকল কেন্দ্রের সচিববৃন্দ/ভারপ্রাপ্ত অফিসারবৃন্দ।		
(ঙ) জেলার ২ জন গণ্যমান্য ব্যক্তি (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)		
(চ) জেলা শিক্ষা অফিসার	...	সদস্য-সচিব

স্থানীয় জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে থাকবেন। জেলাস্থ পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির সার্বিক তত্ত্বাবধান এবং বিশেষ করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র গ্রহণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ, আইন-শৃংখলা রক্ষা প্রভৃতি ব্যাপারে এই কমিটি যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করবে।

উচ্চতর শিক্ষাস্তরে পরীক্ষা

১৮·৫১· **পাস ডিগ্রী স্তরঃ** পাস ডিগ্রী স্তরে বহিঃপরীক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর নিকট জ্ঞান আহরণ অপেক্ষা পরীক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও প্রয়োগের অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না। সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা শিক্ষা কর্ম ও গবেষণা কর্মকে বিপদ-জনকভাবে আচ্ছন্ন করে তুলেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন পাস ডিগ্রী স্তরের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশ করছেঃ

১৮·৫২· পাস ডিগ্রী পর্যায়ে শিক্ষাদানের অঙ্গরূপে অন্তঃপরীক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, অর্থাৎ সারা বছর কলেজসমূহে যে শিক্ষাদান করা হয় তার মূল্যায়ন নিয়মিত আভ্যন্তরীণভাবে করা অত্যাবশ্যক। টিউটোরিয়াল, বাড়ির কাজ, শ্রেণীকক্ষে পরীক্ষা, ব্যবহারিক ও প্রয়োগমূলক কাজ ইত্যাদি ছাড়াও এ উদ্দেশ্যে প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষাসহ তিনটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

১৮·৫৩· নিয়মিত আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার উত্তরপত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের ফেরত দেয়া হলে তা শিক্ষার্থীদের নিজেদের ত্রুটিসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হতে বিশেষ সহায়ক হবে। শিক্ষকবৃন্দ অন্তঃপরীক্ষার ফল নোটিস বোর্ডে প্রকাশ করলে শিক্ষকদের উপর শিক্ষার্থীদের আস্থা গড়ে উঠবে। পাস ডিগ্রী কোর্স সমাপনের পরে অন্তঃপরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে যে সকল প্রার্থী উপযুক্ত বিবেচিত হবে, কলেজসমূহ সেই সকল প্রার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীতব্য সাধারণ বা বহিঃপরীক্ষার জন্য প্রেরণ করবে।

১৮·৫৪· পাস ডিগ্রীর বেলায় দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি বিভাগ নির্দেশের নম্বর সীমা বর্তমানে এক নয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। বর্তমানে কোনো এক বিষয়ে ফেল করলে সে বিষয়ে পরবর্তী পরীক্ষায় বসতে দেয়ার প্রচলিত নিয়ম চালু থাকবে।

অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী স্তর

১৮·৫৫· অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী পর্যায়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি বিভিন্ন। এমনকি একই বিশ্ববিদ্যালয়েও বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষা পদ্ধতি এক নয়। সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে নানা আর্থ-সামাজিক কারণে যদি সেমিস্টার পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব না হয়, তবে অন্তত বার্ষিক পরীক্ষার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও তাদের অধিভুক্ত কলেজগুলিতে কোর্স সিস্টেম প্রবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

১৮·৫৬· অনার্স ডিগ্রী ও মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষার ফলাফল অন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষার সম্মিলিত ফলাফলের উপর নির্ভরশীল হবে। অন্তঃপরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট নম্বর সংরক্ষিত থাকবে। প্রতি কোর্সে বছরে অন্তত দুটি অন্তঃপরীক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া শ্রেণীকক্ষে টিউটোরিয়াল, প্রায়োগিক এবং গবেষণামূলক কাজ ইত্যাদির জন্য নম্বর প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে। তদুপরি অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষায় মৌখিক পরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম চালু থাকবে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণী নির্দেশের নম্বর সীমা বর্তমানে এক নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমতা বিধান করা সঙ্গত হবে। এ সমস্যার সমাধান গ্রেডিং-এর মাধ্যমে সহজ হতে পারে।

১৮·৫৭· অনার্স ডিগ্রী ও মাস্টার্স ডিগ্রী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর হবে শতকরা ৬০ নম্বর বা তার বেশি, দ্বিতীয় শ্রেণীর নম্বর শতকরা ৫০ থেকে ৬০-এর নিচে নম্বর, শতকরা ৪০ থেকে ৫০ এর নিচে নম্বর প্রাপ্ত প্রার্থীরা তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ এবং শতকরা ৩৩ এর নিচে যারা নম্বর পাবে তাদের অনুত্তীর্ণ বলে ধরে নেয়া হবে।

১৮·৫৮· বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে নানাবিধ কারণে বেশ কয়েক বছর ধরে পরীক্ষা গ্রহণ এবং ফলাফল প্রকাশ অস্বাভাবিকভাবে বিলম্বিত হচ্ছে। এসবের মধ্যে বেশ কিছু কারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং কিছু প্রশাসন ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের আয়ত্তে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভিন্ন পরীক্ষা যাতে যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উত্তরপত্রসমূহ মূল্যায়ন করে ফলপ্রকাশ করা যায় তার নিশ্চিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। এই পদক্ষেপসমূহের অংশ হিসাবে প্রত্যেক পরীক্ষার শুরু ও সমাপ্তির দিন তারিখ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ঘোষণা করতে হবে। লিখিত পরীক্ষার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূল্যায়নের শেষে উত্তরপত্র ফেরত আনার ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণত এই সময় ত্রিশ দিনের বেশি হবে না। তদুপরি এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন যাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ষাট দিনের মধ্যে ফল প্রকাশ করা যায়।

গ্রেড পদ্ধতি

১৮·৫৯· বর্তমানে পরীক্ষার মূল্যায়ন নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীকে শ্রেণী/বিভাগ দেয়া হয় অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী/বিভাগ, দ্বিতীয় শ্রেণী/বিভাগ, তৃতীয় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন বিষয় ও পরীক্ষকের নম্বর প্রদানের মান ভিন্ন হওয়াতে বর্তমানের পাশ নম্বর শতকরা ৩৩ নম্বর, প্রথম বিভাগ প্রাপ্তির নম্বর শতকরা ৬০ নম্বর অনেকের মতে বিজ্ঞান সম্মত নয়। আবার বর্তমান পরীক্ষায় নম্বর দেয়ার প্রচলিত পদ্ধতিতে সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের সমভাবে মূল্যায়নের সুযোগ নেই বলে অনেকে মনে করেন। যেমন গণিত, পদার্থবিদ্যা বা রসায়নবিদ্যায় শতকরা ৮০ নম্বর এবং সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ ভাগ নম্বর পেলে শিক্ষার্থীগণ সমান মেধার বলে বিবেচিত হয় না। খুব সন্তোষজনক উত্তর দিয়েও শিক্ষার্থীরা সাহিত্য, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা অর্থনীতিতে শতকরা ৮০ নম্বর পায়না বললেই চলে। আবার প্রতি বছর প্রশ্নপত্র একই মানের হয় না বলে এক বছরের শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর এবং পরের বছর একই বিষয়ে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর একই মানের বলে মনে করা যায় না। এই বৈষম্য দূর করার জন্য একজন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার মূল্যায়ন প্রতি বিষয়ে অক্ষর গ্রেড—**'A'**, **'B'**, **'C'**, **'D'** বা 'ক', 'খ', 'গ', 'ঘ' এতে করা যায়। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে শিক্ষার্থীদের পাঠের যথার্থ মূল্যায়ন হতে পারে বলে আশা করা যায়।

১৮·৬০· গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত বর্তমানে পরীক্ষায় নম্বরের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের যে মূল্যায়ন করা হয় সেই নম্বরের ভিত্তিতেই পরীক্ষার্থীদের মেধা তালিকা তৈরি হয় এবং সেই মেধা তালিকার ভিত্তিতেই বৃত্তি প্রদান করা হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলন করা হলে বৃত্তির জন্য পৃথক পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কেননা গ্রেডের ভিত্তিতে বৃত্তির জন্য মেধা তালিকা তৈরি সম্ভব নয়। এই ধরনের পৃথক পরীক্ষা প্রবর্তিত হলে শিক্ষার্থীদের জন্য অতিরিক্ত সময় পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। পৃথক বৃত্তি-পরীক্ষা প্রবর্তন করা হলে ঐ পরীক্ষা পরিচালনার জন্য পৃথক সংস্থা স্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে এবং এই জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হবে।

১৮·৬১· দ্বিতীয়ত আমাদের দেশে সকল প্রকার চাকুরির জন্য যে নিয়োগবিধিসমূহের প্রচলন রয়েছে সেই সকল নিয়োগবিধিতে সাধারণভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার বেলায় শ্রেণী/বিভাগ ইত্যাদি ভিত্তিতে প্রার্থীদের চাকুরির যোগ্যতা নির্ধারিত হয়। গ্রেড পদ্ধতি প্রচলিত হলে সকল চাকুরির নিয়োগবিধি পরিবর্তন করে এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হবে যাতে প্রার্থীদের প্রতিযোগিতামূলকভাবে যোগ্যতা নির্ধারণ করা যায়।

১৮·৬২· তাই গ্রেড পদ্ধতির গুণাবলীর বিষয় স্বীকার করেও বলতে হয় যে, এই পদ্ধতি প্রচলন করতে হলে বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা ও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেজন্য গ্রেড পদ্ধতি বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয়, অন্যান্য স্তরের শিক্ষা সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, সরকার, বিশেষ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রভৃতির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

উপসংহার

১৮·৬৩· যে কোনো সমাজে পরীক্ষা যেমন শিক্ষা ব্যবস্হাব একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্হাও বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ কারণে পরীক্ষা ব্যবস্হার সফল উন্নয়ন ও সংস্কার যেমন শিক্ষা ব্যবস্হার সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত, তেমনি শিক্ষা ব্যবস্হার সংস্কার ও উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিস্হিতির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল।

১৮·৬৪· তাই পরীক্ষা সংস্কার কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। পরীক্ষা সংস্কারের জন্য কমিশন যে সকল সুপারিশ করেছে, তার সার্থক বাস্তবায়নে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের সকলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এদের সকলের সহযোগিতা পেলে প্রস্তাবিত সংস্কার বাস্তবায়ন করা দুঃসাধ্য হবে না।

১৮·৬৫· পরীক্ষা পরিস্হিতির ক্রমাবনতি বর্তমানে এক গুরুতর রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাই পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটির (১৯৮৫) সঙ্গে কমিশন ঐক্যমত পোষণ করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এই অবস্হার পরিবর্তনের জন্য জরুরী ব্যবস্হা গ্রহণ করা জাতীয় স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করে। কমিশনের সুপারিশ থেকে লক্ষ্য করা যাবে যে, কিছু কিছু সুপারিশ রয়েছে যার বাস্তবায়নের জন্য পূর্ব প্রস্তুতি আবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ সুপারিশের বাস্তবায়ন অবিলম্বে সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়। সমাজে বিরাজমান উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বিশ্বাস করে যে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে জাতীয় কল্যাণকর এই উদ্যোগ সর্বসাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করবে।

অধ্যায় ১৯

শিক্ষার্থী প্রসঙ্গ

ছাত্র সমস্যা

১৯·১· আজকের ছাত্র সমাজ তথা তরুণেরা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। এটাই সত্য ও স্বাভাবিক নিয়ম। প্রত্যেক সভ্য দেশেই ছাত্রসমাজ যাতে নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারে সে ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে নজর দেয়া হয়। দেশ ও জাতির স্বার্থেই ছাত্রসমাজকে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করা একান্ত আবশ্যক। এর জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা।

১৯·২· দেশের শিক্ষা সম্পর্কিত সকল কর্মকান্ড, সকল ব্যবস্থা ও পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রবিন্দু হল ছাত্রসমাজ। তাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণের উদ্দেশ্যে দেশের সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। বর্তমান ও আগামী দিনের অগণিত শিক্ষার্থী যাতে যথার্থ শিক্ষা লাভ করে নিজ নিজ জীবন গঠনপূর্বক স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক হয়ে উঠতে পারে সেদিকে নিরন্তর দৃষ্টি রেখে কর্মতৎপরতায় নিবেদিত হবে শিক্ষকদের মেধা, শিক্ষা প্রশাসনের উদ্যোগ আর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ অর্থ।

১৯·৩· দেশে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ থেকে আমাদের সমাজ যে অভীপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হতে পারছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাচ্ছে না। শিক্ষার্থীরা বহুবিধ সমস্যার আবর্তে বিভ্রান্ত হচ্ছে, অনেকে লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছে, অনেকের জীবন বিনষ্ট হচ্ছে—সেই সাথে নিভে আসছে অভিভাবকদের আশার আলো। আর অন্ধকার হয়ে আসছে জাতির ভবিষ্যৎ।

১৯·৪· এখনকার ছাত্রসমাজ হাজারো সমস্যার জটিলতায় দিশেহারা। সেশন জট এখন সাধারণ ঘটনা, পরীক্ষার সময় ও ফল প্রকাশের তারিখ আজ অনিশ্চিত। ব্যাপক দুর্নীতি পরীক্ষা পদ্ধতিকে করে তুলেছে অর্থহীন। শিক্ষাঙ্গনে বিরাজ করছে অশান্ত পরিবেশ, সেখানে অস্ত্রের ঝংকার। শিক্ষা ভবন জরাজীর্ণ এবং ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে অপ্রতুল, শ্রেণীকক্ষে স্থানাভাব। অভাব পাঠ্যপুস্তকের, উপকরণের, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের। ভর্তির সুযোগ হয়েছে সংকীর্ণ। পাঠ গ্রহণে বছরে নির্ধারিত সময় কাজে লাগানো যায় না। শিক্ষার মান এসেছে নেমে, পরিবেশ হয়েছে প্রতিকূল। এসব সমস্যা আমাদের শিক্ষার্থীকে নৈরাশ্যে ঠেলে দিচ্ছে। কোনো কার্যকর ও বাস্তবানুসারী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হলে ছাত্রসমাজের সমস্যা সর্বাগ্রে সমাধান করা প্রয়োজন। শিক্ষার সকল পর্যায়ে সমস্যা খুঁজে বের করে তার সমাধান নির্দেশ করা অত্যাবশ্যক।

ভর্তি সমস্যা

১৯·৫· বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্রই ভর্তির জন্য স্থানাভাব। উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর জন্য বর্তমানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। যা আছে তার মধ্যে স্থান সংকুলান হচ্ছে না। শিক্ষার হার বৃদ্ধি করতে হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় স্থান দিতে হবে এবং সেই সাথে আনুষঙ্গিক প্রয়োজন. মিটাতে হবে। ভর্তি সমস্যার সমাধানের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং বর্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ছাত্র সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যেসব প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

বর্তমানে চালু রয়েছে সেগুলিতে ভবনের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে শ্রেণীকক্ষ বৃদ্ধি করতে হবে এবং দুই শিফট চালুর ব্যবস্থা আরো কার্যকর করতে হবে। প্রয়োজনে তিন শিফটের ব্যবস্থাও করা যায়। মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়েও এ ধরনের স্থান সংকুলান প্রয়োজন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সমস্যা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করলেই চলবে না, সেখানে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

১৯.৬. আমাদের দেশে ভাল স্কুল-কলেজগুলিতে ভর্তির ও লেখাপড়া করার জন্য অসম্ভব রকম ভীড় হয়। এজন্য দূরদূরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা নিজেদের বাড়ি বা বাসস্থানের নিকটের স্কুল-কলেজ ছেড়ে এসব ভাল স্কুল-কলেজে ভীড় জমায়। তাই সকল অঞ্চলে উন্নতমানের স্কুল-কলেজের প্রয়োজন। এই উন্নতমানের স্কুল-কলেজের জন্য স্থানীয় লোকদের সাহায্য ও সহযোগিতা দরকার।

১৯.৭. তদুপরি এরূপ ব্যবস্থারও প্রয়োজন যাতে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা স্থানীয় স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া করার জন্য উৎসাহিত হয়। তাতে একদিকে স্কুল-কলেজের মান উন্নত হবে এবং অন্যদিকে ভর্তি সমস্যার যথাসম্ভব সমাধান হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বিশ্বের বহু দেশে স্কুল এলাকা বলে এ রকম ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

১৯.৮. দেশের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যার ভিত্তিতে কেবলমাত্র মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে উচ্চ শিক্ষায় ভর্তির সুযোগ থাকবে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। একই পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্র একই ধরনের ভর্তি নীতি অনুসরণ করা দরকার। প্রকৌশল, চিকিৎসা ও কৃষি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়টি নির্ধারিত হবে জাতীয় চাহিদা বিবেচনা করে। শিক্ষার্থীরা যাতে আবেগের বশবর্তী না হয়ে বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা থাকা বাঞ্ছনীয়। জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে সাধারণ শিক্ষার ভীড় কমাতে হবে।

১৯.৯. সকল শিক্ষার্থীর ভাল লাগার বিষয়বস্তু বা ঝোঁক এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা সবসময়ই একই ধরনের হয় না। যে বিষয়ে যার প্রতিভা রয়েছে সে বিষয় উপেক্ষা করে, শুধু শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা অনুসরণের চাপে পড়ে যে বিষয়ে তার আগ্রহ নেই এমন বিষয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কোনো কোনো ছাত্রের পক্ষে বিচিত্র নয়। জনশক্তি অপচয় রোধ করার জন্য শিক্ষার্থী ও তার অভিভাবককে তার প্রতিভা সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেয়া এবং যে পেশার মাধ্যমে তার প্রতিভা কার্যে নিয়োজিত করা সম্ভব, সেদিকে পরিচালিত করা উচিত। শিক্ষার্থীদের প্রতিভা ও প্রবণতা শুধু নির্ধারণ ও পরিমাপ করলেই চলবে না, তাদের প্রতিভা ও আগ্রহের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থাও থাকতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক এবং এই স্তরের পর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে।

১৯.১০. এই রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়সমূহে যেমন—প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি অধ্যায়ে ছাত্র ভর্তি সমস্যা ও তার সমাধানের পন্থা বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

ছাত্র বেতন

১৯.১১. আমাদের দেশে ছাত্র বেতনের হার সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দু'ধরনের। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের হার কম এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হার বেশি। এর ফলে স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে। অপরদিকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ হারে বেতন দিয়েও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এতে শিক্ষার মানের তারতম্য হচ্ছে। তাই সমস্তরের

ও একই ধরনের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সর্বত্র ন্যায় ও সমতার ভিত্তিতে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দিতে হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ছাত্র বেতনের মধ্যে সমতা বিধানের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

১৯·১২· অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সুনাগরিক তৈরির জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন করা আবশ্যক। দরিদ্র জনগণ সন্তানের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপারগ বলে এই শিক্ষা অবৈতনিক হওয়া উচিত। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করতে হলে বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের প্রেরণের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় অভিভাবককে বহন করতে হবে তা লাঘব করার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে অথবা স্বল্প মূল্যে পাঠ্যপুস্তক, অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও বছরে দুই সেট স্কুল ইউনিফরম ইত্যাদি সরবরাহ করা হলে এবং দুপুরে সকল শিক্ষার্থীর জন্য অল্প মূল্যে টিফিনের ব্যবস্থা করতে পারলে, প্রায় সকল পরিবারই ছেলেমেয়েদের স্কুলের সময় কাজে নিয়োজিত না করে স্কুলে পাঠাবার সুযোগ গ্রহণ করবে বলে আশা করা যায়। সকল শিক্ষার্থী যাতে ন্যায্যমূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ পায় তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে লেখাপড়ায় আকৃষ্ট করে রাখার জন্য অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

১৯·১৩· সুপারিশকৃত নীতি বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে শিক্ষার যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটবে এবং তার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান করতে হবে। এর জন্য অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ ও সরকারকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এর কিছুটা বোঝা শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের বহন করতে হবে বলে ছাত্র বেতন বাড়াতে হবে। বর্তমানে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতনের হার একটি যুক্তিসংগত হারে উন্নীত করা দরকার।

বৃত্তি

১৯·১৪· আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক প্রতিভাবান যুবক শিক্ষার মাধ্যমে নিজেদের কর্মক্ষমতা অনুধাবন করার সুযোগ পায় না। অর্থনৈতিক সংকটের কারণে বিপুল সংখ্যক মেধাবী শিক্ষার্থীর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। উপযুক্ত সহায়তা লাভ করলে এ ধরনের শিক্ষা ব্যক্তি জীবনে যেমন উন্নতি করতে পারত, তেমনি জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হত। আমাদের জাতীয় স্বার্থের খাতিরে দারিদ্র্যকে প্রতিভার পথে অন্তরায় হতে অথবা দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের পথে বাধা সৃষ্টি করতে দেয়া উচিত নয়। শিক্ষার সম্প্রসারণে সরকারী প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন হিসাবে শিক্ষার্থীদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা দরকার। শিক্ষার্থীদের বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত করে তোলা যায়। এমনকি উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী বা ব্যাংক ঋণ দেয়ার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে।

১৯·১৫· উপযুক্ত শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের জন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুব কম বলে সর্বাপেক্ষা মেধাবী ছাত্রও শিক্ষা গ্রহণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। সেজন্য বিভিন্ন স্তরে ও ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৃত্তির সুযোগ রাখতে হবে। সকল প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে বের করার এবং অর্থ সাহায্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই সরকার কর্তৃক মেধাবী ছাত্রদের ব্যাপক হারে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রামের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান যাতে উচ্চতর বা পেশাগত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য মেধাবী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসের ব্যয় সরকারকে বহন করতে হবে। বর্তমানে প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা, যেমন--সম্পূর্ণ বেতন মওকুফ, অর্ধেক বেতন মওকুফ, কনসেশান দেয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি অব্যাহত রাখতে হবে। বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ততার উপর অধিক গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে।

১৯·১৬· শিক্ষার্থীদের আর্থিক প্রয়োজন বিবেচনা করে বৃত্তির পরিমাণ নির্ধারিত হবে। বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তিদানের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে ও পেশায় প্রতিভাবান ছাত্রদের প্রবেশের জন্য আকর্ষণীয় বৃত্তির ব্যবস্থা রাখতে হবে। জাতিগঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক নিয়োগের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও মূল্যায়নের সামঞ্জস্য বিধান করা দরকার। যেখানে চাহিদা কম সেখানে বৃত্তি কমাতে হবে, সমাজের কল্যাণের স্বার্থে বিশেষ প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য বিশেষ যত্ন নিতে হবে। সামাজিক পরিবেশ নির্বিশেষে সকল প্রতিভাবান শিক্ষার্থী যেন বিশ্বের উন্নত দেশের সমকক্ষ শিক্ষা লাভ করতে পারে সেদিকে সচেতন থাকতে হবে।

১৯·১৭· বৃত্তির ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশে বৃত্তি প্রদানের বর্তমান নিয়মাদি ও পদ্ধতি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। অনেক সময় এত দেরিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয় যাতে তাদের সত্যিকারের উপকারে আসেনা অর্থাৎ যেজন্য বৃত্তি দেয়া হয় সেই উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাই সময়মত ও নিয়মিতভাবে যাতে বৃত্তি প্রদান করা হয় তার ব্যবস্থা থাকা অতীব প্রয়োজন।

তরুণ জনশক্তির সদ্ব্যবহার

১৯·১৮· দ্রুত পরিবর্তন ও তীব্র প্রতিযোগিতাই এ যুগের ধর্ম। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উৎসাহী এবং যুগ ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলার মত সক্ষম লোকের প্রয়োজন বর্তমানের মত এর পূর্বে এত অধিক অনুভূত হয়নি। প্রতিভাবান তরুণদের খুঁজে বের করতে এবং তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিতে অক্ষম হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি শ্লথ হয়ে আসবে। এজন্য তরুণ প্রতিভার অনুসন্ধানের গুরুত্ব সমধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা এমন যুগ সন্ধিক্ষণে জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছি যখন বলিষ্ঠ নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত প্রযুক্তিবিদ্যা ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন বহু ব্যক্তির প্রয়োজন। যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাব দূরীকরণের জন্য এসব বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন, সেই অভাবই আবার এদের প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষাদানের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হচ্ছে আমাদের প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ জনশক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার। পৃথিবীতে এমন বহু দেশ রয়েছে যারা কাঁচামালের অভাব সত্ত্বেও তাদের জনশক্তির সদ্ব্যবহারের ফলে উন্নতিশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। অবশ্য দেশের সম্পদই শিল্পোন্নত সমাজের মূল উপকরণ। আমাদের সম্পদের প্রাচুর্য সম্পর্কে এখনো সঠিক হিসাব না পেলেও আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক তরুণ জনশক্তি সম্পদ রয়েছে—তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করলে এই তরুণ প্রতিভাবান জনশক্তি দেশের জন্য মূল্যবান বিবেচিত হবে। বিশেষ করে যাদের মেধা ও প্রতিভা উচ্চমানের তাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

আবাসিক সমস্যা

১৯·১৯· শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা একটি জটিল সমস্যা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সীমানার মধ্যে থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ অনেকে পাচ্ছেনা। এ সমস্যা উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই প্রকট। আবাসিক সমস্যার সমাধান করতে না পারলে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রচেষ্টা বাধাগ্রস্ত হবে।

১৯·২০· শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থার বিষয়টি মাধ্যমিক স্তর থেকে চিন্তা করতে হবে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে, বিশেষ করে যে সকল বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বাসস্থানের ব্যবস্থা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। কলেজসমূহে শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। স্থান, পরিবেশ,

যাতায়াতের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যত বেশি বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যায় ততই মঙ্গল। আমরা এই রিপোর্টের অন্যত্র উন্নতমানের স্কুল ও কলেজের সুপারিশ করেছি। শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে উন্নতমানের স্কুল ও কলেজ চিন্তা করা যায় না।

১৯·২১· বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী যাতে আবাসিক সুবিধা লাভ করতে সক্ষম হয়, সে ব্যবস্থার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আমরা উন্নতমানের কলেজ ছাড়াও সাবেক জেলাগুলিতে এক একটি করে এবং ঢাকা ও বিভাগীয় সদরগুলিতে একাধিক কলেজ এমনভাবে উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে সুপারিশ করেছি যাতে এসকল কলেজকে পর্যায় ও কালক্রমে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়। তাতে উচ্চ শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীর ভর্তি সমস্যার সমাধানের সঙ্গে আবাসিক সমস্যারও সমাধান হবে বলে আশা করা যায়।

১৯·২২· বড় শহরে যারা অভিভাবকদের বাসস্থানে বসবাস করে তাদের যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক যানবাহনের ব্যবস্থা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকি কলেজ অঙ্গনে সারাদিন অবস্থানের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে ক্যাফেটেরিয়ায় খাবারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

১৯·২৩· শিক্ষার্থীদের ছাত্রাবাস নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে থাকতে হবে এবং সে সব তত্ত্বাবধানের জন্য যোগ্য ও উৎসাহী শিক্ষকগণকে দায়িত্ব দিতে হবে। পাঠাগার, খেলাধুলার ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। ছাত্রাবাসগুলি যাতে শিক্ষার্থীদের বসবাস ও লেখাপড়ার কাজে লাগে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষাঙ্গনে শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা

১৯· ২৪· শিক্ষার পরিবেশ সুষ্ঠু ও সুন্দর হলেই শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়। শিক্ষা ক্ষেত্রে যা কিছু আয়োজন সবই সুষ্ঠু পরিবেশে শিক্ষাদানের জন্য পরিকল্পিত।

১৯·২৫· আদর্শ পরিবেশ বর্তমান থাকলে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন উদ্বেগহীন চিত্তে পাঠে মনোনিবেশ করতে পারে, তেমনি শিক্ষক সমাজ, নিত্যনতুন কৌশল অবলম্বনে সর্বোত্তম শিক্ষাদানে তৎপর হতে পারেন। শিক্ষকদের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা অনুকূল পরিবেশে যেমন পল্লবিত হয়ে উঠতে পারে, তেমনি শিক্ষার্থীরা অনুকূল পরিবেশে জ্ঞান সাধনাকেই একমাত্র কর্তব্য বিবেচনা করে জীবন গঠনে তৎপর হয়।

১৯·২৬· তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশেও ছাত্র রাজনীতির এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে এবং এদেশের ছাত্র আন্দোলনের এক গৌরবময় ইতিহাসও রয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আজ পর্যন্ত এদেশের ছাত্র সমাজ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ বিষয় শিক্ষা ও সমকালীন বাস্তবতা অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯·২৭· আমাদের দেশে বর্তমানে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ নেই বললেই চলে। শিক্ষাঙ্গনে সর্বদিক থেকে এখন একটা অশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। এই অবস্থায় শিক্ষক, অভিভাবক ও ছাত্র সমাজ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ কালেও ভর্তির সমস্যা দেখা দেয়। কবে সেশন শুরু এবং কবে তা শেষ হবে তা শিক্ষা কর্তৃপক্ষেরও জানা নেই। ক্লাসের নির্ধারিত সময় কাজে লাগানো প্রায় অসম্ভব। শিক্ষাঙ্গনে নিরাপত্তার অভাব। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা অনিশ্চিত। ব্যাপক দুর্নীতি প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির উপর আস্থার অভাব ঘটিয়েছে।

১৯·২৮· জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে এই প্রতিকূল পরিবেশ দূর করে, আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থী সমাজের জন্য জীবন গঠনের পথ তৈরি করে দিতে হবে। সে জন্য শিক্ষাঙ্গনকে সর্বপ্রকার বিশৃংখলা ও অনিয়মানুবর্তিতা থেকে মুক্ত করতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে নিরবচ্ছিন্ন মনোযোগে পাঠে নিরত থাকতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে।

১৯·২৯· শিক্ষাঙ্গন যাতে অত্যধিক ভীড়ে আক্রান্ত না হয় সেজন্য সামর্থ্যের অধিক শিক্ষার্থী ভর্তি করা ঠিক হবে না। প্রত্যেকটি ছাত্র-ছাত্রীর প্রতি যাতে মনোযোগ প্রদান করা যায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যথাসময়ে পাঠ্যবিষয় শেষ করে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে এবং এর জন্য উপস্থিতির হার সম্পর্কে প্রচলিত বিধি বাস্তবায়ন করা দরকার। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণের উপস্থিতি আরো বেশি সময়ের জন্য নির্ধারণ করতে হবে। ক্লাস অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে। নিয়মিত পড়াশোনা ও পরীক্ষার চাপ থাকলে শিক্ষার্থীরা বিশৃংখল হওয়ার সুযোগ পায় না। সেজন্য সাময়িক পরীক্ষা ও টিউটোরিয়াল ক্লাস যথারীতি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির রেকর্ড নিয়মিতভাবে রাখতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যাবলীর প্রচুর ব্যবস্থা রাখতে হবে। অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের পাঠোন্নতি সম্পর্কে তাঁদের অবহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উচ্ছৃংখল আচরণে নিরুৎসাহিত করার জন্য প্রচলিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি কার্যকর করতে হবে।

ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান

১৯·৩০· শিক্ষার ব্যবহারিক মানের উন্নতি এবং দেশ ও জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান কর্মসূচী প্রবর্তন করা দরকার। এ ধরনের কর্মসূচী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশে এখন পর্যন্ত এর প্রতি তেমন কোনো গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি বলে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে দক্ষ জনশক্তি লাভ করা যাচ্ছে না। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে শিক্ষাকে সফল করে তোলার জন্য আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক হিসাবে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত হতে পারে।

১৯·৩১· ছাত্র নির্দেশনা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর প্রচ্ছন্ন গুণের আবিষ্কার করে তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন, তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা করা, শিক্ষার্থীর সমস্যার সমাধান করে পাঠে অনুরাগ সৃষ্টি করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নের সময় আগ্রহ ও প্রবণতার সাথে পাঠ্যবিষয় ও ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের সমন্বয় করা, শিক্ষার্থীকে আত্মনির্দেশনা ও আত্মনির্ভরশীলতায় সক্ষম হতে সাহায্য করা ইত্যাদি। এই নির্দেশনা হবে ছাত্রকেন্দ্রিক এবং তার লক্ষ্য হবে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে উদ্যোগী করে তোলা। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন স্তর উপযোগী নির্দেশনা থাকবে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ছাত্র, শিক্ষক, সমাজকর্মী, প্রশাসন ও অভিভাবকদের সম্মিলিত সহযোগিতা দরকার।

নির্দেশনা কর্মসূচীর কার্যক্রম হবে নিম্নরূপ

(১) **শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ**—প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে জেনে তার গুণাবলীর উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। শিক্ষার্থীর জীবন-তথ্য, বৈশিষ্ট্য, শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা, স্বাস্থ্য, পারিবারিক তথ্য, আকাঙ্ক্ষা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইত্যাদি তথ্য দিয়ে তৈরি রেকর্ড হবে একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পরিচয় পত্র।

(২) **তথ্য সরবরাহ**—শিক্ষার সুযোগ-সুবিধাজনিত তথ্য, কর্মসংস্থান সম্পর্কিত তথ্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আত্মমূল্যায়নজনিত তথ্যাদি এই কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। পরিচিতি কর্মসূচী, হ্যান্ডবুক, কর্মসংস্থান পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে অবহিত করতে হবে।

(৩) **পরামর্শ দান**—বিশেষজ্ঞ কর্তৃক সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই সমাধানের উপায় বের করতে পারে। সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থী পরামর্শদাতার কাছ থেকে পেশাগত পরামর্শ লাভ করবে।

(৪) **উপস্থাপন কার্যক্রম**—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে লেখাপড়া শেষে বের হবার পর কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণে সাহায্য করা।

(৫) **অনুসরণ কার্যক্রম**—কর্মক্ষেত্রে নিযুক্তির পর প্রয়োজনবোধে কোনো সমস্যা সমাধানের পরামর্শদান।

এইসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক/বিভাগীয় শিক্ষা অধিদপ্তর, জেলা শিক্ষা অফিস, শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ সহযোগে ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ছাত্রকল্যাণ ও জাতীয় সেবা

১৯·৩২· শিক্ষার সামগ্রিক আয়োজন ছাত্র কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করে তাদের পাঠাভ্যাসে নিয়োজিত রেখে ঈপ্সিত ফল প্রত্যাশা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যাতে যোগ্যতা অর্জনে তৎপর হয় সে রকম অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে জাতির জন্য কাজ করার যে মহৎ উদ্দেশ্য পোষণ করে তার প্রস্তুতি হিসাবে সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করবে।

১৯·৩৩· ছাত্র কল্যাণের দিকটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের সর্বপ্রকার সমস্যা দূর করে নিরবচ্ছিন্ন অধ্যয়নে নিয়োজিত থাকার প্রয়োজনীয় সুযোগ দিতে হবে। এর জন্য সকল প্রকার অর্থনৈতিক বাধা দূর করা দরকার। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ, প্রয়োজনীয় বৃত্তিলাভের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত শিক্ষা উপকরণ, প্রয়োজনীয় আবাসিক ব্যবস্থা ইত্যাদি সাধারণ সুযোগ-সুবিধার বিধান ছাড়াও শিক্ষার্থীদের অন্যান্য প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র কল্যাণ তহবিল সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের চাঁদা, স্থানীয় নাগরিকদের অর্থ সাহায্য, কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে এ তহবিল সৃষ্টি হবে এবং এ থেকে দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের লেখাপড়ার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের পুষ্টিহীনতা আমাদের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর একটি সাধারণ সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দুপুরে পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ করা দরকার। বর্তমানে কোনো কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে টিফিন ব্যবস্থা রয়েছে তা আরো ব্যাপক করতে হবে। শিক্ষার্থীদের চাঁদা ও সরকারী অনুদান থেকে এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হ্রাসকৃত মূল্যে পুষ্টিকর খাবারের জন্য নিজস্ব ক্যাফেটেরিয়া থাকতে হবে। সেখানে উন্নত মানের খাবার কম মূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

১৯·৩৪· শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখা দরকার। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রেকর্ড রাখতে হবে এবং বিনা মূল্যে শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রত্যেক কলেজে একজন ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে। যে সকল

কলেজে ডাক্তারের পদ ছিল তা পুনরুজ্জীবিত করা উচিত হবে। যে সকল কলেজে ডাক্তারের পদ খালি রয়েছে তা সত্বর পূরণ করা উচিত। আর যে সকল কলেজে ডাক্তারের পদ এখনো নেই সে সকল কলেজে সত্বর তার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে। এসব ব্যাপারে বর্তমানে প্রচলিত ব্যবস্থাদি আরো জোরদার করতে হবে। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগারের ব্যবস্থাসহ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরচর্চা শিক্ষক থাকবেন।

১৯.৩৫. যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি দরকার সেখানে প্রয়োজনীয় ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। দূর-দূরান্তের শিক্ষার্থীদের জন্যও আবাসিক ব্যবস্থা থাকা দরকার। ছাত্রাবাসে আনুষঙ্গিক সুবিধাদি থাকবে এবং পড়াশোনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে।

১৯.৩৬. শিক্ষার্থীদের জন্য সহপাঠ্যক্রমিক তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে অংশ গ্রহণ করে প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে, সেজন্য উৎসাহী শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য সপ্তাহে একটি সময় নির্দিষ্ট করে রাখা যায় এবং সারা বছর ধরে তা নিয়মিত চলবে। এ ব্যাপারে সকল শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ উৎসাহিত করতে হবে।

১৯.৩৭. শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বর্তমানে এ ব্যাপারে যেসব ব্যবস্থা রয়েছে তা আরো বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের নাগরিক ও সামাজিক দায়িত্ব সচেতন করে তোলার সাথে সাথে জাতীয় সেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণের প্রেরণা দিতে হবে। বিপুল ছাত্রশক্তিকে সক্রিয়ভাবে কাজে লাগাতে পারলে জাতীয় জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

১৯.৩৮. সাক্ষরতা অভিযানে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করলে এ অভিশাপ থেকে জাতির মুক্তির পথ সহজ হবে। কর্ম অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা যায়। এই কর্ম অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে চাকুরির ক্ষেত্রে গুরুত্ব পাবে।

১৯.৩৯. বিভিন্ন সেবামূলক কাজে শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে নিয়োজিত করার জন্য প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট, গার্ল গাইড কার্যক্রম, জুনিয়র রেডক্রস, ছাত্রব্রিগেড ইত্যাদির সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিককালে জাতীয় ক্যাডেট কোর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় ক্যাডেট কোরের (বি.এন.সি.সি) সম্প্রসারণ অতীব প্রয়োজন। এজন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দেয়া উচিত।

ছাত্র-সমাজ ও বেকার সমস্যা

১৯.৪০. বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশে যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে বেকার সমস্যা তাদের মধ্যে অন্যতম। বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশেও বেকার সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা। লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুবক কাজের অভাবে আজ বেকার হয়ে পড়েছে। যার ফলে এই জটিল বেকার সমস্যা আমাদের জাতীয় জীবনকে নানা দিক থেকে বিপন্ন করে তুলছে। ছাত্র সমাজের যারা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরুচ্ছে তারা চাকুরি পাচ্ছে না, তাদের কাজ নেই। তাই তারা হতাশাগ্রস্ত, দিশেহারা ও অসহায় হয়ে পড়েছে।এই সমস্যার সমাধান বা সুমীমাংসার উপায় খুঁজে বের করতে না পারলে দেশে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

১৯·৪১· অর্থনীতিবিদদের মতে আমাদের দেশের ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার মূল কারণ উত্তরোত্তর দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি। অবশ্য অর্থনীতিবিদদের এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য হলেও এটাই বেকার সমস্যার একমাত্র কারণ বলে মেনে নেয়া যায় না। একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বলতে হয় যে, আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা এই বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ। বর্তমান বিশ্বের প্রতিটি উন্নত ও স্বাধীন জাতিই তাদের দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য ভেবে দেখে। তারা বিশ্বাস করে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তির ধারাবাহিকতার উপরই যে কোনো জাতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই জাতিকে একটি পরস্পর সংলগ্ন শৃংখলের সাথেও তুলনা করা যেতে পারে। যদি এই জাতীয় শৃংখলের একটি ক্ষুদ্রতম অংশও জীর্ণ হয়ে যায়, তবে গোটা জাতির ভিত্তিমূলে শিথিল হয়ে পড়বে। তাই, তারা প্রত্যেকটি মানুষের বাঁচার প্রশ্নটা বড় করে ভাবে এবং তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও তদনুযায়ী নীতি হিসাবে গড়ে উঠতে থাকে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠেনি। যার ফলে, এদেশের মানুষেরা যেন স্বার্থান্ধ ও আত্মপরায়ণ হয়ে উঠেছে। এই আত্মপরায়ণতার বলেই এদেশে ধনী শ্রেণী দেশের সম্পদ ও বৈভবকে নিজেদের আয়ত্তে রেখে দেশের বিরাট জনশক্তিকে নিঃস্ব করে রাখার চেষ্টায় সদা সচেষ্ট। এ অবস্থা কোনো দেশের পক্ষেই মঙ্গলময় অবস্থা বলে মনে হয় না।

১৯·৪২· এরপর অর্থনীতি ক্ষেত্রে আমাদের আভিজাত্যবোধের প্রভাবের কথা বলতে হয়। এটা আমাদের দেশের অর্থনীতি ক্ষেত্রে ভয়াবহ মূর্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। মিথ্যা আত্মম্ভরিতা নিয়ে অনেক শিক্ষিত যুবক তাদের সংস্কার পরিপন্থী কোনো কাজ করতে নারাজ। তাই ক্রমান্বয়ে দেশে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত যুবক মাত্রই চাকুরির পেছনে ছুটে চলেছে।

১৯·৪৩· এ সমস্ত ছাড়াও বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অবনতি এবং দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ। সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্বের নানাবিধ জটিলতা ও অর্থনৈতিক মন্দা আমাদের দেশেও বর্তমান।

১৯·৪৪· আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই বেকার সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের শিক্ষার এমনি ব্যবস্থা যে, আমাদের দেশের শিক্ষিত যুবকেরা স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হয়ে প্রায় ক্ষেত্রেই সরাসরিভাবে সত্যিকারের কাজের উপযুক্ত হয় না। তাই আমাদের ছাত্র সমাজের শিক্ষা সমাপনের পর কাজের অভাবেও চাকুরিবিহীন অবস্থায় বেকার থাকতে হচ্ছে। একদিকে দ্বিগুণ-তিনগুণ সময় ব্যয়িত হচ্ছে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া সমাপ্ত করে ডিগ্রী নিয়ে বেরোতে—অন্যদিকে পাশ করে বা ডিগ্রী নিয়ে বের হয়েও বছরের পর বছর বেকার থাকতে হচ্ছে। শিক্ষিত যুবকেরা এতে যে শুধু হতাশা ও নিরাশায় ভুগছে তা নয়, বয়স বৃদ্ধির জন্য বহু ক্ষেত্রে চাকুরির যোগ্যতা হারিয়ে অভিভাবক, সমাজ ও দেশের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ছাত্র সমাজের উপর এর প্রতিক্রিয়া ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে।

১৯·৪৫· উপার্জনের জন্য আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন করে অর্থকরী শিক্ষার প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। ইদানীং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ 'বিকল্প' কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবকদের মাঝে শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করতে যে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে, তা দেশে শিক্ষিত বেকার সমস্যা সমাধানের একটি উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তদুপরি বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে তাদের মনোভাবের ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনও করতে হবে। যা কিছু বলি না কেন, যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত যুবকদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন সাধিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত জাতির অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এই অভিশাপের হাত থেকে রক্ষা আমাদের করতে হবে। বিশেষ করে দেশের যাঁরা কর্ণধার, সমাজপতি বিত্তশালী ও বুদ্ধিজীবী তাঁদেরই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

১৯·৪৬· এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। নানা কারণে সরকারী চাকুরিতে অনেক পদ খালি থাকে, বর্তমানেও আছে। জরিপ করলে প্রতীয়মান হবে যে, গড়ে শতকরা ২৫টি অর্থাৎ মোট সরকারী চাকুরির পদ সংখ্যার এক চতুর্থাংশ পদ গড়ে শূন্য থাকে। তদুপরি গত তিন বছর থেকে ক্যাডার পদগুলি ছাড়া এবং বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে অন্য কোনো পদ পূরণ করা যাবে না বলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। অন্যদিকে কমিশনের মাধ্যমে পদ পূরণ করতে এক থেকে দু'বছর সময়ের মত প্রয়োজন হয়। ফলে আমাদের শিক্ষিত তরুণ সমাজের জন্য সরকারী চাকুরির দরজাও আপাতত প্রায় বন্ধ বলা চলে। এতে তাদের হতাশা আরো বেড়ে চলেছে এবং অনেকের চাকুরির বয়ঃসীমা পার হয়ে যাচ্ছে।

১৯·৪৭· চাকুরির ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বর্তমানে সরকারী চাকুরিতে সরাসরিভাবে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ২৭ বছর। এই বয়ঃসীমা ক্যাডার সার্ভিস এবং নন-ক্যাডার সার্ভিস উভয়ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য মুক্তিযোদ্ধাদের বেলায় ৩২ বছর এবং মহিলাদের বেলায় ৩০ বছর পর্যন্ত ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমায় নির্দিষ্ট আছে। উপজাতীয় পশ্চাৎপদ গোষ্ঠীর প্রার্থীদের জন্য ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। ত্রিশটি ক্যাডারের মধ্যে দু'টি ক্যাডার—এডুকেশন ক্যাডার ও জুডিশিয়াল ক্যাডারের জন্য প্রার্থীদের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩০ বছর। অতএব দেখা যাচ্ছে, মোটামুটিভাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের জন্য প্রার্থীদের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ২৭ বছর।

১৯·৪৮· সাধারণত একজন প্রার্থীকে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের জন্য তিনবার সুযোগ দেয়ার অর্থাৎ তিনটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেয়ার একটা প্রথা প্রচলিত ছিল। এই প্রথানুসারে এখন ২৫, ২৬, ২৭ বছর—এ তিন বছরে একজন প্রার্থীর সে সুযোগ নিতে হয়। সেশন জট, পরীক্ষা পিছানো, অনিয়মিত ছুটি প্রভৃতি কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত যুবকদের পাশ করে ডিগ্রী নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হতেই উপরোক্ত বয়ঃসীমা পার হয়ে যায়। ফলে তারা এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে না।

১৯·৪৯· অন্যদিকে ২৭ বছর থেকে ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৫ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করলে শুধু যে যাদের সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের বয়স পার হয়ে যাচ্ছে তাদের সুযোগ দেয়া হবে তা নয়, প্রকৃতপক্ষে অধিকতর উপযুক্ত যোগ্য ব্যক্তিকে সরকারী চাকুরিতে নিয়োজিত করা সম্ভব হবে। এডুকেশন ক্যাডার ও জুডিশিয়াল ক্যাডারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য ব্যক্তি ২৭ বছর বয়ঃসীমায় না পাবার কারণে এ ক্যাডারগুলির জন্য ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩০ বছর নির্ধারিত হয়েছে। অথচ যখন সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৫ ছিল, তখনো উপরোক্ত দু'টি সার্ভিসে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারিত ছিল ৩৫ বছর।

১৯·৫০· উপরের বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের অভিমত হল যে, আগামী ৫ বছরের জন্য সরাসরিভাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা বর্তমান ২৭ বছর থেকে সকলের জন্য ৩২ বছরে বর্ধিত করা হোক এবং এডুকেশন ও জুডিশিয়াল ক্যাডারে পূর্বের মত ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩৫ বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হোক। ৫ বছর পরে তখনকার অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে সম্ভব হলে তার পরের ৫ বছরের জন্য উপরিউক্ত ৩২ বছরের স্থলে সরাসরিভাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩০ বছরে নির্ধারণ করা যেতে পারে। অবশ্য এডুকেশন ক্যাডার ও জুডিশিয়াল ক্যাডারের জন্য ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩৫ বছর বলবৎ থাকবে। আগামী ১০ বছরের পরে পর্যালোচনা করে দেখা যাবে উপরে সুপারিশকৃত ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩০ বছর থেকে কমিয়ে ২৭ বছরে নির্ধারণ করা যায় কিনা।

১৯·৫১· প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই উপমহাদেশ বিভাগের পূর্বে সরাসরিভাবে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের জন্য যে সকল ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারিত ছিল তা দেশ বিভাগের পর সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে একাধিকবার প্রয়োজনে পরিবর্তন করে বর্ধিত করা হয়েছে। অতি

সাম্প্রতিককালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫০ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমা নির্ধারণ করে বি, সি, এস, প্রশাসনিক ক্যাডারে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে ৬৫০ জনকে নিয়োগ দান করেছে।

১৯·৫২· এও উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে সরকারী চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের বয়স ৫৭ বছর। আর ২৫ বছর চাকুরির পর একজন সরকারী চাকুরে পুরো অবসর ভাতার যোগ্য বিবেচিত হন। সুতরাং সরকারী চাকুরিতে সরাসরিভাবে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩২ বছরে নির্ধারিত হলেও একজন সরকারী চাকুরের পুরো অবসর ভাতা পেতে অসুবিধা হবে না।

১৯·৫৩· সরকারী চাকুরিতে প্রবেশের ঊর্ধ্ব বয়ঃসীমা নির্ধারণের ব্যাপারে সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা করবেন বলে আমরা আশা করি।

১৯·৫৪· **সুপারিশ**

(১) ছাত্র ভর্তি সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, শিফট প্রথা চালু ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত 'স্কুল এলাকা'-এর ন্যায় আমাদের দেশে শিক্ষা এলাকা নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ বাড়ি বা বাসস্থানের নিকটে স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। প্রত্যেক অঞ্চলে যাতে উন্নত মানের স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সাহায্য ও সহযোগিতা করার প্রয়োজন হবে।

(২) জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে একই পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই ভর্তি নীতি অনুসরণ করতে হবে।

(৩) শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন, প্রতিভা ও আগ্রহ, বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তর থেকে বৃত্তিমূলক ও তারপর থেকে বহুমুখী শিক্ষাক্রমের ব্যবস্থা রাখা দরকার।

(৪) শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধানের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বেতনের মধ্যে সমতা বিধানের বিষয় বিবেচনা করা দরকার। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান যাতে বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীরা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মতই শিক্ষার সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৫) সকল শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায্য মূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

(৬) মেধাবী শিক্ষার্থীর জন্য বর্ধিত হারে অধিক সংখ্যক বৃত্তি প্রদান করতে হবে। বৃত্তি নিয়মিত ও সময় মত প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

(৭) মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় আবাসিক ব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

(৮) ছাত্রাবাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গনে থাকতে হবে এবং যোগ্য ও উৎসাহী শিক্ষকগণ তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

(৯) শিক্ষার্থীরা যাতে মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে সেজন্য শিক্ষাঙ্গনকে সর্বপ্রকার বিশৃংখলা ও অনিয়মানুবর্তিতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাবক, সরকার অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থেকে উদ্যোগ নিতে হবে।

(১০) পরীক্ষার তারিখ শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই জানিয়ে দিতে হবে এবং সাময়িক পরীক্ষা ও টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক এবং আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১১) শিক্ষার্থীর সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শ দান কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

(১২) বিভিন্ন সেবামূলক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের সুযোগের ব্যবস্থা রাখতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্কাউট, গার্ল গাইড ইত্যাদির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। জাতীয় ক্যাডেট কোরকে উৎসাহিত করতে হবে।

(১৩) প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত রেকর্ড রাখতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সরকারের জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা সকল বিদ্যালয়ে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কলেজ স্তরে ডাক্তার রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র থাকবে।

(১৪) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সহপাঠক্রমিক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

(১৫) শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সরকারী চাকুরির উর্ধ্ব বয়ঃসীমা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

অধ্যায় ২০

শিক্ষক প্রসঙ্গ

শিক্ষকদের ভূমিকা

২০.১. শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক। শিক্ষক হলেন শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রাণশক্তি এবং সমগ্র শিক্ষা নির্ভর করে তাঁর মান, নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার উপর। কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাই শিক্ষকের চেয়ে উত্তম নয়—কথাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। শিক্ষার প্রতিটি স্তরে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশায় নিয়োগ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে তাঁদের যথাযথ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা, শিক্ষা-সংস্কার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ করার প্রধান শর্ত বলে আমরা বিবেচনা করি।

২০.২. শিক্ষার মান শিক্ষকদের মানের উপর নির্ভরশীল। আমাদের শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষার যে মান আমরা আশা করি, তা থেকে তাঁরা যত নিচে থাকবেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে তত পশ্চাতে পড়ে থাকবে। এ ক্ষেত্রে মান বলতে আমরা উচ্চ শিক্ষা-গত যোগ্যতা ছাড়াও আরো অনেক কিছু বুঝি। শিক্ষকদের নিজ পেশা ও জাতির প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সুউচ্চ ধারণা, গঠনমূলক কাজে সহায়তার ইচ্ছা, স্বীয় পারিপার্শ্বিকতায় সহজলভ্য বস্তুনিচয় ও তাদের সাহায্যে শিক্ষাদানের সংকল্প এবং পেশাগত উচ্চ নীতিজ্ঞান ও সম্মানবোধ ইত্যাদির অধিকারী হওয়া উচিত। যদি আমরা শিক্ষকদের গুরুত্ব স্বীকার করি, তবে শিক্ষকদের পক্ষে উপরোক্ত গুণাবলীর গুরুত্ব যথাথ ভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

শিক্ষকদের দায়িত্ব

২০.৩. শিক্ষকদের নিকট জাতি ন্যায়সঙ্গতভাবে অনেক কিছু আশা করে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা, তাদের মধ্যে শ্রমশীলতা, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের অভ্যাস গঠন করা এবং অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা শিক্ষকদের প্রাথমিক কাজ। স্বীয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষকগণ এসব কাজ করতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কিভাবে সময় অতিবাহিত করবে তা শিক্ষকদের নিজেদের সময় যাপনের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

২০.৪. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণ যোগ্যতা ও কৃতিত্ব সহকারে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজে নির্দিষ্ট সময় নিয়োগ করবেন। শিক্ষকদের উপর যে কাজ ন্যস্ত হবে, শিক্ষাদান, অনুশীলনী তৈরি, শিক্ষার্থীদের পরিচালনার এবং পাঠ্য-তালিকা বহির্ভূত কাজ তার অন্তর্ভুক্ত হবে। বিভিন্ন অন্তঃপরীক্ষা, শ্রেণীর কাজ, টিউটোরিয়াল, খেলাধুলা ইত্যাদিতে এবং বিদ্যালয় জীবনের নানা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষকগণ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

২০.৫. শিক্ষকগণ সর্বাধুনিক শিক্ষা সরঞ্জাম ও পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত থাকবেন। বিদ্যা-লয়ের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ গ্রহণ এবং শিক্ষার ক্রমাগত উন্নতির জন্য শিক্ষকদের কাজ করে যেতে হবে। কায়িক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে, যেমন-বাগানের কাজ, হাতের কাজ, বিদ্যা-লয়ে পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকগণকে উদাহরণ স্থাপন করতে হবে।

২০.৬. বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের সমস্যা আছে এবং সে সব অসুবিধা উপলব্ধি ও অপসারণে সাহায্য করা শিক্ষকদের কর্তব্য। শিক্ষকদের আচরণ যাতে নিজেদের উপদেশাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রাখে সে বিষয়ে তাঁদের সতর্ক থাকতে হবে।

২০.৭. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকদের সময়ের একটি বৃহৎ অংশ বাড়ির কাজে ও টিউটোরিয়ালের কাজে ব্যয়িত হওয়া উচিত। টিউটোরিয়ালের সাহায্যে একজন শিক্ষার্থী যাতে মত বিনিময়ের মাধ্যমে তার মনকে সুস্পষ্ট করে তুলতে পারে এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও আকর্ষণ নিয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

২০.৮. শিক্ষকদের অধ্যাপনা যাতে নৈর্ব্যক্তিক ও গতানুগতিক রুটিনে পর্যবসিত না হয়, তাঁরা অধ্যাপনায় যাতে তাঁদের সময় ও যোগ্যতা পূর্ণরূপে নিয়োগ করেন এবং তাঁদের অধ্যাপনা যাতে আনন্দদায়ক ও লাভজনক অনুসন্ধান কার্য হয়, সে বিষয়ে নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য কার্য তালিকা সম্বলিত তফসিল থাকা দরকার। একজন শিক্ষক এক শিক্ষা বছরে বিভিন্ন কর্তব্যে কতখানি সময় ব্যয় করবেন, তফসিলে সে সম্পর্কে বিধান থাকবে।

২০.৯. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ যত দীর্ঘ সময় শিক্ষাঙ্গনে থাকবেন ততই মঙ্গল। এর ফলে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘতর সময়ের জন্য শিক্ষকদের কাছে পাবে এবং শিক্ষকগণও অভিনিবেশ সহকারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পারবেন। প্রত্যেক শিক্ষককে তাঁর ব্যক্তিগত বা শিক্ষায়তনের পাঠাগারে পড়াশোনা করে দৈনিক যতটা সময় দেয়া সম্ভব তা ব্যয় করা উচিত।

২০.১০. কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকের তৎপরতা ও শিক্ষাদানের শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য গবেষণার প্রয়োজন। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অবশ্য গবেষণার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, কেননা সেখানে গবেষণা ব্যতীত জ্ঞানের সত্যিকার প্রসার সম্ভব নয়। সুতরাং গবেষণা বিষয়ে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সচেষ্ট হতে হবে।

২০.১১. শিক্ষকদের স্বাধীনতার আদর্শের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা পোষণ করেও বলতে হয় যে, শিক্ষার দায়িত্ব পালনে আদর্শের প্রতি জোর দিলেই সর্বোত্তমভাবে শিক্ষাগত স্বাধীনতা সংরক্ষিত হতে পারে। শিক্ষকেরা শিক্ষাগত কাজ করার ব্যাপারে স্বাধীন, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব থেকে রেহাই পেতে পারেন। তাঁদের সামাজিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা অবমাননা করার অধিকার তাঁরা লাভ করতে পারেন না।

২০.১২. বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দের নিকট থেকে আমরা পেশাগত যোগ্যতা এবং বর্তমান অপেক্ষা কঠোরতর পরিশ্রম আশা করছি। অতএব তাঁদের এমন সুযোগ দিতে হবে যাতে তাঁরা ন্যায়সঙ্গতভাবে সন্তুষ্ট থাকেন।

সুষ্ঠু পরিবেশ ও শৃংখলা সৃষ্টিতে শিক্ষকদের দায়িত্ব

২০.১৩. শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি এবং শৃংখলা রক্ষার সাবিক দায়িত্ব শিক্ষক সমাজের। শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম কল্যাণ সাধনে ব্রতী—এ কথা শিক্ষার্থীদের উপলব্ধি করাতে পারলেই তারা শিক্ষকদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আন্তরিক হয়। এর জন্য শিক্ষককে সময়ানুবর্তিতা, আন্তরিকতা ও উৎসাহ সহকারে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। শিক্ষকদের শুধু নির্ধারিত পাঠ্যসূচীর মধ্যে দৃষ্টিসীমাবদ্ধ রাখলেই চলবে না, শিক্ষাঙ্গনে সবদিকে দৃষ্টি

প্রসারিত রাখতে হবে। যথাসময়ে পাঠ্যবিষয় পড়িয়ে শেষ করা, সহপাঠক্রমিক বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ব্যাপকভাবে জড়িত করা, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকা, সর্বক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিক্ষকগণের বিশেষ তৎপর হতে হবে।

২০.১৪. সুশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য শিক্ষকগণ ছাত্র সমাজকে লেখাপড়ায় ব্যস্ত রাখবেন। টিউটোরিয়াল কাজ, বাড়ির কাজ, সাংস্কৃতিক কার্যাবলী ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ব্যাপৃত রাখতে হবে। শ্রেণীকক্ষ শিক্ষকহীন রাখা যাবে না এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা থাকাকালীন শিক্ষকগণকে সর্বাধিক সময় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডে শিক্ষার্থীদের সাথে জড়িত থাকতে হবে। পরীক্ষা গ্রহণ নিয়মিত করতে হবে।

২০.১৫. শিক্ষকগণ উপদেষ্টা হিসাবে ছাত্র সংসদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকবেন। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত চালচলন ও আচার-আচরণ যাতে মার্জিত হয়, সে ব্যাপারে শিক্ষকগণ লক্ষ্য রাখবেন। অবসর সময় গ্রন্থাগারে অতিবাহিত করার বিষয়ে শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। মাঝে মাঝে সেবামূলক কাজে শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করে শিক্ষকগণ প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের যত্নশীল করবেন।

২০.১৬. শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষকগণ বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবেন। পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ায় যোগ্যতাসূচক উপস্থিতির হার সম্পর্কিত প্রচলিত নিয়ম অবশ্যই মানতে হবে। শিক্ষকগণ ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের বসবাস এলাকার শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর রাখবেন এবং অভিভাবকগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীরা যাতে নিয়মিত ভাবে লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয় অভিভাবকগণকেও সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রগ্রেস রিপোর্ট অভিভাবকদের কাছে পাঠাবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানাবেন।

২০.১৭. শ্রেণীকক্ষের শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং গৃহশিক্ষকতা নিরুৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারের জন্য যোগ্যতর শিক্ষকগণকে বারবার বদলি না করে একই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন কর্মরত রাখা বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণা কর্ম

২০.১৮. আমাদের ঈপ্সিত শিক্ষা ব্যবস্থা সফল করার জন্য শিক্ষকতায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেশাগত উৎকর্ষের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়া দরকার। শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ আমরা করেছি। এই পেশায় আগ্রহী এবং এই পেশায় কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ পেশাগত দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করবে।

২০.১৯. শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে এখন পর্যন্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণের কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে সে ব্যবস্থারও উন্নতি দরকার। আমরা মনে করি, শিক্ষার প্রত্যেকটি পর্যায়ে প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা ও মেধাই যথার্থ ও উপযুক্ত শিক্ষকতার একমাত্র মাপকাঠি নয়, বরং প্রত্যেক শিক্ষকের পেশাগত উচ্চ নীতিজ্ঞান ও সম্মানবোধ এবং নিজ পেশা ও শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা ইত্যাদির অধিকারী হওয়া উচিত।

২০.২০. বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের আগে শিক্ষকতা পেশা সম্বন্ধে তাঁদের উপযুক্ত ধারণা প্রদান এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দানের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষকরা যে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করেন সেই বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য এই পেশা সম্বন্ধে প্রাক-কর্মকালীন ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের মনোভাব অনুধাবন ও উপলব্ধি করার শক্তি তাঁদের থাকা দরকার। শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রবণতা সম্বন্ধে তাঁদের অবহিত হতে হবে। প্রশিক্ষণের সাহায্যে শিক্ষকদের এই বিষয়ে সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলা সম্ভব।

২০.২১. শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের মান উন্নত করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দানের প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা উচ্চ মানের হওয়া উচিত। শিক্ষক-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক তৈরির জন্য আমরা মনে করি যে:

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রতিষ্ঠিত পি, টি, আই, সমূহ এবং প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের লক্ষ্যে ময়মনসিংহস্থ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর (নেইপ) কর্মরাও আরো জোরদার করা দরকার। দেশে এই জাতীয় প্রশিক্ষক তৈরির একটি প্রতিষ্ঠানই যথেষ্ট নয়, অবশিষ্ট তিনটি বিভাগের প্রতি বিভাগে আরো একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা দরকার। ঐ সব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষকগণ সময়ে সময়ে বিভিন্ন পি, টি, আই, তে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষকদের পাঠদানের মান পরীক্ষা করে দেখবেন।

(২) দেশে ৫৩টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে দেশের ৪৪ হাজারের উপর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক লাখ একানব্বই হাজারের মত শিক্ষকের সবাইকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রশিক্ষণহীন কেউ যাতে প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত না থাকেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

(৩) কর্মরত অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাতে নিয়মিত রিফ্রেশার্স বা সঞ্জীবনী কোর্সে প্রশিক্ষণ লাভ করেন সে বিষয়েও ব্যবস্থা থাকা উচিত। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে অবহিত শিক্ষাবিদ ও প্রবীণ শিক্ষকগণ প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে উপযুক্ত পরামর্শ দিতে পারেন।

২০.২২. মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের প্রাক-কর্মকালীন ও কর্মকালীন প্রশিক্ষণের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের জন্য ১০টি শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় যথেষ্ট নয়। এই ১০টি মহাবিদ্যালয়ে বছরে তিন হাজার পাঁচশ শিক্ষার্থী এবং ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত বাউড বা দূরশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে দুই বছরের কোর্সে তিন হাজার পাঁচশত শিক্ষার্থীর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সংখ্যা আশু বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব নয়। আমরা মনে করি যে, পি,টি,আই,-এর মধ্যে উন্নত কয়েকটিকে পর্যায়ক্রমে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে উন্নীত করা উচিত। এই সব প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদান অব্যাহত থাকবে, সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও প্রবর্তন করা যেতে পারে। পি,টি,আই-সমূহের এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করলে প্রশিক্ষণার্থীদের স্থানাভাব ঘটবে না। কারণ প্রায় প্রত্যেকটি পি,টি,আইতে উচ্চতর কোর্স প্রবর্তনের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। ময়মনসিংহ মহিলা শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে মাধ্যমিক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মহিলা প্রাথমিক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত। সুতরাং একই প্রতিষ্ঠানে উভয় স্তরের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব এবং প্রকৃতপক্ষে উচিত।

২০.২৩. মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রাক-কর্মকালীন প্রশিক্ষণের সঙ্গে কর্মকালীন প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স বা সঞ্জীবনী কোর্স প্রচলন করা দরকার। এই প্রশিক্ষণ নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ব বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গবেষণালব্ধ তথ্য সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত থাকা দরকার। দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ও বয়ঃসন্ধির কারণে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ অনেক সময় উচ্ছৃংখল ও বেপরোয়া হয়ে ওঠে। শিক্ষার্থীদের এই মনোভাবের কারণ সম্বন্ধে গভীরভাবে অনুসন্ধান এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে না পারলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষাদান সম্ভব নয়। কেবল কড়া শাসন ও পাঠ্যসূচীর পরিমাণ বৃদ্ধি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলা দুরূহ ব্যাপার। তাদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে গভীর ধারণা পোষণ করার উদ্দেশ্যে কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

২০.২৪. সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারভুক্ত করার পর বি,সি,এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সরকারী কলেজ শিক্ষক পদে চাকুরির জন্য মনোনীত প্রার্থীর তিন মাসের একটি প্রশিক্ষণ কোর্স নিয়েয়ারে প্রচলিত হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় সরকারী ও বেসরকারী কলেজের সকল শিক্ষকের প্রাক-কর্মকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। স্বাধীনতার পর অপরিকল্পিতভাবে অনেক কলেজ গড়ে উঠেছে এবং একই ভাবে অনেক কলেজ সরকারীকরণ করা হয়েছে। এসব কলেজের শিক্ষাদানের মান উন্নয়ন করার প্রয়োজনে কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

২০.২৫. সাম্প্রতিক কালে কলেজসমূহে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি অমনোযোগিতা ও উচ্ছৃংখলতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ অধিকাংশ ক্ষেত্রে লোপ পেতে বসেছে। আমরা মনে করি যে, শিক্ষকগণ এই বিষয়ে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করা শিক্ষকদের প্রধান কর্তব্য। কেবল নিজেদের বিষয়ে দক্ষতাই কাউকে সফল শিক্ষকে পরিণত করতে পারে না। শিক্ষাদানে তাঁর দক্ষতা, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শ্রদ্ধা লাভ করা, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার ক্ষমতা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের তিনি যেমন পাঠদান করতে সমর্থ হন তেমনি শিক্ষা ও শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি করতে পারেন। শিক্ষার প্রতি এই শ্রদ্ধা শিক্ষার্থীকে নিজের দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলে এবং দেশ, সমাজ ও জাতির প্রতি তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে তাকে উদ্বুদ্ধ করে। কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাঁদের এরূপ আদর্শ শিক্ষকে পরিণত করা সম্ভব।

২০.২৬. নিয়েয়ারে কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা অপ্রতুল। পর্যায়-ক্রমে দেশের বিভাগীয় শহরগুলিতে নিয়েয়ারের আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। শুধু প্রাক-কর্মকালীন প্রশিক্ষণ নয়, কলেজ শিক্ষকদের জন্য কর্মকালীন সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত। উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রায়ই নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে। কলেজ শিক্ষকগণ এসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিজেদের সমস্যা নিয়ে ব্যাপক ও বিস্তৃত আলোচনার সাহায্যেও সমাধানের পথ অনুসন্ধান করতে পারবেন।

২০.২৭. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আমাদের দেশের উচ্চতম শিক্ষাদানকেন্দ্র। আমরা মনে করি যে, শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতি ঘটার পরেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আশানুরূপ পরিমাণে না হলেও যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থীর মধ্যে সত্যিকার জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানলাভের জন্য উদ্যোগ বিদ্যমান রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষাদানের সামগ্রিক মান আশানুরূপ সন্তোষজনক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। এ কথা সত্যি যে, স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় সাফল্যের উচ্চমানের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পরীক্ষায় সাফল্য বা নিজের বিষয়ে

গভীর জ্ঞানই শিক্ষকতা পেশায় সাফল্যের একমাত্র মাপকাঠি নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সাম্প্রতিক কালে যে ছাত্র-অসন্তোষ ও বিশৃংখলা দেখা যাচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবেশ তার কারণ। দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে গভীর ও স্পষ্ট ধারণা এবং এর কারণগুলি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত থাকলে শিক্ষার্থীগণ কেবল উচ্ছৃংখল না হয়ে গঠনমূলক উপায়ে এর সমাধান অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২০.২৮. শ্রেণীকক্ষে আকর্ষণীয় ও জ্ঞানগর্ভ পাঠদানের সাহায্যেই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগী করে তোলা যায়। নিজের বিষয়কে যথার্থ প্রেক্ষিতে তুলে ধরার মাধ্যমে শিক্ষকগণ উচ্চশিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের নিবেদিতপ্রাণ করে তুলতে পারেন। এর ফলে শিক্ষার্থীগণ নিজের বিষয়ে যথোচিত জ্ঞানলাভ করতে পারবে, বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠবে এবং সর্বোপরি দেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষিতে নিজেদের পঠিত বিষয় থেকে লব্ধ জ্ঞান প্রয়োগ করতে অনুপ্রাণিত বোধ করবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রধানত পাশ্চাত্যের মনীষীদের লব্ধ জ্ঞানই বেশি শিক্ষা দেয়া হয়। জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় পাশ্চাত্যের দেশগুলি উন্নত বলে আমাদের আরো দীর্ঘকাল এই শিক্ষা অনুসরণ করতে হবে। জ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো রকম ভৌগোলিক সীমানা থাকাও উচিত নয়। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের যে কোনো ধরনের শিক্ষাদান করা কালে আমাদের নিজস্ব সমাজ, রাজনীতি ও ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া দরকার। এসব বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শিক্ষকগণকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা উচিত।

২০.২৯. আমরা মনে করি যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ উচ্চশিক্ষায় নিয়োজিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন। তবে তাঁদের ক্ষেত্রে খণ্ডকালীন সামার ইনস্টিটিউট বা রিফ্রেশার্স কোর্স নিয়মিত চালু করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, আই,এ,এস,টি,টি,-এর বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের জন্য কর্মকাণ্ড জোরদার করা দরকার।

২০.৩০. কৃষি ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের পেশাগত প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে এই রিপোর্টে যা বলা হয়েছে তাঁদের সম্বন্ধেও তা প্রযোজ্য।

২০.৩১. প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষাদানের জন্য দেশে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এর মধ্যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসমূহ, টেক্সটাইল কলেজ, লেদার টেকনোলজি কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানও আই,এ,এন, টি,টি, প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আমাদের মতে এসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মান উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার।

গবেষণা কর্ম

২০.৩২. শিক্ষক প্রশিক্ষণ বা শিক্ষা বিষয়ে আমাদের দেশে গবেষণা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই ক্ষেত্রে গবেষণার পরিমাণ বা মান কোনোটিই সন্তোষজনক নয়। ময়মনসিংহস্থ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানকারীদের শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্মরত শিক্ষকগণও সেখানে উচ্চতর প্রশিক্ষণ নিতে পারেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার বা এই শিক্ষার উন্নয়নকল্পে কোনো গবেষণার সুযোগ সেখানে নেই। প্রাথমিক শিক্ষার যথার্থ বিস্তার ঘটানো অর্থাৎ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে এই বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীকে একটি যথার্থ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা উচিত।

২০.৩৩. মাধ্যমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে গবেষণার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিকে উৎসাহিত করা উচিত। এই সমস্ত মহাবিদ্যালয়ে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের অধিকাংশ কর্মরত মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক। শিক্ষকতায় তাঁদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে প্রাপ্ত শিক্ষার সমন্বয় সাধন করে এই বিষয়ে তাঁরা মৌলিক চিন্তাভাবনা করতে পারেন। অপেক্ষাকৃত মেধাবী শিক্ষার্থীগণ শিক্ষক-শিক্ষণে এক বছরে স্নাতক কোর্স সম্পন্ন করে কোনো বিশেষ বিষয় নিয়ে এম,ফিল, করতে পারেন।

২০.৩৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই,ই,আর, নামক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গবেষণার সুযোগ রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদান ও ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এখানে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা বিষয়ে গবেষণার জন্য ব্যবস্থা করা দরকার।

২০.৩৫. সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক, সমাজ বিজ্ঞান, বিজ্ঞান, বাণিজ্য প্রভৃতি অনুষদের মত শিক্ষা অনুষদ গঠন এবং এই অনুষদে শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষণ সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণার জন্য নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং শিক্ষা বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দার্শনিক ও শিক্ষাবিদের চিন্তাভাবনা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে গবেষণা করবেন। গবেষণা তিন বা ততোধিক বছরের কোর্সে সমাধা হতে পারে এবং উচ্চতর ডিগ্রী পি-এইচ,ডি, দেয়া যেতে পারে। এইরূপ গবেষণার ফলে শিক্ষকতার পেশার সামগ্রিক সম্ভাবনা রয়েছে।

শিক্ষকের মর্যাদা

২০.৩৬. শিক্ষাদান একটি সৃজনশীল কর্ম এবং শিক্ষাদানের মানের উপরেই নির্ভর করে দেশের শিক্ষিত জনসম্পদের গুণাগুণ। এজন্য সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী ও সৃজনশীল ব্যক্তিগণকে শিক্ষকতার সকল স্তরে আকৃষ্ট করা প্রয়োজন।

২০.৩৭. শিক্ষকদের পূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করতে হলে সরকার, শিক্ষা বিভাগ ও সমাজের প্রচেষ্টার প্রয়োজন। আইনের সাহায্যে নয় বরং সরকারের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিক্ষকদের নিজেদেরই এই সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি লাভ করতে হবে। শিক্ষকদের সম্মান ও শ্রদ্ধা নির্ভর করে মূলত শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজেদের শ্রদ্ধার্হ করার এবং সেবা ও নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজে শ্রদ্ধা অর্জনে নিজেদের ক্ষমতার উপর।

২০.৩৮. শিক্ষকদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা দরকার এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রতি বছর বিশেষ উৎসব দিবস উপলক্ষে সে সব পুরস্কার প্রদান করা উচিত। এ সকল শিক্ষকদের কৃতিত্বের বিবরণী সংবাদ পত্র, বেতার ও অন্যান্য মাধ্যমে সাধারণ্যে প্রচার করা উচিত।

২০.৩৯. নতুন সমাজ সৃষ্টির মহৎ দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক সমাজকে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মে যথাযথ অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে এবং তাঁদের যথাযোগ্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করতে হবে।

২০.৪০. রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপ হিসাবে তাঁদের ওয়ারেণ্ট অব প্রিসিডেন্সে যথাযোগ্য স্থান দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে ২৬টি আর্টিকেল রয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয়েছে ১৭নং আর্টিকেলে। আর্টিকেল ১৮ থেকে আর্টিকেল ২৬এ যে কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োজিত ব্যক্তিদের স্থান দেয়া হয়েছে তা তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত নিচে। তদুপরি জাতীয়,

বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে যে সকল সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী ব্যক্তিবর্গকে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে রাখা হয়েছে তার সমতুল্য এমনকি উপরের স্তরে রয়েছেন শিক্ষা ক্ষেত্রের এরকম কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গকেও ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে রাখা হয়নি ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স ১৯৮৬ পর্যালোচনা করলে উপরোক্ত উক্তি সত্যতা ও যথার্থতা প্রমানিত হবে। তাই আমাদের সুপারিশ হল যে, শিক্ষকদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পদক্ষেপ হিসাবে ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে তাঁদের যথাযোগ্য স্থান দেয়া হোক।

২০.৪১. শিক্ষকদের চিন্তা, সৃষ্টি ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ও সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সরকারী দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক, কবি, সাহিত্যিক প্রমুখ সুধীবৃন্দের সৃজনশীল, সাহিত্যধর্মী গবেষণামূলক ও পেশাগত রচনা ও বক্তব্য প্রচারের স্বাধীনতা থাকবে। রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রচার মাধ্যমেও শিক্ষকদের প্রচলিত বিধিনিষেধ থাকবে না। তবে বক্তব্য ও মতামত প্রকাশের জন্য প্রত্যেকেই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

২০.৪২. শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কল্পে সরকারের অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। শিক্ষকরা যাতে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আত্মসম্ভ্রম রক্ষার উপযোগী একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে চলতে পারেন তজ্জন্য তাঁদের উপযুক্ত বেতন দিতে হবে এবং তা জীবন যাত্রার ব্যয়ের ওঠানামার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হতে হবে। শিক্ষকতার পেশাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই যে কোনো বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পেশার অনুরূপ আকর্ষণীয় করতে হবে।

শিক্ষকের চাকুরি ও নিয়োগ বিধি

২০.৪৩. শিক্ষকদের জন্য চাকুরি ও নিয়োগ বিধি প্রণয়ন এবং সময়মত তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন দরকার। আমরা এই মত পোষণ করি যে, শিক্ষক সম্পর্কিত ইউনেস্কো এবং আই, এল,ও,-এর সুপারিশের আলোকে শিক্ষকদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্যস্ত চাকুরি ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবয়ন দরকার।

২০.৪৪. ১৯৮৩ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৬ সালে সংশোধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগ বিধিতে এই স্তরের শিক্ষকদের জন্য একেবারে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হলেও মোটামুটিভাবে আপ-টু-ডেট নিয়োগ বিধি পাওয়া যায়।

২০.৪৫. মাধ্যমিক স্তরের সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট চাকুরি ও নিয়োগ বিধি নেই। ১৯৭০ সালের পূর্বে সময়ে সময়ে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে এই স্তরের শিক্ষকদের জন্য চাকুরি ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন করে প্রচলন করা হয়েছিল। ১৯৭০ সালে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন বেতন কাঠামো প্রবর্তনের সময়ে শিক্ষকদের নিয়োগ/যোগ্যতা বিধি তখনকার মত আধুনিক করা হয়েছিল, তবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করা হয়েছিল বলা যায় না। এর পর থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে চাকুরি ও বেতন কাঠামোর পরিবর্তন পর্যন্ত স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট চাকুরি ও নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত করে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি। ১৯৭৫ সালে সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের চাকুরি ও নিয়োগ বিধি পাবলিক সার্ভিস কমিশন পর্যায়ে চূড়ান্ত হয়েও শেষ পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে চূড়ান্তরূপ ধারণ করেনি। ক্যাডার সার্ভিস গঠনের পর আবার নতুন ভাবে চাকুরি ও নিয়োগ বিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং পুনরায় পাবলিক সার্ভিস কমিশন পর্যায়ে চূড়ান্ত হয়েও সরকারী পর্যায়ে নিয়োগ বিধি চূড়ান্ত করার অপেক্ষায় রয়েছে। ফলে মাধ্যমিক স্তরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের পদোন্নতি ইত্যাদি ব্যাপারে বিরাট সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে।

২০.৪৬. মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহ ১৯৬১ সালের ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্সের বলে ১৯৭৯ সালে টার্মস এণ্ড কণ্ডিশনস অব সার্ভিস রেগুলেশনস এর মাধ্যমে এই স্তরের বেসরকারী শিক্ষকদের যোগ্যতা, নিয়োগ ও চাকুরি বিধি জারি করেছিল। বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির শিক্ষকদের ব্যাপারেও চাকুরি-নিয়োগবিধি ঐ সময়ে জারি করা হয়েছিল। এই বিধিগুলিকে স্বয়ং-সম্পূর্ণ বলা যায় না। সেগুলিকেও আপ-টু-ডেট করা হয়নি।

২০.৪৭. কলেজ স্তরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত যোগ্যতা ও নিয়োগবিধি অন্যান্য কারণ ছাড়াও ১৯৮০ সালে ইউনিফায়েড ক্যাডার সার্ভিস গঠনের ফলে কার্যকারিতা হারিয়েছে। ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষা বিভাগের অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তা, যাঁদের ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের বেলায়ও ১৯৭০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত যোগ্যতা ও নিয়োগ বিধির কার্যকারিতা এখন নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালে নিয়োগ বিধি সংশোধিত আকারে পাবলিক সার্ভিস কমিশন পর্যায়ে চূড়ান্ত করার পরও শেষ পর্যন্ত সরকারী পর্যায়ে চূড়ান্ত হয়ে বিজ্ঞাপিত হয়নি। বিজ্ঞাপিত হলেও ইউনিফায়েড ক্যাডার সার্ভিস গঠনের পর তার কার্যকারিতা থাকত না।

২০.৪৮. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের জন্য ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার একটি নিয়োগ বিধি জারি করে। বি,সি,এস-এর অন্যান্য ক্যাডারের মত বি,সি,এস, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারেও প্রাথমিক পদসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রভাষক পদগুলিতে নিয়োগের জন্য ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারিত হয় ২য় শ্রেণীর অনার্সসহ ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী অথবা ১ম শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী। এই ন্যূনতম যোগ্যতাসহ বি,সি, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই প্রভাষক হিসাবে নিয়োগ করা হচ্ছে।

২০.৪৯: বাংলাদেশ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারীকরণ অব্যাহত রেখেছে। কলেজ সরকারীকরণের সময় কর্মরত শিক্ষকদের ১৯৮১ সালের নিয়োগবিধি অনুসারে সরকারী চাকুরিতে আত্তীকরণ করা হচ্ছে। কর্মরত শিক্ষকদের কলেজটি সরকারীকরণের পূর্বের চাকুরির ৫০% এবং ক্ষেত্র বিশেষে ১০০% ইফেকটিভ সার্ভিস হিসাবে গণ্য করে সিনিয়রিটি প্রদান করা হচ্ছে। উক্ত বিধি অনুসারে ন্যূনতম ২য় শ্রেণীর মাস্টার্স ডিগ্রী থাকলে প্রভাষক পদে আত্তীকরণ করা হচ্ছে। আত্তীকৃত শিক্ষকদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে চাকুরি নিয়মিত করার বিধান রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষকদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষকের চাকুরি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অনুমোদন ছাড়াই নিয়মিত করা হয়েছে। পি,এস,সি,ও কেবল চাকুরি সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করেই আত্তীকৃত শিক্ষকদের চাকুরি নিয়মিত করেছে। ফলে একই শিক্ষা ক্যাডারের প্রথম প্রবেশের ক্ষেত্রে দুটি স্বতন্ত্র ধারার সৃষ্টি হয়েছে—একটি ধারা বি,সি,এস পরীক্ষার মাধ্যমে এবং অপরটি আত্তীকরণের মাধ্যমে। একটিতে সরকারী কলেজে যোগদানের তারিখ থেকে সিনিয়রিটি গণনা করা হচ্ছে, অপরটিতে সরকারী কলেজে যোগদানের আগে থেকে সিনিয়রিটি গণনা করা হচ্ছে। ফলে সৃষ্টি হয়েছে স্বার্থের সংঘাত ও নানা জটিলতা।

২০.৫০ তাছাড়া নিয়োগ বিধিতে সহকারী অধ্যাপক ও তার উপরের পদে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগের জন্য শতকরা ২০টি পদ সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং এতে সরাসরি নিয়োগের জন্য সরকার পরবর্তীকালে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এমনকি পদোন্নতির বেলায়ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পরে নির্ধারণ করবে বলে উল্লেখ আছে।

২০.৫১. দীর্ঘ ছয় বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ করে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি। এসব নির্ধারিত না হলেও ১৯৮১ সাল থেকে পদোন্নতি প্রদানের সময় শতকরা ২০টি পদ পদোন্নতির কোটায় খালি পড়ে রয়েছে। স্বয়ং-সম্পূর্ণ নিয়োগ বিধি নেই এই অজুহাতে বর্তমানে প্রায় ৬০০টি সহযোগী অধ্যাপকের পদ এবং ১১২টি অধ্যাপকের পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।

২০.৫২. গত কয়েক বছরে বিপুল সংখ্যক কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুল সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া জাতীয়করণ/সরকারীকরণ করার ফলে সুষ্ঠু নিয়োগ ও চাকুরিবিধি, জ্যেষ্ঠতা বিধি প্রচলন এবং পদোন্নতি ইত্যাদি বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। জাতীয়কৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ, চাকরি ইত্যাদি বিষয়ে যে নীতিমালা সরকার অনুসরণ করেছে তা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী এবং নিয়োগনীতি ও চাকুরি বিধির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে নিয়োগ ও চাকরিবিধি, জ্যেষ্ঠত্ববিধি, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি এবং নৈরাজ্য বিরাজ করছে। স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং শিক্ষা কর্মকর্তাদের মধ্যে এসব কারণে অসন্তোষ, হতাশা ও অনিশ্চয়তা শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান বিরাজমান অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতির জন্য বহুলাংশে দায়ী।

২০.৫৩. স্বাধীনতালাভের পর বিপুল সংখ্যক শিক্ষক পদে এডহক ভিত্তিতে নিয়োগের দরুন নিয়োগ ও চাকুরি বিধিতে জ্যেষ্ঠত্বের বেলায় এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করেছে যার সমাধান দুরূহ হয়ে পড়েছে। মুজিব নগরে নিযুক্ত শিক্ষা কর্মকর্তা ও শিক্ষক-বৃন্দের সমস্যাবলী জটিলতা বৃদ্ধি করেছে।

২০.৫৪. কলেজ স্তরের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি প্রণয়ন করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের। এই ব্যাপারে দেশের বেসরকারী কলেজগুলির ক্ষেত্রে অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ তাদের দায়িত্ব সন্তোষজনক ভাবে পালন করেছে বলে প্রতীয়মান হয় না। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের নিয়োগ ও চাকুরি বিধির যে সকল বিধি প্রণয়নপূর্বক প্রচলন করেছে তা অত্যন্ত সীমিত। স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং বিস্তারিত নিয়োগ ও চাকুরিবিধির ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

২০.৫৫. বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি সম্পর্কেও উল্লেখের অবকাশ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চাকুরি ও নিয়োগ বিধিও সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট নয়। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহ মোটামুটিভাবে অভিন্ন নিয়োগ ও চাকুরিবিধি অনুসরণ করলেও বিধিসমূহ স্বয়ং-সম্পূর্ণ না হওয়াতে বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সময়ে সময়ে ভিন্নতা এসে পড়ছে। তদুপরি বিধি আপ টু-ডেট নয় বলে দেশের, বিশেষ করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যার অবকাশ দেখা দিচ্ছে। সাম্প্রতিককালে পদ উন্নত করে সে পদে নিয়োজিত ব্যক্তিকে পদোন্নতি দেয়ার প্রথা প্রচলন করার কারণে নিয়োগ ও চাকুরি বিধির সম্প্রসারণের প্রয়োজন হয়েছে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের ও কর্মকর্তাদের মৌলিক ন্যূনতম শিক্ষাগত ইত্যাদি যোগ্যতা কি থাকা উচিত সে সম্পর্কে একই ধরনের নীতি নির্ধারণের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে এখনো ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট নিয়োগ ও চাকুরিবিধির অনুপস্থিতির ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচেছ।

২০.৫৬. এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট নিয়োগ ও চাকুরিবিধির প্রণয়ন, প্রচলন ও বাস্তবায়ন যে বিশেষ প্রয়োজন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অতএব সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের কর্তব্য হবে এই ব্যাপারে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

২০.৫৭. প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মধ্যে নিচে উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলিতে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক:

(ক) ১৯৮৩ সালে প্রণীত এবং ১৯৮৬ সালে সংশোধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিয়োগবিধি স্বয়ং-সম্পূর্ণ করতে হবে।

(খ) সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারী কলেজের শিক্ষকবৃন্দ এবং অন্যান্য শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি যাতে ১৯৭০ সালের পরে, বিশেষ করে ক্যাডার সার্ভিস গঠনের পরে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং এখনো রয়েছে এবং যা প্রায় গত এক দশক থেকে চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে সে সব নিয়োগ ও চাকুরিবিধি জরুরী ভিত্তিতে চূড়ান্ত করা উচিত।

(গ) বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি বিস্তারিত-ভাবে প্রণয়ন করে আপ-টু-ডেট করতে হবে। এজন্য দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কাজ ত্বরান্বিত করা যায়। উল্লেখ্য যে, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অধ্যাদেশ যার বলে শিক্ষা বোর্ডসমূহ প্রতিষ্ঠিত তার সংশ্লিষ্ট ধারানুযায়ী এই দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডসমূহের।

(ঘ) বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির শিক্ষকবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি প্রণয়ন, প্রচলন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের। এ স্তরের শিক্ষকবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরিবিধিও বিস্তারিতভাবে প্রণয়ন করে আপ-টু-ডেট করতে হবে। তাই উপরে (গ)-এ বর্ণিত পন্থায় তা ত্বরান্বিত করা যায়। এক্ষেত্রে একটি বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত। সাধারণত ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির অধিকাংশই পর্যায়ক্রমে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হয়। বেসরকারী ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকবৃন্দের চাকুরি ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন, প্রচলন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের। তাই বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলির শিক্ষকবৃন্দের নিয়োগ ও চাকুরিবিধি আপ-টু-ডেট করার সময় অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে আলোচনাক্রমে চূড়ান্ত করলে পরবর্তীতে অসুবিধা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

(ঙ) দেশের বেসরকারী ডিগ্রী কলেজসমূহের শিক্ষকদের চাকুরি ও নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও প্রচলন করার দায়িত্ব অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের। অনুমোদনকারী বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি বেসরকারী ডিগ্রী কলেজগুলির শিক্ষকদের জন্য বিস্তারিত, অভিন্ন এবং আপ-টু-ডেট নিয়োগ ও চাকুরিবিধি প্রণয়ন করে তার প্রয়োগের ব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ত্বরান্বিত করতে পারে।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের মৌলিক ন্যূনতম যোগ্যতা সম্পর্কে একই ধরনের নীতি নির্ধারণ করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়সহ অভিন্ন ও আপ-টু-ডেট নিয়োগ ও চাকুরিবিধি প্রচলন করা প্রয়োজন।

২০.৫৮. সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক, ও শিক্ষা কর্মকর্তা নিয়োগের সময় বর্তমানের নির্ধারিত উর্ধ্ব বয়ঃসীমা বৃদ্ধি করে তা নিয়োগ ও চাকুরিবিধিতে সন্নিবেশিত করার বিষয়টি বিবেচনাযোগ্য। বর্তমানে সরকারী এডুকেশন সার্ভিস ক্যাডারের প্রাথমিক পদসমূহের নিয়োগের উর্ধ্ব বয়ঃসীমা ৩০ বছর অথচ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের

নিয়োগের জন্য উর্ধ্ব বয়:সীমা নির্ধারণ করা নেই। তাই ৩০ বছরের উপরের বয়সের যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকের প্রাথমিক পদগুলিতে নিয়োগ পেতে পারেন-যা হওয়া উচিত। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পেতে তত অসুবিধা হয় না। অথচ বয়সের সীমাবদ্ধতার ফলে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাথমিক পদগুলিতে সীমিত সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি নিয়োগের সুযোগ পায়। এর আগে সরকারী শিক্ষকদের প্রাথমিক পদে সরাসরি নিয়োগের উর্ধ্ব বয়:সীমা ৩৫ বছর ছিল। এখন ক্যাডারের প্রাথমিক পদগুলিতেও সরাসরি নিয়োগের বেলায় তা ৩৫ বছর বয়: সীমা পুনঃ নির্ধারণ করা উচিত।

২০.৫৯. শিক্ষকতার পেশাকে অন্যান্য পেশা থেকে একটু স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখা দরকার। শিক্ষকতা করার সঙ্গে সঙ্গে একজন শিক্ষক পর্যায়ক্রমে পারদর্শী বা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেন। প্রতি বছর তিনি নিজের বিষয়ে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করেন এবং এর প্রেক্ষিতে নতুন বিশ্লেষণ দান করতে পারেন। বিষয়ের নানাদিক বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার শক্তি তাঁর বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকদের সঙ্গে মেলামেশা ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতা পরিণতি লাভ করে এবং শিক্ষকগণ তাদের সম্বন্ধে যথোচিত অবহিত হন। চাকুরির সময়সীমা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিজের পেশায় দক্ষতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়না, বরং প্রতিদিন তা আরো বাড়ে। এই সমস্ত বিবেচনা করে সকল স্তরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স প্রসারিত করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দের ন্যায় ৬০ বছর এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ৬৫ বছর হওয়া উচিত।

২০.৬০. নিয়োগ ও চাকুরিবিধি নতুন ভাবে প্রণয়ন বা প্রচলিত বিধি পরিবর্তন ও আপ-টু-ডেট করার সময় বয়সের উপরোক্ত দুটি বিষয় বিধিতে সন্নিবেশিত করা উচিত হবে।

শিক্ষকের নিয়োগ

২০.৬১. শিক্ষকতার পেশায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা দরকার। শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রার্থীর ফলাফল এবং বিশেষ বিষয়ে তাঁর প্রবণতা, শিক্ষকতার প্রতি অনুরাগ, প্রমাণিত শিক্ষাগত যোগ্যতা, গঠনমূলক ও উপযোগী ছাত্র সংযোগের রেকর্ড, তাৎপর্যপূর্ণ গবেষণা কৃতিত্ব এবং শিক্ষাক্ষেত্রে নেতৃত্বদানের ক্ষমতা প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা দরকার।

২০.৬২. যে প্রাথমিক বিচার করে নিয়োগদান করা হয়, তা সঠিক কিনা তা যাচাই করার যথেষ্ট ব্যবস্থা থাকতে হবে। এজন্য চাকুরির শিক্ষানবিশকালে যথেষ্ট সম্পর্ক থাকতে হবে। স্থায়ীকরণের বিষয়টি ভালভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে, কোনো ক্রমেই কোন আনুষ্ঠানিক বিষয় হিসাবে গণ্য করা উচিত হবে না।

২০.৬৩. যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পেতে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করতে হয় বলে, উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকগণকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানে আকৃষ্ট করা ও নিয়োজিত রাখার জন্য এবং স্বাভাবিক যোগ্যতা ও প্রতিশ্রুতি রয়েছে এরূপ শিক্ষক আবিষ্কার করা ও তাঁদের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। শিক্ষকতার যোগ্যতাসম্পন্ন যেসব বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে অবস্থান করছেন তাঁদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য এবং আমাদের দেশের উচ্চতর শিক্ষার জাতীয় দায়িত্বে অংশ গ্রহণের জন্য চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব থেকে নিম্নতর পদে নিয়োজিত আছেন এরূপ প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষকগণকে অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। যেসব তরুণ শিক্ষক মাস্টার্স বা ডক্টরেট ডিগ্রী পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের জন্য জাতীয় স্কলারশিপ বা ফেলোশিপ প্রতিষ্ঠা করার জন্যও আমরা সুপারিশ করছি। অনুরূপভাবে খ্যাতনামা শিক্ষকদের জন্যও সীমাবদ্ধ সংখ্যক প্রফেসর অব ইমিনেন্স-এর পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে।

২০.৬৪. শিক্ষা উৎকর্ষ নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি সন্তোষজনক সংখ্যানুপাত রাখার প্রয়োজন হবে। অতএব প্রত্যেকটি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক অবশ্যই নিয়োগ করতে হবে যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম হন। যাতে পর্যাপ্ত ব্যক্তিগত মনোযোগ প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর প্রতি দিতে পারা যায় তার জন্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যত সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যার অনুপাত কি রকম হবে তা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করে আমরা দিচ্ছিনা, কেননা ক্লাসের আয়তন, শিক্ষণীয় বিষয় এবং কিরূপ পর্যায়ের শিক্ষা স্বভাবতই তার উপরে এই সংখ্যা নির্ভর করবে। তবে শিক্ষকের সংখ্যা পর্যাপ্ত হওয়া উচিত যাতে টিউটোরিয়াল গ্রুপ এবং প্রাকটিক্যাল ওয়ার্কের গ্রুপ খুব বড় না হয়, যাতে এসব গ্রুপ অল্প সময় অন্তর অন্তর শিক্ষকের সঙ্গে মিলিত হতে পারে এবং যাতে শিক্ষকদের বড় বড় গ্রুপ সামলাতে না হয়।

২০.৬৫. এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এনাম কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে যে সংখ্যক শিক্ষকের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপর্যাপ্ত। তার সঙ্গে শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাতের সম্পর্ক নেই। ফলে বড় আকারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শ্রেণীকক্ষে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত শিক্ষাদান সম্ভব হচ্ছে না। সত্বর এর বিহিত হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিক্ষকের সংখ্যা নির্ণয় করা প্রয়োজন। শিক্ষকের স্বল্পতার দরুন যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করার সময় নেই। তবে এখন থেকে ভবিষ্যতে যেন আর এমন ক্ষতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

২০.৬৬. সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমানে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তা শূন্য পদের পরিসংখ্যান থেকে সহজে অনুমেয়। ১৬৬টি অধ্যক্ষের পদের মধ্যে ৬২টি, ১৪৮টি উপাধ্যক্ষের পদের মধ্যে ৫০টি, ১৯৭টি অধ্যাপকের পদের মধ্যে ১১২টি, ১২৭৭টি সহযোগী অধ্যাপকের পদের মধ্যে ৬০৭টি, ২৯৯০টি সহকারী অধ্যাপকের পদের মধ্যে ৪৯৭টি এবং ৪৯৭৫টি প্রভাষকের মধ্যে ১০৯৭টি অর্থাৎ বর্তমানে মোট ২৪২৭টি পদ শূন্য। ১৯৮৩ সালের ক্যাডারভুক্তির পর থেকে গড়ে প্রায় দুহাজার পদ খালি থাকছে। যে সকল কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের পদ খালি থাকছে সেখানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নিয়মিত ও নিয়মিত পদোন্নতি প্রদান না করায় শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। তা ছাড়া এতগুলি পদ এতদিন ধরে শূন্য পড়ে থাকায় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত, শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানের অবনতি ঘটেছে।

২০.৬৭. শিক্ষা বিভাগে এবং সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষকদের যে বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য রয়েছে যে সকল পদ অবিলম্বে পূরণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নব নিযুক্তি ও পদোন্নতি উভয় ক্ষেত্রে দৃষ্টি দিলে শূন্য পদসমূহ পূরণ করার কাজ ত্বরান্বিত করা সম্ভব।

২০.৬৮. বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বি,সি,এস)-এর এডুকেশন ক্যাডারে অর্থাৎ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লেকচারার ও সমতুল্য পদসমূহে নিযুক্তির জন্য এখন প্রার্থীদের বি,সি,এস, পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এই ক্ষেত্রে শিক্ষকতায় আগ্রহী প্রার্থীদের নিজের বিষয়ের উপর পারদর্শিতা ও দখল পরীক্ষা করা হয় না, যাতে তা করা হয় তেমন ব্যবস্থা গ্রহণ অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

২০.৬৯. পূর্বে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পদে এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তার পদে নিযুক্তির জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে সরকারী নিয়োগ নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দান

করত। ইউনিফায়েড বি,সি,এস প্রবর্তিত হবার পর থেকে এডুকেশন ক্যাডারের প্রাথমিক পদে নিযুক্তির জন্য প্রার্থীদের অন্যান্য ক্যাডারের মত একই সঙ্গে এবং একই প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হয়।

২০.৭০. ফলে এই প্রার্থীদের অন্যান্য ক্যাডারের জন্য প্রার্থীদের ন্যায় সাধারণ বাংলা, সাধারণ ইংরেজি ও সাধারণ জ্ঞান—বাংলাদেশ বিষয়াবলী, আন্তর্জাতিক বিষয়াবলী এবং অংক ও দৈনন্দিন বিজ্ঞান নামে পাঁচটি পত্রে পাঁচশ নম্বরের পরীক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হয়। এতে বহু প্রার্থী এ জাতীয় বিষয়গুলিতে পরীক্ষায় সন্তোষজনক স্থান পেয়ে চাকুরির জন্য মনোনীত হতে পারেনা। এমনও দেখা গিয়েছে যে, একটি বিষয়ে খুবই ভাল অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী প্রার্থী উপরোক্ত বিষয়সমূহে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল করতে পারেনি বলে মনোনয়ন পায়নি, অথচ যে বিষয়ের পদের জন্য যে প্রার্থী সে বিষয়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দক্ষতা ও পারদর্শিতা অন্যান্য প্রার্থী থেকে তুলনামূলকভাবে ভাল। এজন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী না পাওয়ার কারণে পাবলিক সার্ভিস কমিশন বহু শূন্য পদের জন্য মনোনয়ন দিতে পারে না। সকল ক্যাডারের জন্য একই ধরনের বিষয়সমূহে এবং একই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ এজন্য বহুলাংশে দায়ী।

২০.৭১. তদুপরি সকল ক্যাডারের জন্য সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বহু ক্যাডারে চাকুরির জন্য প্রার্থীদের পছন্দ রাখার যে নিয়ম রয়েছে তাও শিক্ষকতার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী না পাওয়ার অন্যতম কারণ। বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী একজন প্রার্থী এক ডজন ক্যাডারে চাকুরির জন্য সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় পছন্দ রাখতে পারে। দেখা যায়, একজন প্রার্থী যে এডুকেশন ক্যাডারের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন সে অন্যান্য প্রায় এক ডজন ক্যাডারের জন্যও উপযুক্ত। তার পছন্দতে দেখা যায় এডুকেশন ক্যাডারের জন্য তার পছন্দের ক্রমিক ৫।৬ থেকে ৯।১০ এর মধ্যে, ১ থেকে ৫-এর মধ্যে নয়। সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বি,সি,এস, পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় যে, বহুক্ষেত্রে প্রার্থীরা ১ থেকে ৫ ক্রমিকের ক্যাডারের মধ্যে স্থান পেয়ে মনোনয়ন পেয়ে যায়, ফলে এডুকেশন ক্যাডারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া যায় না।

২০.৭২. উপরের বিশ্লেষণের আলোকে আমাদের মন্তব্য হল যে, পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ এবং সকল ক্যাডারের একই বিষয়সমূহে পরীক্ষা গ্রহণ এডুকেশন ক্যাডারে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রার্থীর নির্বাচনের জন্য উপযুক্ত ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা নয়।

২০.৭৩. ক্যাডারের প্রাথমিক স্তরের পদসমূহের জন্য কমিশন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (সাধারণত সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা) মাধ্যমে এবং উপরের স্তরের পদের জন্য সাক্ষাৎকার/মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকে। ১৯৮২ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার নিয়ম চালু হবার পর থেকে এবং ইউনিফায়েড সিভিল সার্ভিস ক্যাডারসমূহে নিয়োগের নতুন নিয়মাবলী প্রচলন শুরু থেকে আজ পর্যন্ত পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে এডুকেশন ক্যাডারে কতগুলি পদ, যে স্তরে হোক না কেন, পূরণ করা হয়েছে বা পূরণ করা সম্ভব হয়নি তা খোঁজ করে দেখলে জানা যাবে, শূন্য পদ পূরণ কেন হচেছ না বা করা সম্ভব হচেছনা এবং কি কি কারণে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, এডুকেশন ক্যাডারের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আপ-টু-ডেট নিয়োগবিধি নেই, এমনকি ক্যাডারের বাইরে এডুকেশনে যে সকল নন-ক্যাডার পোস্ট রয়েছে তার জন্যও স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আপ-টু-ডেট নিয়োগবিধি নেই। ফলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হোক বা নিয়মানুযায়ী অন্যান্য কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে হোক যথা সময়ে ও নিয়মিতভাবে শূন্য পদ পূরণ হচেছ না বা করা হচেছ না। বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা এজন্য বহুলাংশে দায়ী।

২০.৭৪. পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বর্তমান নিয়মানুযায়ী শূন্যপদ পূরণ করার ব্যবস্থা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ পন্থা। সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পদ পূরণ করতে এক থেকে দেড় বছর সময়ের প্রয়োজন। এমনকি শুধু সাক্ষাৎকার ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচনেও কমপক্ষে এক বছরের মত সময়ের প্রয়োজন হয়। লক্ষণীয় যে, অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত বি,সি,এস পরীক্ষার ঘোষণা হয়েছে ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসেও এই পরীক্ষা আরম্ভ করা যায়নি।

২০.৭৫. এই পরীক্ষার সমাপ্তির পর কমপক্ষে এক বছরের মত সময়ের প্রয়োজন হবে পদ্ধতিগত সকল নিয়মাবলী অনুসরণ করে নিয়োগ প্রদান করতে। সুতরাং অবস্থা সহজে অনুমেয়।

২০.৭৬. ১৯৮৩ সালে ক্যাডারভুক্তির আদেশ জারি হবার পর এটা সঙ্গতভাবে আশা করা হয়েছিল যে, তাড়াতাড়ি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে ক্যাডার পদ সম্বলিত ক্যাডার সিডিউল প্রকাশিত হবে এবং এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ক্যাডারভুক্তির আদেশ জারি হবার পর চার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আজো ক্যাডার সিডিউল প্রকাশিত হয়নি। ফলে আজো ক্যাডারভুক্তির বিষয়টি বিধিসম্মতভাবে চূড়ান্ত রূপ লাভ করতে পারেনি।

সুপারিশ

২০.৭৭. তাই উপরোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি আমরা সরকার, তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

২০.৭৮. সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনে করি যে, নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি জরুরী ভিত্তিতে তাদের সুবিবেচনা দাবি রাখে :

(ক) অনতিবিলম্বে শিক্ষা সার্ভিসের সকল পদের জন্য—পদগুলি ক্যাডারের অন্তর্ভুক্ত পদ হোক বা নন-ক্যাডারের পদ হোক—স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট নিয়োগ ও চাকুরি বিধি চূড়ান্ত করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা অত্যাবশ্যক। বি, সি, এস, শিক্ষা ক্যাডারকে বিধি সম্মতভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ দানের লক্ষ্যে অনতিবিলম্বে ক্যাডার সিডিউল প্রকাশ করা উচিত।

(খ) পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা বিভাগের, বিশেষ করে শিক্ষকদের পদ পূরণের জন্য অন্যান্য ক্যাডার সার্ভিসের প্রার্থীদের সঙ্গে একই সময়ে ও বিষয়সমূহে পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষক পদের জন্য প্রার্থী নির্বাচনের সঠিক পদ্ধতি ও পন্থা কিনা তা সংশ্লিষ্ট সকলের বিবেচনার বিষয়। কমিশন মনে করে যে, শিক্ষা সার্ভিসের জন্য প্রার্থী নির্বাচন যথোপযুক্ত বিষয়সমূহে স্বতন্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে করা উচিত এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা এমনিভাবে রাখতে হবে যাতে প্রতি বছরই শূন্য পদে নিয়োগ প্রদান করা যায় এবং এডহক বা সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দান করা প্রয়োজন হয়ে না পড়ে। যেহেতু শিক্ষা সার্ভিসে প্রায় দশ হাজারের মত পদ এবং বর্তমানে প্রায় আড়াই হাজারের মত পদ শূন্য রয়েছে সেগুলি পূরণার্থে প্রয়োজনবোধে বিশেষ বি, সি, এস, পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত হবে। বি,সি,এস, পরীক্ষার মাধ্যমে প্যানেল তৈরি করেও রাখা যায়, যাতে নতুন নিয়োগের মাধ্যমে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগ করা যায়।

(গ) সাক্ষাৎকার ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা পদের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রার্থী নির্বাচন করে, সে সকল ক্ষেত্রে নির্বাচনী বোর্ডগুলিকে এক একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠন করে রাখা যায় যাতে বিষয়ভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসমূহ থেকে শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞ এবং শিক্ষা বিভাগ থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি থাকবেন। অনেকটা যেমন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে তেমনি। উপরোক্ত জাতীয় পদ বিজ্ঞপ্তি হবার পর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রার্থী নির্বাচনী কমিটি বসার জন্য কমিশন ব্যবস্থা করবে। উপযুক্ত নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ যাতে প্রতি তিন মাস অন্তর প্রার্থী নির্বাচনে বসেন তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

বি, সি, এস, শিক্ষা ক্যাডারে ও শিক্ষা বিভাগে শূন্য পদ পূরণের জন্য ত্বরান্বিত ব্যবস্থা

২০.৭৯. এই অধ্যায়ে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, বি, সি, এস, সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কলেজ শাখাতেই আড়াই হাজারের মত পদ বর্তমানে শূন্য। এদের মধ্যে রয়েছে অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, প্রভাষকের পদ এবং সমতুল্য পদসমূহ। নন-ক্যাডারের পদগুলির মধ্যেও যথেষ্ট পদ বর্তমানে শূন্য। এ ছাড়াও রয়েছে স্কুল ও পরিদর্শন শাখাতে বহু শূন্য পদ। বি, সি, এস, কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারসহ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে পদগুলির বেলায়ও একই রকম অবস্থা।

২০.৮০. এই বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য থাকায় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষাদান কার্য ব্যাহত, শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত এবং সর্বোপরি শিক্ষার মানের অবনতি ঘটছে। সময়মত ও নিয়মিত পদোন্নতির মাধ্যমে পদ পূরণ না হওয়ায় শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। যে সকল কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদ এবং যে সকল স্কুলে প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী ও সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রীর পদ খালি রয়েছে সেখানে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হচ্ছে তা বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহে শিক্ষকদের পদ খালি থাকায় অপূরণীয় ক্ষতি হচ্ছে।

২০.৮১. এই পরিস্থিতিতে অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে এই বিপুল সংখ্যক শূন্য পদ পূরণ করা যায় সে পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করা অত্যাবশ্যক। এই অধ্যায়ের অন্যত্র বিশ্লেষণের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, গতানুগতিক পন্থা ও পদ্ধতির মাধ্যমে এত বিপুল সংখ্যক শূন্য পদ সত্বর পূরণ করার সম্ভাবনা অতি ক্ষীণ। তাই বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

২০.৮২. শিক্ষা ক্যাডারের ও শিক্ষা বিভাগের নন-ক্যাডার ও অন্যান্য পদগুলিকে নিম্নলিখিত ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়:

(১) স্কুল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষক/শিক্ষিকার পদ এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমতুল্য পদ।

(২) বি, সি, এস, ক্যাডারে কলেজসমূহে প্রভাষকের পদ ও সমতুল্য পদ এবং স্কুল ও পরিদর্শন শাখাতে সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী ও সমতুল্য পদ।

(৩) বি, সি, এস, ক্যাডারে কলেজসমূহে সহকারী অধ্যাপক ও সমতুল্য পদ এবং স্কুল ও পরিদর্শন শাখার প্রধান শিক্ষক/শিক্ষয়িত্রী ও পরিদর্শক/পরিদর্শিকা এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সমতুল্য পদ।

(৪) বি, সি, এস, ক্যাডারে কলেজসমূহে সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, উপাধ্যক্ষ ও অধ্যক্ষের পদ এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমতুল্য পদ এবং উচ্চতর পদগুলি।

(৫) বি, সি, এস, ক্যাডারের বাইরে শিক্ষা বিভাগে যে সকল নন-ক্যাডার পদ রয়েছে তা উপরের ক্যাটাগরির মধ্যে বিভক্ত করা যাবে।

২০.৮৩. এই সকল পদের মধ্যে শূন্য পদ পূরণের পথে বর্তমান প্রধান অন্তরায় এই সব পদের জন্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও আপ-টু-ডেট নিয়োগবিধি নেই বা এখনো সরকারের বিবেচনাধীন চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় রয়েছে। চূড়ান্তকরণে বিলম্বের কারণ অবশ্য যথেষ্ট রয়েছে। তদুপরি চূড়ান্ত জ্যেষ্ঠত্ব তালিকার অনুপস্থিতিতে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণে অগ্রগতি সাধন করা যাচ্ছে না। এসব বিষয়ে এই অধ্যায়ের অন্যত্র আমরা বিস্তারিত আলোচনা করে যথোপযুক্ত সুপারিশ রেখেছি। উপরোক্ত অবস্থা সত্বেও স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক শূন্যপদ পূরণ করার জন্য আমরা নিচের সুপারিশ রাখছি :

২০.৮৪. (ক) স্কুল স্তরের শিক্ষক/শিক্ষিকার পদগুলি দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে পড়ে সেই পদ যেগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় আসে। দ্বিতীয় ভাগের পদগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতার বাইরে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতায় যে পদ পড়ে তার মধ্যে সরাসরি নিয়োগের জন্য পদ এবং পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য পদ রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়োগ-বিধি চূড়ান্তকরতে হবে। চূড়ান্ত করা এখনো সময় সাপেক্ষ হলে বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধি এককালীন সময়ের জন্য গ্রহণ করে অথবা পুরানো নিয়োগ-বিধি প্রয়োগ করে যথা-নিয়মে শূন্য পদ আগামী ছয় মাসের মধ্যে পূরণ করা যায়। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আওতার বাইরের শূন্যপদ পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ জারি করা যায় যাতে আগামী ছয় মাসের মধ্যে পদগুলি পূরণের ব্যবস্থা করে। নিয়োগ-বিধির ব্যাপারে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মতির জন্য ত্বরান্বিত পদক্ষেপ নেয়া উচিত।

(খ) বি, সি, এস, ক্যাডারের কলেজসমূহের প্রভাষকদের পদ ও সমতুল্য পদ এবং স্কুল ও পরিদর্শন শাখায় সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রী ও সমতুল্য পদগুলি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। এ সকল পদ বিশেষ করে স্কুল ও পরিদর্শন শাখাভুক্ত কিছু সংখ্যক পদ, পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য হলেও এক শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণীতে উন্নীত হয় বলে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মতির প্রয়োজন হয়। স্কুল ও পরিদর্শন শাখার ক্ষেত্রে কিছু কিছু পদের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণের অপেক্ষায় থাকলেও তা চূড়ান্তকরণ সাপেক্ষে বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধি এককালীন সময়ের জন্য গ্রহণ করে অথবা পুরানো নিয়োগ-বিধি প্রয়োগ করে উপরোক্ত পদসমূহের শূন্য পদগুলি আগামী ছয় মাসের মধ্যে পূরণ করার ব্যবস্থা নেয়া যায়। সেজন্য অতি সত্বর মনোনয়ন দানের জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট রিকুইজিশন পাঠিয়ে মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা যায়।

(গ) আমরা মনে করি, স্বল্প সময়ের মধ্যে এক বিপুল সংখ্যক প্রভাষক ও সমতুল্য শূন্য-পদ পূরণ করার জন্য বিশেষ বি, সি, এস, পরীক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক। এটি একেবারে কোনো নতুন প্রস্তাব নয়। ১৯৮২ সালে সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বি, সি, এস, পরীক্ষা প্রবর্তিত হবার পর থেকে একাধিকবার পাবলিক সার্ভিস কমিশন

বিশেষ বি, সি, এস পরীক্ষা গ্রহণ করেছে। বি, সি, এস,-এর প্রশাসনিক ক্যাডার, স্বাস্থ্য ক্যাডার, কৃষি ক্যাডার, ইঞ্জিনিয়ারিং ক্যাডার এমনকি শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের জন্য বিশেষ বি, সি এস, পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এই অধ্যায়ের অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বি, সি, এস, পরীক্ষার বিজ্ঞাপন ১৯৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, এক বছরের পর ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসেও পরীক্ষা শুরু হয়নি। পরীক্ষা সমাপ্তির পরও কম-পক্ষে এক বছরের মত সময়ের প্রয়োজন হবে পদ্ধতিগত নিয়মাবলী অনুসরণ করে নিয়োগ প্রদান করতে। ইতিপূর্বে অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে, দেড় বছরের মত সময়ের মধ্যে পি, এস, সি, র সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং, দুই বছরের মত যদি সময়ের প্রয়োজন হয় এক একবার পি, এস, সির মাধ্যমে শূন্যপদ পূরণ করতে, তা হলে আগামী ৫/৬ বছরে শিক্ষা বিভাগের বর্তমান শূন্যপদগুলি পূরণ হবে না। প্রসঙ্গত দেখা যাচ্ছে যে, অনুষ্ঠিতব্য সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বি, সি, এস, পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য বিজ্ঞাপিত পদ সংখ্যা ২০০–এর কম। এই জাতীয় এত বিপুল সংখ্যক পদ শূন্য থাকা সত্ত্বেও এত কম সংখ্যক পদ কেন বিজ্ঞাপিত করা হয়েছে তা বোধগম্য নয়। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। বিকল্প হিসাবে এককালীন সময়ের জন্য বর্তমান শূন্যপদগুলি প্রতি-যোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে পূরণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষ অনুমতি দেয়ার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে। স্মরণীয় যে সম্মিলিত প্রতিযোগিতামূলক বি, সি, এস, পরীক্ষা প্রবর্তিত হবার পরেও আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে জরুরী ভিত্তিতে বি, সি, এস, ক্যাডারে মুন্সেফ নিয়োগের জন্য যথা ব্যবস্থার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। শিক্ষা ক্যাডারে বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রস্তাবও বিশেষ বিবেচনার দাবিদার। যে পরিস্থিতিতে বি, সি, এস, জুডিশিয়াল ক্যাডারে এককালীন নিয়োগের জন্য প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব বিচার ও আইন মন্ত্রণালয়কে দেয়া হয়েছিল শিক্ষা ক্যাডারের বর্তমান পরিস্থিতি তার চেয়েও কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করার কোনো কারণ নেই। দুটির মধ্যে যে পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হোক না কেন স্বল্প সময়ের মধ্যে বর্তমান শূন্য পদ পূরণ নিশ্চিত করতে হবে। আমরা এই অধ্যায়ের অন্যত্র শিক্ষা ক্যাডারের প্রাথমিক পদসমূহে সরাসরি নিয়োগের বেলায় প্রার্থীদের ঊর্ধ্ব বয়সসীমা পূর্বে প্রচলিত নিয়মের ন্যায় ৩৫ বছর (বর্তমানের ৩০ বছরের পরিবর্তে) ধার্য করার জন্য সুপারিশ করেছি। সে সুপারিশ অন্যান্য সুপারিশের সঙ্গে চূড়ান্ত করা সাপেক্ষে এককালীন বিশেষ বি, সি, এস, পরীক্ষার প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্ব বয়সসীমা ৩৫ বছর ধার্য করার জন্য আমরা জোর সুপারিশ করছি। এটিও একেবারে অভিনব প্রস্তাব নয়। ইউনিফায়েড সিভিল সার্ভিস প্রবর্তনের পর বি, সি, এস, প্রশাসনিক ক্যাডারের জন্য প্রার্থীদের ঊর্ধ্ব বয়সসীমা ৫০ বছর ধার্য করে একটি বিশেষ বি, সি, এস, পরীক্ষা গ্রহণ করে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনয়নের মাধ্যমে এককালীন ভিত্তিতে পদ পূরণ করা হয়েছে। উপরোক্ত সুপারিশগুলি কার্যকর করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও পাবলিক সার্ভিস কমিশন আলোচনার মাধ্যমে সত্বর সিদ্ধান্তে পৌঁছার ব্যবস্থা করবে বলে আমরা আশা রাখি।

(ঘ) বি, সি, এস, ক্যাডারের সহকারী অধ্যাপক ও সমতুল্য পদ এবং স্কুল ও পরিদর্শন শাখার সমতুল্য পদের মধ্যে এক পঞ্চমাংশের মত পদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মনোনয়নের মাধ্যমে সরাসরি ভাবে নিয়োগ এবং আশি ভাগ পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করার কথা-অন্তত সরকারের বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধিতে সন্নিবেশিত করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এসকল ক্ষেত্রে পদোন্নতির সময় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সম্মতি বা মনোনয়নের প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রেও নিয়োগ-বিধি

সত্বর চূড়ান্ত করা হোক। নিয়োগ-বিধি চূড়ান্তকরণ সময় সাপেক্ষ হলে পুরানো নিয়োগ -বিধি প্রয়োগ করা হোক অথবা বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধি চূড়ান্ত-করণ সাপেক্ষে প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধি এককালীন সময়ের জন্য গ্রহণ করে বর্তমানের শূন্য পদগুলি পূরণ ত্বরান্বিত হোক। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পূরণ যোগ্য পদগুলির জন্য অতি সত্বর কমিশনে রিকুইজিশন পাঠিয়ে চার মাসের মধ্যে মনোনয়ন দানের জন্য অনুরোধ করা যায়। এর জন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার—যা সময় সাপেক্ষ—প্রয়োজন হয় না। সাক্ষাৎকার ও পরীক্ষার মাধ্যমে কমিশন প্রার্থী নির্বাচন করে মনোনয়ন দান করে। সুতরাং জরুরী ভিত্তিতে পদগুলি পূরণ করার প্রয়োজনে চার মাসের মধ্যে কমিশন মনোনয়ন দান করতে পারবে আশা করা যায়। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলির জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ও পদোন্নতি কমিটি প্রতি ২ মাস অন্তর বসে ছয় মাসের মধ্যে বর্তমানে শূন্যপদ পূরণ করার ব্যবস্থা করতে পারে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্তৃপক্ষদের আপ-টু-ডেট বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন এবং জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা তৈরি রাখার জন্য প্রথমেই নির্দেশ দেয়া যায়।

(ঙ) বি.সি.এস. ক্যাডারে সহযোগী অধ্যাপক ও অধ্যাপক এবং সমতুল্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পদগুলিরও শতকরা ২০টি পদ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে পদোন্নতির ভিত্তিতে পূরণযোগ্য বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধিতে দেখা যায়। এদেরও শতকরা ৮০টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। এ সকল পদের বেলায়ও বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ বিধি এককালীন সময়ের জন্য গ্রহণ করে অথবা পুরানো নিয়োগবিধি প্রয়োগ করে শূন্য পদ সত্বর পূরণের ব্যবস্থা করা যায়। এ সকল পদের মধ্যে যেগুলির জন্য পুরানো নিয়োগ বিধি নেই অর্থাৎ পুরানো নিয়োগ-বিধি প্রচলন করার পরে পদগুলির সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলির বেলায় বিবেচনাধীন প্রস্তাবিত নিয়োগ-বিধি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হবে। নিয়োগ-বিধির ব্যাপারে সুরাহা হবার পর উপরে (গ)-এ বর্ণিত মতে সরাসরিভাবে নিয়োগযোগ্য পদগুলির জন্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে চার মাসের মধ্যে সাক্ষাৎকার ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করে মনোনয়ন দানের জন্য অনুরোধ করা যায়। পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য পদগুলির ব্যাপারে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডকে প্রতি দু' মাস অন্তর বৈঠকে বসে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য অনুরোধ প্রয়োজন হবে। অবশ্য বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন ও জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা তৈরি থাকতে হবে।

(চ) শিক্ষক নির্বাচন ও নিয়োগ সম্পর্কিত দীর্ঘ কালের পুঞ্জীভূত সমস্যা ও তাদের সমাধানের বিভিন্ন দিক উপরে আলোচিত হয়েছে। এই জাতীয় সমস্যাবলীর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে এবং ভবিষ্যতে নিয়োগ সুষ্ঠু ভাবে ও যথাসময়ে করা যায় তার জন্য স্থায়ী বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটি জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন গঠন করা উচিত হবে। বর্তমানে সাংগঠনিক ও অন্যান্য দিক থেকে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষে মাধ্যমিক থেকে শুরু করে কলেজ স্তর পর্যন্ত শিক্ষকের বিপুল সংখ্যক শূন্য পদে নিয়োগের জন্য শিক্ষক নির্বাচন একটি দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই শিক্ষক নির্বাচনের প্রক্রিয়া ও কার্য এককভাবে সহজতর উপায়ে দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করার প্রয়োজনে আমরা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষা সার্ভিস কমিশন (National Education Service Commission) গঠনের প্রস্তাব করছি।

প্রস্তাবিত কমিশন মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরের সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষক নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রেও উক্ত কমিশন সুনির্দিষ্ট পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে নিয়োগ যোগ্য শিক্ষকদের তালিকা প্রণয়ন করবে এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কেবলমাত্র উক্ত তালিকাভুক্ত প্রার্থীদের মধ্য থেকে নিজ নিজ প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করবে। ভবিষ্যতে প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা নির্বাচনের দায়িত্বও উক্ত কমিশনের উপর ন্যস্ত হবে।

জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা

২০.৮৫. শিক্ষা বিভাগের সকল শিক্ষক ও কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা (গ্রেডেশন লিস্ট) আপ-টু-ডেট করে প্রকাশ করা একান্ত দরকার। ক্যাডার সার্ভিসের অপরিহার্য অঙ্গ গ্রেডেশন লিস্ট বা জ্যেষ্ঠত্ব তালিকা। ১৯৮৩ সালে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের ক্যাডার-ভুক্তির সময় যে অন্তর্বর্তীকালীন গ্রেডেশন লিস্ট প্রণীত হয়েছিল তা আজো চূড়ান্ত করা হয়নি। পদোন্নতি প্রদানের সময় কিভাবে তা ব্যবহার করা হচ্ছে তা সঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এই তালিকায় প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড পদে যোগদানের তারিখকে সিনিয়রটি বা জ্যেষ্ঠতার ভিত্তি হিসাবে ধরা হয়। যেহেতু ২২-৪-১৯৬৮ থেকে সরকারী কলেজের প্রভাষক/অধ্যাপকের পদকে প্রথম শ্রেণীর পদে উন্নীত করা হয়, সেহেতু এই তারিখ থেকেই ক্যাডার সার্ভিস হিসাবে সিনিয়রিটি গণনা করা হয়। অবশ্য গ্রেডেশন তালিকায় ২২-৪-১৯৬৮ তারিখের আগের চাকুরিতে যোগদানের তারিখও লিপিবদ্ধ করা হয় এবং পদোন্নতির ক্ষেত্রে পূর্বের চাকুরি গণনা করা হয়। অন্যদিকে আত্তীকৃত শিক্ষকদের কলেজ আত্তীকরণের তারিখ থেকে সিনিয়রিটি গণনা করে গ্রেডেশন তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অবশ্য উল্লেখ করা হয় যে, ইফেকটিভ সার্ভিস অর্থাৎ কলেজ জাতীয়করণের তারিখের পূর্বের চাকুরি ৫০% পদোন্নতি ও পেনশনের ক্ষেত্রে গণনা করা হবে। এ ভাবে যে অন্তর্বর্তীকালীন গ্রেডেশন তালিকা প্রণীত হয় তাকে ত্রুটিমুক্ত করা ও পদোন্নতি প্রদানের সময় অনুসরণযোগ্য করা এবং সর্বোপরি বি.সি.এস. সিনিয়রিটি রুলস ১৯৮৩ অনুযায়ী চূড়ান্ত গ্রেডেশন তালিকা অনতিবিলম্বে প্রণয়ন করা উচিত— যাতে সিনিয়রিটি নির্ধারণ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে জটিলতার অবসান ঘটে।

২০.৮৬. শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার পদসমূহের তালিকা ও তার থেকে শূন্যপদের তালিকা, পদসমূহে নিয়োজিত ব্যক্তিদের তালিকা, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদির রেজিস্টার তৈরি করে শূন্য পদের তালিকা অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগ বা পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ-যোগ্য পদগুলির ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

২০.৮৭. যে কোনো দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে দেশের শিক্ষা সার্ভিসের গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা সার্ভিস যদি দেশের মেধাবী সন্তানদের আকৃষ্ট করতে ও ধরে রাখতে সক্ষম হয় তবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি ঘটে, দক্ষ শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে এবং এর শুভ প্রভাব বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এর বিপরীত অবস্থায় বিপরীত ফল লাভ হয়। বাংলাদেশের শিক্ষা সার্ভিসের বেলায়ও একথা সত্য। বাংলাদেশ সরকার ১৯৮০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিসকে পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমমর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ৩০টি ক্যাডারে বিন্যস্ত করে। এই ক্যাডারের একটি সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার এবং অন্যটি কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার।

২০.৮৮. ক্যাডার সার্ভিস ঘোষণার সময় বলা হয়েছিল, সকল ক্যাডারই সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন হবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বেশ বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। তদুপরি বি.সি.এস. প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত হলেও শিক্ষা ক্যাডারের প্রভাষকদের বেসিক ট্রেনিং বা অনুরূপ বিকল্প প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে না। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ক্যাডারের প্রতিনিধিত্ব নেই বললে চলে, যদিও এনাম কমিটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫০% ক্যাডার পদ শিক্ষা ক্যাডারের জন্য সংরক্ষিত রাখার সুপারিশ করেছে।

২০.৮৯. বর্তমানে শিক্ষা ক্যাডারের আয়তন ও কলেবর বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, দেশ বিভাগের পর সরকারী কলেজের সংখ্যা ছিল ৮টি। পাকিস্তান আমলে সরকারী কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৪টিতে। বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৬১টি। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু সেগুলি ব্যবস্থাপনার জন্য সে অনুপাতে জনবল বৃদ্ধি পায়নি ও সম্প্রসারণ ঘটেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি/দুটি শাখার পক্ষে এত বড় ক্যাডার সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনাও সম্ভব হচ্ছে মনে হয়না। কাজেই সিডিউল প্রকাশ, গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্ত করণ, পদোন্নতি ও নতুন নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদ পুরণ, আত্মীকরণ প্রক্রিয়া নিয়মিত সময়ে সম্পন্নকরণ প্রভৃতি কাজ সময়মত হচ্ছেনা। সমস্যা কেবল স্তূপীকৃতই হচ্ছে।

২০.৯০. শিক্ষা ক্যাডারে অর্থাৎ সরকারী কলেজ শিক্ষকদের চাকুরি কাঠামোর এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে জাতীয়করণের মাধ্যমে বর্তমান পদ্ধতিতে বিপুল সংখ্যক বেসরকারী কলেজ সরকারীকরণের ফলে। আত্মীকৃত শিক্ষক ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের চাকুরিগত স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হওয়ায় শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে সরকারীকৃত অধিকাংশ কলেজেরই উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ভৌত সুবিধার সম্প্রসারণ ইত্যাদি কিছু করা সম্ভব হয়নি। ফলে সার্বিকভাবে সরকারী কলেজসমূহের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়েছে। সরকারী কলেজে শিক্ষার মানের অবনতি ও পরীক্ষার হলে নকলের প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের অতিমাত্রায় গৃহশিক্ষক নির্ভরতা ইত্যাদি কতকাংশে বর্তমানে পদ্ধতিতে কলেজ সরকারীকরণের ফলেই উদ্ভূত বলে অনেকে মনে করেন।

২০.৯১. এর প্রেক্ষিতে সরকারী কলেজসমূহের ভাবমূর্তি রক্ষা ও শিক্ষার স্বীকৃত মান বজায় রাখা এবং শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বৈত নীতি পরিহারের লক্ষ্যে বর্তমান পদ্ধতিতে কলেজ সরকারীকরণ প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন অত্যাবশ্যক এবং মূল্যায়নের পর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত হবে।

২০.৯২. আত্মীকৃত শিক্ষক ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণার্থে কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগকৃত প্রভাষকদের চাকুরি ৫ বছর পূর্ণ হওয়ার তারিখে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেয়া এবং ইতিমধ্যে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ৭ বছর/৫ বছর (যেটা প্রযোজ্য) পূর্তির দিন থেকে পদোন্নতি কার্যকর করা উচিত।

২০.৯৩. প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে জনবল বৃদ্ধি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠিত ও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন। নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট ন্যস্ত করা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা ক্যাডারের সন্তোষজনক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

শিক্ষকদের বেতন

২০.৯৪. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মেধাবী ব্যক্তিদের শিক্ষকতার পেশার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য এই বৃত্তিকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের পেশার অনুরূপ আকর্ষণীয় করে তোলা দরকার। শিক্ষকদের বেতনের হার এমনভাবে নির্দিষ্ট করা উচিত যাতে

তাঁদের কার্যকারিতা খর্ব করতে পারে এমন কোনো কাজ গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য না হন। এজন্য, বিশেষত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ও পদ মর্যাদা বাড়াতে হবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের যোগ্যতা ও বেতন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের সমতুল্য হওয়া উচিত।

২০.৯৫. একই পর্যায়ে, সমান যোগ্যতা ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং সমতুল্য শিক্ষকতার কার্যে নিয়োজিত সরকারী কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একই বেতন স্কেল প্রবর্তন করা দরকার। এ প্রসঙ্গে আমাদের এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশসমূহ, যেমন ভারত ও পাকিস্তানের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষার অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বর্তমান বেতন স্কেলগুলি প্রণিধান ও অনুসরণ যোগ্য।

২০.৯৬. এখানে উল্লেখ করা যায় যে, দেশে ৪৩টি সরকারী কলেজে স্নাতক পর্যায়ে অনার্স এবং ১২টি সরকারী কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান সমূহে শিক্ষাদানের জন্য যে মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শ্রমের প্রয়োজন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শ্রমের তুলনায় কম নয়। সুতরাং উপরোক্ত পর্যায়ের সরকারী কলেজগুলির সেই সব (যাঁরা স্নাতক সম্মান ও স্নাতকোত্তর শিক্ষায় নিয়োজিত) শিক্ষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। ঐ সব শিক্ষকের অবশ্যই গবেষণায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

২০.৯৭. ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের স্কেল নিম্নরূপ:

ভারত

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

পদ	বেতন স্কেল (ভারতীয় মুদ্রা)
লেকচারার	২২০০—৭৫--২৮০০--১০০--৪০০০
লেকচারার (সিনিয়র স্কেল)	৩০০০--১০০--৩৫০০--১২৫--৫০০০
লেকচারার (সিলেকসন গ্রেড)	৩৭০০--১২৫--৪৭০০--১৫০--৫৩০০
রীডার	৩৭০০—১২৫--৪৭০০--১৫০--৫৩০০
রীডার (সিনিয়র স্কেল)	৪৫০০--১৫০--৫৭০০
প্রফেসার	৪৫০০—১৫০--৫৭০০—২০০--৭৩০০
প্রফেসার অব ইমিনেন্স	৮০০০ নির্দিষ্ট
ভাইস-চ্যান্সেলর	৭৩০০—১০০—৭৬০০

কলেজসমূহ

লেকচারার	২২০০--৭৫--২৮০০--১০০--৪০০০
লেকচারার (সিনিয়র স্কেল)	৩০০০--১০০--৩৫০০--১২৫--৫০০০
লেকচারার (সিলেকশন গ্রেড) ..	৩৭০০--১২৫--৪৭০০--১৫০--৫৩০০
প্রিন্সিপাল	৪৫০০--১৫০--৫৭০০ অথবা ৪৫০০--১৫০--৫৭০০--২০০--৭৩০০

পাকিস্তান (পাকিস্তানী মুদ্রা)

লেকচারার	২০৩৫--১৫৫--৩৯২৫
এসিসট্যাণ্ট প্রফেসার	২৭১০--১৯৫--৪৬৬০
এসোসিয়েট প্রফেসার	৪১৮০--২০৫--৫৭৭০
প্রফেসার	৪৮০০--২৯০--৬৭৮০

বাংলাদেশ

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ

	বেতন স্কেল (টাকা)
লেকচারার	১৬৫০—১০০—২২৫০-ইবি-১১০—৩০২০ বেতনক্রমে নন-টেকনিক্যাল বিষয়ে টাঃ ১৮৫০তে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে টাঃ ২০৫০তে শুরু।
সর্বমোট পদের এক তৃতীয়াংশ সংখ্যক লেকচারার	২৪০০—১২০—৩৬০০
এসিসট্যাণ্ট প্রফেসার	২৮০০—১২৫—৪৪২৫
এসোসিয়েট প্রফেসার	৪২০০—১৫০—৫২৫০
প্রফেসার	৪৭৫০—১৫০—৫২৫০—৫৭০০
প্রফেসার (সিলেকশন গ্রেড) ..	৬০০০ নির্দিষ্ট
ভাইস-চ্যান্সেলর	৬০০০ নির্দিষ্ট।

কলেজসমূহ

লেকচারার	..	১৬৫০—১০০—২২৫০—ইবি—১১০—৩০২০
এসিসট্যাণ্ট প্রফেসার	..	২৮০০—১২৫—৪৪২৫
এসোসিয়েট প্রফেসার, ভাইস প্রিন্সিপাল অব ডিগ্রী (পাস) কলেজ ও টি টি কলেজ এবং প্রিন্সিপাল অব ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ।		৩৭০০—১২৫—৪৮২৫
প্রফেসার, ভাইস প্রিন্সিপাল ও প্রিন্সিপাল	..	৪২০০—১৫০—৫২৫০—৫০% পদ
		৪৭৫০—১৫০—৫৫০০—৫০% পদ।

অবশ্য বেতন ছাড়াও এ সকল দেশে শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন রকমের ভাতা, যেমন বাড়ি ভাড়া, চিকিৎসা ভাতা ইত্যাদি রয়েছে। উপরন্তু অন্যান্য বিশেষ ভাতা, যেমন পকিস্তানে প্রফেসারদের জন্য সিনিয়র পোস্ট ভাতা, আপ্যায়নভাতা, অর্ডারলি ভাতা এবং প্রযোজ্যক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য রিসার্চ এলাউন্সের ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লিখিত বেতন স্কেল ও ক্রমসমূহে শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণের সময়েও তাঁদের উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও সফল গবেষণার জন্য উচ্চতর বেতন প্রদানের অবকাশ রয়েছে।

২০.৭৮. ভারতে শিক্ষা বিভাগের সমতুল্য সরকারী চাকুরিতে বিভিন্ন পদের বর্তমান বেতনের স্কেল :

(ভারতীয় মুদ্রা)

(১) ২২০০—৭৫—২৮০০—ইবি-১০০—৪০০০

(২) ৩০০০—১০০—৩৫০০—১২৫—৪৫০০

(৩) ৩০০০—১০০—৩৫০০—১২৫—৫০০০

(৪) ৩৭০০—১২৫—৪৭০০—১৫০—৫০০০

(৫) ৪১০০—১২৫—৪৮৫০—৫৩০০

(৬) ৪৫০০—১৫০—৫৭০০

(৭) ৫১০০—১৫০—৫৭০০

(৮) ৫১০০—১৫০—৬৩০০—২০০—৬৭০০

(৯) ৫৯০০—২০০—৬৭০০

(১০) ৫৯০০—২০০—৭৩০০

(১১) ৭৩০০—১০০—৭৬০০

(১২) ৭৩০০—২০০—৭৫০০—২৫০—৮০০০

(১৩) ৭৬০০ নির্দিষ্ট।

(১৪) ৮০০০ নির্দিষ্ট।

২০.৯৯. পাকিস্তানে শিক্ষা বিভাগের সমতুল্য সরকারী চাকুরিতে বিভিন্ন পদের বর্তমান বেতনের স্কেল:

(পাকিস্তানী মুদ্রা)

(১) ২০৬৫—১৫৫—৩৯২৫

(২) ২৭১০—১৯৫—৪৬৬০

(৩) ৪১৮০—২০৫—৫৭৭০

(৪) ৪৮০০—২৩৫—৬৭৮০

(৫) ৫৪২০—২৯০—৭৭৪০

(৬) ৫৮০০—৩২৫—৮৪০০

২০.১০০. বাংলাদেশে শিক্ষা বিভাগের সমতুল্য সরকারী চাকুরিতে বিভিন্ন পদের বর্তমান বেতনের স্কেল:

(বাংলাদেশী টাকা)

(১) ১৬৫০—১০০—২২৫০—ইবি—১১০—৩০২০

(২) ১৮৫০—১১০—২৬২০—১২০—৩২২০

(৩) ২৪০০—১২০—৩৬০০

(৪) ২৮০০—১২৫—৪৪২৫

(৫) ৩৭০০—১২৫—৪৮২৫

(৬) ৪২০০—১৫০—৫২৫০

(৭) ৪৭৫০—১৫০—৫৫০০

(৮) ৫৭০০ নির্দিষ্ট।

(৯) ৬০০০ নির্দিষ্ট।

২০.১০১. সাধারণ ভাবে বলতে গেলে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় কোনো স্তরে শিক্ষকেরা তাঁদের নিজ নিজ বেতন ক্রমে ও বেতন নির্ধারণের নিয়ম কানুনে সন্তুষ্ট নন। এই অসন্তোষ তাঁদের অধ্যাপনা, ভাষণে ও লেখাপড়ার উপর প্রভাব ফেলছে।

২০.১০২. ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি কর্তৃক দাখিলকৃত বেতনসহ অন্যান্য দাবি পরীক্ষা করে সুপারিশ করার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। এই কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক বেতন এবং আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছে তার অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে গ্রহণীয় নয় বলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেগুলি পুরোপুরিভাবে এখনো প্রচলিত হয়নি।

২০.১০৩. এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি যে, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল এবং বেতন নির্ধারণ করার নিয়ম-কানুন পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। পর্যালোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বর্তমান প্রচলিত বেতন কাঠামোর সীমাবদ্ধতার মধ্যে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তাদের বেতন স্কেল ও ক্রম এবং বেতন নির্ধারণের নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতিতে যুক্তিসঙ্গত রদবদল করা উচিত।

২০.১০৪. উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও অঞ্চল প্রভৃতি পর্যায়ের শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তা ও কর্মীদের বেতন বাড়ানো প্রয়োজন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতনও পর্যালোচনা করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। শিক্ষা বিভাগের স্কুল ও পরিদর্শন শাখার শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের বেতন বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

২০.১০৫. বিশেষ করে মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার বেতন, স্কুল পরিদর্শক/পরিদর্শিকার বেতন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা কর্মকর্তা, সহকারী পরিচালক, উপপরিচালক প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক কর্মকর্তার বর্তমান বেতন স্কেল তাঁদের পদগুলিও দায়িত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এগুলির পরিবর্তন করে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা আবশ্যক।

২০.১০৬. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন, ভাতা ইত্যাদিও পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার আওতায় আনা উচিত। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য প্রবর্তিত ও প্রচলিত বেতন স্কেল, শিক্ষকদের বেতন বাবদ সরকারী অনুদান এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিক্ষকদের প্রদেয় বেতন প্রভৃতির পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

২০.১০৭. সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের বৈষম্য ক্রমান্বয়ে দূর করতে হবে। অবশ্য সেজন্য বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বৈষম্য দূরীকরণের সুবিধার্থে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্টাফিং প্যাটার্ন সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্যাটার্নে হওয়া উচিত। যেমন, সরকারী কলেজের মত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদ থাকা উচিত। তাঁদের নিয়োগ নীতি ও বিধি এবং পদ্ধতিতেও মোটামুটিভাবে সরকারী প্যাটার্ন অনুসরণ করা যায়। তাঁদের পদোন্নতি, বেতন নির্ধারণ ইত্যাদির ব্যাপারেও সরকারী নিয়ম-কানুন অনুসরণ করার অবকাশ থাকে। চূড়ান্তভাবে সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বৈষম্য দূরীকরণার্থে এ জাতীয় ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

২০.১০৮. শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে কার্যত যোগ্যতা ও কৃতিত্বের বিষয় বিবেচনা করতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বেতন বৃদ্ধি একটি মেয়াদী ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছে। যোগ্যতাগত বাধা সাধারণত বেতন স্কেলের একটি অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে। একথা বিশ্বাস করার কারণ রয়েছে যে, যোগ্যতাগত বাধা অতিক্রম একটি গতানুগতিক কার্য অপেক্ষাও সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে।

শিক্ষককের পদোন্নতি

২০.১০৯. সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজে পদোন্নতির মোটামুটিভাবে ব্যবস্থা থাকলেও এই সব প্রতিষ্ঠানে পদোন্নতি হয় খুব ধীরগতিতে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণের অধিকাংশই সমমানের অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তাদের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী। বর্তমানে তাঁদের ক্যাডার সার্ভিসের অন্তর্গত করা হলেও পদোন্নতির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট নীতি প্রচলন করা হয়নি, যা অতি সত্বর করা উচিত। ফলে প্রথম দিকে খুব উদ্যোগ ও নিষ্ঠা নিয়ে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিলেও অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষকদের উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে। এই অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করার জন্য সরকারী বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষকদের সময়মত পদোন্নতির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

২০.১১০. বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো রকম নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। এই অবস্থা শিক্ষকদের পক্ষে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা সহকারে কাজ করার অনুকূল নয়। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহে পদোন্নতির জন্য সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুরূপ স্টাফিং প্যাটার্নসহ সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করার জন্য পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

২০.১১১. বর্তমানে প্রধানত প্রবীণতা বা চাকুরির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে পদোন্নতি হয়ে থাকে। কেবলমাত্র প্রবীণতা বা চাকুরির দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে না করে শিক্ষা ও গবেষণাগত কৃতিত্বের স্বীকৃতিদান করে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা, শিক্ষাদানে একাগ্রতা, গবেষণা, প্রকাশনা প্রভৃতি বিষয় পদোন্নতির জন্য অগ্রাধিকার দেয়া উচিত এবং উপযুক্ত শিক্ষকদের যাতে সময়মত পদোন্নতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

২০.১১২. শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণের যে পদ্ধতি আমরা বর্তমানে প্রয়োগ করি তা তেমন সুব্যবস্থিত বা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং শিক্ষক নির্বাচন, চাকুরি স্থায়ীকরণ, বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগ করাও হয় না। যোগ্যতা নির্ণয়ের ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ করতে হলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গোপনীয় প্রতিবেদন লেখার প্রথার প্রচলন করতে হবে। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে যে সাধারণ গোপনীয় প্রতিবেদন ফরম ব্যবহার করা হয় তারও যথেষ্ট সংস্কারের প্রয়োজন। অতএব আমরা সুপারিশ করি যে, একটি বিস্তারিত গোপনীয় প্রতিবেদন নির্ধারণ করা হউক যাতে শিক্ষকদের কাজের প্রত্যেকটি দিক সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ করা যায়।

২০.১১৩. গোপনীয় প্রতিবেদন যতই সতর্কভাবে প্রণয়ন করা হউক না কেন, একমাত্র এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে শিক্ষকদের, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎকর্ষ বিচার করা সম্ভব হবে না। উৎকর্ষলাভের প্রচেষ্টায় যাতে কোনো শৈথিল্য দেখা না দেয়, সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থার অধীনে বিচার বিশ্লেষণ করে উক্ত প্রতিবেদন ছাড়াও বিশেষ যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার জন্য আমরা সুপারিশ করি যে, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করতে হবে যে পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা মোটামুটি সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক-দের একত্রে অর্ধেকের বেশি না হয়। অধিকন্তু, এই সীমার মধ্যেও প্রত্যেক শ্রেণীর পদের সংখ্যা এরূপ কড়াকড়িভাবে বেঁধে দেয়া উচিত হবে না, যাতে কোনো প্রকৃত দক্ষ ও যোগ্যতা-সম্পন্ন ব্যক্তির নিয়োগের পথ বন্ধ হতে পারে শুধু এই কারণে যে কোনো উপযুক্ত পদ খালি নেই।

২০'১১৪. সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের, বিশেষ করে কলেজ শিক্ষকদের, পদোন্নতির বেলায় অনেক সময় একটা অসুবিধা দেখা দেয় যাতে এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের শিক্ষকদের পদোন্নতির সমতা রক্ষা করা যায় না, তার কারণ প্রত্যেক বিভাগে বা বিষয়ের

সমসংখ্যক উপযুক্ত পদের ব্যবস্থা থাকে না। তাতে দেখা যায় যে, এক বিষয়ের শিক্ষক ৭/৮ বছরের মধ্যে পদোন্নতি পান অথচ অন্য বিষয়ের শিক্ষক উপযুক্ত পদের অভাবে ১০/১২ বছরেও পদোন্নতি পাচ্ছেন না, যদিও পদোন্নতির নিয়ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী শেষোক্ত শিক্ষকেরও পদোন্নতি লাভের কথা। এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে প্রয়োজনে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের পদ উন্নীত করে পূর্ববর্তী পদে নিয়োজিত শিক্ষককে পদোন্নতি দেবার ব্যবস্থা চালু করা যায়। উন্নীত পদ শূন্য হবার পর আবার পূর্বের নিচ পদে পরিণত হবে। তাতে কাঠামোর সাময়িক পরিবর্তন হলেও সংখ্যার পরিবর্তন হবে না, আর্থিক দিক দিয়ে নতুন পদ সৃষ্টির মত ব্যয় হবে না, অথচ পদোন্নতির বেলায় সকল বিভাগ/বিষয়ের শিক্ষকদের মধ্যে যথাসম্ভব সমতা রক্ষা করা যাবে।

শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধার প্রসঙ্গে

২০.১১৫. বর্তমানে সরকার কর্তৃক অনুদান দেয়া সত্ত্বেও বেসরকারী বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসায় কর্মরত শিক্ষকগণ এই ধরনের সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষকদের অনুরূপ আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পান না। প্রায় ক্ষেত্রে তাঁদের সবেতন ছুটির ব্যবস্থা নেই, যুক্তিসঙ্গত ভাড়ায় প্রয়োজনীয় বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই এবং সরকারী সাহায্যে পেশাগত দক্ষতা বাড়াবার সুযোগও নেই। অবসরকালীন আর্থিক সুবিধাও তাঁরা পান না। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই বেসরকারী হওয়ায়, শিক্ষকের এই নৈরাশ্যজনক অবস্থা জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে বাধ্য। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো রকম পরিবর্তন ফলপ্রসূ হতে পারে না। শিক্ষা-খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করে অতিসত্বর সরকারকে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করতেই হবে। কারণ এই অংশকে বাদ রেখে পুরো শিক্ষোন্নতি সম্ভব নয়। তবে যতটা সম্ভব বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবর্তন করা অত্যাবশ্যক। যে সব বেসরকারী স্কুল আর্থিক অনটনের জন্য শিক্ষকদের চাঁদার সমপরিমাণ অর্থ দিতে পারে না, সেখানে সরকারকে এ ব্যয় বহন করতে হবে। অবসরকালীন নিরাপত্তা অবশ্যই দান করতে হবে যাতে শিক্ষকগণ কর্মরত অবস্থায় তাঁদের সমস্ত শক্তি শিক্ষাদানে নিয়োগ করেন।

২০.১১৬. বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও কলেজের শিক্ষকদের অকাল মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসাজনিত পারিবারিক অর্থচিন্তা লাঘব করা, অবসরকালীন আর্থিক সাহায্য প্রভৃতি বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করা হোক। এই তহবিলে দেশের সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যেকেই বার্ষিক অন্তত পক্ষে আড়াই লাখ টাকা করে অনুদান দেবে। বাংলাদেশ টেক্সটবুক বোর্ড বার্ষিক চার লাখ টাকা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বার্ষিক একলাখ টাকা অনুদান দেবে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকগণও নির্দিষ্ট হারে এই তহবিলে বার্ষিক চাঁদা দেবেন। তদুপরি সরকার এই তহবিলে বার্ষিক আবর্তক মঞ্জুরী দেবে। এই অনুদান বার্ষিক পঁচিশ লাখ টাকার কম না হওয়া বাঞ্ছনীয়। তহবিলটির পরিচালনার জন্য একটি অছি পরিষদ থাকবে। তহবিল থেকে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্ম-চারীদের অবসর গ্রহণের সময় এককালীন আর্থিক সাহায্য ও দুর্ঘটনা বা দুরারোগ্য ব্যাধির যুক্তি-সঙ্গত চিকিৎসা ব্যয় এবং তাঁদের অকাল মৃত্যুতে তাঁদের পরিবারবর্গকে এককালীন আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হবে।

২০.১১৭. গবেষণা ও প্রশিক্ষণ শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন। বিদ্যালয় শিক্ষকগণের এখন প্রশিক্ষণের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা আরো নিয়মিত করা উচিত এবং কলেজের শিক্ষকগণকেও তাঁদের নিজের নিজের বিষয়ে অভিজ্ঞ ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

২০.১১৮. কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যাতে অধ্যয়ন, পর্যালোচনা ও গবেষণা অবলম্বন করেন, সে বিষয়ে তাঁদের সম্ভাব্য সকল প্রকার উৎসাহ দিতে হবে। এ প্রসঙ্গে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যাতে তাঁদের স্ব স্ব বিষয়ের সর্বশেষ উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারেন, সে জন্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মকালীন বা দীর্ঘ ছুটি কালীন সময়ে কোর্স প্রবর্তন করা উচিত। যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে তা চালু থাকবে। আর যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই কোর্স এখনো প্রবর্তিত হয়নি সে সকল বিশ্ববিদ্যালয় এই কোর্স সত্বর প্রবর্তন করা উচিত। পর্যায়ক্রমিক ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয় পরিক্রমা সম্পর্কে দশ থেকে বার সপ্তাহ ব্যাপী কোর্স প্রবর্তনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে একটি কেন্দ্রীয় গ্রীষ্মকালীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। প্রখ্যাত বাংলাদেশী এবং সময়ে সময়ে বিদেশী শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণ এই কোর্স পরিচালনা করবেন। কোর্স সমাপ্তির পর মূল্যায়ন শিক্ষকদের চাকুরি সংক্রান্ত স্থায়ী রেকর্ডের অন্তর্ভূত হবে। শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতির বেলায় এই রেকর্ড বিবেচনায় আসবে। বছরের বিভিন্ন সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে দীর্ঘ অবকাশ থাকে বলে শিক্ষকগণ নৈমিত্তিক ছুটি, অর্জিত ছুটি প্রভৃতি অন্যান্য পেশাজীবীদের চেয়ে কম পেয়ে থাকেন। কিন্তু গবেষণার ব্যাপারে নিরুদ্বেগে কাজ করার জন্য শিক্ষকদের ছুটি মঞ্জুর করার ব্যবস্থা থাকা দরকার। গবেষণা একজন শিক্ষককে শুধু তাঁর বিষয় সম্পর্কে ধারণাকে গভীর ও ব্যাপক করে না, উপরন্তু পেশাগত উৎকর্ষ অর্জনেও তাঁকে সাহায্য করে। সুতরাং গবেষণায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে শিক্ষককে প্রয়োজনীয় ছুটি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। কোনো অবকাশে শিক্ষক যদি পরীক্ষার কাজে নিয়োজিত হন তা হলে সেই সময়কাল তাঁর অর্জিত ছুটির জন্য বিবেচিত হবে।

অধ্যায় ২১

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

ভূমিকা

২১.১. সুষ্ঠু ও উন্নত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ব্যবস্থার সুসংহত ও কার্যকরীকরণ প্রক্রিয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত। এই প্রেক্ষিতে একটি শক্তিশালী শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকৃত সুদৃঢ় প্রশাসনিক ভিত্তিকে উত্তম শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিভিন্ন আর্থসামাজিক এবং কিছুটা ঐতিহাসিক কারণে বাংলাদেশে প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ভিত বেশ দুর্বল রয়ে গেছে। বর্তমানে দেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য ও বিশৃংখলার পরিবেশ বিরাজ করছে তার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে দায়ী।

২১.২. আধুনিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ পরিহার করে জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশাসনিক ও শিক্ষামূলক ক্ষমতা ও দায়িত্ব সর্বাধিক বিকেন্দ্রীকরণ। উত্তম শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থায় শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই নীতি প্রণয়ন করেন এবং তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব স্তরে স্তরে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত হয়। শিক্ষা প্রশাসনের সকল পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরই শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সামগ্রিক দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। আইনসিদ্ধ কাঠামোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকা পালন, শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত সম্পদ বণ্টন ও তার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহারের জন্য সুসমন্বিত ও সুসংহত ব্যবস্থাদি বিদ্যমান থাকে। প্রশাসনের সর্ব পর্যায়ে কলুষমুক্ত পরিবেশ বজায় রাখার ব্যবস্থাদি থাকে এবং প্রচলিত প্রশাসনিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন যাতে লঙ্ঘিত না হয় তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়। শিক্ষাদানের পরিবেশ সুশৃংখল রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের পদক্ষেপ থাকে এবং প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাতে শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সুষ্ঠু ও নিয়মমাফিক চালু থাকে তার জন্য শক্তিশালী তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়।

২১.৩. সুষ্ঠু ও উন্নত প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্বাধীনতা-পূর্বকালে বহু শিক্ষা কমিশন ও কমিটি শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য নানাবিধ সুপারিশ রাখে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের কোনো বিশেষ কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার সাধনের জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা পেশ করে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ঐ কমিশনের সুপারিশের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। অনুরূপভাবে, অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা রিপোর্টেরও (১৯৭৯) শিক্ষা প্রশাসনের সার্বিক বিকেন্দ্রীকরণসহ বহু সুপারিশ বহুলাংশে অবাস্তবায়িত থেকে গেছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার গতি প্রকৃতি মূলত ঔপনিবেশিক অবস্থার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এটা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা প্রশাসনের এরূপ পরিস্থিতি কোনো অবস্থাতেই যেমন একটি স্বাধীন দেশের উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারেনা তেমনি অন্যদিকে তা আমাদের শিক্ষার ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনেও সহায়ক হতে পারেনা। তাই বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস একান্তভাবে প্রয়োজন।

বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

প্রাথমিক শিক্ষা

২১.৪. বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উপজেলাসমূহের বেলায় উপজেলা পরিষদের উপর এবং মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনসমূহের এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বেলায় প্রাইমারী এডুকেশন কমিটিসমূহের উপর ন্যস্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে জারিকৃত আদেশে প্রাথমিক শিক্ষার জাতীয়নীতি, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও উন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষার মান, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, শিক্ষা উপকরণ, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুমোদন, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের পদ মঞ্জুরী ও সৃষ্টি, বেতন ভাতা, অবসরগ্রহণ ও পেনশন, গ্রাচুয়িটি, শিক্ষকদের আন্তঃউপজেলা বদলী বিষয়াদি সরকারের দায়িত্বরূপে চিহ্নিত করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার অবশিষ্ট বিষয়াদি উপজেলাসমূহের বেলায় উপজেলা পরিষদসমূহের নিকট এবং মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনগুলির এলাকাস্থ বিদ্যালয়ের বেলায় ১৯৮৩ সালের অক্টোবর মাসে জারিকৃত সংশোধিত আদেশ বলে প্রাথমিক এডুকেশন কমিটিগুলির উপর ন্যস্ত করেছে। এই বিষয়াবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কার্যাবলী, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির কাজকর্মের তত্ত্বাবধান, সরকারের অনুমোদনের জন্য বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান, শিক্ষকদের কার্যাবলী দেখাশোনা করা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা, পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষার অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং ১৯৬২ সালের রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিনান্সের বলে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ের প্রাইভেট স্কুলগুলির রেজিস্ট্রেশন অথরিটি হিসাবে দায়িত্ব পালন।

২১.৫. উপজেলা পরিষদকে উপরিউক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা করার জন্য প্রত্যেক উপজেলায় ৯/১০ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে। এর সদস্যরা হলেন:

> (১) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান (সভাপতি), (২) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সহসভাপতি), (৩) উপজেলা এডুকেশন অফিসার (সদস্য-সচিব), (৪) উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার, (৫) উপজেলায় পৌরসভা থাকলে তার চেয়ারম্যান, (৬) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, (৭) ও (৮) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, (৯) উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত একজন প্রধান শিক্ষক এবং (১০) উপজেলাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত তাঁদের মধ্যে একজন চেয়ারম্যান।

২১.৬ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মিউনিসিপাল করপোরেশন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে জারিকৃত আদেশ পরিবর্তন করে ১৯৮৩ সালে অক্টোবর মাসে জারিকৃত আদেশ বলে প্রাইমারী এডুকেশন কমিটি নামে অভিহিত কমিটিসমূহের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে।

২১.৭. এই কমিটিগুলির গঠন ও প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। ঢাকা মিউনিসিপাল করপোরেশন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য গঠিত কমিটিতে রয়েছেন: (১) মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (সভাপতি), (২) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা (সহ-সভাপতি), (৩) এলাকার প্রাইমারী এডুকেশন অফিসার (সদস্য-সচিব), (৪) সরকার কর্তৃক মনোনীত এলাকাস্থ একজন থানা শিক্ষা অফিসার, (৫) ও (৬) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এলাকাস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, (৭) ও (৮) এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত তাঁদের মধ্য থেকে দুজন প্রধান শিক্ষক এবং (৯) ও (১০) এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের মধ্য থেকে নির্বাচিত দু'জন চেয়ারম্যান।

২১.৮. চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মিউনিসিপাল করপোরেশনসমূহের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে কমিটিগুলির ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলিতে রয়েছেন: (১) এলাকাস্থ প্রাইমারী এডুকেশন অফিসার (সভাপতি), (২) সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সহসভাপতি, (৩) এলাকাস্থ একজন থানা এডুকেশন অফিসার-যিনি সরকার কর্তৃক মনোনীত হবেন, (৪) ও (৫) চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত এলাকাস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী, (৬) ও (৭) এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত দুজন প্রধান শিক্ষক এবং (৮) ও (৯) এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ম্যানেজিং কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানবৃন্দের মধ্য থেকে নির্বাচিত দুজন চেয়ারম্যান।

২১.৯. উপরোক্ত কমিটিগুলি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মিউনিসিপাল করপোরেশন-সমূহের এলাকাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে উপজেলা পরিষদের উপর ন্যস্ত দায়িত্বের ন্যায় তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বহন করে।

২১.১০. প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থাও রয়েছে, যার অন্তর্ভুক্ত থাকেন: (১) ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা বা মিউনিসিপাল করপোরেশনের ওয়ার্ড মেম্বার, (২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, (৩) বিদ্যালয়ের এলাকাস্থ একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, (৪) এরূপ একজন মহিলা, (৫) একজন দাতা বা হিতৈষী, (৬) নিকটবর্তী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং (৭) সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ কর্তৃক তাঁদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত একজন শিক্ষক। ৩, ৪ ও ৫ নং-এ উল্লেখিত ব্যক্তিবৃন্দ উপজেলাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেলায় উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা বা মিউনিসিপাল করপোরেশনের বেলায় এসব সংস্থা মনোনয়ন দান করে। সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদাধিকার বলে কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং ম্যানেজিং কমিটি সদস্যবৃন্দ তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন।

২১.১১. প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির দায়িত্বের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা, বিদ্যালয়ের কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তাদান এবং অন্যান্য কাজকর্মের জন্য কমিটিকে দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

২১.১২. উপজেলাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগ ও শিক্ষকদের পদোন্নতি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তিবর্গ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন ও পদোন্নতি কমিটির ব্যবস্থা প্রত্যেক উপজেলার জন্য রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থায় কমিটিতে রয়েছেন: (১) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান (সভাপতি), (২) উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সদস্য-সচিব), (৩) ও (৪) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একজন প্রধান শিক্ষক এবং একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং (৫) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মনোনীত উপজেলাস্থ একজন কর্মকর্তা।

২১.১৩. মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী যদি না পাওয়া যায় তা হলে উপজেলাস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে সবচেয়ে ভাল বিবেচিত একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে কমিটিতে রাখার ব্যবস্থা আছে।

২১.১৪. প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার তথ্যাদি নিচে দেখা যেতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সরকারী	..	৩৬,৭২২
	বেসরকারী	..	৭,৪৭৮
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের সংখ্যা	সরকারী	..	১,৫৭,১৭৪
	বেসরকারী	..	৩১,০০০
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা	..	..	১,০১,০০,০০০
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	..	..	৪৬০
থানা শিক্ষা অফিসার ..	..	..	২১
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	..	..	১,৮৫০
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	..	..	৬৪
সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার		..	৬৪
বিভাগীয় উপপরিচালক ..		..	৪
বিভাগীয় সহকারী পরিচালক		..	৪

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

মহাপরিচালক	..	..	..	১
পরিচালক ..	..	..	..	৩
উপপরিচালক	..	..	..	৮
সহকারী পরিচালক	..	..	..	১৭
সিনিয়র বিশেষজ্ঞ	..	..	..	২
বিশেষজ্ঞ	..			৪

শিক্ষা অফিসার	..	..	..	৯
গবেষণা অফিসার	..	..	..	৬
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	..	..	..	২

মাধ্যমিক শিক্ষা, কলেজ শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা

(ক) সাধারণ মাধ্যমিক শিক্ষা

২১.১৫. বর্তমানে আমাদের দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার কাঠামো হল: নিম্নমাধ্যমিক ৩ বছর (৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণী), মাধ্যমিক ২ বছর (৯ম ও ১০ম শ্রেণী) ও উচ্চ মাধ্যমিক ২ বছর (১১শ ও ১২শ শ্রেণী), মোট (৩+২+২) ৭ বছর এবং এই পর্যায়ে প্রায় দশ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিস্তারিত নিচে দেখা যেতে পারে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা

সরকারী	..	..	..
বেসরকারী	..	..	২,৫৮৮
মোট	..	..	২.৫৮৮

নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

পুরুষ	..	..	১,৯০,৯৭৪
মহিলা	..	..	১,২৩,৫৫৯
মোট	..	..	৩,১৪,৫৬৩

নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা

পুরুষ	..	..	১৫,৪৫৭
মহিলা	..	..	১,৩৫৯
মোট	..	..	১৬,৮১৬

মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা

সরকারী	..	..	২১৬
বেসরকারী	...	..	৭,০৫৩
মোট	..	..	৭,২৬৯

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা

পুরুষ	১৬,৩১,০১৭
মহিলা	৭,৪৪,১৪৯
মোট	২৩,৪৫,১৬৬

মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা

পুরুষ	৭৭,১৩৬
মহিলা	৮,৩৫৯
মোট	৮৫,৪৯৫

উচ্চ মাধ্যমিক (ইন্টারমেডিয়েট) কলেজের সংখ্যা

সরকারী	১০
বেসরকারী	২৮১
মোট	২৯১

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

পুরুষ	৬৯,০৫১
মহিলা	২৩,৫৩৫
মোট	৯২,৫৮৬

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষকের সংখ্যা

পুরুষ	৩,৬২১
মহিলা	৫১২
মোট	৪,১৩৩

এখানে শুধুমাত্র ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা, শিক্ষার্থীর ও শিক্ষকের সংখ্যা দেখানো হয়েছে—এ ছাড়া ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজের সঙ্গে ইণ্টারমিডিয়েট শাখা রয়েছে।

(খ) সাধারণ কলেজ শিক্ষা

২১.১৬. বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণ কলেজ শিক্ষার কাঠামো হল ২ বছর মেয়াদী পাস ডিগ্রী, ৩ বছর মেয়াদী অনার্স ডিগ্রী এবং ২/১ বছর মেয়াদী মাস্টার্স ডিগ্রী, অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক ক্লাসের পরে ৪ বছরের শিক্ষা। অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রীর জন্য শিক্ষা সাধারণত

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে দেয়া হয়। তবে দেশের ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে ৪৩টি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্সে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। আর ১২টি কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। দেশের ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজে স্নাতক পর্যায়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এই ডিগ্রী কলেজগুলির শিক্ষকের সংখ্যা এগার হাজার পাঁচ শ। ডিগ্রী কলেজের শিক্ষকগণ স্নাতক পর্যায় ছাড়াও ইণ্টারমিডিয়েট পর্যায়ে (উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) শিক্ষাদান করেন। উপরোক্ত ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজের মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলিসহ সরকারী কলেজের সংখ্যা ১৬১, বাকি ২৯০টি বেসরকারী কলেজ।

(গ) মাদ্রাসা শিক্ষা

২১.১৭. বর্তমানে দেশের দাখিল থেকে কামিল পর্যন্ত শিক্ষাদানের জন্য বিভিন্ন স্তরের প্রায় ৩৫০০ মাদ্রাসা রয়েছে। এসকল মাদ্রাসাতে প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজারের মত শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষকের সংখ্যা ৩২ হাজারের মত। তা ছাড়া দেশে প্রায় তের হাজারের উপর ইবতেদায়ি মাদ্রাসা আছে, যাতে ২০ লাখের মত ছাত্র পড়াশোনা করে এবং প্রায় ৫৪ হাজার শিক্ষক এই সকল মাদ্রাসায় শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

(ঘ) সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট

২১.১৮. দেশে ১৬টি সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে রয়েছে, যার ছাত্র সংখ্যা ৩,৬২০ এবং শিক্ষকের সংখ্যা ১১১ জন।

২১.১৯. উপরের অনুচ্ছেদসমূহে দেখা যাবে যে, মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষার যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেশে রয়েছে তার প্রায় ৯০ ভাগই বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

২১.২০. মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। এই অধিদপ্তরের অধীনে দেশে ৮টি আঞ্চলিক উপ-অধিদপ্তর এবং ৬৪টি জেলাতে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস রয়েছে। এ সবের বর্তমান কাঠামো নিম্নরূপ:

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর

মহাপরিচালক	১
পরিচালক	২
উপপরিচালক	৭
সহকারী পরিচালক	১৩
লাইব্রেরী উন্নয়ন অফিসার	১
শিক্ষা অফিসার	৭
গবেষণা অফিসার	৪
হিসাবরক্ষণ অফিসার	১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১

আঞ্চলিক উপ-অধিদপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও রংপুর

উপপরিচালক	...	..	..	৮
পরিদর্শক	..	..	..	৮
পরিদর্শিকা	..	..	..	৮
সহকারী পরিদর্শক	..	..	..	৮

৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস

জেলা শিক্ষা অফিসার	..	..	..	৬৪
সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার				৬৪

২১.২১. মাধ্যমিক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও কলেজ শিক্ষার সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত বিধায় এই সকল স্তরের সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার সম্পূর্ণ ভার এ অধিদপ্তরের। অপরদিকে এই সকল শিক্ষার ও স্তরের শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বলে তাদের পরিচালনার ভার আইনত যথাক্রমে ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডিসমূহের। অতএব ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডির উপর এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সরকার বেসরকারী নিম্নমাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রত্যেকের বেতন বাবদ প্রারম্ভিক বেতনের ৭০ ভাগ, বাড়িভাড়া ১০০ টাকা ও চিকিৎসা ভাতা ১০০ টাকা প্রদান করে। অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি বাবদ সরকার অর্থ মঞ্জুর করে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠক্রমিক ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচী বাবদ সরকার যে অনুদান প্রদান করে তা পর্যাপ্ত নয়। আর্থিক অপ্রতুলতার কারণে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম নানা ভাবে বিঘ্নিত হয়।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

২১.২২. বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে একটি কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ, একটি কলেজ অব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী (ছাত্র সংখ্যা ৪৮৪), একটি কলেজ অব লেদার টেকনোলজী (ছাত্র সংখ্যা ১০৯), একটি গ্রাফিক আর্টস ইনস্টিটিউট (ছাত্র সংখ্যা ১১৭), একটি গ্লাস এণ্ড সিরামিক ইনস্টিটিউট (ছাত্র সংখ্যা ৪৯), ১৮টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট (ছাত্র সংখ্যা ১১,৮৮১), ৫৪টি ভোকেশনাল (বৃত্তিমূলক) ইনস্টিটিউট (শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৩০০) এবং একটি ভি,টি,টি,আই প্রতিষ্ঠানে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিও কারিগরি অধিদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্তমানে একটি স্বায়ত্তশাসিত কাউন্সিলের আওতায় এই কলেজগুলির প্রত্যেকটিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বি,আই,টি) নামে অভিহিত করে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

২১.২৩. কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে তার বর্তমান কাঠামো নিম্নরূপ:

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

মহাপরিচালক	..	..	..	১
পরিচালক	..	..	..	২
সহকারী পরিচালক	..	..	..	৭
হিসাবরক্ষণ অফিসার	..	..	..	১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	..	..	..	১

আঞ্চলিক পরিদর্শন অফিস

আঞ্চলিক পরিদর্শক	..	..	..	৪
সহকারী আঞ্চলিক পরিদর্শক		..	..	৪

উচ্চ শিক্ষা: বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

২১.২৪. ১৯৪৭ সালে এই উপমহাদেশ বিভাগের পর বর্তমান বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার সকল প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন হয়। এর পর ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে রাজশাহী বিভাগের সকল কলেজ এবং সাবেক বরিশাল জেলা (পরে সাবেক পটুয়াখালি জেলাও) ছাড়া খুলনা বিভাগের সকল কলেজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সকল কলেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে নেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীনে থেকে যায় ঢাকা বিভাগে কলেজগুলি এবং সাবেক বরিশাল জেলার (সাবেক পটুয়াখালিসহ) কলেজগুলি। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে স্থাপিত এবং এর আওতাধীনে কোনো কলেজ নেই।

২১.২৫. এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ছাড়াও ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নামে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বাংলাদেশ ইউনিভারসিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেকনোলজী) নামে একটি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। দেশের সপ্তম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছে। সিলেটে দেশের অষ্টম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ এগিয়ে চলেছে। দেশের নবম বিশ্ববিদ্যালয় খুলনায় স্থাপনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া শুরু হয়েছে।

২১.২৬. দেশের সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হয়। এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'হাজার ত্রিশ জন শিক্ষক রয়েছেন।

২১.২৭. দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম এই ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। মেডিকেল কলেজগুলি স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের আইন কলেজগুলি উপরোক্ত ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেসরকারী কলেজ।

২১.২৮. সাম্প্রতিককালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিকে উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ৩টির আওতা থেকে বের করে প্রত্যেকটিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বি.আই.টি) নামে একটি কাউন্সিলের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

২১.২৯. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থায় সিনেট, সিণ্ডিকেট, ফাইনান্স কমিটি, একাডেমিক কাউন্সিল, কারিকুলাম এণ্ড সিলেবাস কমিটিসমূহ, বোর্ড অব এডভান্স স্টাডিস, সিলেকশন বোর্ড/কমিটি ইত্যাদি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ আর্থিক ব্যাপারে সরকারের উপর নির্ভরশীল। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বাজেটের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ অর্থ সরকারের নিকট থেকে আসে। তাদের আয় খুবই সীমিত।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২১.৩০. ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের দায়িত্ব হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন নিরূপণ এবং এই শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বিরচন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ, সরকার থেকে আর্থিক মঞ্জুরী গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনানুসারে তা বরাদ্দকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তথা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ অথবা বিশেষ কোনো কলেজকে ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা অর্পণের বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দান এবং সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নের ভূমিকা পালন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বাজেটের পুরা অর্থ সরকার থেকে আসে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড

২১.৩১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় দেশে ৪টি—ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর-সাধারণ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এ ছাড়া একটি কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং একটি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। এই বোর্ডগুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে। এদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য বোর্ড, একাডেমিক কাউন্সিল, এফিলিয়েশন কমিটি ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের কমিটি রয়েছে। শিক্ষা বোর্ডগুলি নিজেদের আয়ের উপরই নির্ভরশীল। সরকারের নিকট থেকে তাদের কোনো অনুদান দেয়া হয় না—প্রয়োজনও হয়না।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড

২১.৩২. প্রাথমিক শিক্ষার স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, প্রকাশ, রচনা, বিতরণ ইত্যাদির জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড নামে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনে রয়েছে বোর্ড ও বিভিন্ন কমিটি। এই বোর্ডও নিজের আয়ের উপর নির্ভরশীল, সরকারের তরফ থেকে কোনো অনুদান দেয়া হয় না, প্রয়োজনও হয় না।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২১.৩৩. এ ছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে

(১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেশন, এক্সটেনশন এণ্ড রিসার্চ (নিয়েয়ার) নামে একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান,

(২) বাংলাদেশ এডুকেশনাল ইকুইপমেন্ট বোর্ড নামে একটি শিক্ষা উপকরণ বোর্ড,

(৩) বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এণ্ড স্টাটিস্টিকস (বেনবেইস) নামে একটি প্রতিষ্ঠান,

(৪) বাংলাদেশ-ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড) নামে একটি প্রতিষ্ঠান, এবং

(৫) ইন্সপেকশন এণ্ড অডিট নামে একটি অধিদপ্তর এবং ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেন্ট নামে অন্য একটি বিভাগ শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে।

এগুলি সবই সরকারী প্রতিষ্ঠান। সুতরাং সরকারের নিয়ম-কানুনে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে।

২১.৩৪. উপরের অনুচ্ছেদগুলিতে বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা

২১.৩৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস কিভাবে করা হবে তার জন্য সুপারিশ রাখার আগে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার দোষত্রুটিগুলি চিহ্নিত করা প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রধান ত্রুটিসমূহ মোটামুটিভাবে নিম্নরূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে:

(ক) বর্তমানে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার আয়তন ও কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করা হয়েছে এবং বাধ্যতামূলক করার বিষয় বিবেচনাধীন। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় ৪৫ হাজার, শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ২ লাখে পৌঁছেছে। আর শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটির উপর। বর্তমানে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা দেড় কোটির মত। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার বর্তমান সংখ্যা ১৩ হাজারের উপর, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০ লাখের মত এবং ৫৪ হাজার শিক্ষক এই সকল মাদ্রাসায় শিক্ষা কার্যে নিয়োজিত আছেন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বর্তমান সংখ্যা প্রায় দশ হাজার, শিক্ষকের সংখ্যা ১ লাখ ৬ হাজারের মত এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২৮ লাখ। দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা ৩ হাজার ৫ শ, শিক্ষকের সংখ্যা ৩২ হাজারের মত। এ সকল মাদ্রাসায় প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিপ্লোমা স্তরে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৮৮ এবং শিক্ষার্থীর

সংখ্যা প্রায় ১৮ হাজার। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে ৭৪২টি সাধারণ কলেজ, ৮টি মেডিকেল কলেজ, ৪টি বি, আই, টি, এবং নতুন ২টি বিশ্ববিদ্যালয় সহ ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। এ সমস্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৭ হাজারের মত শিক্ষক শিক্ষাকর্মে নিয়োজিত আছেন। তদুপরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বি,আই,টি কাউন্সিল, ৬টি সাধারণ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডসহ আরো অন্যান্য ৪টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তদুপরি রয়েছে ৩টি অধিদপ্তর ও ২টি পরিদপ্তর। শিক্ষা ক্যাডারের আয়তন ও কলেবরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা ক্যাডারে পদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। তদুপরি বিপুল সংখ্যক নন-ক্যাডার পদ রয়েছে। সকল স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু সেগুলির ব্যবস্থাপনার জন্য সে অনুপাতে জনবল বৃদ্ধি পায়নি ও সম্প্রসারণ ঘটেনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি/দুটি শাখার পক্ষে শিক্ষার এতবড় ক্যাডার সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সাথে পরিচালনা সম্ভব নয়। কাজেই সিডিউল প্রকাশ, গ্রেডেশন তালিকা চূড়ান্তকরণ, পদোন্নতি ও নতুন নিয়োগের মাধ্যমে শূন্য পদপূরণ, আত্তীকরণ প্রক্রিয়া নিয়মিত সময়ে সম্পন্নকরণ প্রভৃতি কাজ সময়মত হচ্ছেনা, সমস্যা কেবল স্তূপীকৃতই হচ্ছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলেমেয়ের সংখ্যা বর্তমানে সোয়া দুকোটি। আগামী দশ বছরের মধ্যে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এ সংখ্যা আড়াই কোটির উপরে দাঁড়াবে। এই বিপুল সংখ্যক ছেলেমেয়ের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য একটি শিক্ষা বিভাগ এবং কেন্দ্রীভূত প্রশাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তিনটি পৃথক ও স্বতন্ত্র বিভাগ এবং বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থা অধিকতর কাম্য।

(খ) প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার একটি প্রধান ত্রুটি। বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর রয়েছে। প্রথমোক্ত অধিদপ্তরের দেশের ৪টি বিভাগীয় সদরে ৪টি বিভাগীয় অফিস এবং ৬৪টি জেলা সদরে ৬৪টি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদ ও মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনগুলির এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে প্রাইমারী এডুকেশন কমিটির উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এই জন্য দেশের ৪৬০টি উপজেলায় ৪৬০ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ১৮৫০ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ২১টি থানায় ২১ জন থানা শিক্ষা অফিসারের ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, এর ৮টি আঞ্চলিক উপ-অধিদপ্তর দেশের ৮টি অঞ্চলে অবস্থিত এবং ৬৪টি জেলা সদরে ৬৪টি জেলা শিক্ষা অফিস অবস্থিত। এই উপ-অধিদপ্তরগুলির দায়িত্ব শুধু স্কুল পর্যায়ের (দশম শ্রেণী পর্যন্ত) ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তদুপরি এ উপ-অধিদপ্তরগুলিকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে তা সীমিত এবং তা দায়িত্বের সঙ্গে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে উপ-অধিদপ্তরগুলিকে স্কুল ও মাদ্রাসা পর্যায়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে অধিকাংশ বিষয়ে ঢাকাস্থ সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। অপর দিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর সরাসরি কলেজসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে দায়িত্ব বহন করে। কলেজ-সমূহকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে যে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তা সীমিত বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কলেজসমূহকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের এবং তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকতে হয়। এতে

কলেজ-সমূহের কাজের অগ্রগতিতে বাধা পড়ে এবং তাদের পরিচালনা কার্য সুষ্ঠুভাবে অগ্রসর হতে পারেনা। দেশের কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইনস্টিটিউটগুলি প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে সরাসরি কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে অর্পিত ক্ষমতা সীমিত বলে এসব বিষয়ের অধিকাংশ ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও তার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন নিতে হয়। ফলে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং তাদের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এসব কারণে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি বিশেষ ত্রুটি বলে পরিগণিত হয়ে আসছে।

(গ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে মন্ত্রণালয়ে ও অধিদপ্তরসমূহে বিভক্তিজনিত অপচয় ও একই কাজের পুনরাবৃত্তি আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার জন্য একটি প্রধান ত্রুটি। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষা অধিদপ্তর ও কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর—এই তিনটি অধিদপ্তর রয়েছে। সাধারণত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হচ্ছে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সাধারণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থ বরাদ্দকরণ, আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়াবলী, শিক্ষা ও সাংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদসমূহে নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়। আর শিক্ষা অধিদপ্তরগুলির দায়িত্ব হচেছ শিক্ষানীতি ও শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষানীতিকে বাস্তব রূপদান, শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং মোটামুটিভাবে শিক্ষা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। বাস্তবক্ষেত্রে উপরিউক্ত শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা অতীতেও কার্যকর হয়নি বা করা সম্ভব হয়নি এবং বর্তমানেও কার্যকর হচেছনা এবং পরবর্তিত পরিস্থিতিতেও ভবিষ্যতেও সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়না। বরং শিক্ষামন্ত্রণালয় ও শিক্ষা অধিদপ্তরগুলিতে একই কাজের পুনরাবৃত্তি বহুকাল থেকে চলে আসছে। সুতরাং শিক্ষা অধিদপ্তরগুলির দায়িত্ব এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সম্ভব নয়। ফলে শিক্ষামন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তরগুলিতে আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার যে বিভক্তিতা অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

(ঘ) প্রশাসকদের রক্ষণশীল মনোভাব এবং প্রশাসনিক মানের অবনতি আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে পঙ্গু করার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এ পর্যন্ত যা দেখা গেছে তাতে বলা যায় যে, শিক্ষা দপ্তর বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পদসমূহ সাধারণ প্রশাসন বিভাগের ব্যক্তিরাই পূরণ করেছেন। শিক্ষা বিভাগের ব্যক্তিদের অধিদপ্তরগুলি ব্যতীত উপরোক্ত পদসমূহে বিশেষ কোনো স্থান হয়নি এবং অধিদপ্তরগুলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বলে শিক্ষাক্ষেত্রে শেষোক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়েছে। অথচ এই সিদ্ধান্ত যাঁরা নেন শিক্ষা ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা প্রশাসনের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি সাধারণত তাঁরা নন। তাই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন সব সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যা মোটেই শিক্ষার সহায়ক হয় না, বরং প্রশাসকদের রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচায়ক হয়।

(ঙ) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগ্য প্রশাসকের অভাবও রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষা বিভাগের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয়না। শিক্ষকদের দ্বারা সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রের পদগুলি পূরণ করা হয়। এই শিক্ষকদের সাধারণ প্রশাসনিক বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা অপর্যাপ্ত। এমনকি শিক্ষা প্রশাসন বিভাগের নিচের স্তরে সরাসরিভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরও পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। এর ফলে শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাপনার যতটা কার্যকর পন্থা গ্রহণ করা উচিত ততটা কার্যকর পন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

(চ) শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং একই অধিদপ্তরের বিভিন্ন বিভাগ ও স্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। স্কুল ও পরিদর্শন বিভাগ এবং কলেজ বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। তেমনি স্কুল ও পরিদর্শনের একই বিভাগের বিভিন্ন স্তরের সত্যিকারের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব। স্কুল ও পরিদর্শন এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার পরিপন্থী।

(ছ) শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ব্যবস্থা কেবল উচ্চ পর্যায়কে যথা মর্যাদা দান এবং আনুপাতিক ভাবে নিচের স্তরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন অন্যতম প্রধান ত্রুটি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষা অধিদপ্তর সমূহে মহাপরিচালকবৃন্দের পদ ছাড়া বর্তমানে মর্যাদার দিক দিয়ে শিক্ষা বিভাগের নিচের স্তর সমূহের পদগুলির আমাদের সামগ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেই। ফলে কার্য ক্ষেত্রে তাঁরা উপযুক্ত স্থান পান না বলে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকা নেয়ার সুযোগ ঘটে না। স্বভাবতই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার উপর এর প্রতিকূল প্রতিফলন ঘটে।

(জ) শিক্ষা প্রশাসনে ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিজস্ব অফিস ও বাসস্থান এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনার কাজে নানা অসুবিধা ও বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এতে তাঁদের কাজের ক্ষতি ঘটে ও অগ্রগতি বিঘ্নিত হয়।

(ঝ) প্রতিনিধিমূলক আইন পরিষদের মাধ্যমে শিক্ষা সংস্কারের প্রস্তাবের পরিবর্তে প্রশাসনিক আদেশ বলে শিক্ষানীতি প্রবর্তন করার প্রবণতা আমাদের শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। শিক্ষা নীতি যে জাতীয় নীতিসমূহের একটি অপরিহার্য অংশ তা অনুধাবন করা হয় না বলে উপরোক্ত প্রবণতা বিদ্যমান। শিক্ষানীতিকে যতদিন জাতীয় নীতিসমূহের অংশ হিসাবে গুরুত্ব দেয়া না হবে ততদিন শিক্ষা নীতি সুষ্ঠু বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না।

২১'৩৬. উপরিউক্ত সাধারণ সমস্যাবলী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রধান প্রশাসনিক ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ:

প্রাথমিক শিক্ষা

- প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব বর্তমানে উপজেলা কর্তৃপক্ষ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক যুগ্মভাবে পরিচালিত হওয়ার কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা ও সমন্বয়ের অভাব।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুর্বল ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকার জন্য বিদ্যালয় পরিচালনার স্থানীয় জনগণের উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাব।
- অনিয়মিত পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের উচ্চ হারে অনুপস্থিতি।
- ত্রুটিপূর্ণ প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সম্পদ সংরক্ষণের কার্যকরী নিরাপত্তার অভাব।
- কিণ্ডার গার্টেন ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে না থাকা।

- কেন্দ্রীয়ভাবে পুস্তক মুদ্রণ ও বিতরণ ব্যবস্থা।
- বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রাপ্ত অর্থের অপর্যাপ্ততা।
- উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের অন্যান্য সার্ভিসের কর্মকর্তাদের তুলনায় নিম্ন বেতন স্কেল ও মর্যাদা প্রদান।

মাধ্যমিক শিক্ষা

- স্কুল পরিচালনার সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী শিক্ষা কোডের অনপস্থিতি।
- বেসরকারী বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তার অভাব।
- বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী অর্থ সাহায্য প্রদান ব্যবস্থার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ।
- বিদ্যালয়সমূহের অনিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা।
- ত্রুটিপূর্ণ ও অনিয়মিত স্কুল অডিট পদ্ধতি।
- বিদ্যালয় প্রধানদের অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা।
- সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুনের অভাবে সরকারী স্কুলসমূহের সময়মত শিক্ষকদের পদোন্নতি ও শূন্যপদ পূরণে জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা।

কলেজ শিক্ষা

- কলেজ অধ্যক্ষগণের কার্যকরী প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের অপর্যাপ্ততা।
- বেসরকারী কলেজে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সরকারী অনুদান প্রদানের জটিলতা।
- নিয়মিত কলেজ পরিদর্শন ও কলেজ তহবিল অডিটের অব্যবস্থা।
- কলেজ অঙ্গনে নানা কারণে বিপর্যস্ত শৃংখলা পরিস্থিতি।
- কলেজ গভর্নিং বডিসমূহের সংগঠন ও পরিচালনায় অনিয়ম।
- কলেজের প্রশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের যথা শিক্ষা বোর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, গভর্নিং বডি, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন ইত্যাদি কাজের সমন্বয়ের অভাব।
- সরকারী কলেজসমূহের নিষ্ক্রিয় গভর্নিং বডি
- কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব।

মাদ্রাসা শিক্ষা

- মাদ্রাসার অধ্যক্ষদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাব।
- মাদ্রাসা গভর্নিং বডি সংগঠন ও পরিচালনা সম্পর্কিত জটিলতা ও অনিয়ম।
- মাদ্রাসা পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানে বিশেষ কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকা।
- উচ্চতর মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে মাদ্রাসা বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা।
- মাদ্রাসা তহবিল নিয়মিত অডিটের ব্যবস্থা না থাকা।
- কলেজের ন্যায় গভর্নিং বডিতে মাদ্রাসার অধ্যক্ষগণের সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ না থাকা।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

- ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের জন্য প্রণীত আইনগুলির আওতাধীন সিনেট ও সিন্ডিকেট গঠন এবং উপাচার্য ও ডীন নির্বাচন এবং বিভাগীয় চেয়ারম্যান মনোনয়ন ইত্যাদি সংক্রান্ত নিয়ম, রীতি ও পদ্ধতির ফলে উদ্ভূত সমস্যাবলী।
- ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশে কমিশনকে যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ও আইনগুলিতে তার প্রতিফলন না ঘটার ফলে কমিশনের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের টানাপোড়ান সংক্রান্ত সমস্যা।

২১.৩৭. উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ এবং সমাজের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমাদের বর্তমান প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির পুনর্বিন্যাস জরুরী হয়ে পড়েছে। এই শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা প্রধান প্রধান ত্রুটি দূরীকরণার্থে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন:

সুপারিশ

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

২১.৩৮. বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি এবং শিক্ষার অতীত ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি বিশ্লেষণের আলোকে বর্তমান সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি একটি বলিষ্ঠ ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক পরিধি, বিশাল প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং বিপুল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার নিরিখে সুষ্ঠু প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের কিছু কিছু সংস্কার ও সংশোধনের প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান ব্যবস্থা গৃহীত হলেও প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তিত ব্যবস্থাপনা তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

২১.৩৯. বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উপজেলা পরিষদের সঙ্গে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাজের সম্পর্ক উপজেলার অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাদের থেকে পৃথক হয়ে পড়েছে। উপজেলা পরিষদের আওতায় শিক্ষা বিভাগ ব্যতীত কৃষি, স্বাস্থ্য, তথ্য ও অন্যান্য বিভাগও রয়েছে

কিন্তু উপজেলা পরিষদ শিক্ষা বিভাগের মত অন্যান্য বিভাগের স্থানীয় কর্মচারীদের নির্বাচন, নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতি সম্পর্কিত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করে না। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির মত জটিল কাজগুলি উপজেলা পরিষদকে সম্পাদন করতে হয়। এর ফলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ঈপ্সিত লক্ষ্য বাস্তবায়ন অপেক্ষা উপজেলা পরিষদ প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির ব্যাপারে বেশি ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া পরিষদের নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় হওয়ায় গ্রামীণ জীবনসূত্রে শিক্ষকগণের সঙ্গে নানা সূত্রে পরস্পর সম্পর্কিত। শিক্ষক নির্বাচন, নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর ব্যাপারে শিক্ষকগণের মধ্যে তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে অতিক্রমের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষকগণ তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন কিনা তা তত্ত্বাবধান এবং সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা উপজেলা পরিষদের দায়িত্ব। আবার উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণ পরিষদের অধীন হওয়ায় দোষী ও দায়িত্বহীন শিক্ষকের বিরুদ্ধে স্বাধীনভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না।

২১.৪০. উপরে বর্ণিত বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(১) বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনের জন্য উপজেলার নির্বাচন ও পদোন্নতি কমিটি রয়েছে। শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়টি কোনো স্থানীয় সংস্থা বা কমিটির উপর ন্যস্ত না করে উপরের পর্যায়ে স্থায়ী কমিটির উপর ন্যস্ত করা উচিত হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্বাচনের বেলায় ৪৬০টি উপজেলার ও ২১টি থানাতে নির্বাচনী কমিটিগুলি যোগ্যতা অভিজ্ঞতা, আইন-কানুন ও আইনের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ব্যাপারে পরস্পর ভিন্নধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। জাতীয়মান রক্ষার্থে ও প্রাথমিক শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে যাতে নির্বাচন ও নিয়োগের নিয়ম এবং আইন প্রয়োগে সমতা রক্ষিত হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য জেলা পর্যায়ে একটি শিক্ষক নির্বাচনী কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি নিম্নোক্তরূপে গঠিত হতে পারে:

সভাপতি

(১) সরকার কর্তৃক দু বছরের জন্য মনোনীত ডিগ্রী কলেজের একজন অধ্যক্ষ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান শিক্ষা বিভাগ/প্রস্তাবিত প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এই মনোনয়ন দানের দায়িত্ব পালন করবেন।

সদস্য সচিব

(২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার।

সদস্যবৃন্দ

(৩) উপজেলা পরিষদগুলির চেয়ারম্যানদের মধ্যে এক একজন চেয়ারম্যান একের পর এক করে নির্বাচনী কমিটিতে সদস্য হিসাবে বসবেন। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্যে কে প্রথম, কে দ্বিতীয়, কে তৃতীয় ইত্যাদি করে সদস্য হিসাবে নির্বাচনী কমিটিতে বসবেন তা উপজেলার নামের আদ্যক্ষর নিয়ে ঠিক করা হবে।

(৪) ও (৫) জেলাস্থ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের মধ্য থেকে বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর প্রধান কর্তৃক দু বছরের জন্য মনোনীত একজন প্রধান শিক্ষক ও একজন প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

(৬) জেলাস্থ পি,টি,আই,-এর সুপারিনটেনডেন্ট। কোনো জেলায় পি,টি,আই না থাকলে জেলাস্থ জেলা শিক্ষা অফিসার সদস্য হবেন।

(৭), (৮) ও (৯) সরকার কর্তৃক দু বছরের জন্য মনোনীত ৩ জন শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এই মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিবর্গ বাছাই ও নির্বাচনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। এই পরীক্ষার ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। অবশ্য প্রত্যেক জেলাতে পরীক্ষার কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

পরীক্ষার ব্যবস্থা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রশ্নমালা তৈরি করার ব্যাপারে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন-নেইপ)কে দায়িত্ব প্রদান করতে পারে। পরীক্ষা গ্রহণ ও পরিচালনার জন্য প্রত্যেক জেলার কেন্দ্রের দায়িত্ব জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের উপর ন্যস্ত হবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারবৃন্দ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে পরীক্ষা পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করবেন। সামগ্রিকভাবে পরীক্ষার দায়িত্ব পালন ও সমন্বয় সাধনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন পদস্থ কর্মকর্তার নেতৃত্বে ছোট একটি স্থায়ী কমিটি থাকবে। এই কমিটি পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার এবং ফলাফল যথারীতি অনুমোদনের পর জেলাস্থ নির্বাচনী কমিটিসমূহের নিকট সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্য-সচিববৃন্দ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে যথাসময়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

(২) উপজেলা পরিষদ তার উপজেলায় প্রয়োজনীয় শিক্ষকের চাহিদা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারকে (উপরে প্রস্তাবিত কমিটির সদস্য-সচিব) জানালে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা নির্বাচনী ও পদোন্নতি কমিটি একটি নির্বাচিত শিক্ষকের তালিকা প্রেরণ করবেন। উপজেলা পরিষদ সেই তালিকা অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করবেন। উপজেলা শিক্ষা অফিসার এই নিয়োগ কাজে সদস্য-সচিব হিসাবে কাজ করবেন।

(৩) উপজেলা পরিষদ শিক্ষকদের একই উপজেলায় অন্তর্গত নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রতিবেদনের সঙ্গে যদি পরিষদের ব্যক্তি বিশেষের মতান্তর ঘটে তা হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য একটি দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা যায়, যার প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

(৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের আন্তঃউপজেলা বদলী করবেন এবং আন্তঃজেলা বদলী করবেন বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর প্রধান বা দায়িত্ব-প্রাপ্ত কর্মকর্তা। আন্তঃবিভাগীয় বদলী করবেন কেন্দ্রে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রাথমিক বিদ্যা-লয়ের শিক্ষকদের বর্তমান নিয়মানুযায়ী সরকার কেবল আন্তঃউপজেলা বদলীই করবেন না, সুষ্ঠু প্রশাসন এবং শিক্ষকদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরে তাঁদের আন্তঃ-জেলা ও আন্তঃবিভাগীয় বদলী এবং তাঁদের পদোন্নতি ও পোস্টিং প্রদানের ক্ষমতাও সরকারের কাছে থাকা উচিত।

(৫) উপজেলা শিক্ষা অফিসারের পদটি হবে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড। পাবলিক সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নির্বাচন বা মনোনয়নের মাধ্যমে অন্যান্য বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মত একই সরকারী বিধানানুসারে তাঁদের নিয়োগ করতে হবে। সরকার তাঁর নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি ও শৃংখলা রক্ষা বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

(৬) উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে তাঁর পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য স্বাধীনতা ও সুযোগ দিতে হবে। উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে মাসিক সমন্বয় সভায় তাঁর কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। তাঁর কাজের জন্য তিনি উপজেলা পরিষদের নিকট দায়ী থাকবেন।

(৭) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের চাকুরি হবে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড। প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে যেহেতু তিনি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তত্বাবধায়ক, নিয়মিত পরিদর্শক ও প্রশিক্ষক সেজন্য তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগ বৃদ্ধি করা উচিত।

(৮) পরিদর্শন কাজে সুবিধা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিকসহ উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারকে যথাক্রমে একটি মোটর সাইকেল ও একটি বাইসাইকেল প্রদান করা প্রয়োজন।

(৯) নতুন স্কুল নির্বাচন ও বর্তমান স্কুলগুলির মেরামত সম্পর্কে স্থানীয় সংস্থার সদস্যবর্গ অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারছেন না। এ পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা বিভাগের সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি জরিপের মাধ্যমে নতুন নির্মাণ ও সংস্কার কাজের গুরুত্বের ক্রম নির্বাচনসহ ম্যাপ তৈরি করবে। সেই স্কুল ম্যাপিং থেকে উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি স্কুল নির্বাচন করবে।

(১০) প্রাথমিক স্কুল ম্যানেজিং কমিটি স্থানীয় বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ, মেরামত, বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বিষয়ে তত্বাবধান ও তদারকি করবেন।

(১১) প্রাইমারী স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে একজন দাতা হিতৈষীর জায়গায় আরো ২ জন অন্তর্ভুক্ত করে ৩ জন দাতা ও হিতৈষী ব্যক্তি অন্তভুক্ত করা উচিত হবে। তদুপরি অভিভাবক-দের থেকে ৩ জনকে কমিটিতে নেয়া প্রয়োজন। অভিভাবকদের ম্যানেজিং কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ মনোনীত করবে। এভাবে কমিটিতে ১২ সদস্য বিশিষ্ট করার বিষয় বিশেষ বিবেচনার যোগ্য।

(১২) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের পদমর্যাদা হবে অন্যান্য বিভাগের জেলা পর্যায়ের অফিসারের সমমর্যাদাসম্পন্ন। সে অনুসারে তাঁর বেতন স্কেল এবং সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে।

(১৩) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জেলা পর্যায়ে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সরকারী পর্যায়ে নেতৃত্ব দেবেন। তিনি তাঁর কাজের জন্য বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের নিকট থাকবেন।

(১৪) জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বৃহত্তর কল্যাণে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের বদলীসহ প্রশাসনিক সমন্বয়ে অংশগ্রহণ করবেন। প্রশাসনিক কারণে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের আন্তঃজেলা বদলীর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ দায়ী করবেন।

(১৫) মনিটরিং, মূল্যায়ন ও পরীক্ষাধর্মী প্রকল্পগুলির সমন্বয়কল্পে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসাবে উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের মাসিক সভার আয়োজন করবেন। এই সভার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকের দপ্তর ও কেন্দ্রে নিয়মিত প্রেরণ করবেন।

(১৬) সমস্ত জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সংগঠনের জন্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অধীনে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য জ্বালানীসহ একটি জীপ সরবরাহ করা প্রয়োজন।

(১৭) বর্তমানে প্রায়ই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ স্থানীয় লোক। তাঁদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা হচ্ছে বলে নানা জায়গা থেকেই অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাঁরা যাতে কর্তব্য কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সচেষ্ট হন, সেজন্য তাঁদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকেও সকল সম্ভাব্য পন্থাও অবলম্বন করতে হবে। এর প্রতিকার স্বরূপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিজের গ্রামে বা বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে না রেখে দূরবর্তী বিদ্যালয়ে (অথচ প্রয়োজনবশত যাতে বাড়িথেকে আসা-যাওয়া করতে পারে) বদলী করার কথাও বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

(১৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিও নিয়মিত পরিদর্শন হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করার জন্য যে বিপুল সংখ্যক পরিদর্শক (সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার ১৮৫০ জন) রয়েছেন তাতে এরকমের অভিযোগ পাওয়া সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক বলতে হবে। এদের উপরেও রয়েছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার (৪৮০ জন), থানা শিক্ষা অফিসার (২১ জন), সহকারী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (৬৪ জন) এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার (৬৪ জন)। সুষ্ঠু ও পরিকল্পিত উপায়ে পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা এবং সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরিদর্শন শুধু দেখাশোনার কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেখাশোনার পর পরিদর্শকের দৃষ্টিতে আসা দোষত্রুটিসমূহ সংশোধনের এবং সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আলাপ আলোচনা ক্রমে দোষত্রুটি সংশোধন, সমস্যা সমাধান, বৃত্তিশিক্ষা প্রেরণা দানের জন্য শিক্ষাদানরত শিক্ষকদের সহযোগিতায় কোনো প্রকার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবর্ধন দ্বারা শিক্ষাদান তথা মান উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নামই পরিদর্শন। পরিদর্শন বার্তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুধাবন করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ১৯৮৬ সালের অক্টোবর মাসে যে পরিকল্পিত উপায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশাবলী জারি করেছেন তা প্রশংসার দাবিদার। বর্তমানে প্রস্তাবিত এডুকেশন কোডের অনুপস্থিতিতে এই নির্দেশাবলী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক হবে। কমিশন আশা করে যে, বাস্তবক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সুষ্ঠু পরিদর্শন হবে।

(১৯) প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নিম্নলিখিতভাবে বন্টন করা হবে।

(ক) যে ব্যয় জাতীয় সরকার বহন করবে:

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সকল শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর বেতন ও ভাতা এবং শিক্ষা উপকরণবই, ম্যাপ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

(২) ভূমিহীন গরীব চাষী ও অন্যান্য দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের বই ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের খরচ।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রছাত্রীর প্রাথমিক চিকিৎসার খরচ।

(৪) দরিদ্র শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের পুষ্টি পরিপূরক খাবার।

(৫) শিক্ষক প্রশিক্ষণের যাবতীয় খরচ।

(খ) যে ব্যয় স্থানীয়ভাবে উপজেলা পরিষদ ও জনসাধারণ বহন করবে :

গৃহনির্মাণ ও মেরামত, আসবাবপত্র, অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও বিদ্যালয়ের খামারের জন্য জমি, পুকুর ইত্যাদি এবং জাতীয় সরকারের জন্য নির্দিষ্ট খাত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ব্যয়ভার। উপজেলা শিক্ষা কমিটি এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় জনসাধারণকে, বিশেষভাবে অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধ করে অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ সংগ্রহ করে এই সমস্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

(২০) বর্তমানে প্রচলিত পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা অব্যাহত থাকবে। এই বৃত্তি পরীক্ষা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিয়ন্ত্রণে এবং উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হবে। বৃত্তির হার ও সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

(২১) বর্তমানে দেশে ৭৫০০ এর উপরে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৩৩,০০০ শিক্ষক প্রায় ২,০০,০০০ শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করছেন। আমরা ১৯৯৫ সালের মধ্যে প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষা (১ম—৫ম শ্রেণী) বাধ্যতামূলক এবং ২০০০ সাল নাগাদ ৮ বছর মেয়াদী (১ম—৮ম শ্রেণী) প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের সুপারিশ করেছি। এ জন্য জাতীয় সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক। তদুপরি শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয়ের স্থান সংকুলানের জন্য নতুন ভবন, শ্রেণীকক্ষ বাড়ানো ও উপকরণ ইত্যাদি ব্যাপারে জনসাধারণের সাহায্য অপরিহার্য। এর প্রেক্ষিতে বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাকে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করা উচিত হবে। আমরা সুপারিশ করি যে, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার প্রদান করবে। তবে এরকম প্রাথমিক বিদ্যালয়কে বেসরকারী বিদ্যালয় রেজিস্ট্রেশন অধ্যাদেশের অধীনে যথা নিয়মে রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে এবং নিয়ম-কানুন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে। ১৯৬২ সালের এতদসম্পর্কিত অধ্যাদেশ সংশোধন এবং প্রয়োগের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষের উপর অর্পণ করা যায়।

(২২) দেশের কিণ্ডারগার্টেনগুলিতে যে সমস্যা বিরাজমান এবং সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য এ রিপোর্টের 'প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা' অধ্যায়ে যা বলা হয়েছে তা কঠোরভাবে প্রয়োগ ও কার্যকর করার জন্য আমরা এখানেও জোর সুপারিশ করছি।

(২৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে ড্রয়িং এণ্ড ডিসবার্সিং অফিসাররূপে ক্ষমতা প্রদান প্রয়োজন।

মাধ্যমিক শিক্ষা

২১.৪১. **প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা**

(ক) মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার উন্নতিকল্পে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধানদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। এতে তাঁদের কর্তব্যকার্যে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

(খ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী, সহকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষয়িত্রীদের বর্তমানের বেতন স্কেল তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাঁদের দায়িত্ব ও পদমর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে অনুসারে তাঁদের বেতন স্কেল নির্ধারিত হওয়া উচিত।

(গ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসন পরিচালনা করবেন এবং বিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য তিনি বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির (পরিচালনা পরিষদ) নিকট দায়ী থাকবেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীবৃন্দ তাঁদের কাজকর্মের জন্য প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রীর নিকট দায়ী থাকবেন।

(ঘ) আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন অত্যন্ত প্রয়োজন। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনের ভার সাধারণত মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ পরিদর্শকের উপর ন্যস্ত। এই পরিদর্শকদের পরিদর্শনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আঞ্চলিক শিক্ষা উপ-অধিদপ্তরগুলি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ মাধ্যমিক-বিদ্যালয়গুলিকে অনুমোদন দান করে এবং অনুমোদনের মেয়াদ বৃদ্ধি করে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করার জন্য প্রথমাবস্থায় শিক্ষা বোর্ডসমূহের কোনো পরিদর্শক ছিলনা। এব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডসমূহ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর নির্ভরশীল ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষা বোর্ড তাদের নিজেদের কিছু সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করেছে। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের পরিদর্শকবৃন্দ এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের পরিদর্শকবৃন্দের মধ্যে সম্পর্ক এবং তাঁদের কার্যাবলী ও ক্ষমতার সীমা ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো কিছু জানা যায় না।

(ঙ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করার জন্য যে সংখ্যক পরিদর্শক ও কর্মকর্তা রয়েছেন তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল এবং পরিদর্শনের ব্যবস্থাও অত্যন্ত অসন্তোষজনক। দেশে প্রায় ১০ হাজারের মত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২৮ লক্ষের-মত শিক্ষার্থীর শিক্ষাদান করছে। তারজন্য আঞ্চলিক শিক্ষা উপ-অধিদপ্তরের প্রত্যেকটিতে ৩ জন করে ৮টি অঞ্চলে ২৪ জন পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক রয়েছেন। দেশের শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যেকটিতে অনধিক ৪ জন করে পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক রয়েছেন। অর্থাৎ ৪০ জন পরিদর্শক ১০ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের জন্য নিয়োজিত আছেন। গড়ে ২৫০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য এক জন পরিদর্শক। অন্যদিকে ৪০ হাজারের মত প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার জন্য ২ হাজারের মত পরিদর্শক (সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার) রয়েছেন। তাদের বেলায় ১ জন পরিদর্শককে ২০টি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা। তারতম্যটি সহজেই অনুমেয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে জারিকৃত পরিদর্শন নির্দেশিকার মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সকল অফিসার এবং অধিদপ্তরের অধীনস্থ আঞ্চলিক ও জেলা শিক্ষা অফিসসমূহের সকল অফিসারকে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিদর্শন করার জন্য এমন ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিয়েছে যাতে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বছরে অন্তত একবার পরিদর্শন করা হয়। এই পরিদর্শন কাজ তাঁদের অন্যান্য দায়িত্বের সঙ্গে সম্পাদন করতে হবে। সংখ্যার দিক দিয়ে এই সকল অফিসার অনেক, তবে তার মধ্যে অন্তত এক তৃতীয়াংশ অফিসারের যে স্তর; পদমর্যাদা ও অভিজ্ঞতা তাঁদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল ও মাদ্রাসা পরিদর্শন করা উচিত কিনা তা বিবেচনার যোগ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে নির্দেশিত ব্যবস্থার মাধ্যমে সত্যিকারের পরিদর্শন হবেনা। সুতরাং পরিদর্শনের সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। উপরোক্ত নির্দেশিকা অবশ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমানে বিস্তারিত এডুকেশন কোডের অনুপস্থিতিতে স্কুল, মাদ্রাসা ও কলেজ ইত্যাদি পরিদর্শনের ব্যাপারে এই নির্দেশিকা বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

(চ) বর্তমানে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শককে একাধারে কেরানী ও পুলিশের কাজ সম্পাদন করতে হয়। তদুপরি এই পরিদর্শকদের শিক্ষা বিভাগের আওতা-বহির্ভূত বহু কাজে অনেক সময় ব্যাপৃত রাখা হয়। ফলে বছরের পর বছর বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন হয় না। যাও হয় তা সুষ্ঠুভাবে হয় বলা যায় না। এ পরিস্থিতির দ্রুত অবসান হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে উন্নতদেশে যে রীতি অনুসৃত হয় আমাদের দেশেও তা প্রবর্তনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা দেখা ছাড়াও পরিদর্শকদের কাজ হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের উৎকর্ষ বিধান, নবতর চিন্তা ধারার প্রবর্তন। শিক্ষা যন্ত্রে বহিরঙ্গের পরিবর্তে এর অন্তরঙ্গ দিকটির প্রতি সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখলে পরিদর্শকেরা বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত উৎকর্ষ বিধান করতে পারবেন। বস্তুত পরিদর্শকের কাজ একজন শিক্ষক নির্দেশকের ও পরামর্শদাতার কাজ। শিক্ষাবিদের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্য পরিদর্শনের সময় পরিদর্শকের সঙ্গে বিষয়-বিশেষজ্ঞদের থাকা বাঞ্ছনীয়। এ পদ্ধতি অপরাপর দেশে ক্রমবর্ধিত হারে প্রযুক্ত হচ্ছে এবং আমাদের দেশে প্রবর্তন করা হলে শিক্ষা প্রণালীর উৎকর্ষ বিধান আশা করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় পরিদর্শক ও পরিদর্শিকাদের মধ্যে বদলীর ব্যবস্থা রাখা উচিত হবে। এতে পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত কার্যক্রম সম্পাদন সাফল্যজনকভাবে করা যাবে। এ জন্য তাঁদের বেতন স্কেলে সমতার ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তুত পক্ষে শিক্ষা ক্যাডারে প্রশাসনিক, পরিদর্শন ও শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পদের বেতন স্কেলের সমতা রাখা প্রয়োজন, যাতে তাদের বদলীর ব্যবস্থা প্রয়োজনানুসারে কার্যকর করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে, কমপক্ষে বছরে একবার, যাতে প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন হয় তার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এ জন্য পরিদর্শকদের শিক্ষা বিভাগের আওতায় বাইরের কাজ থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। তদুপরি প্রয়োজনীয় পরিদর্শক সংখ্যার ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর এবং ৪টি শিক্ষাবোর্ডের একত্রে ৪০ জনের মত পরিদর্শক রয়েছেন যাতে প্রত্যেক পরিদর্শককে বছরে একবার পরিদর্শন করলেও গড়ে ২৫০টি বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে হবে। এই পরিদর্শকদের সংখ্যা অনতিবিলম্বে কমপক্ষে ১০০তে বাড়ানো অত্যাবশ্যক। এর মধ্যে কতটি পদ মাধ্যমিক অধিদপ্তরের অধীনে থাকবে এবং কতটি পদ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকবে তা তাঁদের কাজের পর্যালোচনা করে ঠিক করা যায়। মোটামুটিভাবে নতুন

বিদ্যালয়ের অনুমোদন, চলতি বিদ্যালয়ের অনুমোদনের মেয়াদ বাড়ানো এবং শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসারে শিক্ষা কর্মসূচী কাজের জন্য শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শকবৃন্দ বিদ্যালয় পরিদর্শন এবং শিক্ষা প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে অধিদপ্তরের পরিদর্শকবৃন্দ বিদ্যালয় পরিদর্শন করবেন। অবশ্য পরিদর্শনের এ রকমভাবে সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হবেনা তা স্বীকার করতে হয়। উভয় গ্রুপের পরিদর্শক তাঁদের প্রতিবেদন একে অপরের কাছে পাঠাবেন যাতে সামগ্রিকভাবে দুই গ্রুপের পরিদর্শকবৃন্দ বিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারেন। অর্থাৎ শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শকবৃন্দ এবং অধিদপ্তরের পরিদর্শকবৃন্দের কাজের সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

(ছ) মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকদের এবং জেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসারদের বেতনের স্কেল খুব নিচে। তাঁদের বেতন স্কেল তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত। সে অনুসারে তাঁদের পদমর্যাদা নির্ধারিত হবে।

(জ) দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব শিক্ষা বোর্ডসমূহের উপর ন্যস্ত। অতএব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের অনুমোদন, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিরূপন এবং পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাবোর্ডসমূহের করণীয় কাজ। অবশ্য সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ডকে দেয়া হয়েছে, যা দেয়া উচিত হয়নি। এ রিপোর্টের অন্যত্র এ সমস্যা সমাধানের পন্থা নির্দেশ করা রয়েছে। গত দেড় দশকের মত সময়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বহু সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হয়েছে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই যথারীতি ও যোগ্যতাপূর্ণভাবে চালাবার মত সামর্থ্য ও সম্পদ কর্তৃপক্ষের নেই। শিক্ষক, শিক্ষার উপকরণ, আসবাবপত্র, শিক্ষাঙ্গন ইত্যাদির অভাব রয়েছে এমন স্কুল কলেজকে অনুমোদন দান উচিত নয়। স্কুল ও কলেজকে অনুমোদন দান সম্পর্কিত বিধিসমূহ কড়াকড়িভাবে প্রতিপালিত না হলে সংস্কার সাধনের কোনো প্রচেষ্টা সফল হবে না। অতীতের ত্রুটি সংশোধনের জন্য যথাশীঘ্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত বলে আমরা মনে করি। যে সকল স্কুল ও কলেজ অনুমোদনের শর্তাদি পালন করতে অপারগ তাদের অনুমোদন বাতিল করা উচিত হবে। প্রয়োজনীয় স্কুল ও কলেজের অনুমোদন বাতিল এবং প্রয়োজন হলে অনুমোদন দান স্থগিত রাখা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি।

(ঝ) বর্তমানে দেশে ২৯১টি ইন্টারমিডিয়েট কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষাদান করা হয়। তদুপরি দেশের ৪৫১টি কলেজে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ডিগ্রী ক্লাসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। আমরা এই রিপোর্টের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক অধ্যায় এবং উচ্চশিক্ষা অধ্যায়ে কারণ বিশ্লেষণ পূর্বক উচ্চমাধ্যমিক অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী দুটিকে ক্রমান্বয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছি। তা কার্যকর করার জন্য আমরা এখানেও সে সুপারিশের পুনরাবৃত্তি করছি।

(ঞ) বর্তমানে সরকার বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন বাবদ প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ প্রদান করে। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা ক্রমান্বয়ে পুরাপুরিভাবে সরকার কর্তৃক প্রদান করা প্রয়োজন।

(ট) বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের (সরকারীকরণ) ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা উচিত।

(ঠ) সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কেননা বর্তমানে প্রদত্ত সম্পদ অপ্রতুল।

(ড) বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য অনুদান দেয়ার নিয়ম-কানুন, সময়সূচী ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সহজ ও সরল করার পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

(ঢ) শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষায়তনসমূহের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার উন্নতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষায়তনে কার্যনির্বাহী ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ থাকবে এবং এ সমস্ত পরিষদে শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাঙ্গনে সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি, অভিভাবক ও শিক্ষকদের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধিসহ শিক্ষায়তন প্রধানকে সভাপতি করে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা উচিত।

২১.৪২· মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের রেগুলেশন অনুযায়ী প্রত্যেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য একটি করে ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ কমিটি ছাড়া উক্ত ম্যানেজিং কমিটির গঠন নিম্নরূপ:

(ক) সভাপতি

(১) জেলা সদরে অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য জেলা প্রশাসক অথবা তাঁর মনোনীত একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট।

(২) জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত বিদ্যালয়ের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান -ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড সরকারের অনুমতিক্রমে স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকে সভাপতি মনোনীত করতে পারে।

(খ) সদস্য-সচিব: পদাধিকার বলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

(গ) সদস্যবৃন্দ

(১) বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নিজেদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ২ জন শিক্ষক।

(২) বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের মধ্যে থেকে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত ৪ জন অভিভাবক।

(৩) বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্য থেকে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত একজন প্রতিষ্ঠাতা।

(৪) বিদ্যালয়ের দাতাদের মধ্য থেকে নিজেদের দ্বারা নির্বাচিত একজন দাতা।

(৫) আঞ্চলিক শিক্ষা উপ-অধিদপ্তরের উপপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এবং

(৬) উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় (কমিউনিটি স্কুলের বেলায়) প্রতিনিধি ৩ জন। মোট ১৫ জন।

সদস্যবৃন্দ (সদস্য-সচিব ও শিক্ষক প্রতিনিধি ব্যতীত) নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সহসভাপতি নির্বাচিত করবেন।

বিদ্যালয়ের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আর্থিক ব্যবস্থা ও পরিচালনার দায়িত্ব সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের (ম্যানেজিং কমিটি) উপর ন্যস্ত।

২১.৪৩. সুপারিশ

(ক) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে দাতাদের মধ্য থেকে ১ জনের পরিবর্তে ২ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকা প্রয়োজন। দাতাদের মধ্যে দু'শ্রেণীর ব্যক্তি রয়েছেন, এক শ্রেণীর দাতারা হলেন বিদ্যালয়ের আজীবন সদস্য (লাইফ ভোটার)। তাঁদের প্রত্যেককে এককালীন দশ হাজার টাকা দান করে এই শ্রেণীভুক্ত হতে হয়। অন্য শ্রেণীর দাতারা হলেন বিদ্যালয়ের এককালীন সদস্য (ওয়ান টাইম ভোটার)। তাঁদের প্রত্যেককে পাঁচশ টাকা দান করে এ শ্রেণীর সদস্য হতে হয়। বেসরকারী বিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সমাধান কল্পে যত বেশি সদস্য সংগ্রহ করা যায়, ততই বিদ্যালয়ের জন্য মঙ্গল। সাধারণত দেখা গেছে যাঁরা দশ হাজার টাকা দান করে জীবনসদস্য হয়েছেন তাঁরা এককালীন সদস্যদের সঙ্গে (যারা পাঁচশ টাকা দান করে সদস্য হয়েছেন) নির্বাচনে অংশ নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে অনীহা প্রকাশ করেন। বিদ্যালয়ের প্রতি আস্তে আস্তে তাঁদের উৎসাহ কমে যায়। তাঁদের উৎসাহ ও উদ্যোগ বজায় রাখার জন্য এবং বতবেশি সংখ্যক জীবনসদস্য সংগ্রহ করা যায় তার জন্য এই গ্রুপের জন্য ম্যানেজিং কমিটিতে সদস্যের ব্যবস্থা থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে দাতাদের মধ্য থেকে ২ জন সদস্য ম্যানেজিং কমিটির অন্তর্ভুক্ত রাখার ব্যবস্থা করা যায়।

(খ) উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে চেয়ারম্যান হবেন জেলা সদরে অবস্থিত বিদ্যালয়ের বেলায় জেলা প্রশাসক বা তাঁর মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক বা ম্যাজিস্ট্রেট এবং উপজেলায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের বেলায় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান। বিশেষ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড সরকারের অনুমোদনক্রমে কোনো মাধ্যমিক স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান পদের মনোনয়ন দান করতে পারে। এই নিয়মানুযায়ী বাস্তব-ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, একজন জেলা প্রশাসক এক ডজন থেকে দুই ডজন (ঢাকায় বেলায়) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন--আর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান তাঁর উপজেলাস্থ প্রায় সব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন। ফলে এই সব বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাও নিয়মিত করা সম্ভব হচ্ছে না--অন্যান্য কাজকর্ম, যা করার জন্য ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন, তাও সুষ্ঠুভাবে ও সময়মত সম্পাদন করা যায় না। এ সকল কর্মকর্তা তাঁদের নিজস্ব অফিসিয়াল কাজকর্মে এতবেশি ব্যস্ত থাকেন যে বিদ্যালয়ের

প্রধান শিক্ষক বা প্রতিনিধিকে তাঁরা দিনের পর দিন এমনকি মাসের পর মাস বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির জন্য সময় দিতে পারেন না। এটাও এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তারা জেলার ও উপজেলার কলেজসমূহের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান। তদুপরি বর্তমান পরিস্থিতিতে দেখা যাচ্ছে যে, এ সকল কর্মকর্তার মধ্যে অনেকে বয়স ও অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে এমন অবস্থানে পৌঁছেননি যাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের নেতৃত্ব দিতে পারেন। এক-দিকে তাঁদের সময়ের অভাব, অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার অভাবে, ম্যানেজিং কমিটির সুষ্ঠু পরিচালনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভবপর হচ্ছে না।

(গ) অন্যদিকে বিদ্যোৎসাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনয়ন দান করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান করার যে বিধান রয়েছে তাও সন্তোষজনকভাবে কার্যকরী করা সম্ভব হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয় না। যে জাতীয় ব্যক্তি মনোনয়ন পাওয়া উচিত সে জাতীয় ব্যক্তিরা বর্তমানের পদ্ধতিগত পন্থা অতি-ক্রম করে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হবার জন্য অনেকে বিশেষ উৎসুক হননা। ফলে ছিটে ফোঁটা হিসাবে যে দু' চার জন মনোনয়নের মাধ্যমে চেয়ারম্যান হন তাঁরা বিদ্যালয়ের ব্যাপারে সত্যিকারের অবদান রাখতে পারেন কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পরামর্শ হল যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি চেয়ারম্যান বর্তমান পদ্ধতিতে না করে পুরানো নির্বাচনের যে নিয়ম ছিল তা চালু করা হোক। বিভিন্ন সময়ে অবশ্য বিভিন্ন পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান করা হয়েছে, তবে যে পদ্ধতি ও নিয়মের বিষয়ে এখানে অবতারণা আমরা করছি তা হল, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। আমরা তার সঙ্গে যোগ করতে চাই যে, কমিটি নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করবেন অথবা নিজেদের বাইরে থেকে কোনো বিশিষ্ট বিদ্যোৎ-সাহী ও শিক্ষানুরাগী এবং বিদ্যালয়ের জন্য যথাসম্ভব অবদান রাখতে সক্ষম তাঁকেও নির্বাচিত করতে পারেন।

(ঘ) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটিতে স্থানীয় একজন ডাক্তারকে কোঅপট করে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনার যোগ্য। নিয়মানুযায়ী ম্যানেজিং কমিটির সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিদ্যালয়ের ব্যাপারে কমিটিকে যে ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে পালন করা কমিটির কর্তব্য বলে বিবেচিত হতে হবে। বিশেষ বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে বিশেষ বিশেষ ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা রয়েছে--সেগুলি চালু থাকতে পারে। তদুপরি সরকার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের অনুমতিক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ম্যানেজিং কমিটিসমূহ শিক্ষা বোর্ডের রেগুলেশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এডুকেশন কোডের নিয়মানুযায়ী তা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই এডুকেশন কোড ১৯৩১ সালের পর আর পরিবর্ধন, পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে সত্যিকার অর্থে ম্যানেজিং কমিটি কার্যকর অবস্থায় আছে বলা যাচ্ছেনা। এই অবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া প্রয়োজন। সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য সত্বর কার্যকর ম্যানেজিং কমিটির ব্যবস্থা করা উচিত।

২১.৪৪. মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার নিম্নলিখিতভাবে বণ্টন করা উচিত:

(ক) বর্তমানে সরকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ, চিকিৎসা ভাতা ১০০ টাকা ও বাড়িভাড়া বাবদ ১০০ টাকা দিচ্ছে। ক্রমান্বয়ে সরকার শিক্ষকদের বেতন ও ভাতা বাবদ পুরাপুরি অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

(খ) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও খামারের জন্য জমি, পুকুর ইত্যাদি ব্যবস্থা করবে এবং বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ, সংরক্ষণ, মেরামত, আসবাবপত্র ও অন্য শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যয়ভার বহন করবে। এর জন্য যথাযথ উৎসের ব্যবস্থা করতে হবে। ছাত্র বেতন প্রয়োজনে যুক্তিযুক্ত হারে নির্ধারিত করতে হবে। যথা সময়ে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলিতে সরকারী অনুদান প্রদান করতে হবে।

(গ) বেতন সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা ছাড়াও বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এবং অবসরকালীন আর্থিক সুবিধা সম্পর্কিত ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। চাকুরির মেয়াদকালে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী ও নিয়োগকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে চাঁদা দিবে এবং এর ফলে শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারী রোগশোক ও অবসরকালীন অর্থচিন্তা থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারেন।

(ঘ) কোনো কোনো মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানের পদ শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে সমাসীন ব্যক্তিরা অলংকৃত করছেন। এ ব্যবস্থা সঠিক নয়। শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিবর্গ, যেমন শিক্ষা সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, অধিদপ্তরসমূহের মহাপরিচালক, শিক্ষা বোর্ড সমূহের চেয়ারম্যান প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিতে চেয়ারম্যান-মেম্বার হিসাবে অন্তর্ভুক্ত থাকলে প্রশাসনিক বিষয়াদির ব্যাপারে অনেক সময়ে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এবং জনসাধারণেরও বিরূপ সমালোচনার কারণ হয়। এ কারণে যতদিন তাঁরা শিক্ষা বিভাগের উচ্চ পদে সমাসীন থাকবেন ততদিন কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডিতে না থাকা বাঞ্ছনীয়।

(ঙ) মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের যোগ্যতা ও চাকুরি নিয়োগ বিধি, বেতন, নিয়োগ, পদোন্নতি, মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে এই রিপোর্টের শিক্ষক প্রসঙ্গ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট উপ-অধ্যায় সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২১.৪৫. কলেজ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(১) কালেজসমূহের অধ্যক্ষের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বাড়ানো উচিত। বস্তুত কলেজ অধ্যক্ষদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষ করে বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ নিয়ম-কানুন অনুযায়ী ব্যয়ের ক্ষমতা কলেজ অধ্যক্ষদের অর্পণ করা উচিত। এরূপ বিকেন্দ্রীকরণে শিক্ষায়তনসমূহের এবং শিক্ষক ও কর্মচারীদের অনেক অসুবিধা দূরীভূত হবে এবং তাঁদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সহজ হবে।

(২) বেসরকারী কলেজসমূহে আবর্তক অনুদান, সাময়িক ও বিশেষ অনুদান ইত্যাদি সরাসরি দেয়ার প্রচলিত প্রথা অব্যাহত থাকতে পারে। তবে কলেজসমূহের উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ পরিকল্পিতভাবে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ কর্তৃত্বের আওতাধীন। স্কুল ও সাধারণ কলেজগুলিতে যে কৃষি শিক্ষা দেয়া হয় তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন। অথচ কৃষি কলেজ কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। এতে কৃষি শিক্ষার সামগ্রিকভাবে উন্নতি অন্যান্য শিক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে না। আমাদের মতে কৃষি কলেজ বর্তমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্বের আওতাধীনে আনা উচিত। এতে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে প্রকৌশল, কারিগরি, বাণিজ্য ইত্যাদি শিক্ষার ন্যায় কৃষি শিক্ষাও একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব পাবে এবং বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দেশ ও জাতির চাহিদা মেটানোর কাজ সহজ হবে।

(৪) চিকিৎসা শিক্ষার বেলায় আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজগুলির প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে এই রিপোর্টের চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান শিক্ষা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৫) সম্প্রতি দেশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির প্রত্যেকটিকে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী (বি, আই, টি) নামে স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। তারা নিজেরাই এখন ডিগ্রী প্রদান করবে। এর প্রেক্ষিতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন ও আর্থিক ব্যাপারে এই রিপোর্টে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি না।

(৬) আমাদের কলেজগুলির পরিদর্শন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন অতীব প্রয়োজন। দেশের কলেজ পরিদর্শনের জন্য শিক্ষা বোর্ডগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ব্যবস্থা মোটেই সন্তোষজনক বলা যায় না। দেশে প্রায় ৭৪২টির মত ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে ৪৫১টি ডিগ্রী কলেজ যাদের সঙ্গে ইন্টারমিডিয়েট বিভাগ রয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক ডিগ্রী কলেজে ইন্টারমিডিয়েট বিভাগও রয়েছে। দেশের ৪টি শিক্ষা বোর্ডের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে ৮ জনের মত পরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শক রয়েছেন। দেশের ৩টি অনুমোদনদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিতে ২ জন করে ৬ জন পরিদর্শক ও উপপরিদর্শক থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকদিন যাবত পরিদর্শক থাকেন না বা পদ খালি থাকে। আবার কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক অন্য পদের কাজে বিশেষ করে রেজিস্ট্রারের পদের কাজে বছরের পর বছর নিয়োজিত থাকেন। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের কলেজ পরিদর্শনের কাজ প্রায় উঠেই যাচ্ছে বলা যায়। নতুন কলেজ অনুমোদন এবং চলতি কলেজের অনুমোদন বাড়ানোর জন্য যখন পরিদর্শন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়ে তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পরিদর্শকরূপে প্রেরণ করে দায় সারা ভাবে কাজ সমাধা করা হয়। শিক্ষা বোর্ডসমূহের পরিদর্শকদের বিশেষ করে উপ ও সহকারী পরিদর্শকদের যোগ্যতা ও পদমর্যাদা এমন যাতে কলেজগুলির সুষ্ঠু পরিদর্শনের জন্য নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

(ক) এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মোট ১৪ জনের মত পরিদর্শক, উপপরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকের পক্ষে যাদের মধ্যে আবার প্রায় অর্ধেক বিভিন্ন কারণে পদে নিয়োজিত থাকেন না, ৭৪২টি কলেজ সুষ্ঠুভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব নয়। তদুপরি কলেজগুলির প্রশাসনিক, পরিচালনা ও আর্থিক ব্যবস্থা, শিক্ষা কর্মসূচী, মান ইত্যাদি সম্যক পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা ও যাচাই সঠিকভাবে ও

যথাসময়ে, হচ্ছে না। বছরের পর বছর অধিকাংশ কলেজ পরিদর্শনই হচ্ছে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মতে কলেজ পরিদর্শকের সংখ্যা বাড়াবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তদুপরি কলেজগুলির কর্মসূচী বিস্তারিত ভাবে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার মান যাচাইয়ের জন্য পরিদর্শনের সময় কলেজ পরিদর্শকের সঙ্গে বিষয় বিশেষজ্ঞদের সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। প্রত্যেকটি কলেজ যাতে বছরে অন্ততপক্ষে একবার পরিদর্শন করা হয় তার ব্যবস্থাও থাকতে হবে। তদুপরি সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুসারে কলেজগুলিতে বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

(খ) মোটামুটিভাবে শিক্ষা বোর্ড ও অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক, উপপরিদর্শক ও সহকারী পরিদর্শকের সংখ্যা অন্তত পক্ষে বর্তমান সংখ্যার দ্বিগুণ হওয়া উচিত।

(গ) কলেজ পরিদর্শকের ব্যাপারে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরকারের শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চশিক্ষা বিভাগে কলেজ পরিদর্শনের জন্য কোনো পরিদর্শক, তথা পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেই। দেশে যখন গুটিকয়েক কলেজ বিদ্যমান ছিল তখন সরকারের তরফ থেকে ডি,পি,আই, এ,ডি, পি,আই, প্রভৃতি উচ্চ পদস্থ শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা মাঝে মাঝে কলেজ পরিদর্শন করতেন, তাও প্রায় সরকারী কলেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কলেজ পরিদর্শকের বিষয়টি মোটামুটিভাবে অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। তখন অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শনের জন্য খুবই সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখত, তার প্রমাণ আমাদের কলেজগুলির বিগত দিনের রেকর্ড থেকে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের তখনকার কলেজগুলির মধ্যে সরকারী কলেজ ছাড়াও অনেক বেসরকারী কলেজও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও পরিদর্শক বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে একাধিকবার পরিদর্শন করেছেন। এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ইংরেজির অধ্যাপক, পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত পরিদর্শক ডঃ হরেণ কুমার মুখার্জী এবং স্যার ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ তদনীন্তন পূর্ব বাংলার বহু কলেজ পরিদর্শন করেছেন। ডঃ হরেণ কুমার মুখার্জী দেশ বিভাগের পর পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল এবং ডঃ রাধাকৃষ্ণ ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ অলঙ্কৃত করেন।

(ঘ) উপরে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, বর্তমানে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সুষ্ঠু ও নিয়মিতভাবে কলেজগুলির পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের তরফ থেকেও কলেজগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থা নেই। এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার জন্য আমরা জোর সুপারিশ করি।

(ঙ) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শক নির্দেশিকার মাধ্যমে শিক্ষা অধিদপ্তরের উচ্চশিক্ষা বিভাগকে কলেজ পরিদর্শনের জন্য যে নির্দেশাবলী জারি করেছে, যাতে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, পরিচালক,, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক তাঁদের দায়িত্বের সঙ্গে কলেজ পরিদর্শনের কাজও সম্পাদন করবেন; তা বাস্তবিক পক্ষে সম্ভব নয়। এ জাতীয় অফিসারের সংখ্যা এ কাজের জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। তদুপরি উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের কলেজ, বিশেষ করে ডিগ্রী কলেজ পরিদর্শন করা উচিত কিনা বিবেচনা করা দরকার।

(৭) সরকারী ও বেসরকারী কলেজগুলির শিক্ষকদের যোগ্যতা, নিয়োগ ও চাকুরিবিধি, বেতন, পদোন্নতি, মর্যাদা ইত্যাদি সম্পর্কে এই রিপোর্টের শিক্ষক প্রসঙ্গ অধ্যায়ের সংশ্লিষ্ট উপ-অধ্যায়সমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৮) আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধ্যায়ে এবং উচ্চশিক্ষা অধ্যায়ে ক্রমানুয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীদ্বয়কে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করেছি। এ অবস্থায় বর্তমান ডিগ্রী কলেজগুলি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে ডিগ্রী স্তরে শিক্ষাদানের জন্য সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করতে পারবে। তাই কলেজগুলিতে সাধারণভাবে তিন বছর ব্যাপী স্নাতক কোর্স শিক্ষাদান করা সহজ হবে। নির্দিষ্ট সংখ্যক উন্নত মানের কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাদান করা হবে। অপরপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান চলবে। উপরোক্ত কলেজ-সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সংযুক্ত থাকবে। পর্যায়ক্রমে যখন এ সকল কলেজের মধ্য থেকে সাবেক জেলা সদরসমূহে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হবে তখন তারা স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেরাই ডিগ্রী প্রদান করবে।

কলেজের গভর্ণিং বডি

(৯) সরকারী কলেজসমূহে গভর্নিং বডিগুলি নিষ্ক্রিয়, অনেক ক্ষেত্রে গভর্নিং বডি নিয়মিত গঠন করাই হয়না। এ অবস্থার দ্রুত অবসান হওয়া উচিত। সকল সরকারী কলেজের গভর্নিং বডি নিয়মিত গঠন করে যথাযথভাবে তাদের কাজ করতে দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(১০) ডিগ্রী কলেজসমূহের সে সরকারী কলেজই হোক বা বেসরকারী কলেজই হোক গভর্নিং বডি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয় এবং দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করে অন্তত করার কথা। আর ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের মধ্যে বেসরকারী কলেজসমূহের গভর্ণিং বডি সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডগুলির নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী গঠিত হয়ে দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করে অন্তত করার কথা। কিন্তু সরকারী ইন্টার-মিডিয়েট কলেজগুলির জন্য গভর্নিং বডির ব্যবস্থা শিক্ষা বোর্ডগুলির নিয়মাবলীর মধ্যে নেই। আইন অনুযায়ী থাকার কথাও নয়। এই প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক প্রণীত ও প্রবর্তিত এডুকেশন কোডের অন্তর্ভুক্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী সরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের গভর্নিং বডি গঠিত হয়ে দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদন করার কথা। কিন্তু ১৯৩১ সালের পরে এডুকেশন কোড এখন পর্যন্ত আপটু-ডেট করে প্রকাশ না করার দরুন এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যবস্থা কি তা বোঝা যাচ্ছে না। সে যা হোক এর বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

(১১) বেসরকারী ইন্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের বর্তমান নিয়মানুযায়ী গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হচ্ছেন জেলা প্রশাসক। জেলা সদরের বাইরে অবস্থিত কলেজসমূহের গভর্নিং বডিতে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রভৃতি অফিসারকে চেয়ার-ম্যান মনোনীত করতে পারেন। তদুপরি বিশেষ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক বিভাগীয় কমিশনারের অনুমোদনক্রমে স্থানীয় বিশিষ্ট বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিকেও চেয়ারম্যান মনোনীত করতে পারেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হন। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কলেজগুলির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হচ্ছেন বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক প্রভৃতি। আমরা মনে করি যে, কলেজসমূহের

স্বার্থে ও অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ইণ্টারমিডিয়েট কলেজসমূহের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যানদের ন্যায় ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নিজেদের মধ্য থেকে অথবা বাইরের কাউকেও নির্বাচিত করা উচিত।

(১২) কলেজকে আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য ডিগ্রী কলেজের ন্যায় ইণ্টারমিডিয়েট কলেজেরও দাতাদের দুটি ক্যাটাগরি হওয়া উচিত। একটি ক্যাটাগরি হবে দাতা যারা হবেন এককালীন ভোটার এবং যাঁরা পরবর্তী নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন এবং অন্য ক্যাটাগরি হবে বেনিফেক্টার যাঁরা পর পর তিনটি নির্বাচনে ভোটার হবেন এবং অংশ নিতে পারবেন। এই ক্যাটাগরি দুটির প্রত্যেকটি থেকে একজন করে দু'জন সদস্য গভর্নিং বডিতে অন্তর্ভুক্ত করা কলেজের স্বার্থে প্রয়োজন।

(১৩) যে সকল ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের গভর্নিং বডিতে এখন পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই সে সকল বডিতে স্থানীয় একজন ডাক্তারকে কো-অপট করে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনার যোগ্য।

(১৪) ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান সম্পর্কে বিবেচনার বিষয় রয়েছে। সাধারণত বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক প্রভৃতি কর্মকর্তার ডিগ্রী কলেজসমূহের গভর্নিং বডিগুলির চেয়ারম্যান রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কারো কারো মতে একেবারে ঢালাওভাবে কলেজসমূহের গভর্নিং বডিগুলির চেয়ারম্যান পদে পদাধিকারবলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের রাখা উচিত নয়। উপরে বলা হয়েছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী ডিগ্রী কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কর্তৃক মনোনীত হন। অন্যদিকে অনেকের মতে, প্রশাসনিক কর্মকর্তারা কলেজগুলির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান থাকলে কলেজের, বিশেষ করে বেসরকারী কলেজের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে অনেক সাহায্য হয়। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদাধিকার বলে কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান রাখা হলে অনেক কলেজের অধ্যক্ষ, অন্যান্য শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অনেকের যথেষ্ট আপত্তি থাকে। সরকারী চাকুরি ও বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের পর পদ, পদমর্যাদা, বেতন ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলে জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক প্রভৃতি কর্মকর্তারা কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের সঙ্গে তুলনায় পূর্বের ন্যায় পদমর্যাদা ও বেতন ভোগ করেন না। চাকুরির দৈর্ঘ্য, অভিজ্ঞতা ও বয়স ইত্যাদির ব্যাপারেও যথেষ্ট জটিলতা সৃষ্টি হয়।

আমরা এ বিষয়টি বিভিন্ন দিক থেকে বিবেচনা করেছি। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল যে, ডিগ্রী কলেজগুলির গভর্নিং বডির চেয়ারম্যানবৃন্দ তাদের গভর্নিং বডির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নিজেদের মধ্য থেকে অথবা বাইরের থেকেও কাউকে নির্বাচিত করা উচিত হবে।

(১৫) ডিগ্রী কলেজসমূহের গভর্নিং বডির মধ্যে এ পর্যন্ত যেখানে ব্যবস্থা নেই সে সকল গভর্নিং বডিতে স্থানীয় একজন ডাক্তারকে কো-অপট করে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয় বিবেচনা করা যেতে পারে।

২১.৪৬. মাদ্রাসা শিক্ষা

(১) মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও উৎপাদনমুখী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে।

(২) মাদ্রাসা ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের জন্য স্কুল-কলেজ শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অনুরূপ বেতন কাঠামো ও সুযোগ-সুবিধা সমযোগ্যতার ভিত্তি তে মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মচারীদের প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) মাদ্রাসাগুলির সুষ্ঠু পরিচালনা, উন্নয়ন ও তদারকি ইত্যাদির জন্য প্রত্যেক স্তরে প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক স্তর, উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ও কলেজ স্তরের ন্যায় ইবতেদায়ি, দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিলস্তরে ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডি থাকবে।

(৪) বাংলাদেশে প্রায় ১৩ হাজারের উপর ইবতেদায়ি মাদ্রাসা, আড়াই হাজারের মত দাখিল মাদ্রাসা, প্রায় সাড়ে ছয় শ আলিম মাদ্রাসা, সমসংখ্যক ফাযিল মাদ্রাসা এবং ৭৫টি কামিল মাদ্রাসা রয়েছে। এই বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসার প্রশাসনিক, আর্থিক উন্নয়ন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বর্তমানে যে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়। অতএব মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। অঞ্চল, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যোগ্যতাসম্পন্ন মাদ্রাসা শিক্ষা অফিসার নিয়োগ করা দরকার।

(৫) মাদ্রাসার অধ্যক্ষ, সুপারিনটেনডেন্ট ও প্রধানদের সাধারণ প্রশাসনিক ও আর্থিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন স্তরের মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্যও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। মাদ্রাসা শিক্ষাদান পদ্ধতির আধুনিকায়নের জন্য অবিলম্বে দেশের পি,টি,আই, ও ট্রেনিং কলেজগুলিতে এবং বাংলাদেশ শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (নিয়েয়ার) মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

(৬) বর্তমানে ফাযিলকে স্নাতক এবং কামিলকে স্নাতকোত্তর হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে, যদিও চাকুরি প্রদানের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাগুলি দেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন করা উচিত। এখন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এ সকল মাদ্রাসার শিক্ষাদান নিয়ন্ত্রণ করে। তাই এই শিক্ষা বোর্ড ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসার অনুমোদনদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে। দেশের ডিগ্রী স্তরের শিক্ষা যখন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে, তখন মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের এই স্তরের শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করার বিশেষ যৌক্তিকতা নেই, বিশেষ করে যখন দেশে একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।

অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

২১.৪৮. এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা আগে দেয়া আছে। বর্তমানের ন্যায় এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিচে পেশকৃত সুপারিশ বাস্তবায়ন সাপেক্ষে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে চালু থাকবে। তবে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সম্পাদনের জন্য অধিক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

(১) ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেশন, এক্সটেনশান এণ্ড রিসার্চ (নিয়েয়ার): এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও দায়িত্বের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এই রিপোর্টের বিভিন্ন অধ্যায়ে বলা হয়েছে। দেশের মাধ্যমিক ও

কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগকৃত ও নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব যথোপযুক্ত ভাবে সম্পাদনের জন্য এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পেশকৃত সুপারিশের বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

(২) বাংলাদেশ এডুকেশনাল ইকুইপমেণ্ট বোর্ড (বিইইবি): এই বোর্ড সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ এই রিপোর্টের 'শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষা উপকরণ' অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৩) বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন এণ্ড স্ট্যাটিসটিকস (বেনবেইস): এই সংস্থার উন্নয়ন দরকার। শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ, প্রকাশনা ও পরিবেশ-নের ব্যাপারে এই সংস্থাকে আরো কার্যকর উদ্যোগ নিতে এবং ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিস্টাণ্ট এডুকেশন (বাইড): এই সংস্থা সম্পর্কে কমিশনের বক্তব্য এই রিপোর্টের দূরশিক্ষণ উপ-অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(৫) ইন্সপেকশন এণ্ড অডিট অধিদপ্তর: কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে যে সকল সুপারিশ করা হচ্ছে, তার প্রেক্ষিতে এই অধিদপ্তরের পৃথকভাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচনার যোগ্য।

(৬) ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেণ্ট: এই বিভাগের ভিতর ও বাইরে উভয় তরফ থেকে ভীষণ সমালোচনার সম্মুখীন। তাই এর কার্যক্রম পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মূল্যায়নের প্রয়োজন। এই বিভাগ সম্বন্ধে কমিশনের সুপারিশ এই রিপোর্টের শিক্ষাগৃহ ও শিক্ষা উপকরণ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখানেও কমিশন আবার বলতে চায় যে, সেসব সুপারিশ অনতিবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য যথাযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

(৭) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড (এনসিটিবি): ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে এবং স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার দায়িত্ব ছিল শিক্ষা দপ্তরের (ডি,পি,আই) উপরে জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রের। আর নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার দায়িত্ব দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের ওপর ন্যস্ত ছিল। সাধারণত শিক্ষা দপ্তর (ডি,পি,আই) কর্তৃক নিয়োজিত শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসক সমন্বয়ে গঠিত টীম দ্বারা প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করতেন এবং সময়ে সময়ে তা নবায়ন করা হত। অন্যদিকে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রতিটিতে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে স্থায়ী কমিটির সাহায্যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার ব্যবস্থা করত। এই বিষয় ভিত্তিক কমিটিগুলি ছাড়াও প্রত্যেকটি শিক্ষা বোর্ডে একটি করে একাডেমিক কমিটি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সমন্বয় ও চূড়ান্তকরণের দায়িত্বে ছিল। ১৯৬২ সাল থেকে একাধিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপিত হবার পর নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে অভিন্নতা ও দক্ষতা আনয়নের জন্য দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড মিলে সম্মিলিতভাবে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের উদ্দেশ্যে চারটি শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি দ্বারা আবার শ্রেণী শিক্ষক, বিষয় বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাক্রম বিশেষজ্ঞ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সমন্বয়ে কমিটি গঠন ও কার্যক্রমের মাধ্যমে অভিন্ন ও একই মানের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে উপরোক্ত শ্রেণীসমূহের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করত। এই ব্যবস্থা ১৯৮০ সাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

(ক) সরকার ১৯৮১ সালে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' নামে একটি পৃথক সংস্থা স্থাপন করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী 'প্রণয়ন ও উন্নয়নের' দায়িত্ব অর্পণ করে।

(খ) অপরদিকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনার অনুমোদনের জন্য ১৯৫৪ সালে গঠিত বাংলাদেশ টেক্সট বুক বোর্ড পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করতে থাকে।

(গ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং সে অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচনাও প্রকাশনা একটি ধারাবাহিক কার্য—এই যুক্তি প্রদর্শন করে এবং ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে ১৯৮৩ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্রকে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে একত্র করে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড' গঠন করে। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, উন্নয়ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ডের শিক্ষাক্রম উইং-এর উপর ন্যস্ত আছে।

(ঘ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দান, শিক্ষাদান সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিদর্শন, মূল্যায়ন ইত্যাদি এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করার দায়িত্ব যে সংস্থা-সমূহের, বিশেষ করে এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বোর্ডসমূহের, তা থেকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী আলাদা করা শিক্ষানীতি ও প্রকৃত শিক্ষাদানের পরিপন্থী। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী যথোপযুক্ত না হলে শিক্ষা ফলপ্রসূ ও সহায়ক হয় না। শিক্ষাকে সমাজের চাহিদার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক করার জন্য সমাজের চাহিদা নিরূপণ, শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়করণ ও সে অনুসারে শিক্ষাক্রম পাঠ্যসূচী প্রণয়ন এবং শিক্ষার্থীদের অর্জিত মান যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষা বা মূল্যায়নের নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি সার্বিক দায়িত্ব বর্তমান ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষা বোর্ডসমূহের।

(ঙ) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪) একটি শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ব্যুরো স্থাপনের সুপারিশ করেছিল যার উপর ভিত্তি করে সম্ভবত ১৯৮১ জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল। উক্ত কমিশন যে সুপারিশ করে-ছিল তা হল, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর উন্নয়ন সাধনের জন্য সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন নয়, বরং বিভিন্ন শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন শিক্ষা স্তরের জন্য প্রণীত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী উন্নয়নের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো এবং সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দান। অথচ এর উপর ভিত্তি করে ১৯৮১ সালে প্রথমে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম উন্নয়ন কেন্দ্র' স্থাপন করে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাকে বাদ দিয়ে সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব এ সংস্থার উপর অর্পণ করা হয় এবং পরে ১৯৮৩ সালে সে সংস্থাকে বাংলাদেশ স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের সঙ্গে একত্র করে নবগঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সট বুক বোর্ড নামক সংস্থার উপর বর্তমান ক্ষেত্রে সরাসরি শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, যা শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদানের পরিপন্থী।

২১·৪৯· **সুপারিশ**

(১) আমরা সুপারিশ করি যে, শিক্ষাক্রম উইং এবং টেক্সট বুক উইং—এই দুটি উইং আলাদা করে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী উইংকে এই রিপোর্টের অন্যত্র প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিলে নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে যাওয়া হোক। এতে

কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা থাকবে, ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না বরং হ্রাস পাবে এবং প্রকৃত শিক্ষানীতি ও আদর্শ শিক্ষাদানের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে বলা যায় যে, এই কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের আওতাধীন শাখারূপে শিক্ষা বোর্ডগুলি দেশের বর্তমান প্রচলিত মাধ্যমিক (এস, এস, সি) পরীক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ, এস, সি) পরীক্ষা পরিচালনা করবে। ফলে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী, শিক্ষাদানের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষা গ্রহণ পরস্পর সম্পর্কিত বিষয়াদি একই শিক্ষা সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হবে।

(২) তবে প্রাথমিক শিক্ষার (১ম থেকে ৫ম শ্রেণী) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলনের দায়িত্ব প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত হবে। এই অধিদপ্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন ও প্রচলন করার ব্যাপারে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর সহায়তা প্রয়োজন হবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

২১.৫০. বর্তমানে দেশের চারটি প্রশাসনিক বিভাগে ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোরে চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড রয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক (ইণ্টারমিডিয়েট) স্তরের 'শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব' শিক্ষাবোর্ডসমূহের উপর ন্যস্ত। অতএব মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের (ডিগ্রী কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট সেকশনসহ) অনুমোদন, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নিয়ন্ত্রণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাবোর্ডসমূহের করণীয় কাজ।

২১.৫১. গত দেড় দশকে মাধ্যমিক স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের (ডিগ্রী কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট শাখা) সংখ্যা বেপরোয়াভাবে বেড়েছে। শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাদি পালন না করেই বহু সংখ্যক মাধ্যমিক স্কুল ও ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ স্থাপিত হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন মাধ্যমিক স্কুল ও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সংখ্যা একত্রে প্রায় আট হাজার। এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 'সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়ন' দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

২১.৫২. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার (একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর) জন্য পৃথক পৃথক ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ছাড়াও ডিগ্রী কলেজসমূহের ইণ্টারমিডিয়েট শাখা রয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা ১৯৬১ সাল পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আওতাধীন ছিল। সে বছরে আইনের মাধ্যমে এই স্তরের শিক্ষাকে (মাধ্যমিক স্তরের ন্যায়) শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতাধীন করা হয়। এই সঙ্গে এও সিদ্ধান্ত ছিল যে, ইণ্টারমিডিয়েট দু'টি ক্লাসকে ডিগ্রী কলেজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে উচ্চ মাধ্যমিকের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীরূপে গণ্য করা হবে। প্রায় সকল সরকারী ডিগ্রী কলেজ থেকে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস দু'টি বিচ্ছিন্ন করে পৃথক ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালে এই বিষয়সহ শিক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে আন্দোলনের ফলে পরবর্তী সময়ে উক্ত ব্যবস্থা বাতিল করতে হয়। তাই ইণ্টারমিডিয়েটের (উচ্চ মাধ্যমিক) দু'টি ক্লাসও ডিগ্রী কলেজগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে।

২১.৫৩. বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে রয়েছে। কামিল পর্যায় পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্ব মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

২১.৫৪. বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ডিপ্লোমা স্তর পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের দায়িত্বে রয়েছে।

২১.৫৫. দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ড ঢাকা, রাজশাহী, কুমিল্লা ও যশোর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড নিজেদের সমস্যা নিয়ে এত বেশি ব্যস্ত যে তাদের অনুমোদিত স্কুল, ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ ও মাদ্রাসাগুলির সমস্যাবলী ও শিক্ষার মানের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দেয়ার সময় ও সুযোগের অভাব দেখা দিয়েছে। অনুমোদিত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ইত্যাদি ব্যাপারে নির্ধারিত শর্তাদি পালন করার জন্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ এবং সর্বোপরি সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনা শিক্ষাবোর্ডসমূহের জন্য অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হয়ে পড়েছে। ফলে স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানের অবনতি হচ্ছে এবং ছাত্রদের মধ্যে যে অসন্তুষ্টি বিদ্যমান এসব তার কারণ। পরিস্থিতি ক্রমে জটিল আকার ধারণ করছে। শিক্ষাবোর্ডসমূহের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি পরীক্ষা ও তদন্ত করে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, তাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রায় ভেঙে পড়েছে। দায়িত্ব পালন ও কর্তব্য সম্পাদনে শিক্ষাবোর্ডগুলি তাদের কর্মচারীদের ইচ্ছা ও মর্জির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। কর্মচারীদের নিত্য নৈমিত্তিক দাবি-দাওয়া ও আচার ব্যবহার শিক্ষাবোর্ডসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার পথে বহুক্ষেত্রে অন্তরায়। শিক্ষাবোর্ডসমূহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটাকে বিবেচনা করা হয়, সে পরীক্ষা গ্রহণ কাজের দায়িত্ব সম্পাদনের ক্ষেত্রে হর-হামেশা অভিযোগ পাওয়া যায় এবং নানা বিষয়ে শিক্ষাবোর্ডসমূহকে প্রতিকূল সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষাবোর্ডের কর্মচারীদের যোগসাজসে জাল সার্টিফিকেট তৈরি ও বিক্রির বিষয় এখন কারো অজানা নয়।

২১.৫৬. শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন স্থানীয় লোক। ঢাকাস্থ শিক্ষাবোর্ডগুলি অবশ্য কিছুটা ব্যতিক্রম। শিক্ষা বোর্ডসমূহে স্থানীয় প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। কর্মচারীদের বদলীর কোনো নিয়ম বা ব্যবস্থা নেই। জাতীয়ভিত্তিক চিন্তাধারা ও বিচার বিবেচনার অবকাশ তাদের কম। সরাসরি নিয়োগকৃত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া বাইরে থেকে প্রেষণে কারো পোস্টিং শিক্ষা বোর্ডসমূহের কর্মচারীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয়। শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রেষণে শিক্ষা বোর্ডসমূহে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের নিজেদের দায়িত্ব পালনে ও কর্তব্য সম্পাদনে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রায় ভেঙে পড়েছে।

২১.৫৭. আর্থিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারেও শিক্ষা বোর্ডসমূহে নৈরাজ্য বিরাজ করছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নিয়ম ও আইন কানুনাদি মেনে না চলা শিক্ষা বোর্ডসমূহের রীতি ও নীতিতে পরিণত হয়েছে। অনিয়মিতভাবে পদ সৃষ্টি, পদোন্নতি প্রদান ও বেতন নির্ধারণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে দুর্বল করে ফেলছে। অধিকাল ভাতা, বিশেষ ভাতা ও সম্মানী ছাড়া শিক্ষা বোর্ডসমূহের কোনো কাজ সম্পাদন করানো যায় না।

২১.৫৮. মাধ্যমিক (এস,এস,সি) ও উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ,এস,সি) পরীক্ষা শুরু করার সময়, পরীক্ষার খাতা পরীক্ষকদের মধ্যে বন্টনের সময় এবং পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের সময় সাধারণত শিক্ষাবোর্ডসমূহের কর্মচারীরা নানা দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট, ঘেরাও ইত্যাদি আরম্ভ করে। প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রায় অচল করে দেয়। এতে পরীক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের ভোগান্তির একশেষ হয়। এই হল শিক্ষা বোর্ডসমূহের প্রশাসনিক ও আর্থিক দিক।

২১.৫৯. শিক্ষা কার্যক্রমের দিক দিয়ে শিক্ষা বোর্ডসমূহের মধ্যে মোটামুটিভাবে অভিন্নত বিদ্যমান। মাধ্যমিক (এস,এস,সি) ও উচ্চ মাধ্যমিক (এইচ,এস,সি) শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সকল শিক্ষাবোর্ডের এক ও অভিন্ন। মোটামুটিভাবে একই পাঠ্য পুস্তক সকল শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীরা পাঠ করে। বর্তমানে পরীক্ষার প্রশ্নাদিও একই ধরনের। একই সময়ে সকল

শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হয় এবং একই সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। স্কুল ও কলেজের অনুমোদনের ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একই নিয়ম, আইন কানুন ও শর্তাদি প্রয়োগ করা হয়। ছাত্র-ভর্তি এবং ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্কিত বিষয়াদি সম্পর্কে একই ও অভিন্ন নিয়ম ও কানুন রয়েছে। মোটামুটিভাবে একই বেতন স্কেল সকল শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য। বর্তমানে সকল শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ন্যায় অবসর ভাতা (পেনশন), গ্রাচুয়িটি ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। তাদের অবসর গ্রহণের বয়সও একই।

২১.৬০. প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশ বিভাগের পর তদানীন্তন পূর্ব বাংলায় একটি শিক্ষাবোর্ড—ইস্টবেঙ্গল সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড ছিল। ১৯৫৫ সালে তার নামকরণ করা হয় ইস্ট পাকিস্তান সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ড। তখনকার সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয় এই বোর্ডের আওতাধীন ছিল। ১৯৬১ সাল পর্যন্ত দেশের ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ছিল। সেই সময় আইনের মাধ্যমে নতুন ব্যবস্থার ফলে ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলি এবং ডিগ্রী কলেজের ইন্টারমিডিয়েট সেকশন ইস্ট পাকিস্তান সেকেণ্ডারী ও ইন্টারমিডিয়েট এডুকেশন বোর্ডের আওতাধীনে নিয়ে আসা হয়। পরে ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের মধ্যে দেশে আরো তিনটি শিক্ষাবোর্ড যথাক্রমে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, রাজশাহী, বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, কুমিল্লা এবং বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, যশোর স্থাপন করা হয়। ইস্ট পাকিস্তান ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন বোর্ডের নাম বদলিয়ে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, ঢাকা করা হয়। এভাবে বর্তমানের চারটি শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশে একাধিক শিক্ষাবোর্ড প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তি হিসাবে প্রদর্শন করা হয়েছিল যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, ফলে শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বছরের পর বৃদ্ধি উন্নত মানের শিক্ষাদানের ব্যবস্থাকরণ এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার সুষ্ঠু সংগঠন নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের প্রত্যাশা ইত্যাদি। এ সকল সাফল্যজনকভাবে অর্জিত হয়েছে কিনা তা উপরের বিশ্লেষণে প্রতীয়মান। পক্ষান্তরে প্রায় সব কিছুর মাঝে অভিন্নতা রাখা ও সমতা থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মানের দিক দিয়ে সকল শিক্ষাবোর্ডে অভিন্নতা বজায় আছে কিনা তা বিবেচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। শুধু-মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পৃথক পৃথক প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একাধিক শিক্ষাবোর্ড চালু রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা তা বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

২১.৬১. উপরোক্ত বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের অভিমত হল যে, পৃথক পৃথক প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশে ছয়টি শিক্ষাবোর্ড-চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, একটি কারিগরি শিক্ষাবোর্ড ও একটি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পৃথক পৃথক ব্যবস্থাপনায় চালু না রেখে বরঞ্চ একই প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানের ছত্রচ্ছায়ায় বিকেন্দ্রীকভাবে শিক্ষা বোর্ডগুলির দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হোক। আমরা সুপারিশ করি যে, এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সেকেণ্ডারী এডুকেশন) নামে একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হোক যার আওতায় বর্তমানে ছয়টি শিক্ষাবোর্ড একই প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ছয়টি শাখায় রূপান্তরিত হয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষার 'সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান ও উন্নয়নের' এবং পরীক্ষা গ্রহণের দায়িত্বে থাকবে। প্রস্তাবিত কাউন্সিলের অধীনে বর্তমানের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড এই ছয়টি শিক্ষাবোর্ড ও প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল'-এর শাখা হিসাবে মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা, মাধ্যমিক শিক্ষা

বোর্ড, রাজশাহী, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড যশোর, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড নামে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এজন্য এবং প্রস্তাবিত কাউন্সিল স্থাপনের জন্য শিক্ষাবোর্ড পৃথক পৃথক আইন ও অধ্যাদেশগুলির পরিবর্তে একটিমাত্র আইন/অধ্যাদেশ জারি করার প্রয়োজন হবে।

২১.৬২. উপরোক্ত সুপারিশকৃত ব্যবস্থায় শিক্ষা বোর্ডগুলির কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ পৃথক পৃথক শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের পরিবর্তে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীতে পরিণত হবেন। কাউন্সিলের চাকুরির শর্তাদি, একই আইন কানুন, নিয়মাবলী প্রভৃতি তাঁদের সকলের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে। তাঁদের কাউন্সিল ও তার শাখাসমূহ শিক্ষাবোর্ডগুলির যে কোনোটিতেই নিয়োজিত ও বদলী করা যাবে। পদোন্নতির বেলায় কাউন্সিল এবং তার শাখা শিক্ষাবোর্ডগুলির নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একই জ্যেষ্ঠতা তালিকার ভিত্তিতে বিবেচিত হবে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, মোটামুটিভাবে একই বেতন স্কেল সকল শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেলায় প্রযোজ্য। বর্তমানে সকল শিক্ষাবোর্ডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারীর ন্যায় অবসর ভাতা, গ্রাচুয়িটি ইত্যাদির ব্যবস্থা রয়েছে। তাঁদের অবসর গ্রহণের বয়সও একই। সুতরাং কাউন্সিলে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একই ধরন ও প্রকারের চাকুরির শর্তাদি, বেতনের স্কেল, আইন কানুন ও নিয়মাবলী প্রণয়ন ও প্রচলন করতে কোনো আশঙ্কা থাকবেনা। তারপরেও সাধারণ নিয়মাবলী অনুযায়ী সমন্বয়ের ব্যবস্থা থাকবে।

২১.৬৩. প্রস্তাবিত বাংলাদেশ জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা কাউন্সিল ঢাকায় স্থাপিত হতে পারে। কাউন্সিলের শাখারূপে কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডও ঢাকাতে থাকতে পারে। বর্তমানের চারটি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, রাজশাহী, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, কুমিল্লা, মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর এবং মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা নাম নিয়ে তাদের বর্তমান স্থানে অর্থাৎ রাজশাহী, কুমিল্লা, যশোর ও ঢাকায় অবস্থিত থাকতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এ চারটি সাধারণ শিক্ষাবোর্ড ছাড়াও স্কুল, কলেজ, শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের শাখারূপে আরো সাধারণ শিক্ষা-বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে আরো চারটি শিক্ষাবোর্ড দেশের অন্য চারটি অঞ্চলে, যেমন চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, রংপুর ও বরিশালে স্থাপন করার বিষয় যথাসময়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২১.৬৪. প্রস্তাবিত কাউন্সিলে নিম্নোক্ত বিভাগগুলি থাকতে হবে:

১। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী বিভাগ।

২। একাডেমিক বোর্ড।

৩। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন বিভাগ।

৪। শিক্ষাবোর্ড সমন্বয় বিভাগ।

৫। প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিভাগ।

৬। হিসাব রক্ষণ ও অডিট বিভাগ।

৭। পরীক্ষা উন্নয়ন ও গবেষণা সংস্থা।

৮। অন্যান্য প্রয়োজনীয় শাখা।

উল্লেখ্য যে, পরীক্ষা উন্নয়ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের জন্য এই রিপোর্টের 'পরীক্ষা ও মূল্যায়ন' অধ্যায়ে যে সকল সুপারিশ করা হয়েছে তার সফল বাস্তবায়নের জন্য একটি পরীক্ষা উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা অত্যাবশ্যক।

২১.৬৫. কাউন্সিলের প্রত্যেকটি শাখাতে-অর্থাৎ প্রত্যেকটি শিক্ষাবোর্ডে বর্তমানে যে সকল বিভাগ ও শাখা রয়েছে মোটামুটিভাবে সেগুলি থাকতে হবে। তবে সেগুলিকে বিভাগরূপে নামকরণ না করে উইং নামে চিহ্নিত করা সমীচীন হবে।

২১.৬৬. কাউন্সিলের প্রধান হবেন একজন চেয়ারম্যান। একজন প্রখ্যাত ও উচ্চ অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হবেন। কাউন্সিলের মুখ্য নির্বাহী ও একাডেমিক অফিসার হবেন একজন ডিরেক্টর-জেনারেল এবং কাউন্সিলের আওতাভুক্ত তার শাখারূপে বোর্ডগুলির নেতৃত্বে থাকবেন একজন করে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল। তাঁরা সকলে প্রবীণ, উপযুক্ত অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষাবিদ হবেন।

২১.৬৭. কাউন্সিলে একজন মুখ্য সচিব (প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী) এবং প্রত্যেক বিভাগে একজন করে পরিচালক (ডিরেক্টর) এবং তাঁদের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা থাকবেন। অনুরূপভাবে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের আওতাধীন তার শাখারূপে শিক্ষাবোর্ডগুলিতে বর্তমান নামকরণের সচিব (সেক্রেটারী), পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশান্স), স্কুল পরিদর্শক (স্কুল ইন্সপেক্টর), কলেজ পরিদর্শক (কলেজ ইন্সপেক্টর), প্রধান মূল্যায়ন অফিসার, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চীফ একাউন্টস অফিসার) এবং বিশেষজ্ঞ প্রভৃতি কর্মকর্তা এবং তাঁদের অধীনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা থাকবেন।

২১.৬৮. এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সাম্প্রতিক বেতন কাঠামো প্রবর্তন ও বেতন স্কেল নির্ধারণের সময় শিক্ষাবোর্ডগুলির চেয়ারম্যানের পদসহ সকল কর্মকর্তাদের পদের বেতন স্কেল এত নিচে নামানো হয়েছে যে তা কোনোক্রমে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। স্বভাবতই তাঁদের পদমর্যাদাও ভীষণভাবে অবনমিত হয়েছে। 'ওয়ারেন্ট অব প্রিন্সিডেন্স'- এ চেয়ারম্যানদের কোনো স্থানই নেই। এ সবের বিহিত হওয়া প্রয়োজন। প্রস্তাবিত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর জেনারেল এবং তার আওতাধীন শাখারূপে বোর্ডগুলির প্রধান হবেন একজন করে ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল। তাঁদের বেতন স্কেল ও পদ মর্যাদা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যেমন বিনা ভাড়ায় বাড়ি, নির্দিষ্ট হারে প্রদেয় অর্থে সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য গাড়ি ইত্যাদি দেয়া প্রয়োজন। তাঁদের অধীনস্থ অন্যান্য কর্মকর্তার বেতন ও সুযোগ-সুবিধা তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ/পুনর্নির্ধারণ অত্যাবশ্যক।

২১.৬৯. প্রস্তাবিত কাউন্সিলে একটি একাডেমিক বোর্ড এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী কমিটি (কারিকুলাম এণ্ড সিলেবাস কমিটি) থাকবে। কাউন্সিলের আওতাধীন বিভিন্ন শিক্ষাবোর্ডে একটি করে একাডেমিক কমিটি এবং বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সাবকমিটি (কারিকুলাম এণ্ড সিলেবাস সাবকমিটি) থাকবে। এই সাবকমিটিগুলি থেকে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন বিষয়ে সুপারিশ ও মূল্যায়নের প্রতিবেদন ও শিক্ষাবোর্ডের একাডেমিক কমিটির মাধ্যমে কাউন্সিলের সংশ্লিষ্ট কমিটিতে প্রেরিত হবে।

২১.৭০. একই পদ্ধতিতে, একই প্রশ্নমালায় এবং একই সময়ে সারাদেশে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ইত্যাদি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে এবং একই সময়ে ফল প্রকাশিত হবে। জাতীয় ভিত্তিক একই শিক্ষামানের জন্য এসব অপরিহার্য। উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের একই মেধা তালিকা প্রস্তুত করে সেই মেধা তালিকার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদান করতে হবে। বর্তমানে সকল বোর্ডের জন্য একত্রে যত বৃত্তি দেয়া হয় সেই বৃত্তির সংখ্যা কমানো যাবেনা, বরং দেশের সকল অঞ্চলের পরীক্ষার্থীরা যাতে বৃত্তি লাভের সুযোগ পায়, সেজন্য বৃত্তির সংখ্যা বাড়াতে হবে।

২১.৭১. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি কাউন্সিলের পরীক্ষা পরিচালক (ডিরেকটর অফ এগজামিনেশনস) এর নেতৃত্বে বোর্ডগুলির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকদের (কন্ট্রোলার অব এগজামিনেশন্স) সহযোগিতায় প্রণয়ন করা হবে এবং তাঁরা সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্ব বহন করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকবৃন্দ তাঁদের স্ব স্ব এলাকার কেন্দ্রসমূহে পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থাদির জন্য দায়ী থাকবেন।

২১.৭২. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট প্রস্তাবিত কাউন্সিলের নামে জারি করা হবে। তবে সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলি তাদের স্ব স্ব এলাকার সফলকাম পরীক্ষার্থীদের সার্টিফিকেট ও মার্কশীট কাউন্সিলের নামে প্রদানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। প্রস্তাবিত কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন পর্যন্ত সার্টিফিকেট, মার্ক শীট ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের নামে অবশ্য জারি করতে হবে।

২১.৭৩. শিক্ষা বোর্ডগুলির অর্থ ও অন্যান্য স্থাবর অস্থাবর সম্পদ কাউন্সিলের সম্পদরূপে পরিগণিত হবে, তবে যে শিক্ষা বোর্ডের যে সম্পদ সে সম্পদ কাউন্সিলের শাখারূপে সেই শিক্ষা-বোর্ডেরই থাকবে। শিক্ষা বোর্ডগুলির টাকা পয়সা এবং শিক্ষাবোর্ডগুলির লেনদেন বর্তমান যে সকল ব্যাংকের সঙ্গে রয়েছে সে সব ব্যাংকের সঙ্গে থাকবে।

২১.৭৪. অনুরূপভাবে শিক্ষা বোর্ডগুলির দায় ও দায়িত্ব প্রস্তাবিত কাউন্সিলের শাখারূপে শিক্ষা বোর্ডগুলির উপর বর্তাবে।

২১.৭৫. প্রস্তাবিত কাউন্সিল তার শাখাগুলিসহ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ন্যায় পরিচালিত হবে।

২১.৭৬. কাউন্সিলের বাজেট সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হবে। কাউন্সিল ও তার শাখাগুলির জন্য একটি বাজেট হবে, তবে শাখাগুলির জন্য পৃথক পৃথকভাবে বাজেট বরাদ্দ ও আয়ব্যয় দেখাতে হবে।

২১.৭৭. কাউন্সিল এবং তার শাখাগুলির আয় ও ব্যয় এবং হিসাবপত্র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মহাহিসাবরক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত ও নিরীক্ষিত হবে।

২১.৭৮. প্রস্তাবিত কাউন্সিলের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিচালনা বোর্ড (একজিকিউটিভ বোর্ড) থাকবে। তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিণ্ডিকেটের মত হবে। কাউন্সিলের অর্থ কমিটি থাকবে, তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের ফাইনান্স কমিটির ন্যায় হবে।

২১.৭৯. বর্তমানে শিক্ষা বোর্ডগুলিতে যে সকল কমিটি, সাবকমিটি প্রভৃতি চালু আছে, সে সকল কমিটি ও সাবকমিটির কার্যাবলী, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রস্তাবিত কাউন্সিলে সে জাতীয় প্রয়োজনীয় কমিটি ও সাবকমিটি থাকতে হবে।

২১.৮০. সরকারের সঙ্গে প্রস্তাবিত কাউন্সিলের সম্পর্ক মোটামুটিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কের ন্যায় হবে-যাতে ক্ষমতা প্রয়োগে, দায়িত্ব পালনে ও কর্তব্য সম্পাদনে কাউন্সিল তার শাখাগুলিসহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিচালিত হতে পারে।

২১.৮১. শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরসমূহ

(১) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণ করতে হবে। প্রশাসনিক ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে আঞ্চলিক, জেলা, উপজেলা এবং মাধ্যমিক পর্যায় থেকে উপরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে যথা প্রয়োজন ও যথাসম্ভব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিতে বিকেন্দ্রী-করণ করতে হবে।

(২) শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হবে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষানীতির সমন্বয় বিধান, বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার মধ্যে সাধারণ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিধান, আন্তঃমন্ত্রণালয় বিষয়াবলী, শিক্ষা সংক্রান্ত বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়সমূহ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিভিন্ন বিষয়, শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদসমূহে নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয় যা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং শিক্ষা অধিদপ্তর, আঞ্চলিক শিক্ষা পরি-দপ্তর এবং জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের ক্ষমতার বাইরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট প্রণয়ন, যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার অনুমোদন গ্রহণ এবং বিভিন্ন কর্মসূচীর বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত সকল পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ বণ্টন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবে। শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে সকল উন্নয়ন প্রকল্প যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্বও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের থাকবে। শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের বিদেশে প্রশিক্ষণ ও সফর সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যবস্থা ও তদারক করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে ও ক্ষেত্রে সরকারী 'রুলস অব বিজিনেস' এবং সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে 'এলোকেশন এণ্ড ডিস্ট্রিবিউশন অব ফাংশনস' বলবৎ থাকবে।

(৩) শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের বিস্তৃতি ও সম্প্রসারণের (এই অধ্যায়ের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সমস্যাবলী বিষয়ে বিবরণ দ্রষ্টব্য) সঙ্গে উপরোক্ত ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্য বিবেচনা করলে তার সঙ্গে প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যস্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাঠামো এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ ও মর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তা সংস্থানের কথা এসে পড়ে। আমাদের মতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা উচিত। মোটামুটিভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে (ক) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, (খ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ এবং (গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা বিভাগ—এই তিনটি বিভাগে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। স্বভাবতই প্রাথমিক স্তরের সকল শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব হবে। সেরূপ মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বে থাকবে। উচ্চ স্তরের সকল শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ দায়িত্ব পালন করবে। দেশের সকল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে। শিক্ষা

মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের চ্যান্সেলরের সেক্রেটারিয়েট হিসাবেও দায়িত্ব পালন করবে। উপরে উল্লিখিত তিন স্তরের শিক্ষার বিভিন্ন শাখা ও অপরাপর দায়িত্বের ভিত্তিতে বিভাগগুলি আরো কতিপয় উপ-বিভাগে(উইং/ব্রাঞ্চ ইত্যাদি) বিভক্ত হওয়া উচিত। এর অর্থ হবে এই যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরূপ ব্যক্তি রাখতে হবে যাঁদের পরামর্শ দেশের ও বিদেশের শিক্ষাবিদদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। সর্বোপরি তাঁরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বাঞ্ছিত কাজ পেতে হলে এর সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এই তিনটি বিভাগের দায়িত্বে থাকবেন ও নেতৃত্ব দেবেন সরকারের সচিব পর্যায়ের (শুধু মর্যাদা সম্পন্ন নয়) তিনজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তার নেতৃত্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তিনটি বিভাগের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা সে অনুসারে পদ মর্যাদাধারী ও বেতনভোগী হবেন। তিনটি বিভাগের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্য সচিবদের নিয়ে একটি স্থায়ী সমন্বয় কমিটি থাকবে।

(৪) উপরোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ও অধীনস্থ বিভিন্ন অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর, সকল আঞ্চলিক/বিভাগীয় শিক্ষা অফিস ও জেলা শিক্ষা অফিসের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের প্রয়োজন হবে। উদাহরণ স্বরূপ, বর্তমান মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরকে দুভাগে বিভক্ত করে উচ্চশিক্ষা উইং এবং মাধ্যমিক শিক্ষা উইংকে কেন্দ্রীয় ভাবে দুটি অধিদপ্তরে পরিণত করা যায়, যার উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় দেশের সকল কলেজ আসবে এবং এর জন্য আঞ্চলিক/বিভাগীয় ও জেলা ভিত্তিক এই অধিদপ্তরের কোনো শাখা বা অফিসের প্রয়োজন হবেনা। মাধ্যমিক শিক্ষা উইং মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর হিসাবে কেন্দ্রীয়ভাবে কাজ করবে। মাধ্যমিক শিক্ষা উইং-এর বর্তমান আঞ্চলিক শিক্ষা অফিসগুলিকে উন্নীত করে চারটি পরিদপ্তরে পরিণত করা প্রয়োজন হবে, সে রূপ জেলা শিক্ষা অফিসগুলিকে উপযুক্ত ভাবে উন্নীত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় প্রাথমিক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলির বেলায়ও উপরোক্ত সুপারিশ প্রযোজ্য। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বেলায় বিশেষ কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন হবে বলে আমরা মনে করি না। তবে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি স্বায়ত্তশাসিত বি.আই.টি'তে রূপান্তরিত হবার আলোকে এবং বর্তমানে এই অধিদপ্তরের আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই অধিদপ্তরের কাঠামো ও গঠন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যথোপযুক্ত ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে।

(৫) সাম্প্রতিক কালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা ভিত্তিক পরিদর্শন ও হিসাব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিরেক্টরেট অব ইন্সপেকশন এণ্ড অডিট) এবং ফ্যাসিলিটিস ডিপার্টমেণ্টকে স্বতন্ত্র-ভাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা আছে বলে মনে হয় না। তদুপরি ঢাকা ভিত্তিক এই পরিদপ্তর দুটির দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ অত্যাবশ্যক। এই দুটি পরিদপ্তর প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠিত আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরিদপ্তরগুলির সঙ্গে একত্রীভূত করা উচিত হবে। এই দুটি পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপরোক্ত পরিদপ্তরগুলিতে আত্তীকরণ করা যায়। বস্তুতপক্ষে এই দুটি পরিদপ্তরের যা দায়িত্ব ও কর্তব্য তা সুপারিশকৃত আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরিদপ্তরগুলি থেকে আলাদা করার ন্যায়সঙ্গত কোনো কারণ নেই।

(৬) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ ও আওতাধীন সকল অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং শিক্ষা অফিসসমূহের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা বিশদভাবে সকল দিক বিবেচনা করেছি। দেশে শিক্ষার স্বার্থে এবং এই রিপোর্টের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলির পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ একমত এবং তার জন্য জোর সুপারিশও করছি। তবে কি প্রকার বা ধরনের পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন প্রয়োজন এবং তা বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে কমিশন মনে করে যে, এসব বিষয় বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং তার অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলিকে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখা বা বিবেচনা করা সম্ভব নয় এবং তা যুক্তিযুক্ত হবেনা। প্রস্তাবিত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন অন্যান্য মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরগুলির উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি ও ছায়াপাত করতে বাধ্য। তাই আমরা সুপারিশ করি যে, সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এই সকল বিষয় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

(৭) সুষ্ঠু কর্মদক্ষতা লাভের জন্য সকল অধিদপ্তর ও পরিদপ্তর এবং সমস্ত আঞ্চলিক/বিভাগীয় ও জেলা শিক্ষা দপ্তরগুলিকে অধিকতর প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক বরাদ্দকরণ ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে। বর্তমানে এদের যে দায়িত্ব, কর্তৃত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা, আর্থিক বরাদ্দকরণ ও ব্যয়ের ক্ষমতা রয়েছে বিকেন্দ্রীকরণ ও সুষ্ঠু প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে সমস্ত ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজন। এর ফলে কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হবে।

(৮) আঞ্চলিক/বিভাগীয় পরিদপ্তর এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরগুলির অধীন ও আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সেই দপ্তরগুলির নিকট দেয়া উচিত। এর ফলে এ সকল শিক্ষা দপ্তরসমূহের শিক্ষা প্রশাসন ও উন্নয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

(৯) শিক্ষা অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলির এবং তাদের অধীনস্থ শিক্ষা অফিসসমূহের নিজ নিজ আওতাধীন শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্ব হবে:

(ক) সকল পর্যায়ের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়ন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা, সকল এলাকাতে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন, সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, শিক্ষা প্রশাসনের সকল দিক তদারক, প্রশাসন ও উন্নয়ন উভয় ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন। এই দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে সরকারী ও বেসরকারী উভয় প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে।

(খ) বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন ও সমন্বয় সাধন। এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ এবং শিক্ষা বোর্ডগুলির সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন।

(গ) শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের (সরকারী রুলস অব বিজিনেস অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিক্ষক ও কর্মকর্তা ছাড়া) নিয়োগ বদলী, পদোন্নতি, নিয়ন্ত্রণ, অবসর প্রদান, দেশের ভিতরে প্রশিক্ষণ এবং চাকুরি সংক্রান্ত অন্যান্য দায়িত্ব বহন।

(ঘ) শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিশ্চিতকরণ।

(ঙ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি ও অনুমোদন দান ও নবায়নের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন, তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং তার ভিত্তিতে সুপারিশদান অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলি এবং তাদের অধীনস্থ জেলা শিক্ষা অফিসসমূহের উপর ন্যস্ত থাকবে।

(চ) অধিদপ্তর ও পরিদপ্তরগুলির বিভিন্ন বিভাগ/শাখা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, সম্প্রসারণ, উন্নয়ন, অর্থ বরাদ্দকরণ, নিয়ন্ত্রণ, ও তত্ত্বাবধান করবে। এ সকল বিভাগ/শাখা তাদের নিজ নিজ আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করবে। পরিদর্শনের কাজ নিয়মিত ও ব্যাপক ভিত্তিতে করার জন্য প্রতিটি বিভাগে পর্যাপ্ত সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে পরিদর্শকদের প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে।

(ছ) মাধ্যমিক শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রত্যেক মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদপ্তরের অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলা সদরগুলিতে বর্তমান জেলা শিক্ষা অফিসগুলি কাজ করে যাবে। তবে এ সকল কার্যালয়ের প্রধানদের জেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারী জেলা শিক্ষা অফিসার, পরিদর্শক, পরিদর্শিকা, সহকারী পরিদর্শক, সহকারী পরিদর্শিকা প্রভৃতির বেতন ও পদমর্যাদা উন্নীত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া বর্তমানে এ সকল কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় পরিদর্শকের অভাবে মাধ্যমিক স্কুল পরিদর্শনের নিয়মিত ব্যবস্থা নিতে সমর্থ হচ্ছে না বিধায় কার্যালয়গুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যক স্কুল পরিদর্শক-পরিদর্শিকা নিয়োগ করা আবশ্যক।

(জ) মাদ্রাসা শিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার জন্য আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(ঝ) জেলা পর্যায়ে বর্তমান জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসগুলি কাজ করে যাবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা পরিষদের সার্বিক তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় বর্তমান উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ কাজ করে যাবেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিস্তারিত সুপারিশ এই অধ্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহে দেয়া আছে।

শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ

২১.৮২. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় নীতিগতভাবে, উপযুক্ত ও যোগ্য শিক্ষাবিদদের নিয়োগ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদসমূহ শিক্ষা প্রশাসনে অভিজ্ঞ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা দরকার। শিক্ষা একটি জটিল এবং উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞতাপূর্ণ ক্ষেত্র। কাজেই এ ক্ষেত্রে সুষ্ঠু প্রশাসনের জন্য পেশাগত ও কারিগরি যোগ্যতা, প্রশাসনিক নৈপুণ্য, দেশের এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষানীতি, সমস্যা ও অগ্রগতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের আবশ্যক। এ ব্যতিরেকে শিক্ষানীতি নির্ধারণ, শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য হতে বাধ্য।

২১.৮৩. পেশাগত ক্ষেত্রে শিক্ষা পরিচালককে শিক্ষা কর্মসূচী, শিক্ষাদানের গুণগত মান, বিশেষজ্ঞতাপূর্ণ শিক্ষক নৈপুণ্য ও পাঠক্রমের উৎকর্ষ বিধান এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্য নিরূপণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। অন্যান্য দেশে চালু শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। বিভিন্ন পদে লোক নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি প্রশাসন সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার জন্য শিক্ষকতা কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পেশাগত যোগ্যতা নির্ধারণ সম্পর্কে বিশেষ দক্ষতার প্রয়োজন। উচ্চতর স্তরে একই ব্যক্তির দ্বারা এসব কাজ সম্পন্ন হয় এবং তাঁর নিকট আনীত বিভিন্ন প্রশ্নে তাঁকে পেশাগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তাঁর দায়িত্ব পেশাগত ক্ষেত্রেই হোক বা প্রশাসন ক্ষেত্রেই হোক সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে তিনি কাজ করছেন সে সম্পর্কে এবং অপরাপর দেশের শিক্ষা-নীতি এবং সমস্যা ও সমাধানের সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান থাকতে হবে। কোনো ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে এবং শিক্ষার্থী সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং এর সঙ্গে জড়িত সমস্যাবলীর সমাধান প্রচেষ্টায় তাঁর কর্মজীবন অতিবাহিত হয়ে না থাকলে তাঁর পক্ষে এ যোগ্যতা সহসা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর দূরদৃষ্টির মিলন হলে তবেই শিক্ষা প্রশাসকের পক্ষে বাস্তব ও শিক্ষাগত সুষ্ঠু নীতি উদ্ভাবন করা সম্ভব। শিক্ষা পরিচালন ব্যবস্থাকে ফলপ্রসূ ও সুসংগঠিত করে তুলতে হলে এমন শিক্ষা প্রশাসনের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে শুধু নৈপুণ্যের সঙ্গে নয় বরং পেশাগত যোগ্যতার সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। সুতরাং শিক্ষা প্রশাসনে উপযুক্ত শিক্ষা-বিদদের নিয়োগ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অফিসারদের পদগুলি শিক্ষাবিদদের দ্বারা পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই।

শিক্ষা প্রশাসকদের প্রশিক্ষণ

২১.৮৪. শিক্ষা বিভাগের অফিসারদের প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত করার পূর্বে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। বস্তুতপক্ষে শিক্ষার সকল স্তরে শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক পদে নিয়োগের অব্যবহিত পরে এবং পদোন্নতির পূর্বে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের নিয়ম করা সুষ্ঠু শিক্ষা প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার অন্যতম পূর্বশর্ত।

২১.৮৫. যাঁরা অল্প বয়সে নিয়োগ লাভ করবেন তাঁদের বেলায় কমপক্ষে ৬ মাসের জন্য স্কুল ও কলেজ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী থাকবে। এর পর আরো ৬ মাসের জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করার কর্মসূচী থাকবে। উল্লিখিত সময়ে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাবলী এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নবীন অফিসারদের মধ্যে বাস্তব জ্ঞানের সঞ্চার করতে হবে। যাঁদের অধিক বয়সে প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত করা হবে, বিভাগীয় কার্যধারা ও নীতির সঙ্গে তাঁদের পরিচিতির এবং শিক্ষা সংক্রান্ত স্বীয় বিশিষ্ট জ্ঞানের উৎকর্ষ বিধানের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করতে হবে। বর্তমানে কর্মরত ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্যভাবে প্রয়োজনীয়। চাকুরিরত ব্যক্তিদের জন্য নির্দিষ্ট কোর্সের প্রয়োজন হবে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক, পরিদর্শক, বিশেষজ্ঞ এবং বিভাগীয় শাসন পরিচালনা ব্যবস্থায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক ও পেশাগত দক্ষতার উৎকর্ষ বিধানকল্পে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কর্মসূচীতে তাঁদের কাজের গুণাগুণ নির্ণয় করা হবে এবং পদোন্নতি ও ভবিষ্যৎ নতুন কাজে নিয়োগের বেলায় এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। বস্তুত কৃতিত্ব সহকারে পূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত না করলে এবং উচ্চতর পদের জন্য প্রয়োজনীয় পেশাগত, প্রশাসনিক ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর অধিকারী নয় বলে বিবেচিত হলে কোনো ব্যক্তিকে উচ্চতর পদে নিয়োগ করা উচিত হবে না।

২১.৮৬. বর্তমানে এসব প্রশিক্ষণ লাভের ব্যবস্থা সীমিত বিধায় অনতিবিলম্বে এর সুযোগ সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে সাভারস্থ জাতীয় গণ প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শিক্ষা বিভাগের ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাদের বিপুল সংখ্যার প্রয়োজনীয় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্ষম হচ্ছে না। এ প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় শিক্ষা প্রশাসন, সম্প্রসারণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে (নিয়েমার) শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে তা আরো শক্তিশালী ও সম্প্রসারিতকরণ প্রয়োজন। এ জন্য এই প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়োগদানসহ এর বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক। এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর নিয়েমারকে শিক্ষা কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সকল প্রকার চাকুরি-পূর্ব ও চাকরি-কালীন প্রশিক্ষণ প্রদানের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রদান সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ এডুকেশন কোড

২১.৮৭. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশের প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুপারিশটি হল:

২১.৮৮. "শিক্ষা সংক্রান্ত নানা নিয়ম-কানুন, শিক্ষকের নিয়োগ, ছাত্র ভর্তি, ছাত্রাবাস পরিচালনা সম্পর্কিত নিয়মাবলী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃংখলা রাখা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তিদান, পরীক্ষার সং-শ্লিষ্ট নিয়মকানুন ইত্যাদি বহু শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয় সম্বলিত একটি 'এডুকেশন কোড' দ্বারা এবং শিক্ষা বোর্ডগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আইন ও নিয়ম ও কানুন দ্বারা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত। এ ধরনের একটি 'এডুকেশন কোড' শেষ বারের মত ১৯৩১ সালে সংকলিত হয়েছিল। এ সময়ের পর বহু বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু আর নতুন কোন এডুকেশন কোড সংকলিত হয়নি। অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে নানাবিধ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বহু আইন-কানুন ও নিয়মাবলীর পরিবর্তন, পরি-বর্ধন ও সংশোধন হয়েছে। এ সকল অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সময়ে সময়ে অনেক আইন-কানুন, নিয়ম-নীতি ও নির্দেশনামা জারি হয়েছে। সে সব সংকলিত করে প্রকাশ করা জাতীয় কর্তব্য। এ কারণে আমরা সুপারিশ করি যে, এডুকেশন কোড সংকলনের জন্য সরকারের একজন সচিবের পদ-মর্যাদা ও মানের একটি পদ দুই বছরের জন্য সৃষ্টি করে একজন যোগ্য ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হোক। এ কাজে সহায়তা করার জন্য তাঁকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারী দেওয়া ও অফিসের ব্যবস্থা করা হোক।"

২১.৮৯. শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুসংহত করার ব্যাপারে এডুকেশন কোড যে বিশেষ অবদান রাখবে তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

২১.৯০. এই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এডুকেশন কোড সংকলনে আর কালক্ষেপন না করে চূড়ান্ত করে প্রকাশ করবে, আশা করি।

২১.৯১. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (১৯৭৪)-এর অন্য একটি সুপারিশের প্রতিও আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সে সুপারিশটি হল: 'সমগ্র দেশে সর্বস্তরে শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে একটি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষায়তনের শিক্ষার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধান এবং মান সুনিশ্চিত করাও এই সংস্থার অন্যতম দায়িত্ব হিসাবে গণ্য হবে। উল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য স্তরের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত হওয়া উচিত। শিক্ষা মন্ত্রী ও শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী পদাধিকার বলে এ সংস্থার সভাপতি ও সহ-সভাপতি হবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সচিব দ্বিতীয় সহ-সভাপতি থাকবেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব বা সম মর্যাদাসম্পন্ন পদে অধিষ্ঠিত একজন শিক্ষাবিদ এর সদস্য-সচিব হবেন।'

২১.৯২. আমরা উক্ত কমিশনের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করার জন্য সুপারিশ করি।

উচ্চশিক্ষাঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন

২১.৯৩. ভূমিকাঃ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাব পরিচালিত হচ্ছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত হয়। এদের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক কর্মকাণ্ড কতকগুলি অঙ্গের, যেমন কোর্ট (এখন সিনেট), নির্বাহী পরিষদ (এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল, এখন সিণ্ডিকেট), একাডেমিক পরিষদ, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হত। শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ বিভিন্ন সিলেকশন বোর্ড ও কমিটির বাছাই ও নির্বাচনের মাধ্যমে করা হত। এমন কি ভাইস চ্যান্সেলরকেও নির্বাহী পরিষদের সুপারিশে চ্যান্সেলর নিয়োগ করতেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এই আইন পরিবর্তন করে ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি চ্যান্সেলরের হাতে নেয়া হয়। পরে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই ভাবেই স্থাপিত হয়। তারপর ১৯৭৩ সালে ঢাকা, রাজশাহী চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ/আইন জারি করা হয় এবং এই আদেশ, আইন অনুসারেই এখন এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে। এদের সিনেট, সিণ্ডিকেট, অর্থ কমিটি, একাডেমিক পরিষদ, বিভিন্ন অনুষদ ও বিভাগীয় কমিটিগুলি রয়েছে এবং সিনেটের সুপারিশকৃত তিন নাম বিশিষ্ট প্যানেল থেকে চ্যান্সেলর ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন। এদের অনুষদের ডীন, অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক থেকে নির্বাচিত হন, বিভাগীয় চেয়ারম্যান পালাক্রমে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক এবং সহকারী অধ্যাপক থেকে তিন বছর অন্তর অন্তর নিযুক্ত হন। অন্যদিকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় ১৯৬২ সালে প্রণীত তাদের প্রতিষ্ঠাকালীন আইনানুসারে চলছে। এদের সিনেট নেই, তবে অন্যান্য অঙ্গগুলি রয়েছে এবং চ্যান্সেলার সরাসরি ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ করেন। সবগুলি বিশ্ববিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসিত।

বর্তমান অবস্থা

২১.৯৪. ১৯৭৩ সালে প্রণীত আদেশ/আইনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর গণতন্ত্র এসেছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষকদের চিন্তা প্রকাশের নিরঙ্কুশ অধিকার, শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তির যথোচিত বিকাশ এবং সর্বোপরি উচ্চশিক্ষার সর্বাঙ্গীন বিস্তারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ গণতান্ত্রিক ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত। তবে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, এখন এদের সুষ্ঠু ও দায়িত্বশীল ব্যবহার হচ্ছে না। এ বিষয়ে আমাদের কাছে অনেক বিরূপ অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। নিম্নে তার কতকগুলি নমুনা দেয়া হল।

২১.৯৫. ভাইস-চ্যান্সেলর মনোনয়ন/নির্বাচনঃ বর্তমানে নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের প্যানেলগুলির মনোনয়ন পদ্ধতি বিপুল সমালোচনার সম্মুখীন। বর্তমানে প্রচলিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচিত হবার জন্য প্রার্থীদের দেশের অন্যান্য নির্বাচনের ন্যায় 'ইলেকশন ক্যাম্পেন' করতে দেখা যায় এবং সিনেট সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন দলগঠন করাও হয়। এতে দলভিত্তিক নির্বাচন প্রাধান্য পায়। এসব দলের সমর্থন না থাকলে উপযুক্ত, অভিজ্ঞ, প্রখ্যাত ব্যক্তির ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োগের জন্য প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। ভাইস-চ্যান্সেলর প্যানেলে অন্তর্ভুক্তির জন্য 'ইলেকশন ক্যাম্পেন' এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে ভোট সংগ্রহের জন্য প্রার্থীরা এবং তাঁদের সমর্থকেরা সিনেট সদস্যদের বাড়ি পর্যন্ত ধর্ণা দেন। সত্যিকারের উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন অনেক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাইস-চ্যান্সেলর পদের জন্য

প্রার্থী হতে চান না বা হন না। অন্যদিকে এতে নির্বাচন শুধু সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যেই সীমিত থাকে। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা দেশে অধিকতর উপযুক্ত ব্যক্তি থাকলেও তাঁরা সাধারণত প্যানেল ভুক্তির জন্য বিবেচনায় আসেন না। এ ছাড়া একটি মারাত্মক অভিযোগও পাওয়া গিয়েছে। দলকে কেন্দ্র করে ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচিত হওয়ায় নিযুক্তির পর ঐ দলের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়া ভাইস-চ্যান্সেলরের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। দলের প্রভাব প্রকটভাবে অনুভূত হয়। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন, বাছাই বা অনুসন্ধান কমিটি গঠন করে তাঁদের সুপারিশকৃত প্যানেল থেকে ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগ করা উচিত।

২১.৯৬ ভাইস-চ্যান্সেলর নিয়োগের মেয়াদঃ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী একই ব্যক্তি ভাইস-চ্যান্সেলর পদে প্রথম দফায় চার বছর পূর্তির পরও একাদিক্রমে দ্বিতীয় দফায়ও চার বছরের জন্য নিয়োগ লাভ করতে পারেন, অর্থাৎ একাদিক্রমে দু'দফায় আট বছরের জন্য ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিয়োজিত থাকতে পারেন। যে সকল কারণে সিনেট, সিন্ডিকেট ইত্যাদি পুনর্বিন্যাস ও পুনর্গঠন করা প্রয়োজন বলে নিচে অভিমত রাখা হয়েছে সে সব কারণে ভাইস-চ্যান্সেলর পদে একাদিক্রমে দুবার নিয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয় বলে অনেকে মত প্রকাশ করেন।

২১.৯৭ প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচন/মনোনয়নঃ সুষ্ঠু প্রসাশন ও ব্যবস্থাপনার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনজন উপ-উপাচার্য থাকা উচিত। এই তিন জন হবেন:

(ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর .. একাডেমিক

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর .. প্রশাসন এবং

(গ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর অর্থ

ট্রেজারারের পদটি লুপ্ত হবে এবং পদবীটি প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর (অর্থ) নামকরণ করা হবে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রেজারারের পদ নেই, সেখানে সে পদটি সৃষ্টি না করে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (অর্থ) পদ সৃষ্টি করা যায়।

২১.৯৮ ডীন নির্বাচনঃ উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডীন নির্বাচনের পদ্ধতি হল প্রত্যেকটি অনুষদের সকল শিক্ষক—অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক এবং প্রভাষক-একত্রে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপকদের মধ্য থেকে এক জনকে দু'বছরের জন্য ডীন নির্বাচন করেন। দেখা গিয়েছে যে, অনেক ক্ষেত্রে অধ্যাপক নির্বাচিত না হয়ে, অনুষদের ডীন পদে একজন সহযোগী অধ্যাপক নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে দেখা গিয়েছে যে, অনেক জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ঐ পরিষদ সভাতে উপস্থিত থাকেন না বা অনুষদের কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করেন না। তদুপরি ডীন হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং কর্মকাণ্ডে প্রতিনিধিত্ব করা থেকে এবং অংশ গ্রহণ থেকে জ্যেষ্ঠ অধ্যাপকরা বঞ্চিত হন। তাতে সংশ্লিষ্ট অনুষদের ক্ষতি হয়।

২১.৯৯ বিভাগীয় চেয়ারম্যানঃ অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপক পালাক্রমে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তিন বছরের জন্য বিভাগীয় চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এতে অনেক সময় বিভাগে অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক থাকা সত্বেও পালা পদ্ধতির জন্য সহকারী অধ্যাপক বিভাগীয় চেয়ারম্যান হন। এতে বিভাগীয় নেতৃত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণার অনুকূল হচ্ছে না এবং বিভাগীয় শৃংখলা অনেকাংশে ব্যাহত হচ্ছে। নবীন শিক্ষক চেয়ারম্যান

হলে অভিজ্ঞতার অভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগও ঠিক মত হয়ে ওঠেনা, তাতে পারস্পরিক সম্পর্কও ঠিক মত স্থাপিত হতে পারে না। এতে বিভাগীয় চেয়ারম্যানের নিকট থেকে যে নেতৃত্ব আশা করা উচিত তা পাওয়া যায়না।

২১.১০০. **সিনেট গঠন ও নির্বাচন :** ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও জাহাঙ্গীরনগর-এ চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রত্যেকটিতে ২৫জন করে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধি রাখা হয়েছে। তাঁদের নির্বাচন পদ্ধতি ক্রটিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা নির্বাচিত ৩৫ জন প্রতিনিধি এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রত্যেকটিতে ৩৩ জন করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতিনিধি রয়েছেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের আওতাভুক্ত কলেজগুলির অধ্যক্ষ ও শিক্ষকদের মধ্যে থেকে ৫ জন অধ্যক্ষ ও ১০ জন অন্যান্য শিক্ষকের প্রত্যেক সিনেটে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন অধ্যক্ষ প্রতিনিধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত হন, তারা নিজেরা নিজেদের মধ্য থেকে সিনেট প্রতিনিধি নির্বাচিত করেন না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন কোনো কলেজ নেই, সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে যে ৫জন অধ্যক্ষ প্রতিনিধি দেশের যে কোনো পাঁচটি কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলে মনোনীত হন। অন্যদিকে সিনেট ও সিণ্ডিকেটে শিক্ষকদের এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের (সিনেটে ছাত্রদের) প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতিনিধি পাঠাবার দাবি উঠেছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে এবং শিক্ষকগণ তুলনামূলকভাবে বেশি সুবিধা ভোগ করছেন বলে একটি অনভিপ্রেত ধারণা উপরোক্ত আদেশ/আইনগুলি আওতায় জন্ম নিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় সিনেটগুলির গঠনের কারণে ভাইস-চ্যান্সেলর নির্বাচনের বেলায় ভারসাম্য রক্ষা করা যায় না বলে অনেকে মনে করেন। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিনেটগুলিতে ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং যাতে অবাঞ্ছিত মতবিরোধ ও ভাগাভাগির পরিস্থিতি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে যথাসম্ভব দূরীভূত করা যায়, তজ্জন্য বর্তমানে যাঁরা সিনেটে আছেন তাঁদের সংখ্যা উপরের বিশ্লেষণের আলোকে পুনর্নির্ধারণ করে তাঁরা ছাড়া বাইরে থেকেও উপযুক্ত সংখ্যক সুযোগ্য সদস্য নিয়ে সিনেটগুলিতে ভারসাম্য রক্ষা করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

২১.১০১. **সিণ্ডিকেট গঠন ও নির্বাচন :** যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর সিণ্ডিকেটের সদস্য নন সেখানে তাঁকে/তাঁদের পদাধিকার বলে সদস্য রাখা উচিত। ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুপস্থিতিতে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে ভাইস-চ্যান্সেলরের দায়িত্ব পালন করতে হয়, এমন কি ভাইস চ্যান্সেলরের উপস্থিতিতে তাঁর দায়িত্ব পালনে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরকে তাঁকে সাহায্য করতে হয়। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যাপারে পুরোপুরিভাবে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। সিণ্ডিকেটে ভারসাম্য রক্ষার্থে বিভিন্ন "ক্যাটাগরির" সদস্যদের সংখ্যার সাম্য বজায় রাখা দরকার।

২১.১০২. **বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন নির্বাচন :** বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যা-লয়ে শিক্ষকদের মধ্যে মতভেদ ও দল সৃষ্টি হচ্ছে এবং প্রশাসনেও বিরোধ প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আকাঙ্খিত পরিচালনা ও মূল পরিচালিকা শক্তি থেকে শুধু বঞ্চিত হচ্ছে না, উপরন্তু অবাঞ্ছিত ঘটনা ও পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে।

২১.১০৩. **সুপারিশ**

এমতাবস্থায় আমরা মনে করি যে, গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের জন্য ১৯৭৩ সালে প্রণীত আদেশ/আইন পর্যালোচনার সময় এসেছে। বর্তমানে এই কমিশনের পক্ষে সীমিত সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদেশ/আইন বিস্তারিত

বিশদভাবে পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চূড়ান্ত মতামত ও সুপারিশ রাখা সম্ভব নয়। তদুপরি এ সকল বিস্তারিত ও বিশদভাবে পর্যালোচনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ, বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির জড়িত থাকা প্রয়োজন। উপরের বিষয়গুলি ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ও আইনগুলি এবং বিধি বিধান ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অভিন্নতা প্রয়োজন বিধায় এবং এ সকল বিষয়ে পরামর্শ দানের জন্য আমাদের সুপারিশ হল যে, অনতিবিলম্বে সরকার একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করে সে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

২১.১০৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির এক আদেশে ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কমিশনের দায়িত্ব হল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রয়োজন নিরূপণ এবং এ শিক্ষা উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা বিরচন, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক প্রয়োজন নির্ধারণ, সরকার থেকে অর্থ মঞ্জুরী গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনানুসারে তা বরাদ্দকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ সম্পর্কিত সকল তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন তথা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ অথবা বিশেষ কোনো কলেজের ডিগ্রী প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ বিষয়ে সরকারকে পরামর্শদান এবং সাধারণভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ভূমিকা পালন।

২১.১০৫. বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশে কমিশনকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে তার সাথে বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ/আইনসমূহের বহুক্ষেত্রে সামঞ্জস্য-হীনতা প্রমাণিত হচ্ছে। ফলে কমিশনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা বিষয়ে অনেক রকমের সংশয় ও বিভ্রান্তি রয়েছে। সেই সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন এবং তার সংজ্ঞা ও স্বরূপের বিষয়টি। বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহ তাদের বাজেটের জন্য প্রায় পুরোপুরিভাবে সরকার তথা কমিশনের উপর নির্ভরশীল হয়েও আর্থিক বিধি বিধান ও শৃঙ্খলা পালন বিষয়ে একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান হেতু কমিশনকে ভুল বোঝার অনেক অবকাশ রয়েছে। তদুপরি অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সঙ্গে সরকারের সম্পর্ক ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণের প্রয়োজন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেভাবে গঠিত তাতে কমিশন নিরপেক্ষ ও স্বাধীনভাবে কোনো সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম নয় বলে সংশ্লিষ্ট অনেকেই মনে করেন। ফলে যে উদ্দেশ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত প্রকৃতপক্ষে তার বাস্তবায়নে মঞ্জুরী কমিশন যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেনা। তাই এই সব অসামঞ্জস্য দূর করে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে কার্যকর প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে হবে।

২১.১০৬. সাম্প্রতিককালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে বর্তমান অবস্থায় চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ/আইনগুলির মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয়সাধন এবং সরকারের সঙ্গে কমিশনের সম্পর্ক ও ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করার পরে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য মঞ্জুরী কমিশনকে পুনর্বিন্যস্ত ও শক্তিশালী করা হলেও গত পনের বছরের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সত্যিকারের অবদান রাখতে পারবে কিনা বা রাখার সুযোগ-সুবিধা পাবে কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। তাঁরা মনে করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে বর্তমান অবস্থায় চালু না রেখে, তার উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রতিপালন করার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করা উচিত।

২১.১০৭. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কমনওয়েলথ দেশসমূহের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের বহুদেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ন্যায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান না রেখে সরকারের মন্ত্রণালয়ভুক্ত উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্বের ন্যায় দায়িত্বগুলি পালনের ব্যবস্থা রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতে কেউ কেউ সুপারিশ করেন যে, আমাদের দেশেও সেই রকম বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পরিবর্তে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সে দায়িত্ব পালন করতে পারে।

২১.১০৮. আমরা এই অধ্যায়ের অন্যত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও পুনর্গঠন ব্যাপারে সুপারিশ করেছি শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে তিনটি বিভাগে ভাগ করে উচ্চশিক্ষার বিষয়াবলীর দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত করতে। এই প্রস্তাব গৃহীত হয়ে কার্যকরী করার পর বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করার দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপর ন্যস্ত করা যায় কিনা তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২১.১০৯. দেশের উচ্চশিক্ষার প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিষয়াবলীর দায়িত্ব পালনের জন্য সুপারিশকৃত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি করা হলেও তা কার্যকর করা স্বভাবতই সময় সাপেক্ষ ব্যাপার হবে। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বর্তমান অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং উচ্চশিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার স্বার্থে কমিশনের ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত হবে।

২১.১১০. তদুপরি এই রিপোর্ট উচ্চশিক্ষা বিষয়ে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছি। সাবেক জেলাগুলির প্রত্যেকটিতে একটি করে কলেজকে এবং ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলিতে প্রয়োজনের তাগিদে একাধিক কলেজকে এমনভাবে উন্নীত করতে হবে যাতে এগুলিকে পর্যায়ক্রমে স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা যায়। ডিগ্রী কলেজগুলিকে পর্যায়ক্রমে উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে যাতে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক কোর্স চালু করা যায়। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীকে ডিগ্রী কলেজ থেকে পৃথক করার প্রস্তাবও দেয়া হয়েছে। এসব কার্যকর করার বিস্তারিত পদক্ষেপের ব্যাপারে সরকারকে নিয়মিত পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চশিক্ষা বিভাগের পক্ষে সরাসরিভাবে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া কতটুকু সম্ভব হবে তা বিবেচনার বিষয়। বিশেষ করে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিভাগকে কতটুকু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত করা যাবে তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে।

২১.১১১. তাই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং উপরের বিষয়াদি সম্পর্কিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে নিচে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলে আমরা মনে করি।

২১.১১২. সুপারিশ

(১) আশু ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আদেশ/আইনসমূহের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় ঘটাতে হবে যাতে কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতাব অবকাশ না থাকে এবং কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের দায়িত্ব ও অধিকার সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়। এর সঙ্গে সরকারের ভূমিকাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত থাকবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে শক্তিশালী করতে হবে। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ ইউজিসি এবং ভারতীয় ইউ জি সি-র সাথে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যে সাংগঠনিক তফাৎ রয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। ব্রিটিশ বা ভারতীয় ইউজিসি-তে কোনো সদস্য বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেননা। ফলে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রের যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত কমিশন নিরপেক্ষভাবে গ্রহণ করতে পারে। এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব না হলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যথোচিত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ আশা করা যায়না। সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গঠন বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বমূলক না হয়ে সার্বিকভাবে উচ্চশিক্ষা ও প্রশাসনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত হতে পারে। সাম্প্রতিককালে কমনওয়েলথ দেশসমূহের মধ্যে কয়েকটি দেশে, যেমন যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া, তাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো ও দায়িত্বের পুনর্বিন্যাস করেছে। এ সকল সামনে রাখলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের পুনর্বিন্যস্ত কাঠামো ও দায়িত্বের ব্যাপারে যথোপযুক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য পাওয়া যাবে। বস্তুতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনকে শুধু যে জোরদার করতে হবে তা নয়, তার দায়িত্ব ও কর্তব্যের সম্প্রসারণও প্রয়োজন।

(৩) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ গঠন করার পর তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মঞ্জুরী কমিশনের প্রয়োজন থাকবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অধ্যায় ২২

শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বণ্টন ও ব্যয়

২২.১. আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার অবদান যে অপরিসীম সে বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ও সমাজ বিজ্ঞানীরা এখন একমত। শুধু তাই নয় আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপযোগী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁরা অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করছেন এবং সেজন্য অর্থ সংগ্রহ ও অর্থ ব্যয়ের পরামর্শও দিচ্ছেন। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে অর্থ বা পুঁজি বিনিয়োগ করে যেভাবে এবং যত সত্বর সুফল পাওয়া যাবে বলে সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং এই প্রকারের বিনিয়োগ থেকে যে ভাবে লাভ লোকসানের খতিয়ান করা যায়, শিক্ষার জন্য ব্যয়ের ফলাফল সম্পর্কে তেমন খতিয়ান সম্ভব না হলেও দীর্ঘ মেয়াদে বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তিবিদ্যা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রসূত দক্ষতা যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি তা এখন সবাই উপলব্ধি করছেন। সবাই উপলব্ধি করছেন যে প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় বা বিনিয়োগের মাধ্যমে ঈপ্সিত আর্থসামাজিক উন্নয়নের উপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষাদান করে সুদক্ষ কর্মী বা কারিগর গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার যথেষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। সুতরাং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ে মূলধন বিনিয়োগের ন্যায় শিক্ষা বাবদ ব্যয়কেও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির একটি অপরিহার্য উপায় হিসাবে দেখার যৌক্তিকতা আজ সর্বজনস্বীকৃত।

২২.২ যে সব দেশ সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি লাভ করেছে সে সব দেশ সাধারণ, কারিগরি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় অগ্রগামী তা সহজেই অনুমেয়। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের মধ্যে একটি অনুকূল সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে সাধারণ শিক্ষা জ্ঞানের বিকাশ, নাগরিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল পরিবর্তন সাধন করে মানুষের কর্মোদ্যম বৃদ্ধি করে এবং কারিগরি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও পেশাগত প্রশিক্ষণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। সেই সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রক্রিয়া, পদ্ধতি ও কৌশল ব্যাপকভাবে বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ও উৎপাদন ক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব। এসব তথ্যের বাস্তব উপলব্ধি ও সার্থক রূপায়ণ তখনই সম্ভব যখন জনসাধারণ এ সব পদ্ধতি-প্রক্রিয়া বোঝার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে। প্রাথমিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষা যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুকূলে কাজ করে তা প্রতীয়মান হয় এই জন্য যে, শিক্ষিত শ্রমিকদের ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ বেশি, তারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারে এবং অধিকতর যোগ্যতা ও উৎসাহের সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধিতে আত্মনিয়োগ করে। অনুরূপ অভিমত যে কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নত দেশসমূহের শীর্ষ স্থানীয় অর্থনীতিবিদগণই পোষণ করছেন তা নয়, উন্নয়নশীল দেশসমূহের অর্থনীতিবিদ, সমাজ-সেবক, ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এবং জনসাধারণও অনেকেই তা স্বীকার করছেন। শিক্ষাখাতে উচ্চতর হারে অর্থ ব্যয়ের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের উৎপত্তি এখানেই। আজ এ সত্যও প্রতিষ্ঠিত যে শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় শিক্ষা সম্প্রসারণ, শ্রমিকের কর্মদক্ষতা ও কর্মোদ্যম এবং আর্থসামাজিক প্রবৃদ্ধি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

২২.৩. বাংলাদেশে কোনো সময়েই শিক্ষার জন্য যথেষ্ট আর্থিক পোষকতা পাওয়া যায়নি। যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে, শিক্ষা খাতে অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে দেশের সাধারণ আর্থিক অবস্থার সম্পর্ক রয়েছে এবং এ দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষা বাবদ ব্যয় সাধ্যানুযায়ীই করা হয়ে থাকে। অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি নৈসর্গিক বিপর্যয় বাংলাদেশকে প্রায়শই বিপর্যস্ত করে এবং ত্রাণকাজে বিপুল সম্পদ ব্যয়িত হয়, যার ফলে আমাদের সম্পদ সীমিত বিধায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষা কর্মসূচীর জন্য প্রচুর সম্পদ যোগান দিতে আমরা অক্ষম। এই

যুক্তির পেছনে অবশ্য সত্যতা আছে। আমরা অবশ্যই এমন কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা গঠনের আশা করতে পারি না যার তুলনা আমাদের থেকে বহুগুণ বেশি সম্পদ বিশিষ্ট দেশসমূহের শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে করা যায়। কিন্তু সম্পদ সীমিত হলেও শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করা যাবেনা এই যুক্তি সকল অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিরোধী। বস্তুতপক্ষে আমাদের সম্পদ সীমিত বিধায় এরূপ একটি শিক্ষা পদ্ধতি আমরা কার্যকর করতে চাইব যাতে স্বল্প ব্যয়ে সমধিক ফল লাভ হয়। আমাদেরও অতিরিক্ত ত্যাগ স্বীকার করতে হবে কেননা ভবিষ্যতে তা আমাদের সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে সহায়ক হবে।

২২.৪. প্রাথমিক শিক্ষা ব্যয়সাপেক্ষ তার কারণ এই বয়োবর্গের শিশুদের সংখ্যা বিপুল। উচ্চশিক্ষা বিশেষত বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি ও কৃষিবিদ্যাও বোধগম্য কারণেই ব্যয় বহুল। সুতরাং একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ তখনই সম্ভব যখন সরকার ও জনসাধারণ সবাই উপলব্ধি করবেন যে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে সবাইকে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। ত্যাগ স্বীকারের সুফল যে সুনিশ্চিত সে বিষয়েও সকলের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে, তবেই শিক্ষা লাভের এবং শিক্ষার জন্য অর্থ যোগানের আগ্রহ বাড়বে।

২২.৫. একটি সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থার সুফল লাভের প্রত্যাশায় আমরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত), বৃত্তিমূলক, কারিগরি, পেশাগত ও কৃষি শিক্ষা সম্প্রসারণের এবং প্রাপ্ত বয়স্ক শিক্ষার ব্যাপক কর্মসূচীর গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছি। বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি এবং জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত বিষয়াবলীর উচ্চতর শিক্ষার যথোপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। আমরা স্তর ভেদে শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সুপারিশ করছি। তবে এ কথা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষকদের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার উপর ভিত্তি করে একটি ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে। এই ফল লাভ করতে হলে প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকার ও অর্থ ব্যয়ের জন্য অবশ্যই সমাজ ও সরকারের সামর্থ্য ও সম্মতি থাকতে হবে। আমাদের বিশ্বাস, শিক্ষা সম্পদ সৃষ্টির একটি পন্থা—সত্যটি সবাই উপলব্ধি করবেন এবং প্রয়োজনীয় ত্যাগ স্বীকারে ব্রতী হবেন। শিল্পোন্নত দেশসমূহে শিক্ষা ও গবেষণা খাতে ক্রমেই অধিকতর পরিমাণে অর্থ ব্যয়ের জন্য সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষ এগিয়ে আসছে এই আস্থা ও বিশ্বাসে যে, কালক্রমে এই প্রকারের ব্যয় বা বিনিয়োগ থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সুফল লাভ হবে। অতীতের অভিজ্ঞতা তাঁদের এই আস্থার পক্ষে সমর্থন যোগাচ্ছে।

২২.৬. উপরের বর্ণিত তত্ত্ব ও তথ্যাবলী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদেরও শিক্ষা খাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় ও বিনিয়োগের জন্য ত্যাগ স্বীকারের প্রস্তুতি নেয়া অত্যাবশ্যক, কেননা শিক্ষা মনোভঙ্গির পরিবর্তন এনে মূল্যবোধকে পরিমার্জিত করে, কর্মদক্ষতা, কর্মোদ্যম ও কর্মকৌশল পরিপুষ্ট করে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করার মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির একটি পন্থা হিসাবে কাজ করে।

২২.৭. শিক্ষা খাতে অর্থ-সংস্থানের বিষয়টি প্রধানত তিন ভাগে বিবেচনা করা যায়: (ক) দ্রুত আর্থসামাজিক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জন করতে হলে আমাদের মোট জাতীয় উৎপাদন বা আয়ের কত অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করা দরকার তা নির্ধারণ করা, (খ) বিভিন্ন স্তরের ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে কিভাবে এই ব্যয় বণ্টন করা হবে তা নিরূপণ করা এবং (গ) আমাদের শিক্ষা খাতে অর্থ সংস্থান পদ্ধতি প্রক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা।

২২.৮. বিষয়গুলির মীমাংসার জন্য সর্বজন-স্বীকৃত কোনো পন্থা নেই। তবে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ নির্ধারণ পদ্ধতি অর্থাৎ কোন প্রকারের কি পরিমাণ জনসম্পদ প্রয়োজন—এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। দেশে বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্র রয়েছে এবং ক্ষেত্রানুযায়ী বিভিন্ন

প্রকারের দক্ষ জনসম্পদের প্রয়োজন। আর্থসামাজিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রয়োজন জরিপ করে কোন ক্ষেত্রে কি প্রকারের ও মানের কি পরিমাণে দক্ষ জনসম্পদ লাগবে তা নির্ধারণ করে পরিকল্পিত উপায়ে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় জনসম্পদ সৃষ্টির পরিমাণে অর্থ ব্যয় বাঞ্ছনীয়। যে পরিস্থিতিতে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব সেক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকারভেদ নির্ণয়ে বৈদেশিক প্রয়োজন ও পরিমাপ করা আবশ্যক। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার অন্যান্য উদ্দেশ্য যাতে উপেক্ষিত না হয় সে দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

২২.৯. প্রয়োজনীয় জনশক্তি সম্পর্কে জরিপ ক্রটিহীন হওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার যাতে নিছক পূর্বানুমানের উপর কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নির্ভরশীল না হয়। যেখানে প্রয়োজনীয় জনশক্তির কোনো পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করতেই হয়, সে পূর্বানুমান যত বিস্তারিতভাবে হবে এবং যত বেশি উৎপাদন ও উপকরণের উপর ভিত্তিশীল হবে, শিক্ষা পরিকল্পনাও তত সঠিকভাবে প্রণয়ন সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে শিক্ষার প্রয়োজন নির্ধারণের জন্য পরীক্ষামূলক ভিত্তিরূপে ব্যবহৃত হতে পারে এমন কোনো পূর্বানুমানের অবর্তমানে আমাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় বিশ্বের এমন অন্যান্য দেশের তথ্য-ভিত্তিক নীতিও সাবধানতার সাথে কাজে লাগান যায়।

২২.১০. বিশ্বের উন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের তুলনায় তাদের জাতীয় আয়ের বৃহত্তর অংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে থাকে। ষাটের দশকের প্রথমাংশে বহু অগ্রসর দেশের শিক্ষায় শুধু সরকারী ব্যয়ই ছিল জাতীয় আয়ের ৫% থেকে ৮% এর মধ্যে, অথচ সেই সময় বাংলাদেশের এই অনুপাত ছিল ১% এর মত এবং ১৯৭২-৭৩ এর ব্যয় বরাদ্দের হিসাব অনুযায়ী তা ছিল প্রায় ১.৮% (১)। ১৯৮৫-৮৬ সালে বাংলাদেশের মোট রাজস্ব ও উন্নয়নে ব্যয়ের শিক্ষা খাতে ব্যয়ের এই অনুপাত দাঁড়ায় নীট জাতীয় আয়ের ১.৬% ভাগ (২)। অথচ ভারতে এই ব্যয়ের অনুপাত ৩% (১৯৮১), নেপালে ২.৫% (১৯৮২) এবং শ্রীলংকায় ৪.৫% (১৯৮২) (৩)। এ ক্ষেত্রে আমরা যত আশাই করি না কেন বাংলাদেশে অগ্রগতির কোনো চিহ্নই এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। ১৯৮৬-৮৭ সালের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী শিক্ষা খাতে মোট ব্যয় (রাজস্ব ও উন্নয়ন) সরকারী মোট ব্যয়ের (রাজস্ব ও উন্নয়ন) ১০.২% (৪)। এই সব তুলনামূলক হিসাব থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষার জন্য বাংলাদেশের ব্যয়ের পরিমাণ আমাদের প্রতিবেশী বা আমাদের মত অবস্থার যে কোনো রাষ্ট্র অপেক্ষা অনেক কম।

২২.১১. সম্পদের পরিমাণের সঙ্গে প্রচেষ্টার তুলনামূলক বিচার করলেও আমরা দেখি যে, যে সব দেশের সম্পদ প্রায় আমাদের সমান সে দেশ অপেক্ষা আমরা শিক্ষা খাতে আমাদের জাতীয় আয়ের ও মোট রাজস্বের স্বল্পতর অংশ ব্যয় করছি। বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির কথা বাদ দিলেও আমাদের ন্যায় যেসব দেশ যুক্তিসঙ্গত আর্থিক দারিদ্র্য ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের চেষ্টা করছে সেসব দেশের সঙ্গে তুলনা করলে প্রতীয়মান হয় যে আমাদের আর্থিক প্রচেষ্টা নগণ্য। এ কথা সত্য যে, শিক্ষার জন্য আমাদের জাতীয় আয়ের এবং সরকারী ব্যয়ের আরো বড় অংশ বরাদ্দ করতে পারলেই কেবল এই রিপোর্টে প্রস্তাবিত শিক্ষা উন্নয়ন ব্যবস্থাসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬২ সালে টোকিওতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা মন্ত্রীদের সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশসমূহের জন্য মোট জাতীয় আয়ের ৪% থেকে ৫% শিক্ষাখাতে ব্যয় আদর্শরূপে বিবেচনা করার প্রস্তাব নেয়া হয়েছিল। (৫)

---

(১) বাশিকরি (১৯৭৪) পৃঃ ২৮৩--৪।

(২) স্ট্যাট-ই-বুক, ১৯৮৬, পৃঃ ৭৫২।

(৩) এডু স্ট্যাট পৃঃ ১২১-২২।

(৪) বাশিকরি (১৯৭৪) পৃঃ ২৮৪।

(৫) ১৯৮৭--৮৮ সালের বাজেট থেকে হিসাবকৃত।

২২.১২. উপরের আলোচনার প্রেক্ষাপটে আমাদের সুপারিশ এই যে, আমাদের শিক্ষাখাতে ব্যয় উন্নীত করা দরকার এবং এই ব্যয়ের পরিমাণ পর্যায়ক্রমে উন্নীত করে বর্তমানের মোট সরকারী (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের ১০% থেকে দু'হাজার সালের মধ্যে ২০% এ নিয়ে যাওয়া অত্যাবশ্যক। এই কাজ দুরূহ হলেও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনের গুরুত্ব সত্বেও উপরোক্ত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের পন্থা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায় হিসাবে বলা যায় যে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে অধিক থেকে অধিকতর হারে জাতীয় আয়ের ক্রমবৃদ্ধিকরণ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাসকরণ। তা ছাড়া নির্মিত দালান-কোঠা এবং সংগৃহীত আসবাবপত্র, শিক্ষা সরঞ্জাম ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সম্যক সংরক্ষণ- এগুলি বার বার সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে ব্যয় সংকোচে সহায়তা করবে। এ সব সম্পদ দীর্ঘদিন কর্মোপযোগী থাকবে এবং সীমিত সম্পদের সাশ্রয় হবে।

২২.১৩. শিক্ষার জন্য ব্যয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তর ও বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার মধ্যে যে প্রশ্ন উঠতে পারে তার সমাধানেরও কোনো সর্বজন-স্বীকৃত উপায় নেই। শিক্ষা ব্যয় বণ্টনের প্রশ্নের সমাধানের জন্যও অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা দরকার। আজকের উন্নত দেশসমূহেও তাদের উন্নয়নের গোড়ার দিকে সাধারণ শিক্ষায় তাদের মোট ব্যয় সাধারণত কম ছিল এবং তার প্রধান অংশ বিদ্যালয় শিক্ষায় ব্যয়িত হত। উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ব্যয়ের অনুপাত ক্রমশ বাড়তে থাকে।

২২.১৪. ১৯৮৭-৮৮ সালে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার জন্য মোট শিক্ষা খাতের বাজেট বরাদ্দ নিম্ন লিখিত অনুপাতে করা হয়েছে:

	আবর্তক(%) (৬)	অনাবর্তক বা মূলধনী (%) (৭)
প্রাথমিক শিক্ষা	৩৯.১৫	৪৯.০
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা	৪৫.৪২	২৭.৩
কারিগরি শিক্ষা	২.৬৫	২.৮
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	৯.২৩	১০.০
অন্যান্য	৩.৫৫	১০.৯

লক্ষণীয় যে, প্রতিটি স্তরের শিক্ষার জন্য আবর্তক ও অনাবর্তক ব্যয়ের অনুপাতের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তবে এ থেকে অবশ্য এমন কোনো স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায় না যে বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে অনুপাত দেখা যায় প্রয়োজনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাও ঠিক আছে।

---

(৬) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর এবং অর্থ মন্ত্রণালয়
(৭) ঐ

২২.১৫. আর্থসামাজিক উন্নয়নে সহায়কের মাপকাঠিতে কোন স্তরের শিক্ষা অগ্রাধিকারের দাবিদার বা কোন স্তরের শিক্ষা পদ্ধতির গুরুত্ব বেশি এ সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে আমাদের উপলব্ধি এই যে, যেখানে জনসাধারণের জ্ঞানের বিকাশ, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ও পরিমার্জন, কর্মোদ্যম ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সহায়ক সেখানে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অপরিহার্য। ৫—১০ বয়োবর্গের শিশুদের বর্তমান সংখ্যা ১৯৮ লক্ষ। তাদের মধ্যে মাত্র ৯১ লক্ষ শিশু বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। অর্থাৎ এই বয়োবর্গের অর্ধেকেরও বেশি শিশু এখনো বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। যদি সরল হারেও ধরা যায় যে, এদের সংখ্যা বছরে ২% বাড়বে তা হলে দু'হাজার সাল নাগাদ ৫—১০ বয়োবর্গের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ২৫০ লক্ষ অর্থাৎ আগামী ১৩ বছরে অন্তত আরো ১৫৯ লক্ষ শিশুর বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বর্তমানে ৪৪,০০০ থেকে আরো ৭৭,০০০ বাড়িয়ে দু'হাজার সাল নাগাদ ১,২১,০০০ করতে হবে। অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে চিন্তা করলে আগামী ১৩ বছরে এত বড় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা একটি দুরূহ সমস্যাই বটে। এই সমস্যা মোকাবিলার জন্য দুটি বিকল্প পদ্ধতির কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। প্রথমত উচ্চতর স্তরের (৮ম শ্রেণীর উপরের) শিক্ষা সম্প্রসারণ স্থগিত রেখে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে স্বল্প সময়ে সার্বজনীন করা অথবা উচ্চতর সম্প্রসারণ মন্থর করে পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষাকে দু'হাজার সাল নাগাদ সার্বজনীন করা। ১৯৬০ সালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৪২%, ৪৫% ও ১৩%। শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমের গোড়ার দিকে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর আমরা বিজ্ঞান, প্রকৌশল, প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার ব্যয়ের অনুপাত এবং পরিমাণ যুক্তিসঙ্গত ভাবে বাড়াতে পারি।

২২.১৬. পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার সঙ্গে সঙ্গে ১১—১৩ বয়োবর্গের (অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) শিক্ষাকেও সার্বজনীন করার ব্যবস্থা নেয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। ৫—১৩ বছর বয়ঃক্রম পর্যন্ত মৌলিক শিক্ষা থেকে অর্জিত জ্ঞানই শিশু-কিশোরের মনে দায়িত্ববোধ, মূল্যবোধ ও অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে তাকে সুনাগরিক করে গড়ে তুলতে সক্ষম। বর্তমানে ১১—১৩ বয়োবর্গের কিশোর-কিশোরীর সংখ্যা প্রায় ৭২ লক্ষ, এদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে তাদের সংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ, অর্থাৎ এই বয়োবর্গের ৫৪ লক্ষ কিশোর-কিশোরী এখনো বিদ্যালয়ের শিক্ষার বাইরে রয়েছে। যদি ধরা যায় যে, এদের সংখ্যা প্রতি বছরে ২% বাড়বে তা হলে সরল হারে দু'হাজার সাল নাগাদ ১৩ বছরে ২৬% বেড়ে এদের সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৯১ লক্ষ। সুতরাং আমরা যদি দু হাজার সালের মধ্যে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা সার্বজনীন করতে চাই, তবে বর্তমানের অধ্যয়নরত প্রায় ১০৯ লক্ষ শিক্ষার্থীর তুলনায় প্রায় ৩২২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষার ব্যবস্থা আগামী ১৩ বছরের মধ্যে করতে হবে। অর্থাৎ এই স্তরে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রায় ২০০% সম্প্রসারণ করতে হবে। এটা করতে পারলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু যে দৃঢ়তর ভিত্তিক উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে তাই নয়, তা সুনিশ্চিত ভাবেই দেশের উৎপাদন ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির হারও বৃদ্ধি করে সম্পদ সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

২২.১৭. নবম শ্রেণী ও তদূর্ধ্ব শিক্ষার সম্প্রসারণ, বিকাশ, পরিমাণ ও ধরন আমাদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জনসম্পদের আলোকে নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি সৃষ্টি না করে বরং বিপুল সংখ্যক

বেকার সৃষ্টি করছে যার প্রতিফলন আমরা সমাজে অহরহ দেখতে পাচ্ছি। তাই আমাদের এখন কলা বা মানবিক শাখায় বিদ্যা শিক্ষা অপেক্ষা পেশাভিত্তিক, বৃত্তিমূলক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-মুখী শিক্ষার উপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে দ্রুততর হারে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় দক্ষ ও উদ্যোগী জনশক্তি উৎপন্ন করতে হবে। বিভিন্ন প্রকারের শিক্ষার জন্য আবশ্যক প্রতি ছাত্রের মাথাপিছু ব্যয়ের সঠিক কোনো তথ্য নেই। তবে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমরা সুপারিশ করি যে, শিক্ষা খাতে মোট সরকারী ব্যয়ের বর্তমানের ১০%কে পর্যায়ক্রমে ২০% এ উন্নীত করে মোটামুটিভাবে তার ৬০% প্রাথমিক শিক্ষার জন্য, ২৫% মাধ্যমিক শিক্ষা, বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং বিশেষ শিক্ষার জন্য এবং অবশিষ্ট ১৫% কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হোক। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় কারিগরি ও ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা খাতে এ স্তরের বরাদ্দকৃত অংশের অধিকাংশ ব্যয় করতে হবে। এইভাবে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে বিজ্ঞান, কৃষি, প্রকৌশল, চিকিৎসা, বাণিজ্য এবং সর্বোপরি গবেষণার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

২২.১৮. প্রয়োজনীয় জনশক্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই বলে অর্থ বিভাজনের ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বানুমানের উপর নির্ভর করতে হবে। তবে এই অর্থ বিভাজন এমন ভাবে হবে যেন বর্ধিষ্ণু অর্থনীতির পক্ষে অপ্রয়োজনীয় শাখাসমূহের কলেবর স্ফীত হতে এবং সেখানে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা অবাধে না বাড়তে পারে। অর্থাৎ ছাত্র ভর্তি হবে বাছাইকৃত সীমিত সংখ্যক, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত মেধা, সমাজ জীবনে প্রত্যেক ধরনের শিক্ষার চাহিদা এবং প্রাথমিকোত্তর শিক্ষায় সমাজকে ব্যয়ভার বহন করতে হচ্ছে তার ভিত্তিতে উচ্চ পর্যায়ে ছাত্র ভর্তি নিরূপিত হবে। শিক্ষা যে দক্ষতা উৎপন্ন করবে অর্থনীতি এবং সমাজে তার কতখানি প্রয়োজন তা বিশেষভাবে দেখতে হবে। জাতীয় জীবনের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের জন্য প্রণীত নির্ধারিত পাঠ্যক্রমের যে কোনো বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা তাদের থাকবে, তবে পর্যায়ক্রমে ছাত্র ভর্তির পূর্বশর্ত হবে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও মেধা।

২২.১৯. সাধারণ বিদ্যালয় ও কলা কলেজগুলি থেকে যে সব ছাত্র বের হয়ে আসছে তাদের সংখ্যা যদি আমাদের অর্থনীতিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়, তবে এসব শিক্ষায়তনকে প্রয়োজনানুসারে বৃত্তিমূলক বিদ্যালয় বা কলেজে রূপান্তরিত করাই বিধেয় হবে। উচ্চ স্তরের কোনো ক্ষেত্রেই প্রয়োজনাতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা রাখা সমীচীন হবে না। আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একথা স্বীকার করতেই হবে যে ১৪—২২ বয়োবর্গের সকল তরুণকে বা তাদের বিরাট একটি অংশকে আমরা সর্বক্ষণের জন্য নামমাত্র শিক্ষায় নিয়োজিত রেখে উৎপাদনমুখী কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অবশ্যই তাদের আয় বৃদ্ধি করে দৈনন্দিন অভাব মোচনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২২.২০. প্রাথমিক শিক্ষা (অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) সার্বজনীন করতে হলে ১৯৮৫-৮৬ সালের ৩৭৯ কোটি টাকা (উন্নয়ন+রাজস্ব) ব্যয়ের ভিত্তিতে হিসাব করলেও শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্যই দু'হাজার সালে প্রয়োজন হবে ১১৬২ কোটি টাকা। সম্পদের সীমাবদ্ধতাহেতু এরূপ বিপুল পরিমাণ অর্থ গতানুগতিক পন্থায় সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এজন্য চিরাচরিত পদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে।

২২.২১. এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী কমিশনসমূহের রিপোর্ট বিশেষ করে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আমরা নিম্নোক্ত সুপারিশ করছি।

২২·২২ সুপারিশ

(১) বিশেষ পন্থায় দেশের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা কাজে লাগিয়ে এবং অপচয়ের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করতে হবে। নির্মিত দালানকোঠা যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও সংগৃহীত শিক্ষা সরঞ্জাম ও উপকরণের যত্ন সহকারে ব্যবহার এ সব সম্পদের স্থায়িত্ব বাড়িয়ে সম্পদের স্বল্পতা জনিত সমস্যা লাঘব করতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের বিষয়টি বিকেন্দ্রিক ও স্থানীয় করলে বিষয়টির জটিলতা কমবে। বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য স্থানীয় সম্পদ ও শ্রম ব্যবহার করতে হবে। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসাবে দ্বিতীয় এবং অবস্থা বিশেষে তৃতীয় শিফট চালু করা বা গ্রামের সমাজ কেন্দ্র, গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের বহির্বাটি, এমনকি মসজিদ ভিত্তিক মক্তব-এবতেদায়ি ইত্যাদি ব্যবহার দ্বারা অনাবর্তক বা মূলধনী ব্যয়ের প্রয়োজন কমান যেতে পারে। আমাদের সীমিত সম্পদ প্রধানত ব্যবহার করতে হবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বই ও লেখাপড়ার অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য এবং কিছু খরচ হবে চক ও ব্ল্যাকবোর্ড জাতীয় অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের জন্য। স্কুল গৃহের ভূমি গ্রামের বিত্তবানদের নিকট থেকে অনুদান হিসাবে অথবা ভূমি ব্যবস্থা সংস্কারের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

(২) শিক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থের সংস্থান প্রয়োজন এবং তার ব্যবস্থার জন্য যে সুপারিশ আমরা করেছি তা বাস্তবায়নের সময় আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান সুযোগ-সুবিধা, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি, আসবাবপত্র এবং শিক্ষাগৃহ ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের পূর্ণ সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা দরকার। তাই এ সবের ব্যবহার কিভাবে হচ্ছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তথ্য সংগ্রহ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই তথ্যের ভিত্তিতে স্থান ও সময়ের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। নতুন তথ্যের ভিত্তিতে প্রত্যেক ক্লাস ও ল্যাবরেটরির জন্য একটি সময় তালিকা তৈরি করা যায়। এরূপ তথ্যানুসন্ধান কার্য যেখানে চালানো হবে, সেখানে ক্লাসের সময় তালিকার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে এবং নতুনভাবে ক্লাসের ব্যবস্থা করে আরো অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য স্থানের ব্যবস্থা করা যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ ব্যবস্থা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রযোজ্য হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বেলায় এও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, বিশেষ কয়েকটি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার কৃত্রিম বাধার সৃষ্টি যেন না হয়, যেমন—এমন কোনো বিশেষ কারণ নেই যে, বাংলা বা ইংরেজি ক্লাসের জন্য ব্যবহৃত শ্রেণীকক্ষ অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা ইতিহাসের জন্য অনুরূপ সুবিধার খাতিরে ব্যবহার করা যাবে না।

(৩) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গৃহ, শ্রেণীকক্ষ, ল্যাবরেটরি, আসবাবপত্র প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ প্রায় ক্ষেত্রেই সন্তোষজনক নয়। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের এবং সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। তদুপরি যাঁরা আমাদের দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য গৃহ নির্মাণ করে থাকেন, তাঁদের উচিত হবে অতীতের ত্রুটি বিচ্যুতির দিকে লক্ষ্য রাখা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহগুলিকে স্বল্প ব্যয়ে নির্মাণ করতে হলে দেশীয় মাল-মসলা ব্যবহার করে শিক্ষাগৃহ ও আসবাবপত্র নির্মাণ সম্পর্কে গবেষণা চালানো প্রয়োজন। যে সমস্ত মাল-মসলা এদেশে সহজপ্রাপ্য ও দীর্ঘস্থায়ী, সেগুলির ব্যাপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে আমাদের শিক্ষাগৃহ ও আসবাবপত্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় প্রসার সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুদর্শন ও আকর্ষণীয় করার নামে অলংকৃত দালানকোঠা নির্মাণ না করে স্বল্প ব্যয়ে সাদামাঠা গৃহ নির্মাণই আমাদের অর্থনৈতিক সামর্থের প্রেক্ষিতে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

(৪) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার উপকরণ প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত। আগামীতে আমাদের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাগৃহ, ছাত্রাবাস ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং সুষ্ঠু পরিকল্পনার প্রয়োজন। বর্তমানে প্রয়োজনের তুলনায় যেমন শিক্ষার উপকরণ পর্যাপ্ত নয়, তেমনি আবার কতগুলি ক্ষেত্রে অহেতুক অত্যধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছাড়া মূল্যবান যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে। বেশ কিছু সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবরেটরিতে বহু যন্ত্রপাতি অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নতুন যন্ত্রপাতির জন্য অর্থ ব্যয় করার আগে সেগুলির আশু ব্যবহার, যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষার উপকরণ এবং ল্যাবরেটরিতে যে সকল যন্ত্রপাতি রয়েছে তার রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

(৫) আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়মিত ভাবে পরিদর্শন করা হয় না। ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুষ্ঠু শিক্ষাদান, লেখাপড়া এবং অপচয় রোধের জন্য প্রতিকারের ব্যবস্থা যথাসময়ে এবং ঠিকভাবে হচ্ছে না। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিপুল সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং এই স্তরের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিদর্শন হওয়া উচিত। মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ স্তরের শিক্ষার পরিদর্শনের জন্য ব্যবস্থা পর্যাপ্ত নয়। অতএব এসব স্তরের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যাতে সুষ্ঠু শিক্ষা দান, লেখাপড়া এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অপচয় রোধের ব্যবস্থা হয়। অপচয় রোধ করতে পারলে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের সমস্যার অনেকটা সমাধান হবে বলে আমাদের ধারণা।

(৬) এই উপমহাদেশের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনান্তে প্রতীয়মান হয় যে, উপমহাদেশে শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে জনসাধারণের এবং বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদান অসামান্য। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদানের অনুপাতে সরকারী ব্যবস্থা নগণ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে যে প্রায় দশ হাজারের মত মাধ্যমিক স্কুল ও সাত শ'য়ের মত কলেজ রয়েছে, তা একত্র করলে প্রায় শতকরা পঁচানব্বই ভাগই জনসাধারণ ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বেশ কিছু সংখ্যক কলেজ জাতীয়করণের মাধ্যমে দেশের এক ষষ্ঠাংশ কলেজ সরকারী কলেজে পরিণত করা হলেও মাধ্যমিক স্কুলের ক্ষেত্রে প্রায় দশ হাজারের মধ্যে এখনো সরকারী স্কুল তিন শ হয়নি। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারী অনুদানের মাধ্যমে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতনের শতকরা সত্তর ভাগ সরকারী তহবিল থেকে প্রদান করা হচ্ছে। এখানে আসল কথা হল যে, দেশে শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণে জনসাধারণ ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদান যে বিপুল তা স্বীকার করা। বেসরকারী ও জনসাধারণের উদ্যোগ ও অবদান কেন যে স্তিমিত হয়ে এসেছে তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই উদ্যোগ ও অবদানকে অতীতের স্তরে পুনরুজ্জীবিত ও বর্ধিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শত ইচ্ছা সত্ত্বেও যে সরকারের পক্ষে শিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব নয় তা না বললেও চলে।

(৭) শিক্ষা বিস্তার ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সাধারণের ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদান যা ছিল এবং বর্তমানেও স্তিমিত অবস্থায় যা আছে তা স্কুল ও কলেজ স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে কলা, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং কিছু কিছু বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট নয়। অথচ জাতির ও

দেশের চাহিদা বিশ্লেষণ করলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ করে এসবের উচ্চশিক্ষার বেলায় জনসাধারণের ও বেসরকারী উদ্যোগ ও অবদান বিশেষ নেই বলা যায়। ব্যক্তিগত উদ্যোগ যাতে বৃদ্ধি পায় তজ্জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

(৮) অতি সম্প্রতি 'বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ' নামে ঢাকায় চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার একটি মহাবিদ্যালয় বেসরকারী প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে। এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় ও অনুকরণ যোগ্য। আমরা আশা করি জাতির ও দেশের চাহিদা অনুযায়ী বিজ্ঞান, বাণিজ্য, প্রযুক্তি, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ রকম বেসরকারী উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। এ ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা উচিত। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ অবশ্যই কঠোরভাবে শিক্ষা সংক্রান্ত আইন কানুন ও নিয়মাবলী অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাবেন। প্রয়োজনে আইন প্রণয়ন ও প্রচলন করতে হবে। শিক্ষার জাতীয় মান যাতে বজায় থাকে তার প্রতি সজাগ থাকবেন। দেশবিদেশে যাতে সুনাম অর্জন করতে পারেন তার দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।

(৯) আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষকের প্রয়োজন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে শিক্ষক নিযুক্ত করে বা শিক্ষিত যুবকদের থেকেও বাধ্যতামূলকভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাতীয় সেবার মাধ্যমেও শিক্ষকের অপ্রতুলতা হ্রাস করা যেতে পারে। দরিদ্রদের মধ্যেও প্রাথমিক শিক্ষাকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিদ্যালয়ের ছুটি পুনর্গঠিত করা (যাতে ভরা মওসুমে চাষাবাদে শিক্ষার্থীরাও সাহায্য করতে পারে), অতি গরীব শিশুদের মধ্যে পোষাক বিতরণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গ্রামীণ জীবন, পেশাগত শিক্ষা ও কৃষির উপর জোর দিয়ে শিক্ষাক্রমের পরিবর্তন সাধন করলেও শিক্ষার প্রতি গ্রামের শিশুদের এবং তাদের অভিভাবকদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের বেতনাদি এবং উপকরণের জন্য ব্যয় সরকারী খাত থেকে নির্বাহ করা হবে। গৃহ ও তার রক্ষণাবেক্ষণ স্থানীয় অধিবাসীদের দায়িত্বে থাকবে।

(১০) জাতীয় অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার দরুন এবং পরিকল্পনা কমিশনের অনুচিন্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ও মাথা পিছু আয়ের সঙ্গে সরকারী রাজস্বের সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু বলা আমাদের পক্ষে এখন সম্ভব নয়। তবে আমাদের মতে শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকর করার জন্য জাতীয় (অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন) ব্যয়ের বর্তমানের ১০% থেকে পর্যায়ক্রমে দু'হাজার সাল নাগাদ ২০% এ উন্নীত করতে হবে। সকল পৌরসভা এবং জেলা/উপজেলা পরিষদগুলিকে শিক্ষার জন্য প্রাথমিক ব্যয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। বেসরকারী বদান্যতায় উৎসাহ সঞ্চারের জন্য দাতার স্মৃতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়া যেতে পারে।

(১১) বর্তমানে আমাদের কর আইনে শিক্ষার জন্য অনুদানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন প্রকারের নির্ধারিত বিনিয়োগের জন্য কর মওকুফের ব্যবস্থা আছে। এজন্য সর্বমোট বিনিয়োগ ত্রিশ হাজার টাকায় সীমাবদ্ধ। আমাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনে অর্থ সংস্থানের সুবিধার্থে এই হিতৈষণামূলক অনুদানকে উৎসাহিত করা দরকার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিস্তারে ব্যক্তি উদ্যোগ যাতে অর্থবহ অবদান রাখতে আগ্রহী হয় সে জন্য হিতৈষণামূলক অনুদানকে এই ত্রিশ হাজার টাকার সীমাবদ্ধতার বলয়-মুক্ত রাখার জন্য আমরা সুপারিশ করছি।

(১২) শিক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ ও বরাদ্দের কথা আমরা সুপারিশ করেছি তার বাস্তবায়ন সম্ভব হবে কেবল যদি সমগ্র সমাজ ঐকান্তিক ইচ্ছা, আগ্রহ, ও ত্যাগ স্বীকারের ব্রত নিয়ে এগিয়ে আসে। নতুন কর ধার্য করা সত্ত্বেও আরো অর্থের প্রয়োজন হবে এবং এই অর্থ জনসাধারণের হিতৈষণামূলক অনুদান এবং ছাত্র বেতনের মারফতেই সংগৃহীত হতে পারে। এই অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থার জন্য সকলকেই আরো বেশি পরিমাণ আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সেজন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ত্যাগ স্বীকারের মহিমা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশনের (১৯৭৪) অভিমত ও সুপারিশ প্রণিধানযোগ্য।

(১৩) মাধ্যমিক ও কলেজ শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের সুপারিশ এই যে, এই শিক্ষার ব্যয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে ছাত্র বেতন, হিতৈষণামূলক অনুদান এবং অন্যান্য সম্ভাব্য উৎস থেকে সংগ্রহ করার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সঙ্গতি ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে ছাত্র বেতন বেশি করার বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে চিন্তা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ত্যাগ স্বীকারের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাবে। সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে যে, শিক্ষক বেতন ও শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় এবং স্কুল ও কলেজ গৃহ নির্মাণ ও সংরক্ষণ ইত্যাদিতে যে বিপুল ব্যয় হবে তা বহনের জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতেই হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থানীয় জনগণের ভূমিকা বৃদ্ধি করা দরকার। সরকার শিক্ষক বেতনে এবং স্থানীয় জনগণ গৃহসংস্থান ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করবেন।

(১৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ক্ষেত্রেও আশা করা যায় যে, ছাত্র বেতন বর্ধিত করা হবে এবং জনসাধারণকেও সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস যে, ভবিষ্যৎ বংশধরদের কল্যাণের প্রত্যাশায় জনসাধারণ সে অনুপাতে ত্যাগ স্বীকারে সম্মত হবেন। শিক্ষার দ্বারা শেষ পর্যন্ত তাঁরাই বেশি উপকৃত হবেন এই জন্য যে, শিক্ষালাভের ফলে তাঁদের ছেলেমেয়েরাই উন্নততর জীবন যাপনের নানারূপ সুযোগ সুবিধা অধিক পরিমাণে ভোগ করতে সক্ষম হবে। কারণ শিক্ষার প্রত্যক্ষ আর্থিক সুফল হবে জীবন যাত্রার উচ্চতর মান এবং অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যে সামাজিক জীবন যাপন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে স্থায়ী আর্থসামাজিক উন্নতির একটি অবিচ্ছেদ্য ও অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে শিক্ষা যা অর্জনে প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের অধিকতর পরিমাণে ত্যাগ স্বীকারের ঐকান্তিক ইচ্ছা। এ ছাড়াও সরকার কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সমূহকে এককালীন উল্লেখযোগ্য অনুদান দেবার বিষয়ও বিবেচনা করা যায় যাতে তারা সে অনুদান ব্যবহার করে বছরের পর বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের খরচ চালাতে সমর্থ হয়। জনসাধারণের তরফ থেকেও এ রকমের সাহায্যের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

(১৫) মেধাবী অথচ দরিদ্র এমন শিক্ষার্থীদের জন্য সরকার থেকে হোক অথবা ব্যাংক জাতীয় সংস্থা থেকে হোক লেখাপড়ার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(১৬) স্থানীয় সরকারের করের একটি অংশ শিক্ষা খাতে ব্যয় করার জন্য ব্যবস্থা রাখতে হবে।

(১৭) শিল্পোন্নত দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগকে দিয়ে থাকে—গবেষণা প্রসূত ফল লাভের আশায় এবং এজন্য তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সাধারণত শিক্ষা প্রসারে সহায়তার জন্য অর্থ সাহায্য করে না, এমন কি, যে কারি-গরি শিক্ষা দ্বারা শিল্প কারখানা প্রত্যক্ষভাবে উপকার পেয়ে থাকে সে শিক্ষা

প্রসারেও তাদের অনীহা দেখা যায়। শিল্প কারখানায় কারিগর, দক্ষ শ্রমিক, যন্ত্রবিদ, সুপারভাইজার এবং প্রকৌশলী নিয়োগ করা হয়। কিন্তু শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাধারণত এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে দেখা যায় না। কারিগরি শিক্ষার যে কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়েছে তা থেকে শিল্প কারখানা আরো বেশি উপকৃত হবে। সুতরাং আমাদের সুপারিশ এই যে, শিক্ষার বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা-ব্যয়ের বড় একটা অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের বহন করতে হবে। তাই আমরা প্রস্তাব করছি যে, কারিগরি শিক্ষায় অর্থ সাহায্যের জন্য শিল্প কারখানার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হোক। এ ভাবে আরোপিত কর থেকে আদায়কৃত অর্থ পুরোপরিভাবে কারিগরি শিক্ষার জন্য নির্দিষ্টভাবে ব্যয় করা উচিত হবে। শিল্পোন্নত বহু দেশেই এ ধরনের কর বহু পূর্বেই ধার্য করা হয়েছে। এ বাবদে শিল্প কারখানা যে অর্থ ব্যয় করবে তা সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় হিসাবে গণ্য করা বিধেয় হবে।

(১৮) উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আয় ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে কাঁচা মাল, শ্রমিক ও সরঞ্জাম এবং টেকনিশিয়ান ও উপদেষ্টাদের বাবদেও ব্যয় ধরা হয়। অথচ প্রকল্প একবার বাস্তবায়িত ও কার্যকরী হলে তা পরিচালনা ও কাজের জন্য অথবা অন্যত্র অনুরূপ পরিকল্পনার জন্য যে সব লোকের প্রয়োজন হয় তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণত কোনো ব্যয় ধরা হয় না। আমাদের পরিকল্পনাসমূহের কাজের জন্য যে সব লোকের দরকার তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যয় উন্নয়ন তহবিল থেকে বহন করাই যুক্তিসঙ্গত এবং আবশ্যক। বিশেষত বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগ এবং বড় বড় শিল্প সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের এ ক্ষেত্রে আমাদের সুপারিশ এই যে, প্রধান প্রকল্পসমূহের বিশেষত বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগ এবং বড় বড় শিল্প সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের ব্যয়ের একটি উপযুক্ত অংশ বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কৃষি এবং কারিগরি শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা উচিত। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বৃত্তিমূলক, কারিগরি, প্রকৌশল ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এই অর্থ ব্যয় করা যাবে। এমন দৃষ্টান্ত বিশ্বের বহু উন্নত দেশে প্রচলিত আছে। যেমন বৃটেনের কোল বোর্ড, গ্যাস কাউন্সিল এবং সেণ্ট্রাল ইলেকট্রিক অথরিটি তাদের তহবিলের নির্দিষ্ট একটি অংশ শিক্ষা খাতে বরাদ্দ করে থাকে। এই প্রকারের ব্যয়ের ফলে উৎপাদিত দ্রব্যাদির মূল্য প্রাথমিক পর্যায়ে বৃদ্ধি পেতে পারে, তবে সে মূল্য শীঘ্রই কমে যাবে এ জন্য যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক নিয়োগের ফলে একক প্রতি উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাবে। এভাবে বৃত্তিমূলক, কারিগরি ও প্রকৌশল শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগৃহীত হতে পারে। জনসাধারণ প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় বহন করলেও পরে উপকৃত হবে। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতেও সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

(১৯) এশিয়ার যে সব দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বৈদেশিক সাহায্যের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে সে সব দেশে সাধারণত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপোষকতার জন্য তার পাশাপাশি ব্যাপকভাবে শিক্ষা পরিকল্পনাও কার্যকর করা হয়। আমাদের অর্থনীতিতেও বৈদেশিক সাহায্য সর্বোচ্চ পরিমাণে ফলপ্রসূ করতে হলে বৈদেশিক সাহায্য কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা পরিকল্পনা সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, পলিটেকনিক বিদ্যালয় ইত্যাদি স্থাপনের ব্যাপারে অবশ্য বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে, তবে যেরূপ শিক্ষা সম্প্রসারণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণের পক্ষে অপ্রতুল। বৈদেশিক সাহায্যের একটি সঙ্গত অংশ বিভিন্ন পর্যায়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আবশ্যকীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে বরাদ্দ হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি।

২২.২৩. পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নানা উপায়ে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান করতে হবে। উপায়গুলি হচ্ছে কর, ছাত্র বেতন, জনহিতৈষণামূলক অর্থ অনুদান, উন্নয়ন তহবিল, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি। রাজস্ব সংক্রান্ত পরিকল্পনা এ রকম লোকের দ্বারা প্রণীত হওয়া উচিত যাঁরা শিক্ষাক্ষেত্রের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত ও এই ব্যাপারে সহানভূতি-শীল এবং সেই সঙ্গে রাজস্ব কর ধার্য ও উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক জ্ঞানেরও অধিকারী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখায় থাকবেন অর্থনীতি বিজ্ঞান ও অর্থ সংস্থানের যথোপযুক্ত ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দ যাঁরা শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে কিরূপ অর্থ সংস্থান আবশ্যক এবং এদেশে কিরূপ আর্থিক পরিস্থিতি বিদ্যমান সে সম্বন্ধে এবং সরকারের রাজস্বনীতি ও বিভিন্ন দেশের শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত। এভাবে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের প্রস্তাবসমূহ এবং নতুন তহবিল সৃষ্টির উদ্যোগ বাস্তব অর্থ-নৈতিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

২২.২৪. উপরের অনুচ্ছেদসমূহে শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থানের ব্যাপারে নানা উপায় অবলম্বনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। নতুন কর ধার্য, ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, শিক্ষা খাতে ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে অর্থ প্রদান, বৈদেশিক সাহায্য ইত্যাদি কয়েক ধরনের উপায়ের কথা আমরা বলেছি। তবে আমাদের প্রস্তাবাবলীর কার্যকারিতা সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাস্তব ক্ষেত্রে এ সকল পন্থার মাধ্যমে এবং অন্যান্য কি কি প্রক্রিয়ায় শিক্ষার জন্য অর্থ পাওয়া যেতে পারে, তার উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে সরকারকে বিস্তারিতভাবে পরামর্শদানের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও আমরা করছি। শিক্ষা প্রশাসক, কর সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অধ্যায় ২৩

পরিশেষ

২৩·১· এই প্রতিবেদনে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছি এবং সেগুলির সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুপারিশ রেখেছি। আমাদের বিশ্বাস, এই সব সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে, শিক্ষাক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে।

২৩·২· এই প্রতিবেদনের সুপারিশমালা বাস্তবায়নে সরকারকে পরামর্শদান ও সহায়তা করার জন্য অনতিবিলম্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি "বাস্তবায়ন কোষ" ইমপ্লিমেন্টেশন সেল) গঠন করার প্রস্তাব করছি।

ভিন্নমত

ভিন্নমত

অধ্যায় ঃ ৭ ঃ উচ্চশিক্ষা

সমযোগ্যতা, সমঅভিজ্ঞতা ও সমদায়িত্বে নিয়োজিত সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এক ও অভিন্ন করার সিদ্ধান্ত ১৯৭৯ সালে সরকারীভাবে গৃহীত হওয়ার পরও উচ্চ শিক্ষার প্রবেশদ্বার হিসাবে স্বীকৃত একই প্রকার যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দায়িত্বসম্পন্ন সরকারী ও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত অন্যায় ও অযৌক্তিক বৈষম্য বিরাজমান রয়েছে। ব্যবস্থাপনার দিক থেকেও কলেজ পর্যায়ে বর্তমানে ত্রিমুখী ব্যবস্থাপনা প্রচলিত রয়েছে, যথাঃ- (ক) সরকারী কলেজ, (খ) জাতীয়করণকৃত কলেজ ও (গ) বেসরকারী কলেজ। সরাসরি সরকারীভাবে নিয়োগকৃত শিক্ষকগণকে পূর্ণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০০ ভাগ বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে, জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের অভিজ্ঞতার ৫০ ভাগ গণনার ভিত্তিতে বেতন নির্ধারিত হচ্ছে এবং বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ধরা হলেও দেয়া হচ্ছে প্রারম্ভিক বেতনের শতকরা ৭০ ভাগ। শিক্ষার একটি পর্যায়ে তিন ধরনের ব্যবস্থাপনা এবং একই ধরনের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বেতন ও সুযোগ সুবিধা প্রচলিত থাকা কোনো বিবেচনায়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

বর্তমানে বেসরকারী কলেজ জাতীয়করণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার নীতিমালা অনুসরণ করা হয় না। রাজনৈতিক প্রভাব, ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এর ফলে অপরিকল্পিতভাবে একদিকে যেমন কলেজের সংখ্যা বেড়েই চলছে, অন্যদিকে সরকারী ও বেসরকারী কলেজ পর্যায়ে পেশাগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দিন দিন বেড়েই যাচ্ছে।

উপরোক্ত বৈষম্যমূলক কলেজ শিক্ষা ব্যবস্থার অবসানকল্পে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট জাতীয় ভিত্তিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অবিলম্বে কলেজ শিক্ষা জাতীয়করণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। কলেজ শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এক ও অভিন্ন করার লক্ষ্যে কলেজ শিক্ষা জাতীয়করণের কোনো বিকল্প আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে উল্লেখ্য যে অন্তর্বর্তীকালীন শিক্ষা নীতিতে (৮ম অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬) ১৯৮৫ সালের মধ্যে সুপরিকল্পিত উপায়ে কলেজ শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব রাষ্ট্র কর্তৃক গ্রহণের সুস্পষ্ট সুপারিশ করা হয়েছিল।

পেশাগত বৈষম্য দূর করে সরকারী বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এক ও অভিন্ন করার লক্ষ্যে বেসরকারী কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে সরকারী শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার ১০০ ভাগ ১৯৯৫ সালের মধ্যে সরকার কর্তৃক বহন করার যে সুপারিশ কমিশন গ্রহণ করেছে এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে কলেজ শিক্ষা জাতীয়-করণের বিকল্প হিসাবে এ সুপারিশের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছিনা বলে দুঃখিত।

এ, কে, এম শহীদুল্লাহ

অধ্যায় ঃ ২১ ঃ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ১০নং আদেশের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হয়। এই আদেশ পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, বৃটিশ ও ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করা হয়েছে যদিও ঐ দুটি দেশের কমিশনগুলির আকৃতি, প্রকৃতি ও কার্যক্রম ভিন্ন। বাংলাদেশের বর্তমানে মাত্র ৭ (সাত)টি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। এর বিপরীতে ঐ দুই দেশে মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা অনেক বেশি। ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠিত হওয়ার আগে শিক্ষা বিভাগ/শিক্ষা মন্ত্রণালয়ই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয় তত্ত্বাবধান করত। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি বর্তমানের চেয়ে বোধ হয় খারাপ ছিলনা। কমিশনের কার্যাবলী বহুল পরিমাণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পুনরাবৃত্তি (duplication) হচ্ছে। অনেক প্রশাসনিক ও আর্থিক প্রসঙ্গে কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হয়। কমিশন সিদ্ধান্ত দিতে পারে না বা এর সুপারিশ সরকারের প্রতি বাধ্যতামূলক নয়। এই দ্বৈত প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য অযথা সময়, শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান দ্বারা অন্য একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কাজের তদারকি করা নীতিগতভাবে বাঞ্ছনীয় নয়। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর অন্য কোথায়ও এমন ব্যবস্থা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার প্রেক্ষিতে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনেক কাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবৈধ হস্তক্ষেপ বলে মনে করেন। এসবের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে মঞ্জুরী কমিশনের সম্পর্ক মধুর বলা যায় না।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনা পরীক্ষা করা কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কমিশনের অভিমত শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশন অনেক সময় গ্রহণ করে না। ফলে এই পরিকল্পনা একাধিকবার সংশোধন করতে হয় এবং এর জন্য অনেক সময় ও অর্থের অপব্যয় হয়।

উচ্চশিক্ষা তদারকি করার জন্য একটি উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় গঠন করার প্রস্তাব শিক্ষা কমিশন রেখেছে। এই উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয় চালু হলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে করি না।

জাতীয় শিক্ষা কমিশন একটি অনুমোদনকারী (Affiliating) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব রেখেছে। মঞ্জুরী কমিশনকে এই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। এর ফলে অর্থ, জনবল ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন তা নতুনভাবে সরকারকে বহন করতে হবে না এবং কমিশনের অভিজ্ঞ ও পারদর্শী জ্ঞানশক্তিকে পূর্ণভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডঃ এ, এম, এম, মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী

অধ্যায় ঃ ২১ ঃ শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

(১) উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি বিশেষ সেলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিষয় থাকতে পারে যেমন ইউ জি সি সৃষ্টির আগে ছিল।

(২) ইউ জি সি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সাহায্যের পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক কাজ কর্মে বাধা সৃষ্টি করছে এবং ফাইনান্স কমিটি ও সিন্ডিকেটকে কাজ করতে দিচ্ছে না, বরং নতুন নতুন প্রশাসনিক সমস্যা সৃষ্টি করছে। এটা অনেকটা শ্বেত হস্তীর রূপ নিয়েছে এবং পাশা-পাশি একটি সরকার রূপে কাজ করছে। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম ও স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করছে।

(৩) সরকারী টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে বরাদ্দ হয় কিন্তু ইউ জি সি সে টাকা সময়মত ছাড় না করে ব্যাংকে জমা রেখে সুদ নেয়, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজ-কর্ম দীর্ঘায়িত করে এবং বাধার সৃষ্টি করে। এই মুহূর্তে (১৬/২/৮৮) ইউ জি সি ব্যাংকে ছয় কোটি টাকা জমা রেখেছে।

(৪) ইউ জি সি-কে অধিভুক্ত কলেজের দায়িত্ব দিয়ে যাতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ থেকে অধিভুক্ত কলেজ ছাড়া পায় সে ব্যবস্থা করে ইউ জি সি তুলে দেয়া হোক। অধিভুক্ত কলেজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম চালাবার দায়িত্ব ইউ জি সি নিক।

(৫) ইউ জি সি-র সব সুবিধা এফিলিয়েটিং কলেজের দায়িত্ব পালনে এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হোক।

ডঃ এম, এ, মান্নান

অধ্যায় ঃ ২২ ঃ শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বণ্টন ও ব্যয়

"শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বণ্টন ও ব্যয়" শীর্ষক অধ্যায়ের ২২.২২(১৭) প্যারায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, যেহেতু "শিল্পোন্নত দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগকে দিয়ে থাকে—গবেষণা প্রসূত ফল লাভের আশায় এবং এজন্য তারা প্রচুর অর্থ ব্যয় করে," এবং যেহেতু "কারিগরি শিক্ষাদ্বারা মিল কারখানা প্রত্যক্ষভাবে উপকার পেয়ে থাকে", সেহেতু "শিক্ষার বিশেষত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ব্যয়ের বড় একটি অংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে বহন করতে হ'বে" এবং সেজন্যই "কারিগরি শিক্ষার অর্থ সাহায্যের জন্য শিল্প কারখানার উপর প্রত্যক্ষ কর ধার্য করা হোক"। প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে যে "এ বাবদে শিল্প কারখানা যে অর্থ ব্যয় করবে তা সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানার উৎপাদন ব্যয় হিসাবে গণ্য করা হ'বে।"

২২.২২(১৮) প্যারায় প্রস্তাব করা হয়েছে যে, "আমাদের পরিকল্পনাসমূহের কাজের জন্য যেসব লোকের দরকার তাদের শিক্ষা ও ট্রেনিং এর ব্যয় উন্নয়ন তহবিল হতে বহন করাই যুক্তি সংগত এবং আবশ্যক" হেতু "প্রধান প্রকল্পসমূহের বিশেষত বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন, যোগাযোগের" উপর করারোপ করা হোক।

আমার প্রথম বক্তব্য হল যে, আমাদের দেশ শিল্পোন্নত নয়। আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নানা সমস্যাভারে জর্জরিত। বর্তমান সরকারের বলিষ্ঠ শিল্পনীতির ফলে মৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি সবেমাত্র কোনোমতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। সুতরাং শিল্পোন্নত দেশের সাথে তুলনার প্রশ্ন একেবারেই অবান্তর, অবাস্তব। তবুও যদি কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বিভাগকে স্বেচ্ছায় উদ্যোগী হয়ে কোনো গবেষণামূলক কাজের ভার দিতে চায় এবং তৎবাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দেয় তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে বাধ্যতামূলকভাবে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর প্রত্যক্ষ শিক্ষাকর আরোপ করে ঐ করকে শিল্পের উৎপাদন ব্যয় হিসাবে গণ্য করবার প্রস্তাব করা হয়েছে তার ফলাফল আমার সীমিত ধারণায় মারাত্মক হবে এবং এর ফলে শুধু জনগণ আর্থিক বিপাকে পড়বেন তাই নয় সরকারও অহেতুক সমালোচনার সম্মুখীন হবেন—রাজনীতির শিকারে পরিণত হ'বেন। কারণ যখনই এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের কথা বলা হ'বে তখনই শিক্ষা করকে মূলধন করে আমাদের শিল্পপতিরা স্ব-স্ব শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বাড়াবেন এবং জোরে শোরে প্রচার করবেন যে, শিক্ষাকর বাড়ানোর ফলেই আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য বেড়েছে। ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতির সাথে শিক্ষাকর আরোপ জনিত কারণে দ্রব্যমূল্যে বৃদ্ধি সাধারণ মানুষকে অসহিষ্ণু করে তুলবে এবং রাজনীতির একটা বড় খোরাক যোগাবে। ফলে জাতীয় জীবনে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের সম্ভাবনা হয়ে দাঁড়াবে অনেক বেশি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য যে, আমাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রায় নব্বই ভাগেরও বেশি আজও দুর্ভাগ্যবশত সরকারী মালিকানাধীন এবং এগুলির যাবতীয় অর্থের যোগান দিয়ে থাকে সরকার এবং এসব মিল-কারখানার শুভ ফলের কোনো সুনাম সরকার ভোগ করতে না পারলেও এর সামান্যতম ত্রুটির জন্য সরকারকে বহন করতে হয় সব দায়-দায়িত্ব। ১৮ প্যারায় "প্রধান প্রকল্পসমূহের বিশেষত বিদ্যুৎ, সেচ, যানবাহন ও যোগাযোগের" উপর শিক্ষাকরের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তার ফলাফল আরও ভয়াবহ হবে বলে আমার ধারণা। কারণ এর ফলে বিদ্যুতের দাম ও সেচের খরচ বাড়বে এবং তাতে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হ'বে তদুপরি এই করের বোঝা সবটাই গিয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের উপর। প্রসঙ্গত আমরা একথা মনে রাখলে ভাল হবে যে, বাসের সামান্য ভাড়া বৃদ্ধির ফলে নিকট অতীতে সারাদেশে এক ব্যাপক অশান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। যেহেতু বাংলাদেশে বিদ্যুৎ এবং সেচের প্রায় সবটাই সরকারী তত্ত্বাবধানে চালু আছে সেহেতু এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক করারোপের অশুভ প্রতিক্রিয়ার ফল অহেতুক সরকারকে বহন করতে হ'বে। সুতরাং এসব করারোপের ব্যাপারে আমি কমিশনের সম্মানিত ও বিজ্ঞ সদস্যাবৃন্দের সাথে একমত হ'তে পারছিনা বলে দুঃখিত।

মুঃ আয়েন উদ্দিন

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

বিষয়

১। গেজেট বিজ্ঞপ্তি—
বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের গঠন,
সদস্যবৃন্দের তালিকা

২। স্টীয়ারিং কমিটির সদস্যবৃন্দের তালিকা

৩। অনুধ্যান (স্টাডি) কমিটিসমূহের সদস্যবৃন্দের তালিকা

৪। কমিশন সচিবালয় গঠন ও কর্মকর্তাদের তালিকা

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশনের গঠন ও সদস্যবৃন্দের তালিকা

গেজেট বিজ্ঞপ্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা—৮

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

ঢাকা, ২৩শে এপ্রিল, ১৯৮৭/৯ই বৈশাখ, ১৩৯৪

নং শাঃ ৮/১০এম-৮/৮৬/২৭৬(১৫০)-শিক্ষা—দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করে উপযুক্ত সুপারিশ পেশ করার জন্য সরকার নিম্নলিখিত শিক্ষাবিদ/কর্মকর্তা-গণের সমন্বয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেনঃ

চেয়ারম্যান

(১) অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ
প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলর।

সদস্যবৃন্দ

(২) জনাব মোমিন উদ্দিন আহম্মদ
জাতীয় সংসদ সদস্য।

(৩) প্রিন্সিপাল মোঃ আজাহারুল হক
জাতীয় সংসদ সদস্য।

(৪) জনাব এ. কে. এম. শামসুল হুদা
জাতীয় সংসদ সদস্য।

(৫) জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন
জাতীয় সংসদ সদস্য।

(৬) অধ্যক্ষ আবুল কালাম মজুমদার
জাতীয় সংসদ সদস্য।

(৭) কাজী ফজলুর রহমান
সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন।

(৮) ডঃ নরুল ইসলাম
জাতীয় অধ্যাপক।

(৯) অধ্যাপক এ. মান্নান
ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

(১০) অধ্যাপক এম এ. রকীব
ভাইস-চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(১১) ডঃ মোমতাজ উদ্দিন
ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়।

(১২) অধ্যাপক মোশার্রফ হোসেন খান
ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৩) অধ্যাপক জেড, এইচ, ভূঞা
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৪) জনাব আবদুর রশীদ
রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

(১৫) ডঃ মুহাম্মদ ইউনুস
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংক।

(১৬) জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ
প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ সরকার।

(১৭) ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিন
প্রাক্তন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগ।

(১৮) জনাব মোঃ নুরুস সাফা
প্রাক্তন ডি, পি, আই।

(১৯) ডঃ নুরুল হক
প্রাক্তন মহা-পরিচালক, নিয়েয়ার।

(২০) মহা-পরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর।

(২১) মহা-পরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

(২২) মহা-পরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।

(২৩) অধ্যাপক মোঃ আবুল কাসেম
রাজশাহী কলেজ।

(২৪) জনাব এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ
অধ্যক্ষ, শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ।

(২৫) মিসেস কিউ, এ, মনসুর
প্রধান শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়।

(২৬) জনাব মোহাম্মদ নুরুল হক
প্রধান শিক্ষক, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা।

(২৭) জনাব আবুল হোসেন
প্রধান শিক্ষক, নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সদস্য-সচিব

(২৮) জনাব নূরুদ্দীন আলমাসুদ
অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা বিভাগ।

২। কমিশনের কর্মপরিধি নিম্নরূপ হবেঃ

(১) কমিশন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক চাহিদার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমানে বিরাজমান সার্বিক পরিস্থিতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা, কারিগরি ও চিকিৎসা শিক্ষাসহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে সুদৃঢ়, সময়োপযোগী, উৎপাদনমুখী এবং অপচয়বিহীন করার লক্ষ্যে এবং দেশ প্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দক্ষ-মানবসম্পদ ও সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রয়োজনে সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রস্তুত করবে।

(২) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি কমিশনের বিশেষ বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত হবেঃ

(ক) ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পদ্ধতি,

(খ) পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পাঠাগার, শিক্ষণ-পদ্ধতি, শিক্ষার গুণগতমান, পরীক্ষা পদ্ধতি ও শিক্ষার্থীদের সময়, সামর্থ্য ও সম্ভাবনার অপচয়,

(গ) কর্মমুখী শিক্ষা এবং শিক্ষা শেষে কর্মসংস্থান,

(ঘ) শিক্ষক নিয়োগ, পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণ, গবেষণাকর্ম, সামাজিক মর্যাদা ও দায়িত্ববোধ, চাকুরিবিধি ও পদোন্নতি,

(ঙ) শিক্ষা-ব্যয়ের জন্য সরকারী, বেসরকারী ও অভিভাবক প্রভৃতি উৎস হতে প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্পদের সুষম বণ্টন,

(চ) মাথাপিছু ব্যয়, ছাত্র-বেতন ও মেধাভিত্তিক বৃত্তি প্রদান,

(ছ) ছাত্র সমস্যা ও শিক্ষাঙ্গনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা,

(জ) বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনার সংস্কার ও উন্নয়ন,

(ঝ) বাংলাদেশে এর আগে বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন/কমিটি কর্তৃক পেশকৃত রিপোর্টসমূহের কি কি সুপারিশ গ্রহণ করা যায়,

(ঞ) প্রাসঙ্গিক অন্য যে-কোন বিষয়।

৩। কমিশন সুপারিশ চূড়ান্ত করার প্রস্তুতির পূর্বে জনমত যাচাই করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন স্তরের ও অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের (শিক্ষাবিদ), শিক্ষক, ছাত্র, রাজনীতিবিদ, প্রশাসক, (পেশাজীবী প্রভৃতি) সংগে কয়েকটি বৈঠক অথবা সেমিনারের মাধ্যমে মত বিনিময় করবেন।

৪। কমিশন সুপারিশগুলি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচীর রূপরেখা প্রস্তুত করবেন।

৫। কমিশন অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করবেন এবং ২৪-৭-১৯৮৭ তারিখের মধ্যে সুপারিশ ও কর্মসূচীর রূপরেখাসহ চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করবেন।

ঢাকা, ২৮শে এপ্রিল, ১৯৮৭/১৪ই বৈশাখ, ১৩৯৪

নং শাখা৮/১০এম-৮/৮৬/১৬৫-শিক্ষা—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩-৪-১৯৮৭ ইং তারিখের শাখা৮/১০এম-৮/৮৬/২৭৬/(১৫০)-শিক্ষা সংখ্যক বিজ্ঞপ্তির অনুবৃত্তিক্রমে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ পেশ করিবার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক শামসুল হককে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

ঢাকা, ২রা মে, ১৯৮৭/১৮ই বৈশাখ, ১৩৯৪

নং শাখা৮/১০এম-৮/৮৬/১৭০-শিক্ষা—শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩-৪-১৯৮৭ তারিখের শাখা৮/১০এম-৮/৮৬/২৭৬(১৫০)-শিক্ষা সংখ্যক বিজ্ঞপ্তির অনুবৃত্তিক্রমে দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া সুপারিশ পেশ করিবার লক্ষ্যে গঠিত কমিটিতে মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার (ঢাকা) অধ্যক্ষকে সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এম, এ, সাঈদ
শিক্ষা সচিব
ও
চ্যান্সেলরের সচিব।

স্টীয়ারিং কমিটি

৯/৫/৮৭ তারিখে অনুষ্ঠিত শিক্ষা কমিশনের উদ্বোধনী সভায় নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে একটি স্টীয়ারিং কমিটি গঠন করা হয়ঃ

১।	অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ	... সভাপতি
২।	জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দিন জাতীয় সংসদ সদস্য,	... সদস্য
৩।	অধ্যাপক নুরুল ইসলাম জাতীয় অধ্যাপক,	... ”
৪।	ডঃ এ, এ, এম, মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী ভাইস-চ্যান্সেলর, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়,	... ”
৫।	অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়,	... ”
৬।	অধ্যাপক জেড, এইচ, ভুইয়া কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,	... ”
৭।	ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী-শরফুদ্দীন প্রাক্তন সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ,	... ”
৮।	জনাব মোহাম্মদ নুরুস্‌ সাফা প্রাক্তন ডি, পি, আই,	... ”
৯।	ডঃ মুহাম্মদ নুরুল হক প্রাক্তন মহাপরিচালক, নিয়েয়ার,	... ”
১০।	অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,	... ”
১১।	জনাব নুরুদ্দীন আলমাসুদ অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ও সদস্য সচিব, জাতীয় শিক্ষা কমিশন	... ”

অনুধ্যান (স্ট্যাডি) কমিটিসমূহ

১। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা

১।	ডঃ জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া	... মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২।	জনাব আজিজ আহমদ চৌধুরী	... পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।	—যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক	... সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪।	জনাব মোঃ আব্দুল জব্বার	পরিচালক, নিয়েয়ার, ঢাকা।	
৫।	জনাব আবদুল মান্নান	... পরিচালক, ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ।	
৬।	ডঃ হাফিজ উদ্দিন শেখ	... শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৭।	ডঃ হালিমা খাতুন	... শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৮।	মিস সাহানা বেগম	... সুপারিনটেনডেন্ট, পি, টি, আই, ফরিদপুর।	
৯।	জনাব মোঃ নূরুল হক	... প্রধান শিক্ষক, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী স্কুল, ঢাকা ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
১০।	মীর আবুল হোসেন	... প্রধান শিক্ষক, নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
১১।	জনাব হাসান আলী	... সহকারী পরিচালক (অর্থ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১২।	ডঃ এ,কে,এম, খায়রুল আলম	... ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	
১৩।	সিস্টার মেরী পেট্রা	... প্রধান শিক্ষিকা, বটমলী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।	
১৪।	জনাব এম, এ, কুদ্দুস	... প্রাক্তন সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক।	

২। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা

১। ডঃ মোহম্মদ নূরুল হক	...	সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন —আহবায়ক
২। জনাব মুহম্মদ আনওয়ার আলী	...	এস, এম, ডি, এস, নিয়েয়ার,—যুগ্ম-আহবায়ক ঢাকা।
৩। ডঃ এ এইচ এম করিম	...	মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর ও সদস্য জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৪। জনাব মুহম্মদ এলতাস উদ্দিন	...	চেয়ারম্যান, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা।
৫। ডঃ আবু হামিদ লতিফ	...	পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। জনাব আব্দুর রশীদ চৌধুরী	...	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৭। ডঃ মোঃ আবুল কাসেম	...	অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৮। জনাব এ কে এম শহীদুল্লাহ	...	অধ্যক্ষ, শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৯। শেখ দামান আলা	...	মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা উপকরণ বোর্ড।
১০। জনাব গিয়াস উদ্দিন হায়দার চৌধুরী।	...	অধ্যক্ষ, রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
১১। ডঃ নূরুন্নাহার ফয়েজুন্নেসা	...	শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২। জনাব মোঃ নূরুল হক	...	প্রধান শিক্ষক, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই-স্কুল, ঢাকা ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১৩। মিসেস কিউ, এ, মনসুর	...	প্রধান শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয় ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১৪। জনাব মোহাঃ মজিবুর রহমান	...	বিশেষজ্ঞ, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা নিয়েয়ার, ঢাকা।
১৫। অধ্যক্ষ,	...	নটরডেম কলেজ, ঢাকা।
১৬। জনাব মোহাঃ সিদ্দিকুর রহমান	..	অধ্যক্ষ, তেজগাঁও বিজ্ঞান কলেজ, ঢাকা।
১৭। জনাব আলফাজুর রহমান	...	অধ্যক্ষ, কুমুদিনী কলেজ, টাংগাইল।
১৮। অধ্যক্ষ,	...	মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ, টাংগাইল।

৩। মাদ্রাসা শিক্ষা

১। ডঃ মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী	...	উপাচার্য, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় —আহবায়ক ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
২। জনাব মোঃ ইউনুছ আলী শিকদার	...	অধ্যক্ষ, আলিয়া মাদ্রাসা, ঢাকা-যুগ্ম-আহবায়ক ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৩। জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন	...	জাতীয় সংসদ সদস্য ও সদস্য, জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৪। জনাব এম, এ, সোবহান	...	মহা-পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।
৫। অধ্যাপক হাবিবুর রহমান	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। অধ্যাপক মোঃ মুজিবুর রহমান	...	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৭। ডঃ মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	...	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৮। জনাব আবদুর রকিব	...	চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯। ডঃ মোহাম্মদ ইছহাক	...	সাবেক অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০। মওলানা আব্দুস সালাম	...	অধ্যক্ষ, দুর্বাটি মাদ্রাসা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর।
১১। খন্দকার নাসির উদ্দিন	...	চাঁদনা মাদ্রাসা।
১২। মওলানা ফখরুদ্দিন	...	আলিয়া মাদ্রাসা।
১৩। জনাব ওয়াজি উল্লাহ	...	আলিয়া মাদ্রাসা।
১৪। ডঃ মুহাম্মদ নূরুল হক	...	প্রাক্তন ডি, জি, নিয়েয়ার, ঢাকা।
১৫। জনাব আবু বকর রফিক আহমদ	...	ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬। জনাব তমিজ উদ্দিন	...	বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড।
১৭। মাওলানা অবায়দুল হক	...	প্রাক্তন হেড মাওলানা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

৪। শিক্ষক-শিক্ষণ

১। ডঃ এ এইচ এম করিম	মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	—আহবায়ক
২। জনাব শামসুল কবীর	এম. ডি. এস, নিয়েয়ার, ঢাকা	-যুগ্ম-আহবায়ক
৩। ডঃ আব্দুল্লাহ আল-মুতী-শরফুদ্দীন	প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ সরকার।	
৪। ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক	সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৫। জনাব আবদুর রশীদ	রেজিস্ট্রার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৬। ডঃ আবু হামিদ লতিফ	পরিচালক, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৭। মিসেস রাশিদা বেগম	অধ্যক্ষা, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।	
৮। ডঃ শামসুল হক	প্রাক্তন পরিচালক, আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৯। মিসেস সারা তৈফুর মাহমুদ	অধ্যক্ষা, মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ময়মনসিংহ।	
১০। জনাব রফিকুল হক	টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।	
১১। কাজী আবদুল আলিম	অধ্যক্ষ, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।	
১২। জনাব সাইফুল হক	অধ্যক্ষ, ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, বগুড়া।	
১৩। ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডিসট্যান্স এডুকেশন (বাইড), ঢাকা।	
১৪। জনাব আবদুর রশীদ খান	সহকারী পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।	
১৫। জনাব আবদুল মান্নান	পরিচালক, ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্রাইমারী এডুকেশন, ময়মনসিংহ।	

৫। উচ্চ-শিক্ষা

(মানবিক, সামাজিক বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও আইন শিক্ষা)

১।	অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক	... বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আহবায়ক ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
২।	ডঃ দেলওয়ার হোসেন	... বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন—যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	জনাব মোমিন উদ্দিন আহমেদ	.. জাতীয় সংসদ সদস্য।
৪।	জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দিন	... জাতীয় সংসদ সদস্য।
৫।	অধ্যাপক আবদুল মান্নান	... উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৬।	অধ্যাপক এম এ রকীব	.. উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৭।	অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী	... উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৮।	অধ্যাপক এ এফ এম. কামাল উদ্দিন	... উপাচার্য, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
৯।	জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১০।	ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ	... অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১।	অধ্যাপক, এ, এম, শামসুল হক	... অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১২।	ডঃ মেসবাহ উদ্দিন আহমেদ	.. অধ্যাপক, জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩।	ডঃ কাজী জাকির হোসেন	... অধ্যাপক, প্রাণী বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪।	ডঃ শমসের আলী	... অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫।	ডঃ এম হাবিবুল্লাহ	হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬।	ডঃ আসগর আলী তালুকদার	... অধ্যাপক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭।	অধ্যাপক, কে, এ, এ, কামরুদ্দিন	... আইন অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮।	জনাব এ, কে, এম, শহীদুল্লাহ	... অধ্যক্ষ, শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজ, ঢাকা ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
১৯।	মীর মোস্তফা আলী	... পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা।

৬। প্রকৌশল ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১।	অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান	... উপাচার্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়—আহবায়ক ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
২।	ডঃ ইকবাল মাহমুদ	... অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।
৪।	জনাব এম, টি, সি, মিয়া	... মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
৫।	জনাব এস, এম, আল হোসায়নী	... চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, ঢাকা।
৬।	জনাব শফিউদ্দীন সরকার	... সভাপতি ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স।
৭।	জনাব এম, এ হান্নান	.. ডাইরেক্টর, বি, আই, টি, খুলনা।
৮।	জনাব মোশাররফ হোসেন	.. কনকর্স
৯।	জনাব মোঃ শাহজাহান	.. প্রজেক্ট ডিরেক্টর, টেকনিক্যাল এডুকেশন, ঢাকা।
১০।	জনাব আবদুর রফিক	... পরিচালক, কারিকুলাম, টেকনিকেল এডুকেশন বোর্ড, ঢাকা।
১১।	ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান	... অধ্যক্ষ, টেক্সটাইল কলেজ, ঢাকা।
১২।	ডঃ আজিজুর রহমান	... অধ্যক্ষ, লেদার টেকনোলজী কলেজ, ঢাকা।
১৩।	জনাব ইমদাদুল হক	.. অধ্যক্ষ, ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ঢাকা।
১৪।	জনাব আবদুল মতিন	... মেহেরপুর ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট।
১৫।	জনাব আর মল্লিক	... প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬।	জনাব এম, আর, চৌধুরী	... মহা-পরিচালক, জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, ঢাকা।

৭। কৃষি শিক্ষা

১।	অধ্যাপক জেড, এইচ, ভূঁইয়া	... কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২।	ডঃ মতলুবুর রহমান	... বি, এ, আর, সি, ঢাকা,	—যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪।	অধ্যাপক শাহ মোঃ ফারুক	... কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	
৫।	অধ্যাপক এম, এল, দেওয়ান	... কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	
৬।	অধ্যাপক মোঃ আঃ লতীফ	... কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	
৭।	অধ্যাপক এ, এম, মুহসী	... কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	
৮।	অধ্যাপক মোঃ আসাদুর রহমান	... পরিচালক, মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	
৯।	ডঃ আমিনুল ইসলাম	... মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১০।	মহা পরিচালক,	... কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, জয়দেবপুর।	
১১।	ডঃ মোস্তাফিজুর রহমান	... রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	
১২।	ডঃ মোহাঃ শফিউল আলম	... অধ্যক্ষ, পটুয়াখালী কৃষি কলেজ, দুমকী, পটুয়াখালী।	
১৩।	অধ্যক্ষ,	... তেজগাঁও কৃষি কলেজ, ঢাকা।	
১৪।	মোহাঃ শহিদুল ইসলাম	... মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ, খামারবাড়ী, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।	
১৫।	ডঃ মীর্জা জলিল	... প্রেসিডেন্ট, কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।	
১৬।	জনাব এম, এ, রহমান	... কনজারভেটার অব ফরেস্ট, মহাখালি, ঢাকা।	
১৭।	জনাব ওমর আলী	... সদস্য পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ঢাকা।	

৮। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষা

১। ডাঃ নূরুল ইসলাম	... জাতীয় অধ্যাপক ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২। অধ্যাপক মোঃ ওয়ালি উল্লাহ	... অধ্যক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।	—যুগ্ম-আহবায়ক
৩। জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪। ডঃ মুহম্মদ নূরুল হক	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৫। প্রফেসর আবু আহমেদ চৌধুরী	... সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, ঢাকা।	
৬। ডাঃ সারোয়ার আলী	... মহা-সচিব, বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন।	
৭। প্রফেসর আবদুল মান্নান	... অধ্যাপক, নিউরোলজী, আই পি জি এম আর, ঢাকা।	
৮। ডাঃ মিজানুর রহমান	... নিপসম, মহাখালী, ঢাকা।	
৯। ডাঃ এম, এ, হাই.	... অধ্যাপক, ফিজিওলজী, আই, পি, জি, এম, আর, ঢাকা।	
১০। ডাঃ কে, এম, ফরিদ উদ্দিন	... অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।	
১১। ডাঃ জোবেদা খাতুন	... প্রফেসর, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।	
১২। ডাঃ এস, এ, ওয়াদুদ	... ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতাল, ঢাকা।	
১৩। অধ্যাপক এম, এন, আমিন	... আই পি জি এম আর, ঢাকা।	
১৪। অধ্যাপক এ, কে, এম, আব্দুস সালাম	... অধ্যাপক, ঢাকা মেডিকেল কলেজ।	
১৫। কাজী মশিউর রহমান	... অধ্যাপক, আই পি জি এম আর, ঢাকা।	

৯। বিশেষ শিক্ষা

(নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দূর শিক্ষণ, শরীর চর্চা শিক্ষা, শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা, সংগীত শিক্ষা, ললিত কলা শিক্ষা, জনসংখ্যা শিক্ষা, নারী শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষা ইত্যাদি)।

১। ডঃ মোহাম্মদ ইউনুস ... ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্রামীণ ব্যাংক। —আহবায়ক

২। ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম .. পরিচালক, বাইড, ঢাকা।

৩। মিসেস কিউ, এ, মনসুর .. প্রধান শিক্ষিকা, অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা।

৪। জনাব মোঃ নূরুল হক ... প্রধান শিক্ষক, গভর্ণমেন্ট ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ঢাকা।

৫। মীর আবুল হোসেন ... প্রধান শিক্ষক, নবাবগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা।

৬। ডঃ এ, কে, এম, ওবায়েদ উল্লাহ পরিচালক, নিয়েয়ার, ঢাকা।

৭। জনাব সামন্ত ভদ্র বড়ুয়া ... সদস্য-সচিব, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, ঢাকা।

৮। ডঃ সুলতানা সারোওয়াতারা জামান .. মনস্তত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৯। জনাব আবুল কাশেম সন্দীপ ... উপ-পরিচালক, ভি, ই, আর, সি, সাভার।

১০। কাজী রফিকুল আলম .. আহসানিয়া মিশন, ঢাকা।

১১। মোঃ আবু তাহের .. পরিচালক, সুরভি বিদ্যালয়, ঢাকা।

১২। ওয়াজ উদ্দীন আহমদ .. অধ্যক্ষ, মূক ও বধির বিদ্যালয়, ঢাকা।

১৩। ডঃ মুহাম্মদ নূরুল হক .. প্রাক্তন ডি, জি, নিয়েয়ার, ঢাকা।

১৪। মীর মোস্তফা আলী ... পরিচালক, ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্টস, ঢাকা।

১৫। জনাব আজাদুর রহমান ... অধ্যক্ষ, সংগীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

১৬। কাজী আবদুল আলিম .. অধ্যক্ষ, শারীরিক শিক্ষা কলেজ, ঢাকা।

১৭। জনাব মুহাম্মদ আনওয়ার আলী .. এস, এম, ডি, এস, নিয়েয়ার, ঢাকা।

১৮। প্রফেসর মুহম্মদ আব্দুল মান্নান ...পরিচালক, নেইপ, ময়মনসিংহ।

১০। পরীক্ষা ও মূল্যায়ন

১। ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন	সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২। অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ	পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	—যুগ্ম-আহবায়ক
৩। প্রিন্সিপাল মোঃ আজহারুল হক	জাতীয় সংসদ সদস্য ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪। জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা	সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৫। ডঃ মোঃ আবুল কাসেম	অধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৬। জনাব এ, কে, এম শহীদুল্লাহ	সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৭। জনাব মুহম্মদ আনওয়ার আলী	এস, এম, ডি, এস, নিয়েয়ার, ঢাকা।	
৮। ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক	অধ্যাপক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।	
৯। ডঃ আনওয়ারুল আজিম	অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	
১০। ডঃ এ, কে, শামসুদ্দিন আহমদ	অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	
১১। অধ্যাপক কমির উদ্দিন মোল্লা	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।	
১২। ডঃ মোহতাসেম হোসেন	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৩। ডঃ তাহেরুল ইসলাম	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৪। অধ্যাপক মোঃ এলতাস উদ্দিন	চেয়ারম্যান, জাতীয় কারিকুলাম ও টেক্সটবুক বোর্ড, ঢাকা।	
১৫। জনাব আবদুর রশীদ চৌধুরী	চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।	
১৬। ডঃ এ, এম, মামুনুর রশীদ	অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৭। ডঃ মাযহারুল হক	আই, ই, আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৮। ডঃ খান মোঃ সিরাজুল ইসলাম	পরিচালক, বাইড, ঢাকা।	

১১। শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা

১।	জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা	.. সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২।	ডঃ এ, কে এম, ওবায়েদ উল্লাহ	... পরিচালক, নিয়েয়ার, ঢাকা	—যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	জনাব মুহাম্মদ আয়েন উদ্দীন	.. জাতীয় সংসদ সদস্য ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪।	কাজী ফজলুর রহমান	.. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।	
৫।	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ	.. সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৬।	ডঃ আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দিন	.. সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৭।	অধ্যাপক মোঃ শামসুল হক	... সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন	
৮।	ডঃ নূরুদ্দিন আহমেদ	... অধ্যাপক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।	
৯।	ডঃ এম, আনিসুজ্জামান	... লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	
১০।	ডঃ আবদুল জব্বার মিয়া	.. অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
১১।	ডঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী	... অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	
১২।	ডঃ সৈয়দ সফিউল্লাহ	.. অধ্যাপক, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।	
১৩।	অধ্যাপক ফজলে হোসেন	.. গণিত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	

১২। শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান, অর্থের সুষম বন্টন ও ব্যয়

১।	জনাব বোরহান উদ্দিন আহমদ	... সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	—আহবায়ক
২।	ডঃ মোঃ নঈম উদ্দীন	... পরিকল্পনা ও উন্নয়ন অফিসার, জাহাংগীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	যুগ্ম-আহবায়ক
৩।	কাজী ফজলুর রহমান	.. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৪।	জনাব মোহাম্মদ নুরুস সাফা	.. সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৫।	জনাব নুরুদ্দীন আলমাসুদ	... অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সদস্য সচিব বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন।	
৬।	অধ্যাপক হাবিবুর রহমান	.. ডীন, বাণিজ্য অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।	
৭।	জনাব শহিদুল হক চৌধুরী	... সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।	
৮।	ডঃ হারুন-অর-রশিদ	.. অর্থ মন্ত্রণালয়।	
৯।	ডঃ এস এ সামাদ	.. যুগ্ম-সচিব, বহিঃসম্পদ বিভাগ।	
১০।	অধ্যাপক আলী এমদাদ খান	.. হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।	

কমিশন সচিবালয়

প্রশাসন শাখা

১। অধ্যাপক মফিজ উদ্দিন আহমদ ... চেয়ারম্যান

২। জনাব নূরুদ্দীন আলমাসুদ ... সদস্য-সচিব
অতিরিক্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৩। মোহাঃ সাইফুল ইসলাম ... পরিচালক
সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান
সরকারী তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ।

৪। মোহাম্মদ নেসার উদ্দিন ... উপ-পরিচালক
সহকারী অধ্যাপক, হিসাব বিজ্ঞান,
সরকারী কবি নজরুল কলেজ, ঢাকা।

বিশেষজ্ঞ শাখা

১। জনাব মোহাম্মদ নূরুস সাফা সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন
প্রাক্তন ডি, পি, আই, ঢাকা।

২। ডঃ মুহাম্মদ নূরুল হক ,,
প্রাক্তন মহাপরিচালক,
নিয়েয়ার, ঢাকা।

৩। মুহম্মদ আনওয়ার আলী ... পরিচালক
এস, এম, ডি, এস, নিয়েয়ার, ঢাকা

৪। মোহাম্মদ শামসুল কবীর। ... পরিচালক
এম, ডি, এস, নিয়েয়ার, ঢাকা।

৫। আখতারুজ্জামান মোঃ ইলিয়াস। ... পরিচালক
উপাধ্যক্ষ, সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, ঢাকা।

৬। মাহবুবুল আলম ... পরিচালক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নরসিংদী সরকারী কলেজ।

৭। মোঃ শামসুল হক ... পরিচালক
সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ,
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারী কলেজ,
গাজীপুর।

বাঃসঃমুঃ—৮৭/৮৮-৫১২৩ডি—১৬০০—১২-৬-৮৮।